৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

সন্দেশ



আশ্বিন, ১৩৪০



JATIN SAHA

সম্পাদক- শ্রীসুবিনয় রায়
শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম্‌এস্‌সি

ছেলেমেয়েদের জন্য

কয়েকখানি বাছাই বই

এগুলির পরিচয় ছেলেমেয়েদের কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যেমনি সরস সুন্দর ভাষা, তেমনি চমৎকার চমৎকার এক রঙের ও ৩-রঙের ছবি। মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত, এবং ডিরেক্টর-অব-পাবলিক-ইনস্ট্রাকসন কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র ...	॥০	কথাসরিৎ সাগর ...	॥৵০
” বেতাল পঞ্চবিংশতি	॥০	রবিন্ হুড	॥৶০
” বত্রিশ সিংহাসন	॥০	ওডিসিয়ুস	।৶০
পুরাণের গল্প ...	॥০	ইলিয়াড	।৶০

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

নূতন সংস্করণ

স্বাস্থ্য

পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত

স্বাস্থ্যের কথা ছেলেমেয়েদের জন্য অতি সরল সরস ভাবে লেখা। ভাল কাগজে, বড় অক্ষরে, পরিষ্কার ছাপা। অনেকগুলি ছোট ছবি, সুন্দর মলাট। মূল্য—ছয় আনা

১। পড়া শুনা ।৶০

২। খেলার পড়া ।৶০

বই দুইখানির নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম-এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা



কিরাত ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অঙ্কিত চিত্র হইতে)

মা ও ছেলের আনন্দ !



মা ও ছেলে, ছোট ও বড়, সকলেরই আনন্দ ও গর্ব্ব—
পাবনা শিল্পসঞ্জীবনীর গেঞ্জী প'রে ও পরিয়ে

শিল্প সঞ্জীবনীর গেঞ্জীর কারখানা এদেশে সব চেয়ে প্রথম ও প্রধান। তাঁদের তৈরী নানা রকম হোসিয়ারী জিনিষ আপনারা সকলেই জানেন এবং ভালবাসেন।

এবার পূজায় তাঁরা আপনাদের জন্য বিপুল আয়োজন করেছেন। পূজার বাজার করার সময় তাঁদের জিনিষ নিশ্চয়ই আপনাদের আনন্দ দেবে।

পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী, লিমিটেড।

COLOURED DOCUMENT.

গত বর্ষের

বাঁধানো "সন্দেশ"

নব পর্য্যায় ২য় বর্ষের (১৩৩৯-৪০) বাঁধানো সন্দেশ বাহির হইল।

ছেলে মেয়েদের এমন একখানি সুন্দর ও এত সুলভ মূল্যের বই আর নাই!

৫৭২ পৃষ্ঠার প্রকাণ্ড বই — বহু ৩-রঙা এবং অসংখ্য এক-রঙা ছবিতে ভরা। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকলেখিকার সরস লেখায় অতীব মনোরম।

দাম মাত্র ২৲ টাকা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,
১১৭।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

নীতিগল্পগুচ্ছ

"বসুমতী"র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক, ঔপন্যাসিক ও "মনোমোহনে" অভিনীত "মেঘনাথ" নাট্যকার—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত।

ছেলেমেয়েদেরকে আনন্দ দেবার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও আদর্শের পথে টানবার চেষ্টায় বিখ্যাত পারসিক নীতিগ্রন্থ "গোলস্তান" ও অন্যান্য স্থান থেকে কয়েকটী বাছা বাছা গল্পের ছায়া নিয়ে সরল ও ঝরঝরে বাঙলা ভাব ও ভাষায় এই "নীতি গল্প গুচ্ছ" রচিত। পাতায় পাতায় ছবি,—চমৎকার তিন-রঙা ছবির বাঁধাই, এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, উপহারের শ্রেষ্ঠ বই। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস –
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ময়ূরপঙ্খী রাজকন্যা

শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

কথায় কথায় ছবি,
ঝক্‌ঝকে ছাপা,
চমৎকার মলাট

দাম আট আনা

বড় বড় সব দোকানেই পাওয়া যায়

সন্দেশ

নবপর্য্যায়—৩য় বর্ষ ২ আশ্বিন ১৩৪০—ভাদ্র ১৩৪১

বর্ষ সূচী

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
অজানা কুটুম	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...	৩৪৫
অতীতের অতিকায়	শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ	...	৩৬
অনেকেরই জোড়া আছে	শ্রীসুবিনয় রায়	...	৩৯৯
অন্ধ	শ্রীমান সুবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	৫৫৫
অভাগা	শ্রীঅরুণকুমার দত্ত	...	৪৬০
আমরা নাচি	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...	৮৪
আকাশ ও মা	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৪৫
আত্মদান	শ্রীমতী বেণু গুপ্ত	...	১৭৮
আর ঝগড়া নয়	শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩৯২
আত্ম-তৃপ্তি	শ্রীমতী নিভাননী দেবী	...	৩৯৫
আষাঢ়ে ছড়া	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...	৪১৯
আসামের বন্যা	কুমারী হেমলতা লাহিড়ী	...	৫০৫
একটি পাখীর কথা	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	...	২৭
এক মিনিটের হাসি	...	...	১১৮
এম্-সি-সির খেলা	...	...	২৬৭
ওস্তাদী মার-প্যাঁচ্	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...	৩২৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কবি অভিরাম	শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ...	২১৯
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলার	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ বি-টি	৪৯৭
কাকাবাবু	শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী, বি এ ...	৭০
কালা	... ...	৩০৭
কাণ্ড শোন	শ্রীসত্যগোপাল সরকার ...	৩৯৮
কুহু	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ...	২৮
কেরানী	শ্রীহিমাংশুভূষণ সেন গুপ্ত ...	২৯৬
খড়কুটোর জীব	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী ...	৫৪৬
খিচুড়ী	শ্রীসত্যগোপাল সরকার ..	৩৩৯
খুকির নাম	শ্রীবুদ্ধদেব বসু ...	১৮
খেলা	শ্রীসুবিনয় রায় ...	২৮৮
খেলা (আঙ্গুলমুখো)	...	২১৯
গল্প-স্বল্প	৯৬, ১৪১, ১৮১, ২২৫, ২৭২, ৩১৭, ৩৬৪, ৪১৪, ৪৬১, ৫০৮, ৫৫	
গোবিন্‌দা'র গোয়েন্দাগিরি	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	৫৩৬
ঘড়ি-রহস্য	শ্রীদেবব্রত রায় চৌধুরী, এম বি ...	৮৮
ঘুমের রাজা	শ্রীযতীন সাহা ...	৫২৯
ঘৃণা	শ্রীমতী নিভাননী দেবী ...	২৫৬
চল্ চল্ চল্	শ্রীমান প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ...	৫৫৬
চালাকির ফল	শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন ...	৫৫৬
চালিয়াৎ চীৎপাত	... ...	৪৪৬
চিঠি	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ...	১০৬
চিড়িয়াখানার পলাতক	শ্রীসুবিনয় রায় ...	১১৬
চিরসুন্দর কাশ্মীর	শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু ...	৫২৬
চোখের ভুল	শ্রীসুবিনয় রায় ...	১৫৬
চৈতী-সাঁঝে	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	২৭৬
ছোটদের আশা	শ্রীকালীপদ শর্ম্মা ...	৪৮৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ছোট্ট-বেলায় ...	শ্রীসুবিনয় রায় ...	১২৫
গুর দান ...	কুমারী সাধনা সরকার ...	৩৬১
ষ্টি সাঁঝে বিষ্টি	শ্রীঋটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩৭১
পানী মুখোস	শ্রীসুবিনয় রায় ...	১৫
বজন্তুর কথা	শ্রীননীগোপাল মজুমদার ...	৪৭৩
জুর দেশে ...	শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী ...	৫৩৫
কার শোক	কুমারী হেমলতা লাহিড়ী ..	৪৫৮
ক্ দুপুর বেলা	শ্রীসুকুমার দে সরকার ...	৪৬১
ক্ ও ভুতুরেবাড়ী	শ্রীদেবব্রত রায় চৌধুরী, এম্-বি ...	৩৫২,৩৭৩
ল গাছ—তার পাশে চাঁদ	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	২৪১
রুণের অভিযান	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ...	৩৩১
ক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় দলের ফুটবল খেলা	...	৫৪৯
াড়ির দাম	শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত ...	৩৪৩
নের বেলায়	শ্রীলীলা দেবী, এম্-এ ...	৩
বা স্বপ্ন	শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বানার্জ্জি ..	৪১০
ষ্টু ছেলে	শ্রীরাধামোহন বটব্যাল, বি-এ ...	২৬০
দেরে কেটে নাক্ দেরে কেটে"	শ্রীমান সুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী ...	৪০৬
দোল-পার্ব্বণী	শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী ...	২৮১
াঁধার উত্তর	৪৮, ৯৯, ১৪৩, ১৮৩, ২২৭, ২৭৫, ৩২০, ৩৬৯, ৪১৭, ৪৬৩, ৫১০,	৫৬১
নী গাঙ্গুলী	শ্রীযতীন সাহা ...	২৬১
নবীনের গান	শ্রীশিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ...	৩৫৯
তুন ছাতা যে	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	৪৬৫
দীপারের কেয়া	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫১৩
াতির যুক্তি	শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য ...	৪৩৫
নশুর ব্যথা	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৩৭
নিমের চারা	শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ...	৫০৬
তুন ধাঁধা	৫০, ১০০, ১৪৪, ১৮৪, ২২৮, ২৭৬, ৩২১, ৩৬৯, ৪১৮, ৪৬৪, ৫১১,	৫৬২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পণ্ডিতের খেলা	শ্রীসুবিনয় রায় ...	৪৭, ৮৭
পণ্ডিত বিদায়	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	১৮৯
পল্লী-কুসুম	শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস ...	৪৫
পশুর ভাব ও ভাষা	শ্রীসুবিনয় রায় ...	৪৫
পারুল	শ্রীআহম্‌দ নওয়াজ, বি-এ, বি-টি ...	১৬
পাঁচ টাকা	শ্রীঅসীম বসু ...	১৩
পাঁচ বোকার কাহিনী	শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২১
পূজোর মজা	শ্রীযতীন সাহা ...	২
পৃথিবীর কম্পন	শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম্ এস-সি ...	২৫
পেলিকান	শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম্ এস-সি ...	৪২
ফাগুণ বীণা	শ্রীমনীন্দ্র দত্ত ...	২২
ফুলের ফসল	শ্রীসুবিনয় রায় ...	১১
বইয়ের মেলা	শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন ...	৪৯
বর্ষা	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৩৭
বহুরূপী	... ...	৫
বড়দিনের উপহার	শ্রীকুমারেন্দ্রনাথ সরকার, বি-এ ...	১
বাজি-বিভ্রাট	শ্রীসুবিনয় রায় ...	১৫
বাবলা	মিস্ হামিদা হোসেন ...	১৭
বাদল রাতে	শ্রীদেবব্রত রায়চৌধুরী ...	১৩
বাদল্ স্বপন	শ্রীষষ্ঠীধন সেন গুপ্ত	১৬
ব্যাধ বালক	শ্রীনির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়	২১
বিনি পয়সার ভোজ	শ্রীহেমদাকান্ত বন্দোপাধ্যায় ...	২
বিজলী বাতি	শ্রীসুবিনয় রায় ...	২৫
বীরত্ব	শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী ...	৪২
বুদ্ধি বলিহারী	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	২২
বেচারী দীনু	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	১১
বেহালা	শ্রীঅমিয়কুমার রায়চৌধুরী ...	৪৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভোকা	শ্রীযতীন সাহা ...	১০৩
‘বোধ হয়’ বিদ্যালয়	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম–এ ...	৩১০
ভবিষ্যৎ	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম্–এ ...	৪২২
ভাগ্যিস ...	... ...	১১৪
ভারতে বিলাতের ক্রিকেট দল ...	... ...	১৬৪
ভূমিকম্পে	... ...	২১৮
ভোরের পাখী ডাকে	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৮৫
ভোরের গান	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	১
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়	শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি	৬৫
মাণিক জোড়	শ্রীনিতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ...	৩৯৬
মাটির তেল	শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি ...	৩৮৪
মাথা-ভাঙ্গা ছেলে	” ” ...	৫১৫
মিতালি	শ্রীসুকুমার দে সরকার, বি-এস-সি	১৪৭
মুক্তসর	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ..	৫
মুণ্ড-ভাঙা কোম্পানী	শ্রীপঙ্কজকুমার দাসগুপ্ত ...	১৫৫
মুক্তার মূল্য	শ্রীঅতুল ভূষণ সরকার ...	১৮৭
মুঘল সম্রাট বাবর ও গুরু নানক	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	২৭৯
মূক সাথী	কুমারী হামিদা হোসেন ...	৩১৩
মক্ষের দ্বীপ	শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি ...	৪৮৭
যাদুকরের কুত্তা	শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী ...	১১৬
রূপকথা	শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৩৯
লতদল	কুমারী ঊষা মিত্র ...	৯২
শুকতারা	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ...	৫৫
শুকতারা	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ...	৫৬
শ্রাবণের ঝর্ণা	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৯২
ষাঁড়ের গুঁতো	শ্রীপরিমল রায় ...	২১৪
সবচেয়ে ছোট	শ্রীননীগোপাল মজুমদার ...	৪৪২

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
সম্ভাষণ		...	৪৯৮
সাগরের গান	শ্রীমতী নিভা নিয়োগী	...	৫৩
সিদ্ধার্থ	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৫৬
সূর্য্যমুখীর গল্প	শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার	...	১৩২
স্বর্গীয়া কামিনী রায়	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৩৫
স্বপ্নের ফল	...	...	২০১
স্বপ্নাদ্য ঔষধ	শ্রীনবেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৩১
স্মৃতি	অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	...	৪৯১
হাফ-টিকিট	শ্রীমতী অশ্রুদাস	...	৫৪৯(ক
হানাবাড়ী	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	...	৯, ৭৬, ১১২, ১৬৯, ২০৩, ২৪২, ২৯৪, ৩২
হাবা গঙ্গারাম	শ্রীসুখলতা রাও	...	৩
হারাণো বন্ধু	...	...	৩৫
হিংসুটে	শ্রীঅখিল নিয়োগী	...	৩৮
হেমন্ত	শ্রীরণেন্দ্রনাথ সরকার	...	১
হুহুঙ্কার (ছবি)	...	...	৯
ক্ষিপ্রপদ ক্ষেত্রপদ	শ্রীসুবিনয় রায়	...	৪৫



নব পর্য্যায়
৩য় বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৪০

১ম সংখ্যা।

ভোরের গান

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

সূর্য্য ওঠার অনেক আগেই
আমরা উঠেছি,
শিউলি তলায় ফুল্ কুড়াতে
তাইত জুটেছি।
নীল্ আকাশের চত্বরে কে
লাল্‌চে আলোর গাল্‌চে ঢেকে,—
মাঠের মাঝে সব্‌জে জাজিম্
পাত্‌লো আজি রে?
তালের পাতার ঝুম্‌ঝুমি, শোন্,
উঠ্‌ছে বাজি' রে।

ধানের ক্ষেতের গান শোনা যায়
নদীর এ পারে ;
কলার ঝাড়ে বাব্‌ড়ী নাড়ে
কোন্ সে ক্ষ্যাপা রে ?

যেই দিকে চাই—রূপ যে রাজায়,
সোনার হাসি উপ্‌চিয়ে যায় ;
অধীর পাখীর ডানায় ডানায়
কাঁপন ধরেছে,
ভোরাই গানে ওরাই আজি
ভুবন ভরেছে।

আল্‌গোছে কে কাশের চামর
দুলায় আদরে ?
মেঠো-ফুলের চুম্‌কি জ্বলে
ঘাসের চাদরে।

জলের মাঝে, মাঠের শেষে—
মুখ দেখে কে রঙীন্ বেশে
কা'র আবাহন—কবির সুরে
আমরা গেয়েছি ?
বাংলা দেশে শরৎ এলো—
খবর পেয়েছি।

(শিল্পী—শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

দিনের বেলায়

(শ্রীলীলা দেবী, এম্-এ)

ভাই সন্দেশ,

সেবার গন্‌শার চিঠিখানা প'ড়ে অবধি তোমাকে লিখ্‌বো লিখ্‌বো কচ্ছি, কিন্তু পেন্‌সিল ছিল না ব'লে এতোকাল লিখ্‌তে পারি নি।

রাতের বেলায় তো অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ হবেই, সে সবাই জানে। আমিই তো রাতদুপুরে ক্যাঁচর ম্যাঁচর শুনেছি, যেন একশ' শুঁয়োপোকা পাতা চিবুচ্ছে। দিনের বেলা তাদের দেখা নেই, শুধু ছিট্‌কিনির পাশে হল্‌দে শুঁয়োপোকা হল্‌দে শুঁয়োপুকীকে পরামর্শ দিচ্ছে!

রাত হ'লেই সব কেমন জানি জেগে ওঠে। মাঠ জুড়ে দেখি রাতারাতি সাদা গোল জিনিষ,—অবাক্-পাখীর ডিমের মতন, তলায় তা'র শেকড়বাকল খুঁচিয়ে তুলতে হয়।

রাত্রে শুনি পাশের বাড়ীর ছাতে কিসের খোকা কিচ্‌মিচ্ করে। শুনে মনে হয় উঁচিয়ে তোলা কাণ আছে, মিশ্‌কালো গায়ের রং, হাতপাগুলো চামচিকের ডানির মতন চিম্‌ড়ে। দিনের বেলায় চুপ।

রাত্তিরে এই রকম। আবার দিনের বেলায় তালগাছের শুক্‌নো পাতা শিরশির করে; চিলের ছানা মুখ বাগায়; ইঁদুরছানা খচ্‌মচ্ করে, আরসোল্লা হাঁটে। ভয়ের কিছু নয়, আশ্চর্য্য কিছু নয়। চারিদিকে আলো। মাটিতে চ্যাপ্টা হ'য়ে শু'লে আলমারীর তলা দিয়ে এমন কি ওপারের দেয়ালের গায় ছ্যাৎলাপড়া দেখা যায়।

অবাক কিছু নেই। দেয়ালের ফোকর থেকে পেন্সিলকাটা ছুরি দিয়ে খুদে দাদা গোলাপী ডিম বের করেছিলো, আমার ভারী অবাক লেগেছিলো ; কিন্তু সেও দাদা বল্লো অবাক্ কিছু নয়, টিক্‌টিকির ডিম হবেওবা। দিনের বেলায় জোনাকী পর্য্যন্ত গুব্‌রে হ'য়ে যায়। কিছু আর আশ্চর্য্য থাকে না।

কিন্তু আজকের কথা আলাদা। দিনের বেলায় দেখা। দুপুরে ঠিক নয়, বিকেলের দিকে ; যখন পানকৌড়ীগুলো 'স্যাঙ্গাৎ! স্যাঙ্গাৎ!' ব'লে ডাক্‌তে ডাক্‌তে কোথায় জানি উড়ে যায়, সারাদিন ঝিলেবিলে মাছ খেয়ে খেয়ে পেট ঢাক করে।

আর সূর্য্যটাও সরসর ক'রে নেমে এসে ইয়া লম্বা লম্বা ভূতের ট্যাঙের মত গাছপালার ছায়া ফেলে, তখন। ন্যাড়াদের বাড়ীর পাশে মাঠে সবাই খেলতে গেছিলো। সে মস্ত মাঠ, তা'র একপাশে ঝোপঝাপ, তা'তে রাতে যাদের না করতে নেই, তা'রা কিলবিল করে। সে ঝোপের পাতা করাতের মতন, তা'তে আঁচড় দিলে বিশ্রী গন্ধ। তার থেকে আনারসী সুতো হয়। বছরে একবার করে ঝোপের মধ্যিখান থেকে লম্বা ডাণ্ডি বেরোয়, তা'তে মাগো মা কি সুন্দর সাদা কাঁঠালকোয়ার মতন ফুল হয়! অনেক ফুল; কিন্তু বড্ড মাকড়সার জাল, আর হুমো মাকড়সা ওঁত পেতে দিনরাত ব'সে। বাবাগো!

ঝোপের পেছনেই খুদে বাড়ী। সেখানে পদীপিসি থাকে। সে বেজায় খুদে বাড়ী, সাম্‌নে খুদে উঠোন, ল্যাপাপোঁছা, গুব্‌রে গন্ধওয়ালা। পদীপিসির মস্ত কালো বিল্লি উঠোনের কোণায় পেঁপে গাছে ঠেসান দিয়ে দিনরাত ঝিমোয় মাঝে মাঝে মাছি খায়। বারান্দায় খুদে বাঁকা থাম, তা'তে লণ্ঠন ঝুলোন হয়। তা'র পেছনে খুদে দু'টো ঘর। একটাতে পদীপিসি রান্নাবান্না করে, আর একটাতে পদীপিসি তা'র বিল্লি তার মুর্গী পাখী তার ভাইপো, এই সব নিয়ে ঘুমোয়। তার চারদিকে ইয়া উঁচু দেয়াল তোলা।

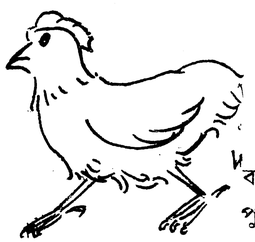

দাদারা মাঠে খেলছে, আমি কোণায় বসে বাতাবি-লেবু খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কালো কঁক্-কঁক্ নাকের উপর লাল কম্বল মতন উঁচিয়ে শীগ্‌গির শীগ্‌গির হেঁটে যাচ্ছে। পায়ের আঙ্গুল লেগে লেগে ধূলো উড়ছে। কঁক্-কঁক্‌টা ঝোপের ফাঁক দিয়ে, পদীপিসির নালা দিয়ে, গ'লে চ'লে গেলো।

আমি চুপচাপ বাতাবিলেবু খেলুম। ওমা, একটু পরেই দেখি পদীপিসির দরজা ঠেলে বেরুলো পদীপিসির কালো ভাইপো, মাথায় লাল কম্বলের টুপি! আমার বেজায় ভয় করলো, একটা কথা ভেবে। বাতাবিলেবু ফেলে দে লম্বা! পরে মেজদাকে বল্লুম; ও অনেকক্ষণ ধরে কাব্‌লী মটর খেলো, পরে বল্লো 'দ্যুৎ!'

কিন্তু আবার যখন পরদিন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ঝিঁঝিঁ বলছে, 'ঝিঁ! ঝি দেখ্‌ছ নি'!, আর শেয়াল বলছে, 'আরে কেয়া হিয়া? কেয়া হিয়া?', অ

মেজদার তাড়া খেয়ে ঠ্যাং খোঁড়া লাল্‌চে কুকুর পদীপিসির নালা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে, ঠিক তখন বলটাকে সুট্ মেরে আমি ঝোপঝাপ দেয়াল টেয়াল ডিঙিয়ে পদীপিসির উঠানে ফেলে দিয়েছি। বোধ করি বিল্লির উপর পড়লো, আওয়াজ শুনে মনে হোলো।



মেজদা বল্লো—"আন্ গিয়ে"। এমন সময়ে দরজা খুলে পদীপিসি বল্ ঝুলিয়ে বেরিয়ে এলো। গায়ে লালচে আলোয়ান্, খুঁড়িয়ে চল্‌ছে!

মেজদা অম্‌নি এক দৌড়ে পগার পার!

আমিও আর বল্ নিলাম না, দৌড় মারলাম। তোমরা গণ্‌শার চিঠি পড়েছো, হয়তো আসল ব্যাপারটা কী বুঝ্‌তে পারবে। আমার ভারী আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে! ইতি

—হাবু।

মুক্তসর

(শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

ফিরোজপুর জেলায় মুক্তসর। মুক্তসর একটি মস্ত বড় সরোবর। প্রতি বৎসর 'মাঘি' দিনে সেখানে খুব বড় মেলা বসে। পঞ্জাবের সব যায়গা হইতে পুরুষ ও নারীরা দলে দলে আসিয়া এখানে মিলিত হয়—তাহারা মনে করে এই সরোবরের জলে স্নান করিলে, এই পুণ্যস্থানের মাটিতে মাথা ছোঁয়াইলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। কেন এস্থানের এত খ্যাতি?—একদিন এইখানে এই মাটিতে চল্লিশজন শিখ বীর 'ওয়া গুরুজীকি ফতে' রবে এই প্রান্তরভূমি ধ্বনিত করিতে করিতে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। এই চল্লিশজনের চিতাভস্ম বুকে করিয়াই মুক্তসর পুণ্য তীর্থ হইয়াছে।

এই চল্লিশজন শিখ বীর কে ছিলেন?—এইবার তাহাদের বীরত্ব কাহিনী

শোন। আনন্দপুর গুরু গোবিন্দের বাসভবন। শত্রুরা আসিয়া আনন্দপুর ঘিরিয়া রহিয়াছে। শিরহিন্দের মুঘল শাসনকর্ত্তা, দিল্লী ও লাহোরের সৈনিকদল, এমনকি কাঙ্গরা, জম্মু, চম্বা ও অন্যান্য পার্ব্বত্য অঞ্চলের রাজারা পর্য্যন্ত মুঘল সেনাবাহিনীর সহিত যোগ দিয়াছে। তাদের পণ — গুরু গোবিন্দকে তাঁহার জন্মভূমি আনন্দপুর হইতে বিতাড়িত করা।

এদিকে গুরুর পণ — কিছুতেই আনন্দপুর ত্যাগ করিবেন না। শিখের দলে দলে শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে লাগিল। তাহাদের খাদ্যের অভাব হইল তবু গুরুর দৃঢ়পণ — আনন্দপুর ত্যাগ করিবেন না। শত্রুরা যাহা চায় গুরু তাহাতে রাজি নন্। তখন মুঘল সেনাপতি দলের সকলের মুখপাত্র হইয়া গুরুকে বলিয়া পাঠাইলেন — আমরা আপনাকে মিছামিছি কোন ক্লেশ দিতে চাই না, আমরা আপনার প্রাণ নিতেও আসি নাই, আমরা চাই আপনি আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যদি সম্মত হন, আমরা আপনাকে কিছুই বলিব না, বন্ধুর মত ব্যবহার করিব। আর যদি এখানেই থাকিতে চান তবে আপনি আমাদিগকে আপনার পরম শত্রু মনে করিবেন।

গুরু গোবিন্দের মাতা—মাতা গুজ্‌রির কাণে একথা পৌঁছিল। শিখদের এ অনাহার এই নির্য্যাতন ও বেদনায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি গোবিন্দকে বলিলেন—বাবা গোবিন্দ, তুমি তোমার মনের সঙ্কল্প দূর কর। আনন্দপুর দুর্গ ছাড়িয়া দেও, এই নিরীহ শিখদের জীবন রক্ষা কর। মুঘল সেনাপতি বলিতেছেন, রাজারা বলিতেছেন — আমরা আনন্দপুর ছাড়িয়া গেলে তাঁহারা আমাদের কোন শত্রুতা করিবেন না; তবে কিসের ভয়? যদি তুমি বাঁচিয়া থাক আবার আনন্দপুর জয় করিয়া নিজের হাতে আনিতে পারিবে। এখানে থাকিলে এই বন্দী অবস্থায় তোমারও প্রাণ যাইবে, আর তোমার শিখ সৈন্যদের একজনেরও প্রাণ বাঁচিবে না। ঐ দেখ তাহারা না খাইয়া মরিতেছে — এমনভাবে ত মানুষ বাঁচিতে পারে না!

শিখেরা মাতা গুজ্‌রির কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। তাহারাও গুরুজীকে বলিল—আমরা না খাইয়া মরিতেছি প্রভু, কিন্তু যদি আমরা এ স্থান ত্যাগ করি তাহা হইলে প্রাণে বাঁচিব এবং আবার শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে পারি। আদেশ দিন গুরুজী, আমরা এ স্থান ত্যাগ করি।

মাতা গুজ্‌রির কথায় কিংবা শিখদের এই করুণ মিনতিতেও গুরুজী, বিচলিত হইলেন না; তিনি বলিলেন — আর পাঁচদিন পরে আমি আনন্দপুর ত্যাগ করিব।

গুরুর একথা কয়েকজন শিখের কাছে ভাল লাগিল না। তাহারা বলিতে লাগিল — আমরা গুরুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু গুরু ত আমাদের সুখ-দুঃখের কথা এতটুকুও ভাবেন না! এইবার যদি গুরুর আদেশ মানিয়া লইয়া আমরা এই দুর্গে বন্দী অবস্থায় থাকি তাহা হইলে মৃত্যু নিশ্চিত। না, আমরা এইবার গুরুর আদেশ মানিব না। তিনি আমাদের আর গুরু নহেন। চল আমরা আনন্দপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাই।

এই দলের চল্লিশজন শিখ আনন্দপুর ছাড়িয়া নিজেদের বাড়ীতে চলিয়া গেল। গ্রামের লোকেরা তাহাদিগের এই ভাবে আনন্দপুর ছাড়িয়া আসায় আশ্চর্য্য হইয়া গেল! সকলে তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল — 'ভীরু কাপুরুষের দল, সঙ্কট সময়ে গুরুকে ত্যাগ করিয়া তোমরা জীবনের ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছ? তোমরা কি শিখ?'

সেই চল্লিশজন শিখের বীরপত্নীগণ বলিল — 'তোমরা নারীর চেয়েও ভীরু, তোমরা কি পুরুষ? তোমাদের যারা পুরুষ বলে তারা কাপুরুষ — পুরুষ নামের যোগ্য নয়।'

লজ্জায় ও অপমানে সেই চল্লিশজন শিখের প্রাণে ধিক্কার জাগিল। বুঝিতে পারিল কি অন্যায় তাহারা করিয়াছে। তাহারা স্থির করিল — আবার আনন্দপুরে ফিরিয়া যাইয়া গুরুর কাছে এই গুরুতর অপরাধের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়া লইবে; তারপর তাঁহার জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে।

এদিকে গুরু আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে খিদ্‌রাণা নামক একটি গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক শিখেরাও আসিয়াছিল। গুরুজী এখানেও শান্তিতে ছিলেন না। শত্রুরা এখানেও তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। একটি গাছের উঁচু ডালে বসিয়া একজন শিখ চারিদিকে নজর রাখিত, কোন্ দিক্ হইতে কখন শত্রু আসে!

একদিন সেই শিখ বলিল — গুরুজী, অই দূরে মুঘল সৈন্যদের দেখা যাইতেছে। চারিদিক ধূলার মেঘে আচ্ছন্ন করিয়াছে। অই তাহারা আসিতেছে।

গুরু একথা শুনিয়া তাঁহার কালো ঘোড়ার পিঠে চড়িলেন, তাঁহার তীর

ধনু হাতে লইলেন, তারপর একটি ছোট পাহাড়ের উপর শিখদের লইয়া শত্রুর আক্রমণ রোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন !

সহসা দূর হইতে শোনা গেল—'অলখ নিরঞ্জন !' শোনা গেল ভৈরবকণ্ঠে কাহারা চীৎকার করিতেছে 'ওয়াগুরুজীকি ফতে !' কে তাহারা ?—তাহারা সেই দলভ্রষ্ট চল্লিশজন শিখ। আনন্দপুরে আসিয়া দেখিল দুর্গ পরিত্যক্ত, গুরুজী আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। গুরুজীর সন্ধানে তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে যখন খিদ্‌রাণার দিকে আসিতেছিল, তখন তাহারা দেখিল—মুঘল সেনাবাহিনী গুরুজীকে আক্রমণ করিবার জন্য খিদ্‌রাণার দিকে আসিতেছে। অগণিত শত্রুসেনার বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল তাহারা চল্লিশজন। কণ্ঠে তাহাদের ধ্বনিত হইতেছিল—অলখ নিরঞ্জন ! আর অভয় মন্ত্র ওয়াগুরুজীকি ফতে। এই চল্লিশজন শিখবীরের অমিত বিক্রমে মুঘলেরা হটিয়া গেল। কিন্তু এই চল্লিশজন শিখের রক্তে রণক্ষেত্র রাঙ্গা হইয়া গিয়াছিল।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। মুঘলেরা চলিয়া গিয়াছে। গুরু গোবিন্দ রণক্ষেত্রে আসিলেন—তিনি দূর হইতে এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন আর আশ্চর্য্য হইতেছিলেন কে ইহারা তাঁহার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে ? নিকটে আসিয়া দেখিলেন—একদিন যে চল্লিশজন শিখ তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিয়া আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহারাই তাঁহার জন্য প্রাণ বলি দিয়াছে। গুরুর চক্ষে জল আসিল।

সেই চল্লিশজনের মধ্যে মহান্ সিং নামে একজন শিখবীরের তখনও মৃত্যু হয় নাই, সে তখন মুমূর্ষু। গুরুজীকে নিকটে পাইয়া তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া মহান্ সিং কহিল—'গুরুজী, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমরা না বুঝিয়া আপনার আদেশ অমান্য করিয়াছি। ক্ষমা করুন গুরুজী !'

প্রশান্ত নির্ম্মল হাস্যে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া গুরুজী বলিলেন—'ক্ষমা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের ক্ষমা করিতেছি। আমার জন্য আজ যাহারা প্রাণ দিল তাহাদের নাম চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুকে অমর হইয়া থাকিবে।'

সেই চল্লিশজন অমর শিখবীরের স্মৃতি চিহ্ন বুকে করিয়া মুক্তসর পুণ্যতীর্থ প্রতি বৎসর শিখেরা এই বীরপুরুষগণের স্মৃতি পূজা করে। আর ওয়াগুরুজীকিফতে শব্দে গুরুজীর পুণ্যনামের বিজয় ঘোষণা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে।

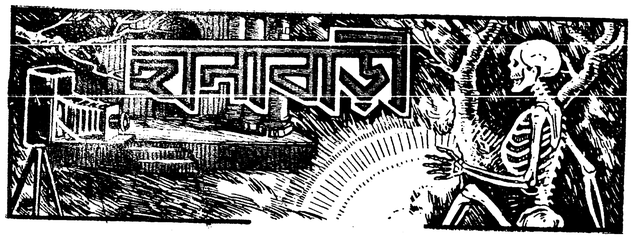

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

এক

রায়পুর স্কুল

অজয় ছুটে এসে ঘরে ঢুকল—বুঝলাম, নতুন কোন খবর নিশ্চয়ই আছে। থার্ড ক্লাশের অজয় দত্তকে স্কুলের সবাই চিন্‌তো, তার বেশ সুন্দর গোলগাল মোটা শরীরটির জন্যে। মুখে তার দাঁত বের করা হাসি যেন লেগেই ছিল, ছেলেরা যতই তাকে ক্ষেপাতো সে-ও মজা পেত ততই। তা ছাড়া অজয় ছিল স্কুলের গেজেট। মাষ্টার মশাইরা তাকে ভালোবাসতেন, সে মহলের খবরটা সবার আগেই পেতো সে। কাজেই তাকে ছুটে আস্‌তে দেখে আমরা বুঝ্‌লাম—তাজা খবর কিছু না নিয়ে সে আসেনি।

সহায় হেসে বল্‌ল, "কিহে দত্তমশাই, নতুন খবর কি ? কোন রহস্য ? ভাঙ্গা ঘর ? পুরাণো বাড়ী ? গুপ্তধন ?..."

অজয় এক গাল হেসে বল্‌ল, "আরে থামো থামো, সহায় দা। এক নিঃশ্বাসে যে কেবল বলেই চল্‌লে, আমায় বল্‌তে দিচ্ছ কই ?" একটু থেমে দম নিয়ে সে বল্‌ল—"নতুন খবর ? হাঁ আছে বই কি।"

নতুন খবরের কথা শুনে, একলাফে চেয়ার টেবিল ছেড়ে আমি আর বীরেন গিয়ে সহায়ের টেবিলের কাছে অজয়ের দু'দিকে দাঁড়ালাম। সহায় বড় বড় চোখ করে মস্ত মস্ত চশমার ফাঁক দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো !

অজয় বলে চল্‌লো,—"সেদিন যে একজন মোটামত মাড়োয়ারী আমাদের

স্কুল দেখ্‌তে এসেছিলেন না? তিনি নাকি একটা নতুন স্কুল করেছেন। সেই ভদ্রলোক নাকি আবার আমাদের হেডমাষ্টার মশাইকে তাঁর স্কুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ছেন।"

বীরেন বল্‌ল, "বলিস কিরে! মাষ্টার মশাই বল্‌তে গেলে এস্কুলের গোড়া থেকেই আছেন। তিনি···

অজয় একটু হেসে বল্‌ল, "বীরেন দা, টাকা, টাকা, মাইনে বেশী পেলে···"

সহায় 'চুপ কর অজয়' বলে ধমক দিয়ে বলল, "হেডমাষ্টার মশাই যাবেন কি না যাবেন তা তোর কাছে বলেন নি। তবে অত ব্যাখ্যা কেন শুনি? আর কি খবর আছে?" অজয় একটু থতমত খেয়ে গেল, কিন্তু সামলে গিয়ে বল্‌ল, "প্রতাপদা স্কলারসিপ নিয়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছেন, সে জায়গায় শুন্‌ছি সহায়দাকে—"



সহায় মৃদু হেসে বল্‌ল, "অজয় যা তা বলিসনি, ফার্ষ্টক্লাশের অতগুলি ছেলে থাক্‌তে···" এবার অজয় চতুর্ম্মুখ হয়ে উঠ্‌ল, বল্‌ল, "ইস্, ভারী ই-য়ে কিনা! এ বছরটা প্রতাপদা থাক্‌তেও ত বল্‌তে গেলে তুমিই ছিলে আমাদের দলপতি ঈশানবাবু দেখেন নি বুঝি?"

আমি বল্‌লাম, "সত্যিইত! থ্রি···"

"থামো, থামো" বলে সহায় আমায় থামিয়ে দিলে, চিয়ার্স আর শে হোলো না, অজয়ের দিকে চেয়ে সে বল্‌ল, "গেজেটের আর কি খবর আছে শুনি?

অজয় বল্‌ল, "সহায়দা, তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমি নিজে কাণে শুনেছি। ঈশানবাবু সকলের সঙ্গে বসে সব ঠিক করেছেন। চাই হয়তো মিনিট কয়েকের মধ্যেই সব জান্‌তে পার্‌বে।"

"বেশ, তা হ'লে না হয় আমাকে একদিন বেশ ভাল করে খাইয়ে দি আর কি খবর আছে শুনি?"

অজয়ের মুখ একটু ম্লান হয়ে উঠ্‌ল; সে বল্‌ল, "শুন্‌লাম, 'বিদ্যাসাগরে একজন নতুন ছেলে আস্‌ছে, জব্দ করা কিন্তু চাই-ই সহায়দা।"

আমাদের স্কুলের শ'চারেক ছেলের তিনশো জন ছেলেই থাক্‌তো হোষ্টেলে। মস্ত মস্ত তিনটা হোষ্টেল। প্রত্যেক হোষ্টেলের নিজের নিজের খেলবার জায়গা, স্নান করবার পুকুর—সব। এর প্রত্যেকটির জন্য একজন করে মাষ্টার; তিনিই হ'লেন অভিভাবক, আর তাঁকে সাহায্য করবার জন্য ছেলেদের ভেতর থেকে একজন ছেলে থাক্‌তো, সেই হ'লো বোর্ডিং-কাপ্তান। তা ছাড়া পড়া, খেলা, খাওয়া, স্নানকরা, ব্যায়াম প্রত্যেক বিষয়েই এক একজন করে সেরা ছেলে বেছে নেওয়া হ'তো, তারা হ'তো সেই সেই বিষয়ের 'কাপ্তান' (Captain)।

আর আমাদের এই তিন বোর্ডিংএর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল—ভূদেব, বিদ্যাসাগর, আর রামমোহন। আমরা ছিলাম ভূদেবে। এই বোর্ডিংগুলির মধ্যে লেখাপড়ায় খেলায়, বুদ্ধিতে সব রকমে রেশারেশি চল্‌তো। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য থাক্‌তো মরামারি না ক'রে অন্য দলের ছেলেদের বোকা বানানো যায় কি ক'রে। এ বিষয়ে সহায়ের মত ওস্তাদ খুব কমই ছিল। কাজেই অজয়ের এই মিনতি—"তাকে জব্দ করা চাই-ই সহায়দা।"

সহায় বল্‌ল, "কোথায় আস্‌ছে? বিদ্যাসাগরে?" —"হ্যাঁ"

"কবে, আস্‌ছে কবে?" —"ছুটির পরে বোধ হয়।"

"বছরের মাঝখানে হঠাৎ···, কোত্থেকে আস্‌ছে বল্‌তে পারিস্?"

"না, তা তো ঠিক জানিনা।"

সহায় একটু ভেবে বল্‌ল, "তা, ছুটির পরে তো? সে তো অনেকদিন বাকী—সে দেখা·····।"

সহায়ের কথা আর শেষ হলো না, সশব্দে আমাদের দরজা খুলে, ভূদেবের ছেলেরা সব হৈ হৈ কর্‌তে কর্‌তে ঢুকে পড়্‌লো। ফার্ষ্টক্লাশের রবীন সহায়ের হাত ধরে বলল, "সহায়, তুমি ক্যাপ্টেন হয়েছ বলে আমরা ভারী খুসি হয়েছি, ভারী খুসি হয়েছি।" ছোটরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে সহায়দার হাত ধরে আনন্দ জানাতে লাগ্‌লো। আমরা চীৎকার করে উঠ্‌লাম, "জয় সহায়রামের জয়।"

সবাই সহায়কে টান্‌তে টান্‌তে বাইরে নিয়ে চলল। যারা জানেনা, তাদের দেখাতে হবে যে হোষ্টেলের সবচেয়ে প্রিয় ছেলেটিই ক্যাপ্টেন হয়েছে।

দুই

নতুন ছেলে

আমাদের বোর্ডিংএর ঘরগুলি বেশ বড় বড়। এক একটা ঘরে তিন করে থাকে। তারই চার নম্বর ঘরে ছিল আমাদের আস্তানা। আমি, বীরেন আর সহায়রাম প্রায় একবছর ধরে এই ঘরে আছি। বীরেন, আগেই ছি আমি আর সহায় এসে গতবার তার সঙ্গে জুটেছি।

সহায়রাম বসু নতুন ছেলে, তবু তাকে না চেনে এমন ছেলে খুব ক আছে। একটা জিনিষ দেখ্‌লে সে তার খুঁটিনাটি সব বলে দিতে পারে শুধু কি তার? কোন জিনিষ দেখে তার মালিকের খবর পর্য্যন্ত সে বলে দি পার্‌তো। তা ছাড়া তার লম্বা দেহ, মস্ত মস্ত হাত, সুন্দর মুখ, চমৎকার উপ বুদ্ধির জন্য তাকে সবাই চিন্‌তো,—সবাই ভালোবাস্‌ত। কাজেই যখন দেখ্‌লো যে সহায়কে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে, তখন কেহই দুঃখিত হ'লো আমাদের বোর্ডিংএর অভিভাবক ঈশান বাবু বলেছিলেন যে, ছুটির পর থে সহায় কাজ আরম্ভ কর্‌বে, কাজেও তাই হ'লো। ছুটির পরে এসে সহায় ঘরটায় চলে গেল, আমাদের ঘরে একটা সিট খালি পড়ে রইলো। আ বল্‌লাম, বেশ ভালই হ'লো, সহায়ের ঘরে বেশ আড্ডা জমানো যাবে।

ছুটির পরে আবার আমরা এসে সব জুটেছি। অজয়ের তাড়া কিন্তু দিন বেড়েই চল্‌ল; সে রোজ এসে একবার করে শুনিয়ে দিয়ে যেতে লাগ্‌লো সে ছেলেটি সত্যি সত্যি একদিন আস্‌ছে।

সহায় বল্‌ল, "সারাটা ছুটি'ভর ভেবেছি, কি করে ছেলেটাকে জব্দ যায়। কিন্তু তেমন ফন্দিত একটাও মাথায় আস্‌ছে না।" সহায়রামের মা আস্‌ছে না কোন ফন্দি!—শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। সহায়রাম বলে

সহায়রামই আবার বল্‌ল, "তাই ভাব্‌ছি, আজ আমরা চতুষ্টয় গিয়ে ভায় আদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসি, চেনা শোনাটা হোক, পরে যা হয় করা যাবে বীরেন বল্‌ল, "কিন্তু আজকে তুমি কিছুতেই ওকে একেবারে ছেড়ে দিতে পার্‌বে অন্ততঃ ওর জিনিষপত্র দেখে ওর নিজের কথাই খানিকটা বলে বাহাদুরী নিতে হ

সহায় মৃদু হেসে বল্‌ল, "তা দেখা যাবে, কিন্তু সন্ধ্যা সাতটায় গা

আমাদের অন্ততঃ মিনিট পাঁচেক আগে গিয়ে সেখানে পৌঁছুতে হবে, বুঝেছো?"

আমরা সব ঘাড় নাড়্‌লাম।

ষ্টেশনটি বেশ। স্কুল থেকে মাইলখানেক দূরে। সুন্দর ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার, ছোট হলেও ছবির মত সুন্দর। আমরা প্রায় পৌনে সাতটায় গিয়ে সেখানে পৌঁছালাম। ষ্টেশনে রায়পুর স্কুলের ছেলেদের সবাই চেনে, কাজেই গল্প গুজব বেশ চল্‌লো। গাড়ী যখন হুস্‌-হুস্‌ কর্‌তে কর্‌তে এসে ষ্টেশনে ঢুকলো, তখন সন্ধ্যা উত্তরে গেছে। ষ্টেশনের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে সাতটা বেজে উঠ্‌লো। আমরা প্ল্যাটফর্ম্মে এগিয়ে গেলাম।

আমাদের ছেলেটিকে পেতে খুব বেশী কষ্ট হ'লো না; কারণ, লোকই নাম্‌লো মাত্র দু'জন। একজন, একটি চৌদ্দ পনের বছরের ছেলে, সুন্দর মুখ, বেশ ভাসা ভাসা চোখ, মস্ত বড় কপালখানা, চমৎকার গায়ের রং, গায়ে একটা সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী, পরণে শান্তিপুরী ধুতি, পায়ে এক জোড়া ডার্ব্বি। অন্যজন বৃদ্ধ, মাঝারি অবস্থার কোন ভদ্রলোক হবেন।

ছেলেটির মোট টোট খুব বেশী নেই, দুয়েকটা ট্র্যাঙ্ক, একটা জুতার বাক্স, একটা বিছানা, কুলিরা জিনিসগুলি গাড়ী থেকে নামালো। বৃদ্ধটি আপনমনে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, আমরা দেখ্‌লাম ছেলেটি একা প্ল্যাটফর্ম্মে। মতটুকু ছেলে একলা এসেছে! পৌঁছে দিতে কেউ আসে নি। আশ্চর্য্য! সহায় এগিয়ে গিয়ে বলল, "সত্যগোপাল বোধ হয়, রায়পুর স্কুল ত?" ছেলেটি দূর থেকে আমাদের দেখেছিল, হঠাৎ এই রকম প্রশ্ন শুনে চমকে উঠ্‌ল; বল্‌ল, "সে কি? আপনি আমায় চেনেন না কি?"

সহায় হেসে বল্‌ল, "মোটেই না।"

"তবে?—তবে জান্‌লেন কি করে?"

"ভায়া, মালপত্র যা এনেছো তার উপরে ত লেবেল লাগাতে আর কম লাগাও নি!—যাক রায়পুর স্কুলে ত?"

ছেলেটি হেসে বল্‌ল, "তাইত! আপনারা রায়পুর স্কুলে পড়েন বুঝি।"

"পড়ি বলেইত তোমায় অভ্যর্থনা কর্‌তে এলাম। ঢাকা থেকে আস্‌ছো!" তারপর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে সহায় বল্‌ল, "তোমার সাইকেল কোথায় হে সত্যগোপাল? সত্যগোপাল এবার দস্তুর মত হক্‌চকিয়ে গেল; সে থতমত খেয়ে

বল্‌ল, "আরে, দাঁড়ান। দাঁড়ান। এ—এত কথা জান্‌লেন কোত্থেকে?"



সহায় তার ভীত মুখের দিকে একটু চেয়ে বল্‌ল, "অমনভাবে তাকিয়ো না সত্য, আমার ভারী হাসি পায়। এ সহজ কথাটা বুঝ্‌তে পারোনি? মালের উপরই ত তিন চারটে 'From Dacca' লাগিয়েছো।—আর সাইকেল?—সাইকেল না থাকলে এ বিদেশে তোমার জুতার বাক্সের ছ্যাঁদা দিয়ে সাইকেলের বেলটা আত্মপ্রকাশ কর্‌ছে কেন হে?" বাঃ···রে! তোমার চোখ এতদিন ধরে খারাপ তবু চশমা নেওনি সত্য? তোমার নেওয়া উচিৎ ছিল।"

সত্য বল্‌ল, "বাস্ বাস্, এবারে আমার কোথায় জন্ম, কি দিয়ে খাই, কি পড়ি, সব একধার থেকে বলে যান।"

সহায় মৃদু হেসে আস্তে আস্তে বললো, "তা-ও অবশ্য চেষ্টা কর্‌লে পারি। কিন্তু সে পরে হবে'খন—এখন স্কুলে যাবে কিনা শুনি।"

"বাঃ রে, যাবোনা ত থাকবো কোথায়?"

"তা বাপু তুমিই জান। যাক, কোন হোষ্টেলে থাক্‌বে জানো?"

"কেন?—ভূদেবে?"

এবার বিস্ময় প্রকাশ করার পালা আমাদের। তার কথা শুনে আমরা চারজনই একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম। ভূদেবে? আমাদের বোর্ডিএ? সেকি!—শুনলাম বিদ্যাসাগরে! সহায় বলল, "সেকি সেকি, তুমি বিদ্যাসাগরে যাচ্ছো না?"

"উহুঁ—গোড়ায় অবশ্য সেখানেই যাবার কথা ছিল, কিন্তু পরে রেক্টর লিখে পাঠালেন যে ভূদেবের চার নম্বর ঘরে একটা সিট খালি আছে, সেখানেই আমার যেতে হবে।"

চার নম্বর ঘর! সর্ব্বনাশ! এ যে কেঁচো খুঁড়্‌তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়্‌লো। একে তো অন্য বোর্ডিংয়ের ছেলে হ'লে বোকা বানাবার ফন্দি-গুলি খাটানো যেতো—তারপর এ আবার আমাদের রুম মেট (Room mate)। সহায় রামের জায়গায় সত্যগোপাল! অথচ এ খবর তো সবজান্তা অজয়ও আমাদের দেয়নি। আমরা হাঁ হয়ে গেলাম। বলে কি? সহায় সাম্‌লে নিয়ে বলল, "বেশ চল, আমরা পরের নম্বরেই থাকি, তোমার কথা সত্যি হ'লে সেখানেই হবে তোমার আস্তানা।—চল।" সত্য একবার চারিদিকে ভালো করে চেয়ে বলল, "বেশ চলুন।"



জিনিষপত্রগুলি টেনে টেনে একটা গাড়ীর ছাদে তুলে দিয়ে সবাই মিলে গাড়ীতে চাপলাম। হৈ চৈ ক'রে সারা রায়পুর মাথায় করে আমাদের গাড়ী এসে ভূদেবের গেটের কাছে থাম্‌লো। ছেলের দল সব এসে গেটের কাছে ভীড় করে দাঁড়ালো। সত্যকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল। এই সুদর্শন ছেলেটি কয়েক মুহূর্ত্তেই সবাইকে আপন করে ফেললো, সকলে মিলে তাকে নিয়ে চার নম্বরে এসে প্রাণ খুলে একটু হৈ চৈ করা গেল।

(ক্রমশঃ)

জাপানী মুখোস

(শ্রীসুবিনয় রায়)

আমাদের দেশে পর্ব্ব বা ছুটির সময় যেমন নানা রকমের নাচ ইত্যাদি হয়ে থাকে, জাপানেও সে রকম নাচ হয় এবং তা'র অনেকগুলিই মুখোস-পরা মুখের নাচ। ছবিতে দেখ, নববর্ষের দিনে জাপানের একটি সহরে কয়েকটি লোক মুখোস প'রে

কেমন নাচ্‌ছে। আজকাল মুখোস-নাচের চল ততটা বেশী নাই এবং এখনকার নাচে সস্তা মুখোসের চল হয়েছে। আগেকার দিনে জাপানের মুখোস-নাচ একটা দেখ্‌বার মত জিনিষ ছিল। তখন বড় বড় ওস্তাদ কারিকরেরা মুখোস তৈরী কর্‌ত

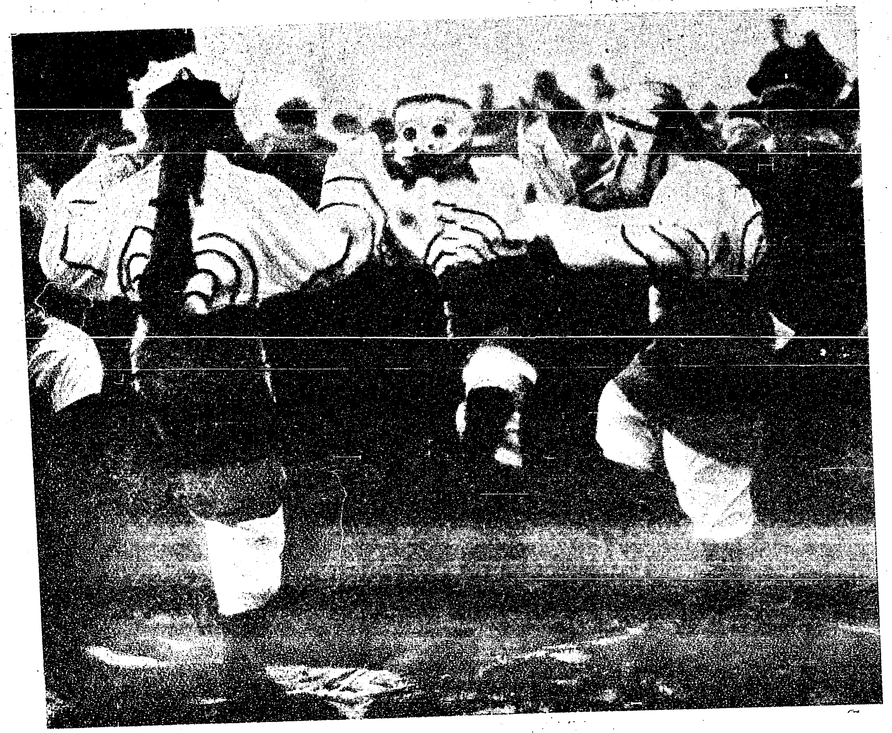

এবং সে সব মুখোসও ছিল আশ্চর্য্য রকমের। তা'র মধ্যে সুন্দর চেহারাও ছিল, আবার বিদ্‌ঘুটে আর মজার চেহারাও যথেষ্ট ছিল। যুবা, বুড়ো, ছেলে, মেয়ে, ভূত, রাক্ষস, জানোয়ার, পাখী কিছু আর বাদ ছিল না। জাপানের জাতীয় মিউজিয়ামে এসব মুখোস রাখা হয়েছে; তা'র থেকে ৪খানি মুখোসের ছবি দিলাম। 'হিংসা'র মুখোসের মত 'রাগ', 'ভয়', ইত্যাদি অন্যান্য মনের ভাবের চেহারার মুখোসও আছে।

জাপানী মুখোস



রাক্ষস



ভূত

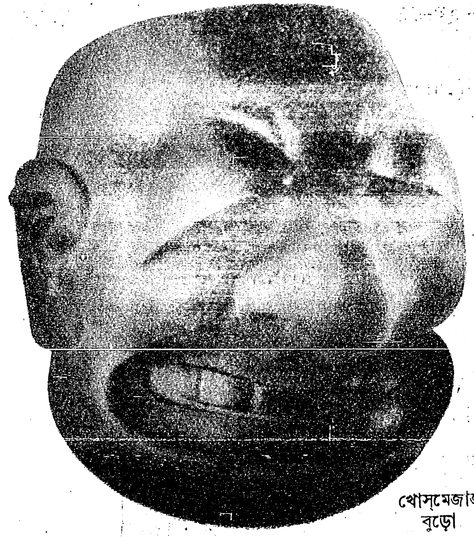

খোসমেজাজী বুড়ো

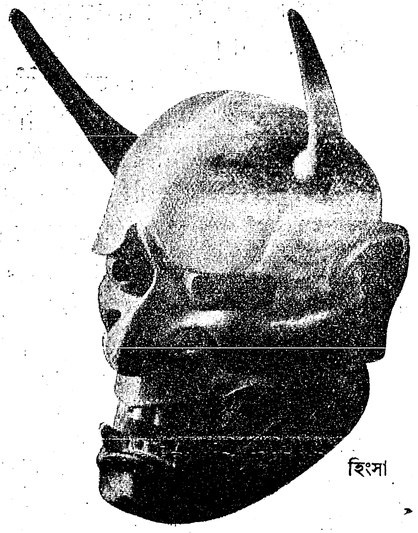

হিংসা

খুকির নাম

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

দিদির এক খুকি হয়েছে ; বয়েস তা'র সাতদিন হ'তে চল্‌লো।

বাড়ীতে খুকী নামের আর একটি যে মানুষ আছে, তা'র বয়েস তেরো, গোখ্‌লে মেমোরিয়েলে সে পড়ে। সে বল্‌লে, 'তোমরা আর কেউ ওকে খুকি বল্‌তে পারবে না—এখন থেকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে শেষটায় ওর নাম খুকিই হ'য়ে যাবে। খুকি—কী ভীষণ হোপ্‌লেস্ নাম!'

তা'র নিজের খুকি নামের বিরুদ্ধে সে বড় হ'য়ে অবধি প্রাণপণে প্রতিবাদ ক'রে এসেছে, ফল হয়নি কোনো। তা'র যে আর একটা নাম আছে, আভা, তা যেন ভুলে'ই গেছে সবাই ; সব চেয়ে ভুলেছেন তাঁরা, যাঁরা ও-নাম রেখেছিলেন। অবিশ্যি আভা নামটাও যে তা'র খুব পছন্দ হয়, তা নয়—আভা, কেমন যেন সেকেলে গন্ধ! মানুষ কেন বড় হ'য়ে তা'র নিজের নাম বদ্‌লে রাখ্‌তে পারে না ইচ্ছেমত!

যা-ই হোক্, নিজের নাম তো যা হবার হয়েছে, এখন দিদির মেয়েকে নিয়ে ভাবনা। বাড়ীর লোকগুলো এমন—হয়-তো ওর নাম সুরমা কি বিমলাই রেখে বস্‌লো!

আভা—আমরা তাকে আভাই বল্‌বো—মনে-মনে যুদ্ধঘোষণা কর্‌লে বাড়ীর লোকের বিরুদ্ধে। বল্‌লে, 'আমি রাখ্‌বো খুকির নাম'।

কোত্থেকে মাণিক বলে উঠ্‌লো ফট্ ক'রে, 'তা হ'লেই হয়েছে!'

মাণিক দস্তুরমত বড় হয়েছে ; বালিগঞ্জ ইস্কুল থেকে সে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে সাম্‌নের বার। আভাকে সে মনে-মনে জানে ছেলেমানুষ।

আভা মনে-মনে জানে যে তা'র ছোড়্‌দা, এই মাণিক নির্ব্বুদ্ধিতার একটি গৌরীশঙ্কর। সে ভুরু বাঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, 'তুই এ-সব বিষয়ে কথা বলতে আসিস কেন? যা, ফুটবল খেল্‌ গে।'

মাণিক সে-কথা কিছুমাত্র গায়ে মাখ্‌লে না ; একজন শিশু কি বলে আর না বলে, তা আমরা আমলেই আনি নে। সে গম্ভীরমুখে বল্‌লে, 'আমি একটা চমৎকার নাম ভেবে রেখেছি খুকির জন্য।'

আভা বেণী দুলিয়ে বল্‌লে, 'হ্যাঃ, তোর আবার চমৎকার!'

'দেখ্‌বি?'

'কী আর দেখ্‌বো! পারুলবালা কি সুরকুমারী কি কনকলতা কি ঐ গোছের একটা হবে আর কি! তোর যা taste!'

'আর তোর যত বীণা আর মীরা আর ললিতা আর লতিকা—তা-ই খুব ভালো তো? এক-একটা নাম শুন্‌লে ইচ্ছে করে ম'রে যাই।'

'ওমা', আভা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো, 'আমি বুঝি তাই বল্‌তে যাচ্ছি! ও-সব নাম তো আজকাল একেবারে প'চে গেছে।'

মাণিক বল্‌লে, 'আমি যা একটা ভেবেছি, তা একেবারে আশ্চর্য্য! তাক্ লেগে যাবে তোর শুন্‌লে।'

'ছাই! হতো যদি কুকুরের নাম, তা হ'লে অবিশ্যি তুই—'

'বেশি তড়্‌বড়্‌ করিস্ নে—বুঝলি? এ-সব পুতুলের নাম রাখা নয়, মনে রাখিস্।'

পুতুলের কথা তোলায় আভা ভীষণ অপমানিত হলো। হবারই কথা ; বেশিদিন নয়, সে পুতুলখেলা ছেড়েছে, সেইজন্য এখন তা'র চোখে ও-সব ভয়ঙ্কর ছেলেমানুষি। লাল হ'য়ে উঠে সে বল্‌লে, 'আর তুই তো সেদিনও লাট্টু ঘোরাতিস বোঁ-বোঁ ক'রে। আর মার্বেল ভেঙ্গে ফেলে যে দু' ঘণ্টা কেঁদেছিলি ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ্ ক'রে, মনে নেই?'

'যা-যাঃ, অঙ্কে লাড্ডু পাস্ আবার কথা বল্‌তে আসিস্!'

'আর তুই যে একদিন জিওগ্রাফির ক্লাসে দাঁড়িয়ে ছিলি বেঞ্চির উপর—জানিনে বুঝি!'

'ভাগ্ এখান থেকে রাক্ষুসি।'

'তুই তো কুলির দলের সর্দ্দার, জন্মে সাবান মাখ্‌বি নি গায়ে।'

আলাপের বিষয়টা ক্রমেই খুকির নাম থেকে দূরে স'রে পড়্‌ছিলো ; এবং আরো নানারকম সব কথা উঠ্‌তে পার্‌তো, যা শুন্‌তে মোটেও ভাল নয়—এমন কি, কথা-কাটাকাটি থেমে গিয়ে খানিকটা হাতাহাতিও হ'তে পার্‌তো, যদি না ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আভা হঠাৎ আবিষ্কার কর্‌তো যে এক্ষুনি স্নান কর্‌তে না গেলে সে ইস্কুলের বাস্ ফেল কর্‌বে।

* * * *

কমল, ওদের মেজ-দা, এবার সেকেণ্ড্ ইয়ারে উঠ্‌লো; মাসিকপত্রে তা'র কবিতা বেরোয়। সম্প্রতি সে চুলের চর্চ্চা কর্‌ছে; আর চাদর জড়াচ্ছে অগোছাল ক'রে—যেন এক্ষুনি খ'সে পড়্‌বে গা থেকে।

সে বল্‌লে, 'খুকির নামের জন্য ভাবনা কী, রবীন্দ্রনাথকে আমি এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি একটা নামের জন্য।' সে একবার তা'র অটোগ্রাফের খাতায় দু'লাইন পদ্য লিখিয়ে এনেছিলো রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে; আর-একবার এম্পায়ারে কী-এক পালা হচ্ছিলো, ভাঙ্‌বার সময় সে দাঁড়িয়ে ছিলো দরজার এক পাশে, রবীন্দ্রনাথ কাছে আস্‌তেই টিপ্ করে' এক প্রণাম করেছিলো আর তিনি তাকে বলেছিলেন, 'ভালো আছো?' সেই থেকে—তা'র কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা তুল্‌তে কেউ যেন আর সাহস না পায়!

আভা ঠোঁটের একটা ভঙ্গী ক'রে বল্‌লো, 'রবিবাবুর আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তিনি গেছেন তোমার ভাগ্‌নির নাম কর্‌তে!'

'আন্দাজে বক্‌বক্ করিস্ নে।' কমল দিলে এক ধমক, 'জানিস্, উনি কত ছেলেমেয়ের নাম রেখে দিয়েছেন! আমি চিঠি লিখ্‌লে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন একটা নাম।'

'তা কেন? আমরা নিজেরা বুঝি একটা নামও বা'র কর্‌তে পারি নে ভেবে।'

'করো তোমাদের যা খুসি, কমল গম্ভীর হ'য়ে গেলো, 'ভালো কথা বল্‌লে তো শুন্‌বে না।'

'এমন একটা নাম চাই', আভা বল্‌লে, 'যা এর আগে কেউ কখনো শোনে নি। যা একেবারে নতুন।'

'সেইজন্যই তো বল্‌ছিলুম, রবীন্দ্রনাথকে লিখি। তাঁর অত বড় প্রতিভা, তিনি কোত্থেকে একটা আশ্চর্য্য নাম খুঁজে বা'র কর্‌বেন, দেখ্‌বি হাঁ হ'য়ে যাবি তোরা সবাই। আর তাঁর দেওয়া নাম—এ কি কম ভাগ্যের কথা! খুকি বড় হ'য়ে লোককে বল্‌তে পার্‌বে না!'

'ভারি তো!' রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আভার মনে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিলো না। সে শুধু জান্‌তো, রবিবাবু বুড়ো গোছের এক ভদ্রলোক, যিনি অনেক গান তৈরি

করেছেন, আর যাঁর হাতের লেখা অনেকটা তা'র দাদার লেখার মত। তাই, 'ভারি তো!' সে বল্‌লে।

কমল কিন্তু মর্ম্মাহত হলো। 'তোমরা যা খুসি করো', অমাবস্যার মত মুখ ক'রে সে বল্‌লে, 'আমাকে কেন ডেকেছো এর মধ্যে?'

সত্যি বল্‌তে, কেউ তা'কে ডাকে নি। আভা একবার রঙিন পেন্সিল দিয়ে একটা নদী আঁকবার চেষ্টা করেছিলো; মেজ-দা তা' দেখে বলেছিলো 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে মাঠটা।' সেই থেকে মেজ-দার বুদ্ধিসুদ্ধির উপর আভার কোনো আস্থা ছিলো না।

আভা বল্‌লে, 'আহা, রাগ করো কেন?' ইস্কুলে তা'র সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু মীরার সঙ্গে দু' দিন তা'র কথা বন্ধ ছিলো, আজ ঝগড়া শেষ হয়েছে—তা'রা প্রতিজ্ঞা করেছে, আর কক্‌খনো কক্‌খনো···

থাক্ সে-কথা। মোট কথা, সেই কারণে আভার মেজাজটা ভালো ছিলো; সে বল্‌লে, 'এসো সবাই মিলে একটা নাম ঠিক করা যাক্।' অবিশ্যি তা'র মনে-মনে সন্দেহ ছিলো না যে সে যা বল্‌বে, সেটাই সব চাইতে ভালো হবে, এবং সেটা মেনেও নেবে আর সবাই। 'মাণিক, তুই আগে বল্।'

মাণিক ফোঁস্ ক'রে উঠ্‌লো, 'আমাকে তেম্‌নি বোকা পেয়েছিস্ কিনা! আগে ব'লে দিই, আর তুই তক্ষুনি সেটা নিয়ে নে! বল্‌লেই হলো—আমিও ওটাই ভেবেছিলুম।'

আভা একবার তাকালো মাণিকের দিকে—এমনভাবে, যেন তা'কে ভস্ম ক'রে ফেল্‌বে। তারপর শান্তভাবেই বল্‌লে, 'আচ্ছা, চঞ্চুলিকা কেমন নাম?'

কমল বল্‌লে, 'চঞ্চুলিকা—তা'র মানে কী?' আর মাণিক উঠ্‌লো হেসে; 'চঞ্চুলিকা—হাঃ-হাঃ! তা'র চাইতে গড্ডলিকা কি অট্টালিকা রাখ্ না কেন?'

'কি, ধর্', কমল এবার তা'র প্রতিশোধ নিলে, 'করকমলিকা, কি শ্যামকদলিকা, কি নীলোৎপলিকা?'

আভা একেবারে নিবে গেলো। সে কাঁদ্‌বে না ঘর ছেড়ে চ'লে যাবে, না মা-র কাছে গিয়ে নালিশ কর্‌বে, খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লে না। এমন যে হবে, সে কখনো ভাব্‌তেও পারেনি। অবিশ্যি চঞ্চুলিকার চেয়ে অনেক ভালো নাম ছিলো তা'র মনে, তবে সে সেগুলো বল্‌বে, না খুকিকে ফেলে রাখ্‌বে

তা'র অদৃষ্টের হাতে?—না বলাই বোধ হয় ভালো। ছেলেরা, সে বরাবর লক্ষ্য করেছে, এক-একটি জন্তুবিশেষ; কোনো কথা যদি তা'দের কাছে বলা যায়।

কমল একটু ভেবে বল্‌লে, 'আমার তো মনে হয় বনশ্রী নামটি বেশ মিষ্টি।'

আভা ফস্ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, 'ভারি একটা বল্‌লে! বল্‌লেই বিশ্রী আর মিছ্‌রি মনে পড়ে।'

কমল বল্‌লে, 'তা হ'লে, ধর্, জয়তী।'

'ওমা, জয়তী যে আমাদের ক্লাশের একজন মেয়ে আছে।'

'এমন নাম তুই কোথায় পাবি, যা আর একজনেরও নেই? বাঙ্‌লা দেশের সব মেয়ের নামই তুই জানিস্ নাকি?'

'বয়ে গেছে জান্‌তে। বেশির ভাগ মেয়ের নামই তো রমা আর ছায়া আর মায়া আর বেলা আর রেবা আর বীণা আর লীলা। এমন নাম সহজেই বা'র করা যায়, যা আর কারো নেই।'

'তুই-ই বল্।'

'আমি বল্‌ছি', মাণিক হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো, 'সোনালি'।

'সোনালি! এ আবার নাম হয় কবে!'

এবার আভার পালা হাস্‌বার।—'তার চেয়ে বল্ না চৈতালি কি হরিতালি কি করতালি। রূপালি কি তামালিই বা মন্দ কী?'

'কেন হবে না', মাণিক তীব্রস্বরে বল্‌লে, 'তোমাদের রবিবাবু যদি পদ্যে লিখ্‌তে পারেন খেয়ালী আর কাকলি আর ঝামরী—তা হ'লে সোনালিই বা হবে না কেন?'

'দ্যাখ্ বোকারাম', কমল তক্ষুনি ব'লে উঠ্‌লো, 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তুই কিছু বলিস্ নে। চুপ ক'রে থাক্।'

'ভারি সব দিগ্‌গজ পণ্ডিত এসেছেন এক-একজন। আমি, দেখে নিয়ো, ওকে সোনালি বলেই ডাক্‌বো।'

'তুই মহাকালী ব'লে ডাক্‌লেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু ওর নাম হবে মঞ্জুভাষা।'

কমল বল্‌লে, 'ভারি বল্‌লি। সবাই ডাক্‌বে তো মঞ্জু ব'লে, আর মঞ্জু নামের হাজারখানেক মেয়ে বোধ হয় আছে দেশে।'

'তাও তো বটে! তা হ'লে রাগিণী—'

'দূর', মাণিক বল্‌লে, 'শুন্‌লেই মনে হয় রেগে আছে।'

'বিন্ধ্যবতীটা কেমন? বেশ গম্ভীর আওয়াজ।'

'ঠিক জাম্বুবতীর মত।'

'দ্যাখ্ মাণিক, তুই যদি সব সময় ও-রকম ফাজ্‌লেমি কর্‌বি—'

'হ্যাঁ, ফাজ্‌লেমিই তো! আর তোমরা যখন করো, খুব ভালো।'

'তুই এখান থেকে যা।'

'কক্ষনো যাবো না।'

'নিশ্চয়ই যাবি।'

'ইস্! তোর কথায় নাকি?'

আচ্ছা, যা'র কথায় যাবি, তাকে ডাক্‌ছি।' আভা চ্যাঁচাতে আরম্ভ কর্‌লে, 'মা, মা—'

পাশের ঘর থেকে মা এলেন।—'কী হয়েছে?'

'দ্যাখো তো, মা, মাণিকটা কি কর্‌ছে।'

'কী করেছিস্ তুই, মাণিক?'

'কী আবার কর্‌বো!'

'তোরা জট্‌লা বেঁধে এখানে কর্‌ছিস্ কী? পড়াশুনো নেই কারো?'

আভা তাড়াতাড়ি বল্‌লে, 'খুকির একটা নাম ঠিক কর্‌ছিলুম, মা।'

'খুকির নাম? খুকির নাম আমি সীতা রাখ্‌বো। তোরা যা-ই বলিস্, সীতার মত মিষ্টি নাম কি আর আছে।'

আকাশ ভেঙে পড়্‌লো আভার মাথায়। 'কিন্তু, মা, ওতো একটুও আজকালকার মত হলো না। ছি, ছি, ও-নাম তুমি কিছুতেই রাখ্‌তে পার্‌বে না।'

মাণিক সুযোগ পেয়ে বল্‌লে, 'কেন আমার তো বেশ ভালোই লাগ্‌ছে।'

আভা সাঁঝালো গলায় ব'লে উঠ্‌লো, 'ইস্, ওর আবার একটা ভালো লাগা!'

'থাক্, এখন আর তোদের এ নিয়ে ঝগড়া কর্‌তে হবে না', ব'লে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আভা খানিকক্ষণ ব'সে রইলো হতভম্ব হ'য়ে। শেষটায়, সীতা! আভার সব চেয়ে সখের শাড়ীটা কেউ কেড়ে নিলেও সে এর চেয়ে দুঃখিত হ'তে পার্‌তো

না। তারপর সে ভাব্‌লে, মা বল্‌লেন আর অম্‌নি সবাই নামটা মেনে নিলে, তা'র তো কোনো মানে নেই। যে নামটা সব চেয়ে সুন্দর, সেটাই শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌বে। তখন সে বল্‌লে, 'আচ্ছা মেজ-দা, দীপা নামটা কারো আছে বলে জানো?

কমল একটু ভেবে বল্‌লে, 'কই, মনে তো পড়্‌ছে না।'

মাণিক বল্‌লে, 'ও-নামে কি কেউ কাউকে ডাক্‌তে পারে? ডাক্‌বার জন্যে দেখ্‌বি ঝণ্টু কি হাসি কি ছবি ঐ গোছের একটা নামই হবে।'

আভা ক্লান্তস্বরে বল্‌লে, 'তা-ই যদি হয়, তা হ'লে এত ভেবে-চিন্তে নাম রাখাই বা কেন? একটা বিশ্রী, বিদ্‌ঘুটে নামে না ডাক্‌লে কারো যদি ভালো না লাগে—'

'দ্যাখ্', কমল হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো, 'নাম তো ডাক্‌বারই জন্যে। ডাক্‌তে সুবিধে, এমন নামই ভালো। আর তেমন একটা অসাধারণ নাম তুই পাবিই বা কোথায়? আমি বলি কী, বেশ ছোট-খাটো একট মিষ্টি নাম রাখা যাক্।'

'যেমন?'

'যেমন ধর্ কমলা'

'ক্ষেপেছো? আমাদের অঙ্কের টিচারের নাম কমলা—আর তাঁর যা মেজাজ!'

মাণিক বল্‌লে, 'অরুণা তো বেশ নাম।'

'না, না, অরুণা-বরুণা-তরুণা ও-সবের কাজ নয়। শুন্‌লেই মনে হয় নভেল।'

'মালতী?' কমল বল্‌লে, 'বেশ ঠাণ্ডা নাম।'

'কচু! ঐ তো ও-বাড়ীতে এক মালতী আছে—কী বিশ্রী দেখ্‌তে।'

'রাণী? যে যা-ই বলুক্, রাণীর মত নাম আর নেই।'

'ঐ একটা নাম শুন্‌লেই আমার গা জ্বালা করে। যদি ওর নাম ঊর্ম্মিলাও হ'তে হয়, তবুও রাণী নয়।'

'ঊর্ম্মিলাই বা মন্দ কী, ডাক্‌বে ঊর্ম্মি ব'লে।

'নাঃ', আভা হতাশভাবে মাথা-ঝাঁকুনি দিলে, 'এমন বিপদে কে কবে পড়েছে! একটা নাম পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে!'

'দ্যাখ্, নাম একটা হ'লেই হয়। শুন্‌তে-শুন্‌তে, ডাক্‌তে-ডাক্‌তে সব নামই মিষ্টি শোনায়।'

'নাম রাখো সুধা,' মাণিক অনেকক্ষণ পরে বল্‌লে, 'শুন্‌লেই মনে হয় লক্ষ্মী মেয়ে।'

'মনে হয় ছিঁচ্‌কাদুনে।'

'না-হয় নিরুপমা—একটু সেকেলে অবিশ্যি, কিন্তু বেশ—মোটেও ফাজিল গোছের নয়।'

'কী-রকম যেন মোটা-মোটা নামটা।'

'নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেলোনা। তোর যা খুসি রাখ্, আমরা হার মান্‌লুম।'

আভা চুপচাপ খানিকক্ষণ ভাব্‌লো—প্রাণপণে ভাব্‌বার চেষ্টা কর্‌লো। তা'র নীচের ঠোঁটটা কাম্‌ড়ে-কাম্‌ড়ে সে আর কিছু রাখ্‌লে না, ঘাম দেখা দিল কপালে।

* * * *

ঘণ্টা দুই পরে আভা তা'র দিদির ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো।

'কী রে?'

'দিদি, তোমার খুকির জন্য একটা নাম···।'

'কী, বল্?'

'বনশ্রী। চমৎকার নাম—না? আর একেবারে নতুন।'

'চমৎকার। এ নিয়ে পাঁচটা হলো।'

'পাঁচটা?'

'হ্যাঁ—মা বলেছেন সীতা, বাবা বলেছেন মৃন্ময়ী, কমল—'

'মেজ-দা?'

'হ্যাঁ—কমল বলেছে সুধা—'

'সুধা! কখন্ বল্‌লে?'

'এই তো একটু আগে এসে বলে' গেলো। আর মাণিক—'

'মাণিক কী বলেছে?'

'মাণিক বলেছে রাগিণী। তোরা সবাই মিলে ওর নাম রাখ্‌ছিস্, আর খুকি এদিকে কী সুন্দর হাস্‌ছে, দ্যাখ্। দুষ্টু মেয়ে, এখনই এত হাস্‌তে শিখেছে। এই খুকি, খুকি—তোমার মাসি এসেছে, খুকি। খুকি, তোমার মাসিকে একটু হাসি দেখিয়ে দাও তো।'

বুদ্ধি বলিহারী !

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

গাঁয়ের বুড়ো গঙ্গাচরণ কল্‌কাতাতে এসে,
জিনিষ কিনে হরেক রকম ফিরবে এবার দেশে।

পুতুল, বাঁশী, বইয়ের রাশি, বেলুন, ছাতা, সাড়ী,—
সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাচরণ চল্‌ছে তাড়াতাড়ি।

নাত্‌নী নাতী ঠাকুর্দ্দাদার পথ্‌টি চেয়ে আছে,
পূজার আগেই জিনিষ নিয়ে ফিরবে তাদের কাছে।

ইষ্টিশানে, ইষ্টিমারে লোকের হুড়োহুড়ি,
চাপের চোটে চ্যাপ্টা হবে গঙ্গাবুড়োর ভুঁড়ি।

কাজ্‌ কি গিয়ে ভীড়ের মাঝে,—গঙ্গাচরণ ভাবে,
নতুন কিছু ফিকির ক'রে দেশের পানে যাবে।

অনেক ভেবে জলের মাঝে জালার উপর চড়ি'—
'দুগ্‌গা' ব'লে গঙ্গাচরণ ভাসিয়ে দিল তরী।

পূর্ণিমা চাঁদ উঠ্‌ল সাঁঝে ঝল্‌মলিয়ে হেসে,
ফুর্‌ ফুর্‌ ফুর্‌ লাগ্‌ছে হাওয়া গাম্‌ছা-পালে এসে!

ইষ্টিমার আর রেলের গাড়ী রইল পিছে প'ড়ে,
গঙ্গা বেয়ে গঙ্গা চলে জালার ভেলা চ'ড়ে।

সাবাস্‌, সাবাস্‌, গঙ্গাচরণ, বুদ্ধি বলিহারী!
পূজার আগেই এক্কেবারে পৌঁছে যাবে বাড়ী।



একটি পাখীর কথা

চীনা-কাহিনী

(শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী)

যে পাখীকে বড় কেউ চোখে দেখতে পায় না কিন্তু গানের সুর সবাই সদাই শোনে, গঠনটা যার অনেকটা শালিখের মত, তবে রং কুচ্‌কুচে কালো, আমাদের দেশের পুরুষ কোকিলের মত, আর ডাকও ঐ কুহু কুহু, সেই পাখীর কথা বলতে চীনদেশের লোকে বলেন—অনেক অনেক দিন আগে, সে যে কতদিন আগে তা' কারো মনেই নেই, দু'টি পরমা সুন্দরী মেয়ে পূর্ণিমা রাত্রিতে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ী ছেড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিকে ছোটখাট পাহাড় আছে, তার আশেপাশের বনে থোলো থোলো বঁইচে হয়, তারি ফুল ফোটা দেখতে; ফুলগুলি হয় দুধের মত শাদা আর গন্ধে আকুল-করা।

তোমরা বোধ হয় জানো সব শাদা ফুলই রাত বেলায় ফোটে, যেমন কামিনী, গন্ধরাজ, বেল, যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা, টগর, সিউলি, এসব ফুলের গন্ধ বড়ই মিষ্টি, তাই সবারি মন ভুলে যায়। প্রজাপতিই বলো আর মৌমাছি ভোমরাই বলো, এই গন্ধের টানে, আর শাদা রংএর জন্যে, অন্ধকারে পথ খুঁজে পায়, তাদের কাছে পৌঁছতে পারে। রঙীন ফুল দিনে ফোটে, গন্ধ মোটে নেই বল্লেই হয়, তবে মধু থাকে—যেমন জবা, কল্‌কে ফুল, গাঁদা, সূর্য্যমুখী, নজর করলেই দেখতে পাবে। তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম পদ্মফুল, রক্তকরবী।

যে গাছের খোঁজে মেয়েরা গিয়েছিল, তার পাতা ঝরে না, ফল বঁইচের চেয়ে ছোট, তারি মত গোলাকার, শরীরটা তুঁত ফলের মত নরম তুলতুলে, খেতে ও দেখতে অনেকটা তেমনি।

মেয়ে দুটি হেসে গল্প করতে করতে চলেছিল, কথা যেন আর ফুরোয় না; হঠাৎ বলা কওয়া নেই, একটা প্রকাণ্ড বাঘ—ডোরা-কাটা শরীর—আচম্বিতে মেয়েদের মধ্যে হ'তে যার নাম 'আকো' তাকে নিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার বোন 'আলো' এম্নি ভয় পেয়েছিল, কিছুক্ষণ নড়তেই পারল না, মুখ দিয়ে

কথা বেরোয় না, 'আকো'কে নিয়ে বাঘ যেদিকে চলে গিয়েছিল, বড় বড় চোখ করে বোবার মত সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর পাগলের মত জঙ্গলের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে দিদিকে নাম ধরে 'আকো' 'আকো' বলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে চল্‌ল; তখন তার জ্ঞান বুদ্ধি যেন কিছুই ছিল না। তারপর সে পাখীর আকার হয়ে উড়ে গেল—মুখে কুহু কুহু গান, কোকিল পাখীর মত কালো রং, তেমনি মিষ্টি সুর। চীনদেশের দক্ষিণে এখনো সেই পাখী দেখা ও তার মধুর সুর শোনা যায়।

তোমরা জান কিনা জানিনে, একটা চল্‌তি কথা আছে—'বাঘের দেখন, সাপের লেখন, অর্থাৎ বাঘের সম্মুখে পড়লেই সে মারে আর সর্পাঘাতে যদি মরণ লেখা থাকে তবেই সে কামড়ে দেয়—মানুষ মরে যায়।

—:০:—

কুহু

(শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী)

কোকিল যে কালো পাখী তা' তোমরা জানো
সুর তার সুমধুর তা' তোমরা মানো—
প্রাচীন চীনের দেশে এই মত পাখী,
বারোমেসে গায় গান কুহু কুহু ডাকি'।

বসন্তের পথ বেয়ে নয় আনাগোণা
দু'দিনের গান তার নয় শুধু শোনা—
আমাদের কোকিলের গান সে সুখের
পথ-চলা পথিকের হাল্কা বুকের।

শোকের বেদনা ব'য়ে গায় চীনা পাখী,
সুর তার অফুরাণ শুধু ডাকাডাকি।



(শ্রীযতীন সাহা)

নকুল ভট্‌চার্য্যি তাঁর জীবনে এত বড় ভুল করেননি কোনোদিন—এই ভুলটির জন্যেই বুড়ো বয়সে তাঁকে হ'তে হ'ল একেবারে নাজেহাল। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! ভট্‌চার্য্যি মশাই পাকা লোক হয়ে শেষে কিনা বুড়ো-বয়সে এত বড় একটা ভুল করে বস্‌লেন! কিন্তু তাঁরই বা দোষ কি! ভট্‌চার্য্যি মশাই তো ঠিক ঠিকই ছেড়ে দিয়েছিলেন—সেটা যে অন্য কারুর হাতে গিয়ে পড়বে তা' তিনি বুঝ্‌বেন কি করে! আর তাই যদি বা বুঝ্‌বেন তবে কি আর আজ তাঁকে এমন নাকাল হ'তে হয়! যাক্ মজাটা কিন্তু লুটেছিলুম আমরা! পূজোর দিনে এম্‌নি মজা ক'জনের ভাগ্যে জোটে!

কথাটা তা'হলে খুলেই বলি।

পূজোর ছুটীতে অনেকে অনেক জায়গায় যায়। কেউ দেশবিদেশে, কেউ হাওয়া খেতে, কেউ মাসীর বাড়ী, কেউ বা মামাবাড়ী। আমাদের দলটির কিন্তু ফি-বছরই পূজোর সময় বাড়ী না গেলেই নয়। হোক্‌না পাড়াগাঁ, কিন্তু সেখানে যাবার জন্যে ছুটীর অনেক আগে থেকেই মনটা উতলা হয়ে ওঠে। যা-ই করি, চারিটি বন্ধুই তাতে থাকা চাই। চড়ুইভাতি, যাত্রাগান শোনা, নেমন্তন্ন খাওয়া, সব-কিছুতেই চারজনের থাকা চাই-ই।

সুরেশ, বিশে, কালো আর আমি—চার বন্ধুতো নই, যেন আকাশের চারটি তারা। পাড়ার সবাই আমাদের এক সঙ্গে ডাক্‌তো 'ফোর জুয়েল'।

সেবার পূজোর ছুটীতে স্কুল থেকে 'কন্‌সেশান' টিকেট করে আমরা বাড়ী এলুম।

বিশেদের বাড়ী পূজো; তা সে যেমন তেমন পূজো নয়! ছ' বছর পর পালি ঘুরে তাদের বাড়ী পূজো হচ্ছে—দীর্ঘ ছ'টি বছর পর! বিশেদের টাকা পয়সাও যথেষ্ট, পূজোয় খরচও করবে ঢের।

বাড়ী পৌঁছামাত্র স্বয়ং বিশের বাবা আমাদের বাড়ী এসে বলে গেছেন, পূজোর চার দিন যেন আমরা আর কোথাও না যাই। চারটি দিনই যেন আমরা বিশেদের বাড়ীই থাকি, খাই, আমোদ-আহ্লাদ করি। আর সব দেখা শোনা, লোকজন খাওয়ানো থেকে থিয়েটারের 'ষ্টেইজ্' ম্যানেজ, এমনকি প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভারই আমাদের ওপর। সে চার দিন আমরাই বাড়ীর কর্ত্তা—আমরাই যেন সব।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সপ্তমী-অষ্টমী দু'টো দিন মহা ধূমধামে কেটে গেল।

নবমী দিন রাত্রে আমাদের সৌখিন থিয়েটার। সেই দিনই রাত্রে নবমী পূজোর পর গ্রাম শুদ্ধ মেয়ে-পুরুষ সবারই নেমন্তন্ন। ন'টার ভেতর সবাইকে খাইয়ে ওঠাতে হবে। মোট কথা, ন'টার পর যেন কেউ না বলে যে, 'আমি খাইনি'! মায় বাড়ীর লোক পর্য্যন্ত। তারপর হবে আরতি। আরতি শেষ হ'লেই আরম্ভ হবে আমাদের থিয়েটার।

সন্ধ্যে ছ'টা থেকে লোকে লোকে বাড়ী ভরে গেল। বাইরের উঠোন আর ভেতর বাড়ীর উঠোনে ঠাঁই করা হ'ল। ভেতরে খাবেন মেয়েরা, আর বাইরে খাবেন বেটাছেলেরা। তাছাড়া তো ঘরে, বারান্দায় আছেই। লুচি, পায়স, দই, সন্দেশ, মণ্ডার গন্ধে বাড়ী ভরে গেছে। ওঃ! সে কি বিপুল খাবার আয়োজন!

বাইরে ভেতরে দু'-দু'টো 'পেট্রোম্যাক্স'এর আলোতে একেবারে দিন করে ফেলেছে।

ঠাকুরঘরে যে সব প্রসাদ নিবেদন করা হয়েছে, সেই প্রসাদ আগে সবার পাতে দেওয়া হবে। তারপর ভেতরের খাবার আয়োজন যা হয়েছে তাই। ভট্‌চার্য্যি মশাই ঠাকুরঘরের সব। তিনিই পূজো কর্‌ছেন। দুর্গোৎসবে তিনি পূজো না কর্‌লে নাকি গাঁয়ের কারও শান্তি হয় না। পূজো করে করে তিনি পাকা হয়ে গেছেন—তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছেন। তবুও তার অসীম ক্ষমতা।

এই বুড়ো বয়সে এখনও তিনি দু'হাতে বড় বড় দু'-দু'টো ধূনচি নিয়ে, নামাবলি গায়ে দিয়ে নূপুর পড়ে অসাধারণ ভঙ্গিতে নৃত্য করে আরতি করেন।

ঢাক, ঢোল, কাড়া, সানাইর তালে তালে পা ফেলে, নেচে নেচে তিনি আরতি করেন। পরিধানে গেরুয়া কাপড়, কপালে রক্তচন্দন আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা! ভট্‌চার্য্যি মশাইকে দেখ্‌লেই ভক্তিতে আপ্‌নিই মাথাটা নুইয়ে পড়ে। ডান হাতে যজ্ঞোপবিত নিয়ে তিনি মুক্তকণ্ঠে ছেলে বুড়ো সবাইকে আশীর্ব্বাদ করেন। এমন আশীর্ব্বাদই তিনি করেন, যে তার একটা ফলে গেলেই একেবারে মহারাজাধিরাজ! কিন্তু দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত তা হওয়া কারও ভাগ্যে ঘটেনি। ভট্‌চার্য্যি মশাইর একমাত্র ছেলে নবকিশোর। আমাদেরই বয়সী সে হবে। কিন্তু এরই ভেতর সে বাবার সবটুকু বিশেষত্বই অনুকরণ করে ফেলেছে।



আমাদের সমবয়সী হ'লেও সে কিন্তু মেশে সব বুড়োদের সাথে। ছেলে বয়সের খোলস পড়ে সে সেজেছে অন্তরে অন্তরে ঠিক ষাট বছরের বুড়ো। আদর করে ভট্‌চার্য্যি মশাই তার নাম রেখেছিলেন নবকিশোর; কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিজ্ঞ লোক হয়ে ভট্‌চার্য্যি মশাই তার নামকরণ কর্‌তে ভুল করেছেন। নবকিশোর না রেখে তার নাম জনার্দ্দন রাখলেই মানাতো ভাল।

যাক্ ভট্চায্যি মশাই মনের মত ছেলেই পেয়েছেন বল্‌তে হবে। কারণ কথায় কথাই আমাদের উপদেশ দিয়ে তিনি পিতৃভক্ত ছেলের উদাহরণ স্বরূপ নবকিশোরের নাম উল্লেখ কর্‌তেন। নবকিশোর পিতৃভক্ত ছেলেই বটে! নইলে ভট্চায্যি মশাইর কপালে এও ঘটে! এহেন পিতৃভক্ত নবকিশোরের কাছে কোথায় লাগে ভীষ্মদেব আর কোথায় লাগে ক্যাসাবিয়াঙ্কা!

ঘরে-বাইরে মেয়ে-পুরুষ আসন-পিড়ি হয়ে বসে গেছে মহাভোজে। তাদের ভেতর যারা পেটুক, ভোজের গন্ধ পেলে যাদের জিব বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ে, তারা পর্য্যন্ত শরীর ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়েছে। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তাদের ধরে টেনে তুল্‌তে হবে! মণ্ডা-মেঠাই পেটে জমিয়ে তারা এম্‌নি ভারি হয়েছে। তারা যেন কোন রকমে উঠ্‌তে পারলেই বাঁচে।

বিশে, সুরেশ আর কালো, কোমড়ে গামছা বেঁধে উঠে পড়ে লেগে গেছে পরিবেশন কর্‌তে। তাদের হাতে পড়ে আজ আর কারও রক্ষে নেই।

আমার ওপর পড়েছে কুকুর তাড়াবার ভার। হতচ্ছাড়া কুকুরগুলো একটু ফাঁক পেলেই গিয়ে পাতে মুখ দিয়ে লোকের খাওয়া নষ্ট করে। চাকরগুলো কুকুর তাড়াবে কি! ব্যাটারা ইয়াবড় এক একটা লাঠি নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে লোকের খাওয়া দেখ্‌ছে। ব্যাটাদের দু' ঠ্যাংএর ফাঁক্ দিয়ে যে এদিকে কুকুর হানা দিচ্ছে, সে দিকে হুঁস্ নেই। হতভাগারা যেন চরস খেয়ে এক একটা তালগাছের মত গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেগতিক দেখে আমিই একটা লাঠি নিয়ে চারদিকে পায়চারী কর্‌ছি। আর না করেই বা কি করি! মানুষে কুকুরে গলাগলি ধরে বসে আহার কর্‌বার জন্যে তো ভদ্রলোকদের নেমন্তন্ন করা হয়নি!

গোটা কয়েক ল্যাং খেয়েই কুকুর বেচারীরা যে যার মতন সরে পড়্‌ল। তারা হয়ত মনে মনে বল্‌লে, 'না বাবা, ব্যাপার বড় সুবিধে মনে হচ্ছে না!'

পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ মনে হ'ল, আবছায়া আঁধারে ঠাকুরঘরের পেছনে বেলগাছটার তলায় একটা কুকুর আস্‌ছে। লাঠিটা বাগিয়ে ধরে, পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে দেখি ও মা! এযে আমাদের পুরুতঠাকুরের ছেলে নবকিশোর! আমায় দেখেই নবকিশোর কাচুমাচু করে কি বল্‌তে গেল। তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বল্‌লুম—"তাই বল, তুমি নবকিশোর! আরে, তা বল্‌তে হয় ঠাকুর! আর একটু হ'লেই আমি তো কুকুর ভ্রমে ব্রহ্মহত্যা করে বস্‌তুম আর কি!

ভাগ্যিস্ লাঠিটা ছুঁড়ে মারিনি তাই রক্ষে!"

হঠাৎ প্রফুল্ল হয়ে নবকিশোর বল্‌লে—'কি ছাতু কচ্ছ লাঠি নিয়ে! ওদিক দিয়ে কুকুরে সবার খাওয়া নষ্ট করে দিলে যে!'

—'কোন দিকে,' বলে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে আমি সেই দিকে এগিয়ে গেলুম।

কিছুক্ষণ বাদে আবার টহল দিতে দিতে ঠাকুরঘরের পেছনে এলুম। কাল অনেক রাত্রে দই খেয়ে গলাটা বসে গিয়ে একটু কফের মত হয়েছিল; তাই মাঝে মাঝেই গলাখাক্‌রি দিচ্ছিলুম। হঠাৎ একবার ঠাকুরঘরের দেয়ালের দিকে চোখ পড়তেই দেখি মাটির দেয়াল খানিকটা জায়গায় ভেঙ্গে গেছে। হয়ত কুকুরে সিঁদ কেটেছে ভেবে আমি একটু এগিয়ে গেলুম। গলাটা যেন বড্ড ভারি হয়ে উঠেছে—একটু সাফ্ করার জন্যে গলাখাক্‌রি দিচ্ছিলুম, কিন্তু ঠিক সেই সময় ঠাকুরঘরের ভেতর ভট্চায্যি মশাইর গলাখাক্‌রির শব্দ আমার কানে এলো। স্বভাববশতঃ আমি আবার গলাখাক্‌রি দিতেই ভেতরেও আবার গলাখাক্‌রির শব্দ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাঙ্গা জায়গাটা দিয়ে দু'খানা হাত বেড়িয়ে এলো। ব্যাপার কি! বুঝতে না পেরে আমি ঝুঁকে কাছে যেতেই দেখি শুধু হাত নয় দু'হাতে ধরা একটা সন্দেশের হাঁড়িও!

হাত দেখেই আমি চিন্‌তে পার্‌লুম। এ হাত নিশ্চয়ই আমাদের ভট্চায্যি মশাইর! কেননা ঐ হাতের আশীর্ব্বাদ আমার-- ভাগ্যে বহুবারই ঘটেছে। সুতরাং ও হাত আর ভুল হবার জো নেই! সঙ্গে সঙ্গে আমার কাণে একটা অস্ফুট শব্দ এল 'হুঁ'! এ ইঙ্গিতের অর্থ বুঝ্‌তে আমার একমিনিটও দেরী হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়িটা ধরে আমিও বল্‌লুম্, 'হুঁ'; অম্‌নি হাত দু'টো থেকে হাঁড়িটা আপ্‌নিই খসে আমার হাতে এল! এও কি তবে ভট্চায্যি মশাইর কল্যাণ-হস্তের আশীর্ব্বাদ বৃষ্টি! এখন সহজেই নবকিশোরের এখান দিয়ে আনা-গোনা করার কারণটা বুঝতে পারলুম। হয়ত এতক্ষণ এম্‌নি আরো অনেক হাঁড়ি নবকিশোরের মারফৎ উধাও হয়েছে।

চট্ করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ছুটে গিয়ে বিশে, সুরেশ আর কালোকে ডেকে আনলুম। হাঁড়িটা মাঝখানে রেখে বল্‌লুম, 'খা, মায়ের প্রসাদ কত খাবি!'

এক হাঁড়ি সন্দেশ চারজনে উদরস্থ করে ফেল্‌লুম। পূজোর দিনে তো অনেকে অনেক কিছুই খায়, কিন্তু এমন করে পূজোর মজা করা কজনের ভাগ্যে ঘটে!



তারপর ওদের নিয়ে আবার ঠাকুর-ঘরের পেছনে এসে বল্‌লুম, 'এখানে একটু দাঁড়া, একটা মজা দেখাচ্ছি!'

ভাঙ্গা বেড়ার কাছে গিয়ে একটা গলাখাক্‌রি দিতেই ভেতর থেকেও একটা গলাখাক্‌রির শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে সেই হাত দু'খানা আর সন্দেশের হাঁড়ি বেড়িয়ে এল। তারপর শব্দ হ'ল 'হু'।

'হু' বলে আমিও জামার আস্তিন গুটিয়ে প্রস্তুত হ'লুম কিন্তু এবার হাঁড়ির বদলে ভটচার্য্যি মশাইর হাত দুটো কশে ধরে টান সুরু করে দিলুম। ওরা তো কাণ্ড দেখে অবাক্! এদিকে ভট্‌চার্য্যি মশাইর চীৎকারে সমস্ত লোক এসে সেখানে জড় হ'ল! "ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? বলি অমন করছেন কেন ভট্‌চার্য্যি মশাই?" আর অমন কচ্ছেন কেন— ভট্‌চার্য্যি মশাইর অবস্থা তখন কাহিল।



হাবা গঙ্গারাম

(শ্রীসুখলতা রাও)



হাবা ছেলে গঙ্গারাম,
সাধে তোর হাবা নাম?
পেয়ে পাকা মর্ত্তমান
আহ্লাদে আটখান,
খাওয়া ভুলে হাতে ধ'রে
হাসছিস গাল ভ'রে।



ভাগীদার কত জোটে,
গাছতলা নয় মোটে
নিরাপদে বস্‌বার,
তাই বলি দশবার,
খেয়ে নে রে চট্‌পট্
নয়ত দে চম্পট।



কাক চিল বাজ এসে
ছোঁ মেরে যে নেবে শেষে।
এত বলি, হুঁস নাই?
আয় ছুটে—দূর ছাই,
নিল নিল, আরে আরে—
হাঁদা আর বলে কারে!!

অতীতের অতিকায়

(শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ)

সে বহু কোটি বছর আগেকার কথা। তখন ভারতের আকার এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য একেবারে অন্য রকমের ছিল এবং তখনকার আব্‌হাওয়াও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। মানুষ তো তখন জন্মায়ইনি; মানুষের পূর্ব্বপুরুষ এবং সমসাময়িক স্তন্যপায়ী জীবের পূর্ব্বপুরুষও তখন জন্মায়নি। এখন যেখানে হিমালয় পর্ব্বত সাদা জটাজুট এলিয়ে বসে আছে, সেখানটা ছিল এক মহাসমুদ্র—পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত জুড়ে—এবং ইয়োরোপের আল্পস্ পর্ব্বতও এই সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিল। আরব্য সাগর জুড়ে এক মহাদেশ ভারতকে আফ্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত করে ছিল এবং আফ্রিকাও দক্ষিণ-আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক বিস্তীর্ণ মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। তখনকার দিনের গাছপালাগুলি ছিল অন্যরূপ। তাদেরই কেউ কেউ মাটি চাপা পড়ে কোটি বৎসর মাটির চাপ ও উত্তাপে কয়লায় পরিণত হয়েছে এবং কেউ কেউ বা অবস্থার তারতম্য ভেদে পাথরে পরিণত হয়েছে। এই রকম একটা পাথরে পরিণত গাছের গুঁড়ি (প্রায় ৭০ ফিট লম্বা) কলিকাতার যাদুঘরে আছে। প্রাণীজগতে সরীসৃপের আধিপত্য সব চেয়ে বেশী—এবং এখন যেমন স্তন্যপায়ী জীব-জগতের অধিপতি, সরীসৃপদের অবস্থা ছিল ঠিক সেই রকম। তাদের মধ্যে অনেক জাতীই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে—যদিও কিছু কিছু এখনও আছে, যথা কুমীর, কচ্ছপ, গোসাপ্, ইগুয়ানা, হাঙ্গর ইত্যাদি। এদের মধ্যে একটা জাত ছিল পৃথিবীর রাজা, যেমন স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এখন মানুষ। এই জাতীয় সরীসৃপ আকারে প্রকাণ্ড ছিল এবং তাদের চেহারা ছিল ভীষণ। এই ভীষণাকৃতি অতিকায় জীবের নাম হচ্ছে ডাইনোসর—ডাইনস্ মানে ভীষণ, ভয়াবহ আর সওরাস্ হচ্ছে সরীসৃপ (sauraes হচ্ছে গ্রীক্ কথা)।

সম্প্রতি ভারতের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত জব্বলপুর সহরে এদের প্রস্তরে পরিণত অস্থি-কঙ্কালাদি পাওয়া গেছে। ১৯১৯ সালের আগে এদের বিষয় আমরা বেশী কিছু জান্‌তাম না। জগতের অন্যান্য দেশ থেকে ডাইনোসরের কঙ্কালাদি পাওয়া গিয়েছে; তা'র মধ্যে চীন দেশের মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত গোবী মরুভূমিতে

পাওয়া অস্থি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; কিন্তু ভারতবর্ষের ডাইনোসরসের বিষয় আমরা কিছুই জানতাম না। ঐ বৎসরে ডাক্তার সি,এ, ম্যাট্‌লী নামক এক বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত জব্বলপুরের বড়-সিমলা পাহাড় থেকে ডাইনোসরের অস্থি ও কঙ্কালাবশিষ্ট আবিষ্কার করেন। কলিকাতার যাদুঘরে এইগুলি রাখা হইয়াছে। সম্প্রতি এই বৎসর তিনি এই প্রবন্ধের লেখককে সঙ্গে নিয়ে জব্বলপুরের আর এক জায়গা থেকে (ছোট-সিমলা পাহাড় থেকে) অনেক ভাল ভাল অস্থি ও কঙ্কালাবশিষ্ট সংগ্রহ করেছেন।



ছোট-সিমলা পাহাড় খুঁড়ে ডাইনোসরের অস্থি বের করা হচ্ছে

এবারের অভিযানের ফলে যে সকল ভাল ভাল হাড় পাওয়া গেছে তাদের আকার দেখ্‌লে বোঝা যায় এই জানোয়ার কি রকম অতিকায় ছিল। একটা পুরো জঙ্ঘার হাড় লম্বায় ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং পায়ের দুটো হাড় এক একটা

লম্বায় ২ ফুট ৮ ইঞ্চি, উপরকার হাতের হাড় লম্বায় ৩ ফুট, একটা ছোট ধরণের পাঁজরার হাড় ২০ ইঞ্চি, লেজের অস্থিগুলি ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা। এর থেকে অনুমান করা যায় যে এই জাতীয় সরীসৃপের আকার কি প্রকাণ্ড ছিল। এর আগের অভিযানে ম্যাট্‌লী সাহেব যে সকল অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি আরও বড় জানোয়ারের ;—তাদের এক একটা জঙ্ঘার হাড় ছিল ৬ ফুট।

আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ থেকে এই জাতীয় কোন কোন সরীসৃপের সম্পূর্ণ কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সেগুলি বিশেষরূপে পরীক্ষা ও সে বিষয়ে নানা গবেষণার ফলে দেখা যায় যে এই সরীসৃপগুলি লম্বায় ৫০।৬০ ফুট ছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে জন্তুটি আবিষ্কৃত হয়েছে (আমেরিকার পিটস্‌বুর্গ-নামক জায়গা হতে) সেটা অন্ততঃ ৮০ ফুট লম্বা এবং তার ওজন প্রায় ৪০ টন অর্থাৎ প্রায় ১১০০ মণ।

জব্বলপুর থেকে এবার যে জানোয়ারটির হাড় পাওয়া গেছে সেটা জীবিত অবস্থায় অন্ততঃ ৪৫।৫০ ফুট লম্বা ছিল (এর নাম দেওয়া হয়েছে টিটানোসরাস) এবং এর পূর্ব্বেরটা ৬০ ফুটের কম তো নয়ই—হয়তো তার চেয়ে বেশী লম্বা। জানোয়ারগুলির চেহারাও তদ্রূপ। হাতীর চেয়েও বড় শরীরখানা—অথবা অতিকায় গোসাপকে হাতীর মত বা তার চেয়েও বড় থামের মত চারটে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলে যেমন দেখায়, প্রায় তেমন দেখ্‌তে। লেজটা একটা অজগর সাপের মত লম্বা এবং গলাটাও তদ্রূপ সরু আর লম্বা—তার ওপর একটা ছোট্ট মাথা এবং মস্তিষ্কটা তার চেয়েও ছোট। দেহের অনুরূপ মস্তিষ্ক তো মাটেই নয় বরং দেহের অনুপাতে মস্তিষ্কটা অনেক ছোট। খাওয়া, শোওয়া এবং ডিমপাড়া ছাড়া আর অন্য কোনও কাজ করবার ক্ষমতা সে মস্তিষ্কের ছিল না। অতবড় শরীরের পিছন দিকের অঙ্গ পরিচালনা করার জন্য আর একটা স্নায়বিক কেন্দ্র ছিল সেটা মস্তিষ্কের মতনই কাজ কর্‌ত এবং সেটা শরীরের পিছনের অংশে ছিল। বুদ্ধি এদের খুবই কম ছিল আর সেজন্যই তারা অন্য কোনও দিকে উৎকর্ষ লাভ কর্‌তে পারে নি। এই জাতীয় সরীসৃপ জলে ও স্থলে দু'জায়গাতেই বিচরণ কর্‌ত, তবে বেশীর ভাগ সময় কাটতো জলের ভেতর। অতবড় শরীর নিয়ে ডাঙ্গায় চলাফেরা করার অসুবিধার দরুণ জলেতেই তারা থাক্‌তো এবং জলে ভেসে থাকার ক্ষমতার ফলে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাট্‌তো তাদের। তা

ছাড়া জলে থাকার দরুণ তারা ডাঙ্গার শত্রুদের হাত থেকেও নিজেদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌তো। এই জাতীয় ডাইনোসরেরা উদ্ভিদ্‌ভোজী ছিল—দাঁত তাদের সংখ্যায় অনেক ছিল, কিন্তু সেগুলো জোরালো ছিল না ; পেন্সিলের মত লম্বা নরম নরম জলজ উদ্ভিদাদি সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কোনও কাজে লাগাতে পার্‌তো না। এদের প্রকৃতি ছিল বেশ ঠাণ্ডা ধরণের।

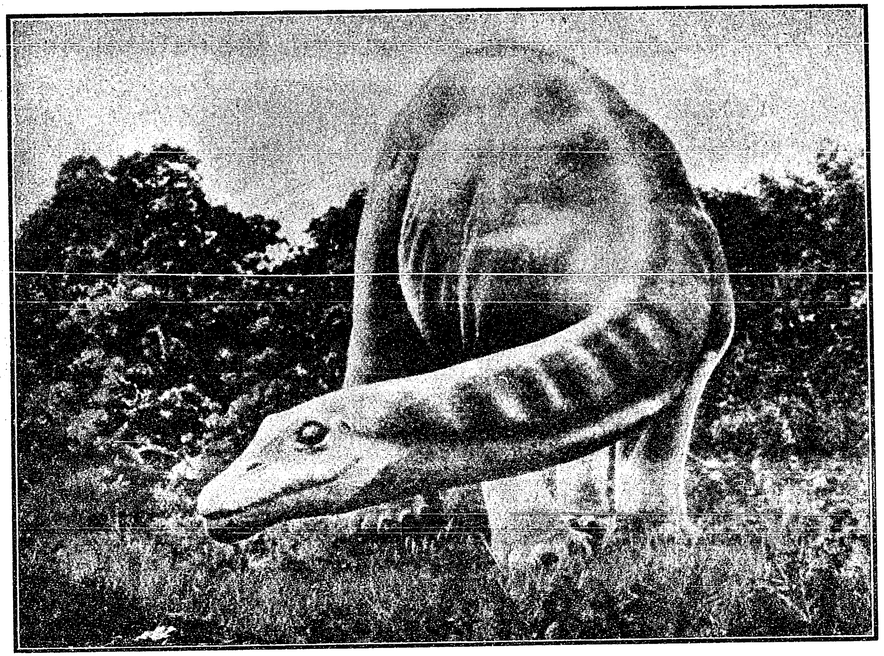

ডিপ্লোডকাস্—জব্বলপুরে এই জাতীয় ডাইনোসরের হাড় পাওয়া গেছে

জব্বলপুর থেকে আর এক জাতীয় ডাইনোসরের হাড়-গোড় এবং দাঁত ও নখ পাওয়া গেছে। তারা ছিল মাংসাশী এবং এত ভয়ানক মাংস-খোর জানোয়ার পৃথিবীতে কোনও কালে দেখা যায় নি। বিরাট্ চেহারা, বাঘ সিংহের

চেয়েও হিংস্র ও ভয়ঙ্কর — দাঁতের দু'দিকে করাতের ধারের মত কিরি কিরি কাটা; একবার এদের কবলে পড়্লে উদ্ধার পাবার কোন উপায়ই ছিল না। এরা হাঁটত দুপায়ে, কতকটা উট পাখীর মত এবং মাটির উপর বেড়াত; এদের সামনের পা দুটো ছিল ছোট এবং নখওয়ালা। এই পা দুটো হাতের কাজ কর্‌ত; যেমন, শীকার ধরা ও তাদের ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করা। আহারের খোঁজে যখন যেত এরা, তখন অন্য সব প্রাণীই সন্ত্রস্ত হয়ে থাক্‌তো। আগে যে উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরের কথা বলেছি তারা এদেরই কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে জলের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হয়েছিল। সুতরাং বুঝতেই পার এই মাংসাশী ডাইনোসরগুলি ছিল কি ভয়ানক জীব। এরা আজ বেঁচে থাক্‌লে জগতের অন্য কোনও জানোয়ার হয় তো থাক্‌তো না। এই জাতের আমিষভোজী ডাইনোসরের মধ্যে "ইণ্ডোসরাস", "ইণ্ডোসুরাস" আর "জব্বলপুরিয়া" — এই নামে তিনটি জাত ছিল।

আর এক রকমের ডাইনোসর জব্বলপুর থেকে পাওয়া গেছে। তারা ডাঙ্গাতেই থাক্‌তো এবং এরাও উদ্ভিদভোজী। তবে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার দরুণ তাদের সারা গায়েতে বর্ম্মের মত ছোট ছোট আঁশ থাক্‌তো। লেজটা তাদের ছিল ডাণ্ডার মত শক্ত এবং হাড়ের তৈয়ারী, আর তার ওপর লম্বা লম্বা শক্ত কাঁটা। কচ্ছপের খোলা যে জিনিষের তৈয়ারী সেই জিনিষের তৈয়ারী আঁশ দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা। এরা হিংস্র প্রকৃতির মোটেই ছিল না, তবে যখন কেউ এদের আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ত তখন এরা না পালিয়ে মাটিতে বসে পড়্‌ত এবং ডাণ্ডার মত লেজটি এদিক ওদিক নাড়্‌ত। শত্রুকে সর্ব্বদাই পিছনদিকে রেখে লেজটি নেড়ে বিষম প্রহার কর্‌ত। তখন সে শত্রুর কি রকম অবস্থা হ'তো বেশ বুঝতেই পার্‌ছ। এই ডাইনোসরের নাম দেওয়া হয়েছে ল্যামেটাসরাস্।

এই তিন রকমের "ভীষণাকার সরীসৃপ" বড় বড় হ্রদ ও জলার কাছে থাক্‌তো। যে সময় তারা ভারতবর্ষে ছিল সেই সময় মধ্যপ্রদেশে অনেক বিস্তীর্ণ হ্রদ ছিল — ভারতবর্ষটা তখন, বল্‌তে গেলে হ্রদ আর জলায় ভর্‌তি ছিল! বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার যে যে স্থানে এখন কয়লার খনি সেই সেই স্থানে ছিল বড় বড় হ্রদ, জলা ও নদী। সুতরাং দেখ, তখনকার ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য কি রকম ভিন্ন ছিল। এই সব হ্রদের সৃষ্টির কারণ সহজে অনুমান করা যায় না;

তবে মনে হয় যে তখনকার কিছু আগে ঐ সব প্রদেশে বিস্তীর্ণ বরফের নদী (Glaciers) ছিল। সারাটা জায়গা বরফে ঢাকা ছিল — এই জাতীয় বরফের নদী চলার ফলে মাটির সঙ্গে সংঘর্ষণে জায়গাগুলিতে গর্ত্ত হ'তো; তারপর বরফগুলি গলে যাবার ফলে গর্ত্তগুলি জলে ভর্‌তি হয়ে যায় এবং তা'র থেকে এই সব হ্রদের সৃষ্টি। আবার অনেক জায়গায় বিস্তীর্ণ প্রদেশ সবশুদ্ধ মাটির গর্ত্তে ধসে গিয়ে

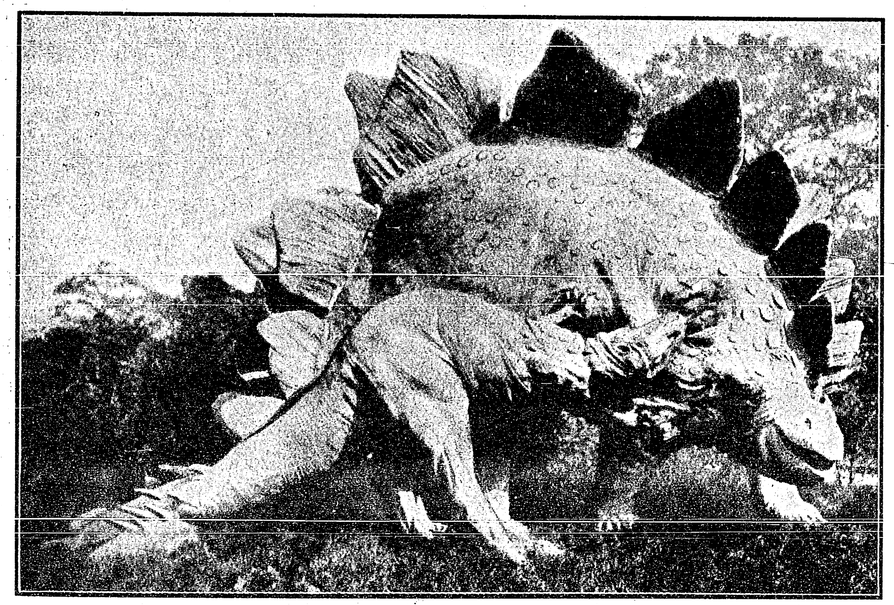

বর্ম্মধারী নিরামিষভোজী ডাইনোসরকে হিংস্র আমিষভোজী আক্রমণ কর্‌ছে

নীচু জমির সৃষ্টি করত; বৃষ্টির জলে এবং নদীর জলে ঐ সব নীচু জায়গা জলে ভরে গিয়ে হ্রদে পরিণত হতো। ক্রমে যতরাজ্যের জীব ঐ সব জলরাশির আশেপাশে জড় হতো এবং তারা মরে গিয়ে কালে তাদের কঙ্কালগুলি অবস্থাভেদে প্রস্তরে পরিণত হোতো। এইরকম কঙ্কাল জগতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়।

জব্বলপুরে ও চণ্ডা প্রদেশে যে সব সরীসৃপের অস্থিরাশি পাওয়া গিয়েছে সেই জাতীয় সরীসৃপের অস্থি দক্ষিণ-আমেরিকার অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ প্যাটাগোণিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাডাগাস্কার দ্বীপেও পাওয়া গিয়াছে। এথেকে মনে হয় যে সে যুগে ভারত, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার যোগাযোগ ছিল, যার ফলে এদেশ থেকে ওদেশে যাওয়ার পথ বেশ সুগম ছিল। এ ছাড়া ভূরি ভূরি অন্য প্রমাণও আছে যা দিয়ে বোঝা যায় যে দক্ষিণ গোলার্দ্ধে এক মহাপ্রদেশ ছিল, যেজন্য কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে এ তিন মহাদেশের গাছপালার ও জীবজন্তুর মধ্যে তফাৎ বিশেষ ছিল না; অর্থাৎ এক জাতীয় গাছপালা ও জীব জানোয়ার দ্বারা এই সব দেশগুলি ভর্‌তি ছিল।

হিমালয় ও আল্পস্ পর্ব্বতাদি সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠ্‌বার কিছু আগেই ভারতীয় এবং জগতের অন্যান্য ডাইনোসরগুলি প্রায় এক সময়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কেন যে এরা একসঙ্গে হঠাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তার কারণ নির্ণয় করা সহজ নয়। হয়তো জল-বাতাসের পরিবর্ত্তনের ফলে তাদের বাসস্থানগুলি ক্রমশঃই থাকবার অযোগ্য হয়ে উঠ্‌ছিল। যাই হোক্, এটা ঠিক যে তাদের বংশ লোপ না পেলে আজও পৃথিবীতে সরীসৃপেরা রাজত্ব করত, কারণ ইহাদের সময়ে যে সব স্তন্যপায়ী জীব ছিল তারা ছিল আকারে কুকুর বিড়ালের মত এবং সদাই প্রাণভয়ে থাকার ফলে তাদের ক্রমঃবিকাশ ও ক্রমোন্নতির পথে বিশেষ বাধা হচ্ছিল।



(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

বাবলা

(মিস্ হামিদা হোসেন—গ্রাহক নং ৮৭৯)

যতীনবাবুর বড় মেয়ে কল্যাণীর বিবাহ হইয়াছিল গ্রামে। একমাত্র ছেলে বাবলাকে লইয়া সে বেশ সুখের সংসার পাতিয়াছিল।

যতীনবাবু দেখিলেন, কল্যাণীর ছেলে যেটের কোলে পা দিয়া আট বৎসর পার হইতে চলিয়াছে, তথাপি পড়াশোনার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি হইবে কি করিয়া! সে তো এক অজ পাড়াগাঁ—না আছে স্কুল পাঠশালা, না আছে লেখাপড়াজানা বিদ্বান লোক! যতীনবাবু কল্যাণীর বিবাহ দিয়াছিলেন অতি শিশু বয়সেই, তাহার শিক্ষার সমাপ্তিও সেই সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছিল। কাজেই কল্যাণীর দিক হইতেও বাবলার পড়াশোনা না হওয়ার জন্য কোনরূপ অনুতাপ বা অনুযোগ ছিল না।

গ্রামে তাহার শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা না হওয়ায় যতীনবাবু তাহাকে সহরে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং শীঘ্রই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মা বাবাকে ছাড়িয়া আসিতে প্রথমে বাবলার খুবই কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দাদু, দিদিমা, প্রায়-সমবয়সী দুই মামা, এবং মায়ের মত যত্ন নেবার ফুলমাসীকে পাইয়া অতি শীঘ্রই তাহার সে কষ্ট দূর হইল।

এখানে আসিয়া বাবলার ভয়-ভীতু মনটা দিদিমার প্রশ্রয়ে ক্রমে পুষ্ট হইয়া এমন দারুণ ডানপিটে হইয়া উঠিয়াছিল যে যতীন বাবুকে বাধ্য হইয়া চশমার ভিতর হইতে বাবলার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে দিদিমার প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য কড়া অর্ডার আসিল। বাবলা সহসা এমন শাসনের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না; তাই অপ্রত্যাশিত শাসনে বেচারা কেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল।

মনের যখন এই অবস্থা, এমনি সময় ফুলমাসী তাঁহার গান গল্প ও স্নেহের মৃদু শাসনে বাবলার শিশুচিত্তটি এমন ভাবে জয় ও বশীভূত করিয়া লইলেন যে

দুর্দ্দান্ত বাবলা ফুলমাসীর একান্ত অনুগত ও বাধ্য হইয়া সুবোধ ছেলেটির মত পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়া সকলকে শুধু বিস্মিত নয় আনন্দিতও করিয়া দিল।

বাবলা আসিয়া দেখিয়াছিল—তাহার দাদু সুন্দর কাঠের কাজ জানেন, নিজের আফিস ঘরটিতে তিনি প্রায়ই ঐ সব নিয়া মাতিয়া থাকিতেন। বাবলা বাড়ীতে নূতন আসিয়া প্রথম Electric light দেখিয়া এক অস্বাভাবিক বিচিত্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সকলের হাস্যাস্পদ হইয়া বিষম জব্দ হইয়াছিল। সেই হইতেই সে সতর্ক হইয়াছে। অজানা বস্তুকে সে আর কখনও অবহেলা করে না, তার ফুলমাসীর নিকট সে সব তথ্যের সুমীমাংসা করিয়া লয়। Electric সম্বন্ধে জানিতে বাবলা ক্রমে অনেক কিছু পড়িয়া ফেলিয়াছে। ফুলমাসী তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ গড়িয়া তুলিয়াছেন। এজন্য সে একান্ত কৃতজ্ঞ।

দাদুর আফিস ঘরে প্রবেশ করিলে এখন আর বাবলা চারিদিকে ছড়ানো যন্ত্রপাতির প্রতি অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে না। এখন সে কোন্ যন্ত্রের কি নাম, কোন্ জিনিষটার কি দরকার, সে সম্বন্ধেও নানা মত প্রকাশ করিতে পারে।

দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল। সহসা একদিন ঝোঁক উঠিল, তাহার একটা বাইসাইকেল চাই। আর সে এও আবিষ্কার করিয়া বসিল যে বাড়ী হইতে তাহার স্কুল নিদেন পক্ষে আধ মাইল তো বটেই। ভাত খাইয়াই এতদূরে হাঁটিয়া স্কুলে যাওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। আব্দারটা সে জানাইয়াছিল দিদিমার কাছে। তিনি সে কথা যতীন বাবুর কাছে পাড়িলেন।

যতীন বাবু তখন সবে Wireless এর একটি নূতন ক্যাবিনেট শেষ করিয়া পূর্ণ উদ্যমে চার ভাল্‌ভের একটি সেট তৈরী করিতে ব্যস্ত! ঐ সব বাজে কথায় কাণ দেবার মত অবসর তাঁহার ছিল না। বর্ষা আসিয়া পড়িলে কয় মাসের জন্য রেডিও বেকার, কাজেই যতীনবাবু তাহার পূর্ব্বেই কাজটী শেষ করিতে চান। বর্ষায় শব্দ ধরিতে কষ্ট হইয়া থাকে, আওয়াজ পরিষ্কার হয় না।

বাবলা ফুলমাসীর সাথে সাথে দাদুকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। সেটটি (set) সম্পূর্ণ হইলে তাহা ক্যাবিনেটে বসান হইল। বাবলার পক্ষে এযে কত নূতন, কত interesting তাহা বলিবার নয়।

* * *

আজ দারুণ অভিমানে বাবলার বুকে ঝড় বহিয়া যাইতেছে! প্রায় ১০।১৫

দিন হইতে সে সাইকেলের জন্য কত অনুনয় জানাইয়াছে কত অনুযোগ করিয়াছে, কিন্তু দাদু সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার! দুত্তোর না কিছু করেছে Radio set-এর!—আর যাইবে না সে দাদুর আফিসে, শুনিবে না সে গল্পদাদার গল্প পর্য্যন্ত! কিন্তু নূতনের মোহ বাবলাকে পাইয়া বসিল। মন টলিতে বেশীক্ষণ বিলম্ব হইল না। John Scott Taggart-এর four valve set! এযে একেবারে অভিনব আমদানী। নাঃ, আজকার মত অভিমানটা স্থগিত রাখিতেই হইল।

বাবলা মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল। অফিসে ঢুকিয়া বাবলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল ভিতরে জনতার সংখ্যা। সিনেমা হলের মত লাইন বাঁধিয়া চেয়ারের সারি পাতা রহিয়াছে—আর তাহা দখল করিয়া চেনা অচেনা অনেক মূর্ত্তি আসীন রহিয়াছেন।

হঠাৎ ঘর্ ঘর্ শব্দে বাজা থামিয়া গেল। যতীনবাবু ব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুতে tune করা গেল না—শব্দ অতি ধীরে ও খস্‌খসে হইয়া আসিতে লাগিল। বাবলা বলিয়া উঠিল, "দাদু, মাটি বোধ হয় শুকাইয়া গিয়াছে, earth tubeএ জল দেব?"

সোৎসাহে বাবলার পিঠ চাপড়াইয়া যতীন বাবু জল দিবার অনুমতি দিলেন। ক্রমে শব্দ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। যতীনবাবু কলিকাতা ছাড়িয়া শ্যামদেশ ধরিবার জন্য Loud speakerএর Switch খুলিয়া head phone লাগাইয়া condenser ঘুড়াইতে লাগিলেন। সকলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন।

বাবলার মাথায় সহসা একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। সে অতি সন্তর্পণে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। এদিকে শ্যামদেশ তো পাওয়া গেলই না—কলিকাতা পর্য্যন্ত বন্ধ! যতীনবাবু condenser ঘুড়াইয়া ঘুড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বাবলা ফিরিয়া আসিয়াছিল, বলিল,—"দাদু, head phone লাগাবার সময় যে switch বন্ধ করেছিলে, আর তো খোল নি।" অপ্রস্তুত যতীনবাবু ক্ষিপ্রহস্তে নিজের ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। যন্ত্র পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক! যতীনবাবু টর্চ্চ লইয়া যন্ত্রের অনেক স্থল পরীক্ষা করিলেন—সবই ঠিক; তবু current আসে না কেন?

বাবলা যতীনবাবুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাঁহাকে বলিল—

"আমার চিঠিখানা লিখে দাও দাদু, আমি তোমায় শ্যামদেশ এখনি শুনিয়ে দেব।"

তাহার কথায় যতীনবাবুর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বাবলার সাইকেল চাওয়ার কথা। সুযোগ বুঝিয়া সুচতুর বাবলা writting pad ও fountain pen সম্মুখে ধরিল আর সামনেই রাখিল খোলা ক্যাটালগ ও লাল পেন্সিলে চিহ্নিত করা একটি সাইকেলের ছবি।

অন্যমনস্ক ভাবে যতীনবাবু সাইকেলের অর্ডার দিয়া চিঠিখানা লিখিয়া ফেলিলেন। ছোঁ মারিয়া চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া বাবলা নিমেষে অন্তর্দ্ধান হইল। ফাঁকিতে পড়িতে হয় মনে করিয়া যতীনবাবু হাঁকিলেন, "বাবলা··· !।" "আস্‌ছি দাদু···" বাবলার স্বর অনেক দূর হইতে ভাসিয়া আসিল। আঁধারে ফুলমাসীকে লইয়া বাবলা তখন আফিস-সংযুক্ত wirelessএর বাইরের বড় switchটি খুলিয়া দিতেছিল।

ফিরিয়া যখন আসিল, তখন তাহার হাতে বড় একটী সাদা খাম। কেহই বুঝিল না যে এই খাম আনিবার অন্তরালে তাহার কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তারপর যতীনবাবুর সামনে গিয়া নাম ঠিকানা লিখাইয়া লইতেও তাহার বিলম্ব হইল না। আফিসের টেবিল হইতে stamp তুলিয়া চিঠিখানা আঁটিয়া ফেলিল। তারপর যতীনবাবুকে সরাইয়া বাবলা অতি বিজ্ঞের মত এদিক সেদিক নানা ভাবে ঝুঁকিয়া, সোজা হইয়া, বসিয়া দেখিল; পরে, যাইবার সময় সকলের অলক্ষ্যে সেট সংলগ্ন যে সুইচটি টিপিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল সেটা খুলিয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে current আসিবার শব্দ পাওয়া গেল। সরিয়া দাঁড়াইয়া উপদেশের স্বরে বাবলা বলিল—"নাও দাদু, চেষ্টা কর দেখি এখন — reception কেমন হয়!"

আফিস ঘরে শ্যামদেশ পাওয়া গেল। ঘরসুদ্ধ লোক বাবলার প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠিলেন। আসল ব্যাপার দাদু পর্য্যন্ত ধরিতে পারিলেন না। বাবলা ততক্ষণে তাহার কার্য্যোদ্ধার করিয়া ফুলমাসীর ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। দুজনে তখন কি হাসির ধুম!



পণ্ডিতের খেলা

(শ্রীসুবিনয় রায়)

শত শত বৎসর আগে গ্রীস্‌দেশে মহাপণ্ডিত আর্কিমিডিস্ জন্মিয়াছিলেন। তিনি একটি খেলা খেল্‌তে ভালবাস্‌তেন; আজ সেটি তোমাদেরও খেল্‌তে দেবো।

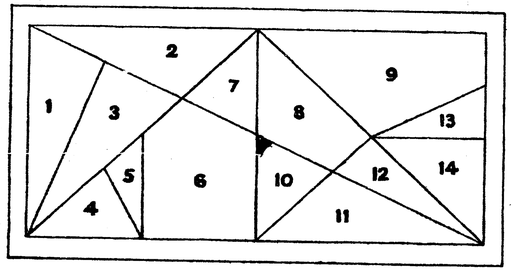

একটি চৌখোপীকে (লম্বায় যত বড়, চওড়ায় তা'র অর্দ্ধেক) কয়েকটি লাইন কেটে ১৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ১৪টি টুকরাকে নানা রকমে সাজিয়ে, মানুষ, জন্তু, জিনিষ ইত্যাদির আকার তৈয়ারী করাই হ'লো এই খেলা। প্রত্যেকবারই ১৪টি টুকরাই ব্যবহার করা চাই।

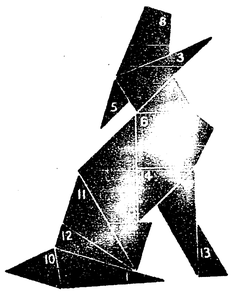

এবার ১৪টি টুকরার তৈয়ারী কয়েকটি মানুষ এবং জন্তুর ছবি দিলাম; আস্‌ছে বারে আরও কয়েকটি ছবি দেওয়া হবে। তোমরাও, ঐরূপ চৌখোপীর ঐরকম ১৪টি

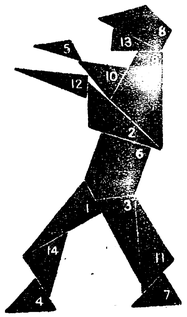

টুকরা কেটে নিয়ে, নানারকমে' সাজিয়ে, মানুষ, জন্তু ইত্যাদির নানারকম আকার গড়্‌তে পার! ভাল হ'লে আমরা সেগুলো "সন্দেশ"এ ছাপ্‌তেও পারি। মনে রাখ্‌বে, প্রত্যেকবারই ১৪টি টুকরা ব্যবহার করা চাই—একটিও বাদ দিলে চল্‌বে না।

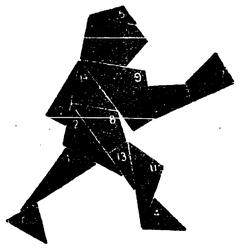

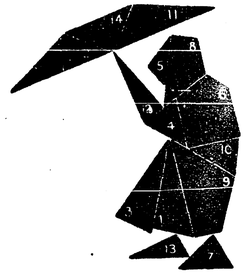

ছুটির দিনে এই খেলা বেশ জম্‌বে। ইচ্ছা কর্‌লে ঐ রকম আরও চৌখোপীর টুকরো কেটে নিয়ে, অনেকে মিলে ব'সে এই খেলা খেল্‌তে পার—কে কত ভাল ভাল চেহারা গড়তে পারে। ভাল কিছু গড়্‌তে পার্‌লে একটা কাগজের উপর ১৪টি টুকরা ঠিকমত সাজিয়ে আঠা দিয়ে মেরে নিতে পার।

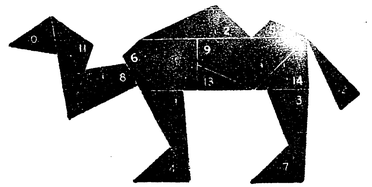

ধাঁধার উত্তর

১। **ইঁদুরের হেঁয়ালি**—'ক' আর 'ল'এর মধ্যে তুমি দাও যদি গো 'পা',
আপনা থেকে 'কপাল' হবে তা'ও কি জান না?

২। **প্রতিশব্দের বাড়াবাড়ি**—

পরশু বৈকালে খবর আসিল, নাগ মহাশয়ের দোকানে নূতন সন্দেশ (সন্-দেশ) আসিয়াছে। সংবাদ পাইবামাত্র আমি দোকানে গমন করিয়া দেখিলাম, ছোট বড় হরেক ব্যক্তি তাহার তসবির দর্শন করিতেছে।

দুইটি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন :—

পূর্ণিমা, বিল্ব ও অশোক, পুরী; প্রভা, প্রীতি, প্রজ্ঞা, পম্পা, প্রবুদ্ধ, প্রকৃতি, পার্ব্বতী, খুকু, ভবাণী, বেতিয়া; শ্রীগৌরীরাণী দাস, সৌরেন, সমরেন ও কনকপ্রভা দাস, সাওরাইল; আমিনা ও রহিমা, রেফায়েতপুর; বুদ্ধু, বকু, ছকু, মণিমালা, মগরাহাট; পরিতোষ, পরাগ, প্রদ্যোৎ, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঞ্জলী দেবী, রাঁচি; রণেন্দ্র ঘোষ, সুবিমল গুহ, প্রতিভা দেবী, খনা দেবী, ধর্ম্মনগর; শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, বরাহনগর; শ্রীকালীকিঙ্করী সাহা, চরপ্রাগপুর; শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বসু, বরিশাল; সেক্রেটারী, 'অশোক পাঠাগার' শিবসাগর; শ্রীমঞ্জিলমুকুল দত্ত, মেদিনীপুর; শ্রীঅশোককুমার সরকার, পুরুলিয়া; প্রবীন, পদ্মা, পরমা, পনি, পারু, পথু, শ্বেতশতদল, পিকা, বাবু, পুতুল, আন্থলিয়া; শ্রীসতীনাথ ভট্টাচার্য্য, নৈহাটী; শ্রীমীরা রায়, ঢাকা; রমণী, বিনয়, বিধু, উষা, বুচী ও মানী, ডোরেণ্ডা; শ্রীমতী রেবারাণী সান্যাল, টাটানগর; শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ আগরওয়ালা, টাটানগর, কুমারী চিণ্ময়ী সেন, রেণুকা সেন, বেলারাণী সেন, হাতীগড়; আবু, মন্থু, আমজাদ ও বুলু, কৃষ্ণনগর; জ্যোতিপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রামগোপালপুর; অণিমা, রেখা ও সুনীল, মোরাদাবাদ; সরোজেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, বেগুসরাই; শ্রীসুনীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাঁকিপুর; শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, চাইবাসা; ছবি, আরতি, প্রভাত, নীলিমা, বারিণ, শান্তিসুধা, কলিকাতা; অনিন্দিতা, সুনন্দা ও পুরবী, থাটন; শ্রীযোগেন্দ্রপৎ সিংদুগড়, আজিমগঞ্জ; কুমারী মমতা মিত্র ও কানাই মিত্র, কলিকাতা।

একটি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন :—

মদনমোহন কুমার ও গোপালচন্দ্র রায়, শ্রীরামপুর; নারায়ণ ও পরিমল, তিনসুকিয়া; প্রতিভা, বেণু, ডলি ও জীবানন্দ ঘোষ, রাজসাহী; শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী, কুচবিহার; সরলা ও কমলা মাইতি, ঝাড়গ্রাম; শ্রীক্ষেত্রগোপাল ধর, জামতাড়া; প্রফুল্ল, সুনীল, সুধাংশু, অরুণ, সত্যরঞ্জণ, প্রমথ, সুধীর, বাঁকিপুর; সুনীল, সলিল, ইলা, তরুণ, সমরেন্দ্র, শচীন্দ্র, ঘাটাল; রবিনন্দন দাস, ঢাকা; কুমারী সরস্বতী মিত্র, কলিকাতা; নির্ম্মলা, চপলা, কেষ্ট, ডলি ও অরুণ সরকার, গার্ডেনরীচ; কুমারী উষা মুখার্জ্জী, লক্ষ্ণৌ; শ্রীঅচিন্ত্যকুমার রক্ষিত, কলিকাতা; রণেশ, রাণী, খুকু, পটিয়া; অণিমা লাহিড়ি, কলিকাতা; শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্ত, বগুড়া; মায়া নন্দী, কুচবিহার; রমলা, কমলা, ইলু, মিণ্টু, পিরোজপুর; পারুল, বুড়া, গুণ্ডা, ভুকনা, রতন ও খুকু লাহিড়ি, কলিকাতা; শ্রীমলয়কুমার গুপ্ত, কৃষ্ণনগর; আশুতোষ, নিরঞ্জন, গোপাল, নির্ম্মল, নেপাল, কনক, করুণা, নীহার ও অনুপমা, রাজসাহী; শম্ভু, চাঁপা, শোভা, কালীঘাট; অন্নপূর্ণা, শান্তিপূর্ণা, বীণাপাণি, সুধাংশু ও মণ্ট, পুরী; বালকসঙ্ঘের সভ্যগণ, কাসুন্দিয়া; শ্রীইন্দুলেখা রায়, তেওতা; অমিতাভ, অশোক, মীরা ও কমলা দাস, এলাহাবাদ; অশোকা, রেণুকা ও সব্যসাচী, রাজসাহী।

নূতন ধাঁধা

১। নূতন রকমের ছাপা —

রামবাবু শ্যামবাবুকে একটা ছাপা দেখিয়ে বল্‌লেন, "বলুন তো, এটাকে কেন 'নূতন রকমের' ছাপা বল্‌ব ?" শ্যামবাবু বল্‌লেন, "এটাকে নূতন রকমের ছাপা বলার তো কোন কারণই দেখি না। শুধু কয়েকটি অক্ষর পুরাণো হয়ে ধ্যাব্‌ড়া আর ভাঙা দেখালেই যদি 'নূতন রকমের ছাপা' হ'তো, তা'হলে তো প্রায় সব ছাপাই 'নূতন রকমের' হ'তো।" রামবাবু বল্‌লেন, "আপনি দেখেও বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না ? আচ্ছা, হরিবাবুকে দেখাই, তিনি কি বলেন।"

রামবাবু ছাপাটা হরিবাবুকে দেখালেন আর বুঝিয়ে দিলেন কেন ওটাকে "নূতন রকমের ছাপা" বলা হয়েছে। হরিবাবু বল্‌লেন, "হ্যাঁ, তা'তো বটেই ; এটা তো 'নূতন রকমের ছাপা' বটেই।"

ছাপাটি ছিল এই ঃ—

"বরাকরে অবিরাম বারি বরষিছে।"

তোমরা কি বল্‌তে পার, কেন এটা "নূতন রকমের" ছাপা ?

২। শব্দ পূরণ—অপূর্ণ স্থানগুলি এমন শব্দ দিয়ে পূর্ণ করতে হবে যে প্রত্যেকটি শব্দ গোড়ার দিক থেকে পড়লেও যা হয়, উল্টো দিক থেকে পড়লেও তার উচ্চারণ একই থাকে। একই শব্দ দুই বার ব্যবহার করতে পারবে না।

কাল সন্ধ্যায় — এবং — দুজনে সকলের — — প্রেসে গিয়ে একটা — খবর এনেছে। তাতে জান্‌লাম যে — মহানায়ক শীঘ্র — যাবে এবং সেখান থেকে —এর ক্রেতাদের জন্য — জিনিষ আমদানী কর্‌বে।

—(শ্রীযতিপ্রসাদ রায় — গ্রাহক নং ১২৬০)

৺শারদীয় পূজার উপহার

— ভেল্কী —

শ্রীপ্রতুল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ শেষ হ'য়ে গেছে। একবার বইখানা নিয়ে বসলে এক নিঃশ্বাসে সবটা না পড়ে ওঠা যায় না।

দাম মোটে আট আনা।

কনক দেউল

শ্রীননীগোপাল দাশগুপ্ত প্রণীত।

ছেলেমেয়েদের কচি মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে। 'বন্ধুর নিঃস্বার্থ দান, রাজকুমারের ভ্রমণ কথা, ঘুমের দেশের রাজকুমারীর ঘুম-ভাঙ্গানো আর পরীর দেশের আজব কাহিনী'।

দাম বারো আনা।

মোহন বাঁশী



শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত।

ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের মন-ভুলানো এরূপ মজাদার গল্পেরবই খুব কমই আছে।

দাম মোটে চার আনা।



তারাবাঈ

(ঐতিহাসিক গল্প)

ছোট্ট মেয়ে তারাবাঈ দেশকে কি ভাবে ভালবাসতে শিখেছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য কি ভাবে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে যুদ্ধ করেছিল—তার পরিচয় প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই বই খানি পড়া উচিত।

দাম মাত্র ছয় আনা।

COLOURED DOCUMENT.



ভুতুড়ে দেশ

(একশ' খানা রঙিন্ ছবি নিয়ে)



নবশক্তি বলেন—

ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে একখানি—হ্যাঁ, আলব্যাৎ একখানি ছেলেদের বই বটে। কৌতূহলে এক পাতা, দুই পাতা, তিন পাতা করে একেবারে শেষের পাতায় যখন পৌছুলাম তখন হুঁস্ হোলো আমার নাওয়া খাওয়া আছে। অদ্ভুত লেখা আর তার সঙ্গে সঙ্গে অখিল নিয়োগীর নিজের হাতের আঁকা কিম্ভুত ছবি তাও আবার এক রং নয়, নানা রংএ নানা ঢংএ।



এডভান্স বলেন—

This is an illustrated novel for children. This uncanny, spooky and creepy tale will not only please the children but also their parents. There is not a single page which is dull or boring.

চাইল্ডস্ এ, বি, সি

আনন্দবাজার বলেন—

.....কেবল পুরস্কার যোগ্য নহে, এখানি **পাঠ্য পুস্তক হওয়া উচিত।** বিলাতী বইএর মত সুন্দর করিয়া রং বেরংএ ছাপা।

মূল্য মাত্র চার আনা।

মধুসূদন দাদা

রেডিও-গায়ক

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু, প্রণীত।

ছোট্ট ছেলেদের ভক্তি-মূলক একাঙ্ক নাটক।

মূল্য মাত্র দু' আনা।

—দেশনায়কগণের অভিমত—

যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য

দেশপূজ্য
৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির
অভিমত

"আমি মিঃ এইচ বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে ইহাই ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।"

স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জননেতা
লালা লাজপৎ রায়ের
অভিমত

"আমি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, মিঃ এইচ. বসুর "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" বাস্তবিক ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধ অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"

স্বাঃ লালা লাজপৎ রায়

কেশতৈল—কুন্তলীন, কোকোলীন, ম্যাকেসার, চামেলীন প্রভৃতি।

হেয়ার লোসন—দেলখোস, দিলতোষ, হার্টস্ ডিলাইট, প্রভৃতি।

পমেটম—দেলখোস পমেড, গোলাপ ও বকুল পমেটম প্রভৃতি।

এসেন্স—দেলখোস, হোয়াইট রোজ, অপরাজিতা, বকুল, মাস্ক, যুঁই, বেলা, চামেলী, খস, অরিগ্যান প্রভৃতি নানা সিরিজের বিবিধ প্রকার সুগন্ধি।

নানাবিধ অটো, হেয়ারওয়াস, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, লাইম যুস ও গ্লিসারিন ক্রীম এবং স্নো প্রভৃতি।

সাবান—হোয়াইট রোজ, চন্দন, খসখস, মাস্ক, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ ফলের সিরাপ।

এইচ, বসু, পারফিউমার,

৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

বিশ্ববরেণ্য
রবীন্দ্রনাথ
বলেন

"কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল কুন্তলীন ব্যবহারে একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক
৺ মতিলাল নেহেরুর
অভিমত

"ভারতবর্ষের প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এইচ, বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

COLOURED DOCUMENT.

Regd. No. C 700.





উড্ ওয়ার্ডের

গ্রাইপ ওয়াটার

চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

ইহা শিশুদিগকে সুস্থ রাখে।

WOODWARD'S
GRIPE WATER

I-WW 13-111A

W. WOODWARD LTD., LONDON, ENGLAND

ডঃ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

সন্দেশ



কার্ত্তিক, ১৩৪০

সম্পাদক-শ্রীসুবিনয় রায়
শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম্.এস্.সি

বার্ষিক ২৷৷৵০ আনা

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

COLOURED DOCUMENT.

ছেলেমেয়েদের জন্য

কয়েকখানি বাছাই বই

এগুলির পরিচয় ছেলেমেয়েদের কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যেমনি সরস সুন্দর ভাষা, তেমনি চমৎকার চমৎকার এক রঙের ও ৩-রঙের ছবি। মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত, এবং ডিরেক্টর-অব-পাবলিক-ইনস্ট্রাকসন কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র ...	॥০	কথাসরিৎ সাগর ...	॥৵০
” বেতাল পঞ্চবিংশতি	॥০	রবিন্ হুড	॥৶০
” বত্রিশ সিংহাসন	॥১	ওডিসিয়ুস	।৶০
পুরাণের গল্প ...	॥০	ইলিয়াড	।৶০

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

নূতন সংস্করণ

স্বাস্থ্য

পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত

১। পড়া শুনা ।৶০

২। খেলার পড়া ।৶০

স্বাস্থ্যের কথা ছেলেমেয়েদের জন্য অতি সরল সরস ভাবে লেখা। ভাল কাগজে, বড় অক্ষরে, পরিষ্কার ছাপা। অনেকগুলি ছোট ছবি, সুন্দর মলাট। মূল্য—ছয় আনা

বই দুইখানির নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম-এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা



মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

জন্ম—রাধানগর,
মে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ

মৃত্যু—বৃষ্টল,
২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ



নব পর্য্যায়
৩য় বর্ষ

কার্ত্তিক, ১৩৪০

২য় সংখ্যা

সাগরের গান

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

নীল সাগরের ডাক শুনেছি একা ব'সে কূলে,
ঢেউ ছেলেরা করছে খেলা কেবল দুলে দুলে,
জলের কোলে আকাশ মেশে,
না জানি কোন মায়ার দেশে,
তাদের পানে চেয়ে চেয়ে মন গেছে মোর ভুলে,
অগাধ নীলের ডাক শুনেছি একা ব'সে কূলে।

ঢেউয়েরা সব কোথা হ'তে আস্‌ছে ছুটে ভাই,
মাটির কাণে চায় বলিতে শোন্‌ সে কথাটাই।
মাটি বুঝি বুঝ্‌তে নারে,
বল্‌ছে সে তাই বারে বারে,
পিছিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে একটি সে কথাই,—
বুঝ্‌তে নারি শুন্‌তে তবু ভাল লাগে ভাই!

COLOURED DOCUMENT.

সন্দেশ

জলের কোলে পড়ল ঢ'লে সন্ধ্যাবেলার রবি,
নীলের কোলে উঠ্‌ল ঝ'লে রাঙা বরণ ছবি।
সোণার দোলায় সাগর দোলে,
সাঁঝের ছায়া নাচ্‌ছে কোলে,
ঢেউয়ের নাচন থেমে আসে সাঁঝের বিরাম লভি',
জলের কোলে পড়ল ঢ'লে রাঙাবরণ রবি।

নীল গগনের একটি তারা সাগর পানে চায়,
আঁধার মাঝে কারে বুঝি দেখ্‌তে সে আজ পায়।
ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে হাসি,
ছুটে আসে তারার রাশি
দেখ্‌তে তারে, নীল ঢেউয়ে যে ভেসে ভেসে যায়,
আঁধার মাঝে সেতার বাজে সাগর কিনারায়।

নীল ঢেউয়েরা হাতছানিতে ডাক্‌ছে বারে বারে,
ওই খানেতে মন চ'লে যায় দূরের দেশের পারে।
যাচ্ছে সেথা সাগর পাখী,
পাখায় সাঁঝের কিরণ মাখি',
ওই খানে যে বাঁশি বাজে রাতের অন্ধকারে,
কি গান গেয়ে ঢেউ আমারে ডাক্‌ছে বারে বারে।



শুকতারা

(আমেরিকার আদিম নিবাসীদের কাহিনী)

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

ছিল দুই ভাইবোন, দুজনে দুজনাকে খুবই ভালবাস্‌ত, কখনো ছাড়াছাড়ি হ'ত না। কেউ কখনো তাদের একা দেখেনি। একদিন তাদের বিদায়ের পালা এল। আকাশের যিনি রাজা তিনি মেয়েটিকে ডেকে পাঠালেন, তাকে আর এ পৃথিবীতে থাক্‌তে হবে না,—সে যাবে আলোর রাজ্যে, ভোরের ভানু যেখান দিয়ে দেখা দেন। ছেলেটি যাবে পাহাড়ী দেশে তার সঙ্গীসাথী হবে সেখান্‌কার পরীরা।

যখন বিদায় নেবার সময় এল, বোন ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে ছল্‌ছল চোখে বল্লে, "ভাইটি, আমি তোমার কথা সদাই মনে রাখব, আর আকাশের বাড়ী হ'তে দেখব যাতে তোমার কোন মন্দ না হ'তে পারে। যখন তুমি দেখবে ভোর হয় হয়, আকাশে রাঙা রাঙা মেঘের সারি ভেসে চলেছে, তখন তুমি জেনো, তোমার বোন লাল শাড়ী প'রে সাজ করছে।" ভাই বল্লে, "তাই হবে বোন, আমি পাহাড়ের চূড়োর কাছে বসে বসে তোমার পোষাক পরিচ্ছদ দেখব, ঝলমলে শাড়ী চকচকে হীরে মাণিক মুক্তো পান্নার গহনা, আর তুমি যে সুখে শান্তিতে আছ, ভাল ভাল কাপড় গহনা পরছ, দিন দিন সুন্দর হয়ে উঠছ জেনে, মনে কোনো দুঃখ রাখব না। তবু বল্‌ছি, তুমি থাকবে না, তোমাকে দেখতে পাব না, সেটা আমায় ব্যথা দেবেই"।

ভাইবোনের কথা শেষ হ'লে শোনা গেল, উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম চারিদিকের বাতাস, চারজন দেবদূত নেমে আস্‌ছে, তারা এসে সোণার একটা খোলা চতুর্দ্দোলায় করে মেয়েটিকে উষাদেবীর রাজ্যে নিয়ে গেল। সেখানে সে শুকতারা হয়ে এখনও আছে আর চিরদিনই থাকবে—কখনো অস্ত যায় না, কেবল যখন খুব কড়া রোদ হয় তখনই চোখে পড়ে না।

ভাই গেল সুমেরুর সোণার চূড়ো-ওয়ালা পাহাড়ে। সুমেরু কোথায় জানো? ভূগোল পড়েছ তো, কমলালেবুর গড়নের আমাদের এই যে পৃথিবী তারি উত্তর

দিকের পাহাড়ে। সেখানে ছ'মাস থাকে পুরোপুরি আলো, আর ছ'মাস আবছায়া অন্ধকার। সেখান হ'তে ভাইটি বোনের সাজ সজ্জা, রাঙা শাড়ী ওড়না পরে বিয়ের কণের মত চেহারা রোজই দেখতে পায়—কেননা ভাইয়ের সেই সোণার পাহাড়ের দেশে মেঘ আদপেই থাকে না।

বড় বড় পণ্ডিতেরা, যেমন তিলক মহারাজ, বলেন—আর্য্যরা ভারতবর্ষে আস্‌বার আগে সেইখানেই বসবাস করতেন; তারপর অনেক ওলট পালট হয়ে সে সব বদ্‌লে গেছে, এখন সেটা হয়ে গেছে শাদা বরফের দেশ।

—০—

শুকতারা

(শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী)

সে ছিল যে একদিন সাঁঝের তারকা,
সাঁঝে এসে দেখা দিত সবাকার আগে;
পশ্চিমের আকাশের খুলিয়া ঝরোকা,
আমাদের ভালোবেসে কত অনুরাগে।

তারপর হয়ে গেছে, ভোরে শুকতারা,
অস্ত যায়নাক কভু—হাসি মুখখানি;
তারে দেখে গান গায় সকল বনানী
ফুল হাসে, পাখী গায় সুখে মাতোয়ারা।





চালাকির ফল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

(১)

কোলারাম চেয়ে দেখ্‌লো, টক আম খেয়ে ডলির জিভ থেকে ফুটো ঘড়ার মত ক্রমাগত জল গড়িয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ আগে কোলারাম বেঙ মশায়েরও জিভ বেয়ে এম্নি রস গড়িয়ে পড়েছিল, তাই খানিকক্ষণ ভেবে সে বল্‌ল—এবারে বড্ড গরম পড়েছে। পশ্চিমে হাওয়া আদৌ নেই। শরীর ভাল হবে কিসে?

ডলি জিজ্ঞাসা করল—কোথায় থাকো তুমি? পূবো হাওয়ায়ই তো বৃষ্টি টেনে আনে।

কোলারাম উত্তর দিল,—এক জায়গায় কি সব সময় থাকি? গতবার এদেশে মোটেই বৃষ্টি হয় নি। তাই গরমে বড্ড কষ্ট হয়েছিল। সাত পুরুষ থেকে যমুনাজোড়ের পোলের ধারে একটা গর্ত্তে বাসা নিয়েছিলুম। বৃষ্টি নাই, যমুনাজোড় শুকিয়ে বালি ধূ ধূ কচ্ছে। অনেক কষ্টে সেখান থেকে উঠে ভাব্‌লুম কুণ্ডার কূয়ার মধ্যে এই দুর্ব্বৎসরটা কাটিয়ে দেবো; কিন্তু বোম্‌পাস শহরের ছেলেগুলো লাগলো আমার পিছু। কাজেই বেগতিক দেখে ভট্টাচার্য্যের গোলাপ বাগানের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়লুম সেখানে। মালিরা রোজ হাজার দু'হাজার

ঘড়া জল কূয়ো থেকে তুলে সকালে বিকালে গোলাপ বাগানে ছড়িয়ে দেয়। সেখানে চৌবাচ্চার ভিতর একটা জায়গা বেছে নিলুম। রাত্রিবেলা প্রত্যহ গোলাপ বাগানে ঘুরে বেড়াতুম। শীতকালে গোলাপ ফুলে বাগান ভরে উঠ্‌ল। সেখানে বছরখানেক কাটিয়েছি কিনা, তাই গা থেকে এখনো গোলাপের গন্ধ বেরয়। সেখানে থেকে মেজাজটাও হয়েছে বাদশাহী। আয়েশ পেলে নড়তে মোটেই ইচ্ছা করে না। গোলাপ জলের চৌবাচ্চা ছাড়া নাইতে ইচ্ছা হয় না মোটেই।

ডলি হি হি করে হেসে উঠ্‌লো, বল্‌ল,—এখন তোমার পুরানো বন্ধুদের কাছে যেতে ইচ্ছা করে না? সেই যমুনাজোড়ের পোলের নীচে।

কোলারাম উত্তর দিল,—একদিন সেখানেও গিয়েছিলুম। কাউকে দেখ্‌তে পেলুম না। নোংরা রকম থাকা এখন আর আমার ধাতে সয় না। তাই ভাব্‌ছি, কোন রকমে যদি পারি, কাশ্মীর বেড়িয়ে আস্‌বো। সেখানে অনেক রকম ফুল ফোটে, হাওয়া বাতাসও ভাল। ঝিলাম নদীতে আমাদের স্বজাতিও বিস্তর আছে শুনেছি।

ডলি জিজ্ঞাসা করলো,—তোমায় দেখে তারা তাড়িয়ে দেবে নাতো?

কোলারাম সগর্ব্বে বুক ফুলিয়ে বল্‌ল,—আমি অন্যের চেয়ে কম কিসে? এদেশে জন্মেছি বলে? কিন্তু বেঙের দেশে মানুষের মতো হিংসুটে বুদ্ধি আদৌ নেই। কোলা, সোণা, গেছো, পাতি, ঢোড়া, মাণিক এই কয় জাতের বেঙের চেহারা এক রকম না হ'লেও জাতে সবই এক। তোমাদের মধ্যে কি সকলের চেহারা এক? কিন্তু কাজের বেলা মানুষমাত্রেই নিজেদের স্বার্থ দেখেই চলে।

হঠাৎ ডলি জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা, কোলারাম হাতী কখনো দেখেছ?

কোলারাম উত্তর দিল,—দেখেছি বই কি? যদি সেটা হাতী হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই দেখেছি। তবে হাতী কিনা জানি না।

ডলি বল্‌ল,—হাতী চেন না, অথচ বল্‌ছ হাতী দেখেছ!

কোলা উত্তর দিল,—না-ই চিন্‌লুম, কিন্তু না চিন্‌লে কি দেখতেও কোন বাধা আছে?

ডলি জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা, সেটা দেখতে কি রকম বলত?

কোলারাম উত্তর দিল,—হাতী দেখতে যে রকম, সেই রকমই তার চেহারা—এইটুকু বুঝতে পারলে না?

ডলি রেগে বল্‌ল,—তুমি হাতী কেন, হাতীর বাচ্চাও দেখনি! হয়তো কখনো একটা খরগোশ দেখেছো, তাকে হাতী মনে করে রেখেছ।

কোলারাম বল্‌ল,—আরে না, না, সেইদিন দেখলুম ইন্দ্রের ঐরাবত রেগে ছুটে আস্‌ছে আমার পিছনে পিছনে। আমি ভয়ে মেরেছি দৌড়। তারপর

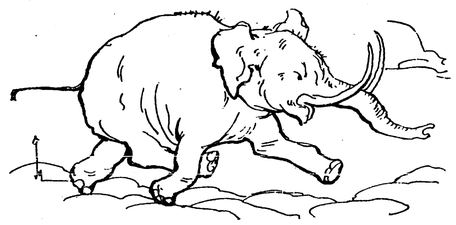

পিছনে তাকিয়ে দেখি, হাতীর শুঁড়টা মাত্র দেখা যাচ্ছে। বাকি শরীরটা বালির ভিতর একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমি রেগে গিয়ে হাতীর শুঁড়ের উপর মারলুম তিন লাথি। তাইতে হাতীটা জোরে চেঁচাতে সুরু করলো। আমি কিনা এই হাতীর ভয়ে পালাচ্ছিলুম! আমার জাতভাইদের ডেকে এনে দেখালুম হাতীর দুর্দ্দশা। এরা সবাই হাতীকে কাম্‌ড়িয়ে তার মাথার উপর চড়ে নাচতে সুরু করলো। সবাই বল্‌তে লাগ্‌লো,—ছিঃ! এই বুনো জন্তুটাকে কেন আমরা সবাই ভয় পেতাম। আহাম্মুকী!—একেবারে বেহদ্দ বেকুবী ছাড়া আর কি?

ডলি বল্‌ল,—তাই বুঝি এ বছর বুক ফুলিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? একটা হাতী না হয় মেরেছ। কিন্তু আরো জন্তু জানোয়ার এখনো বিস্তর বেঁচে আছে।

কোলারাম উত্তর দিল,—তাই মনে করেছি আর একটা ষণ্ডা হাতী এ বছর ধরবো।

ডলি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো,—হাতী ধরবে? সত্যিকার হাতী, না অন্য কিছু? কোলারাম উত্তর দিল,—সত্যিকার বই কি? হাতী ধরবার জন্য একটা ফাঁদ তৈরী করবো।

এমন সময় ভালুকরাম শাল বন থেকে গুটি গুটি বের হয়ে এসে ডলির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দু পা উঁচু ক'রে জিজ্ঞাসা করলো,—হাতী ধরবে কে?

ভয়ে কোলারামের প্রাণ শুকিয়ে গেছিল; কারণ তার জানা ছিল, ভালুকরামের থাবার নখ বড়ই ভীষণ।

ডলি কোলারামের ভয়ের কারণ লক্ষ্য ক'রে ভালুকরামের দিকে চেয়ে

বল্‌ল,—কোলারাম নাকি হাতী ধরবার একটা অদ্ভুত ফাঁদ তৈরী করেছে। তাতে সকল রকম হাতীই ধরা পড়বে।

এই কথা শুনে ভালুকরাম দু'পা তুলে খানিকক্ষণ নাচ্‌তে লাগলো। ভালুকের এই থব্‌থবে নাচন থাম্‌লে ডলি জিজ্ঞাসা করলো—কেমন ভালুকরাম, তুমি পারবে?

ভালুকরাম বল্‌লো,—আলবৎ, জরুর হোগা, নিশ্চয়,ইয়েস্ (Yes)—ভালুকের যতগুলি ভাষা জানা ছিল, প্রত্যেক ভাষায় তার জবাব দিল।

ডলি জিজ্ঞাসা করলো,—কি উপায়ে হাতী ধরবে শুনি?

ভালুকরাম বল্‌ল,—সেটা এখনো ঠিক করিনি।

ডলি বল্‌ল,—তা'হলে সেটা কোলারামের কাছে তোমার শেখা প্রয়োজন।

'অবশ্য শিখ্‌তেই হবে'—ব'লে ভালুক কোলারামকে দুহাতে জড়িয়ে কোলাকোলি করতে উদ্যত হ'তেই সে এক লাফে ডলির কোলের উপর উঠে মুখ গুঁজে চুপ ক'রে রইলো।

ডলি ভালুকরামের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল,—এ রকম করলে হাতী ধরার ফাঁদ শিখে তোমার কাজ নেই।

ভালুকরাম লজ্জা পেয়ে বল্‌ল,—না, না, আমি বন্ধুর সঙ্গে চেয়েছিলুম একটু কোলাকুলি করতে—তা' যাক, বন্ধু যখন তা' পছন্দ করে না তখন দূর থেকেই নমস্কার।

(২)

পরদিন কোলারাম হাতী ধরার যে ফাঁদ তৈরী করবে মনস্থ করেছিল, তা' ঠিক মতো মাপজোক ক'রে দেখা গেল, হাতী তো দূরের কথা, বড়জোর একটা খরগোশ কিম্বা বড় ইঁদুর তাতে আট্‌কা পড়ে।

কোলারামের এত বড় বোকামী ধরা পড়তেই ভালুকরাম চটে আগুন।

অগত্যা ঠিক হ'ল, ভালুকরাম নিজেই একটা ফাঁদ তৈরী করবে, কোলারাম তার সাহায্য করবে। হাতী ধরা পড়লে ডলিকে এনে দেখানো হবে।

কোলারাম রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে ফাঁদ তৈরীর নূতন কৌশল কি ভাবে হবে মনে মনে সেই সব ফন্দি আঁটতে লাগলো।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে কোলারামের ঘুম হয় না। শেষে ঘুম পাড়াবার নূতন কৌশল যা কাঠঠোক্‌রা সেদিন ব'লে গেছে সেটার পরীক্ষা চল্‌ল। ১০০ থেকে উল্টা দিকে ৯৯, ৯৮, ৯৭, ৯৬ করে ১ পর্য্যন্ত মনে মনে গুন্‌তে হবে। এই রকম বার দুই করলে নির্ঘাৎ এমন ঘুম আস্‌বে যে জান্‌তেও পারবে না।

কোলারাম প্রথম বার শেষ ক'রে দ্বিতীয় বার ৫৯এর সংখ্যা পর্য্যন্ত গুন্‌তেই সে দেখ্‌তে পেলো, দুধ সাগরের মধ্যে হীরা মুক্তার ফুল ফুটেছে। কোলারাম সেই ফুলের উপর বসে দুধ সাগরের জল চুষে পান কচ্ছে। আঃ কী মিষ্টি সেই জল! হঠাৎ দেখতে পেল, সেই দুধ সাগরের ভিতর থেকে একটা মস্ত কাল নাগিনী ফণা তুলে তার দিকে ছুটে আস্‌ছে। ভয়ে কোলারামের গা দিয়ে ঘাম ছুট্‌লো। সে লাফ দিয়ে দুধ সাগরের জলে ডুব মারতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলো একটা শিশির মধ্যে তার পা খানা ঢুকে পড়েছে—অনেক টানাটানির পর সেটা খোলা গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাতী ধরার একটা নূতন ফাঁদ তৈরীর কৌশল তার মাথায় গজিয়ে উঠল।

একটা প্রকাণ্ড লোহার জালার মধ্যে যদি খানিকটা মধু রেখে দেওয়া যায়, আর হাতীটা শুঁড় ডুবিয়ে সেই মধু খেতে যেই মুখখানা তাতে ঢুকিয়ে দিবে, অম্নি সেই জালার মধ্যে সে আট্‌কা পড়বে। তারপর যত খুসী হাতীকে পিটিয়ে পিটিয়ে শায়েস্তা করা যাবে।

ভোরে উঠেই কোলারাম দৌড়ে ভালুকরামের দরজায় হাজির।

ভালুকরাম তখন গর্ত্তের মধ্যে শুয়ে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। প্রথমে কোলারামের ডাক তার কাণে পৌঁছায় নাই। অগত্যা কোলারাম নিরুপায় হয়ে একগাছা বাব্‌লার ডাল এনে ভালুকরামের নাকের ছেঁদায় ঢুকিয়ে দিতেই সে হুড় মুড়িয়ে উঠে পড়েছে। সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছিল,—ইন্দ্রের ঐরাবত হাতীটা ভালুকরামকে শুঁড়ে জড়িয়ে শূন্যে তুলে বোঁ বোঁ করে ঘুরাচ্ছে। পাক খেয়ে ভালুকরামের মুখ দিয়ে মধুর রস গড়িয়ে পড়ছে। এতদিন মৌচাক ভেঙ্গে যত মধু খেয়েছিল তার শাস্তি স্বরূপ এই কাণ্ড ঘট্‌ছে।

ভালুকরাম হাতীর বদলে কোলারামকে ঘরের দরজায় দেখ্‌তে পেয়ে খুসী হয়ে বল্‌ল—আসুন বন্ধু, হাতী ধরবার উপায় কিছু স্থির হোল?

কোলারাম উত্তর দিল,—স্থির না হ'লে কি আর এতদূর ছুটে আসি!

কোলারাম নিজের উপায়টা ভালুকরামের কাছে বল্‌তেই ভালুকরাম বিশেষ খুসী হল। বিশেষ, মধুর কথা শুনে। কিন্তু লোহার ভাঁড় ভরা যায় এত মধু কোথায় জুট্‌বে।

কোলারাম উত্তর দিল,—কিছু মধু ভাঁড়ের মুখের কাছে থাক্‌বে। বাকি মধু তলায় পড়ে থাক্‌বে। হাতী ভাঁড়ের মুখের মধুর স্বাদ পেয়ে শুঁড়টি তলার দিকে সেঁধিয়ে দিবে। তার পর মাথা ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেই হাতী কাবু হবে একেবারে কাৎ।

ভালুকরাম খুসী হয়ে কোলারামের বুদ্ধির তারিফ করলো।

ভাঁড় এবং মধু দুই যোগাড় হোল।

হাতীগুলি যে রাস্তায় চলাচল করে, সেখানে একটা গর্ত্তের মধ্যে মধুর ভাঁড়টি রেখে আস্‌বার ভার নিল ভালুকরাম। সন্ধ্যাবেলা সেখানে ভাঁড়টি রেখে ভালুকরাম নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেল। রাত্রিবেলা হাতী এসে সেই ফাঁদে আট্‌কা পড়বে এই বিষয়েও কারু সন্দেহ রইলো না। কেবল হাতীর চীৎকার শুন্‌লেই সেখানে তাদের ছুটে আস্‌তে হবে।



কোলারাম মনের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু উৎকণ্ঠায় ভালুকরামের চোখে ঘুম আসে না। দুপুর রাত্রিতে মনে করলো, ভাঁড়টা ঠিক আছে কি না একবার দেখে আস্‌তে হয়। কি জানি, যদি হাতী এর মধ্যে সব জান্‌তে পারে।

ভালুকরাম চুপে চুপে গর্ত্তের কাছে এসে চুপি দিয়ে দেখলো, হাতী এখনো আসে নাই কিন্তু আস্‌বে এ বিষয়ে মোটেই কোন সন্দেহ নাই।

ভালুকরাম ভাব্‌লো, ইতিমধ্যে ভাঁড়টা গর্ত্তে নেবে দেখে আসাই ভালো।

তাই সে চুপে চুপে গর্ত্তের মধ্যে নাম্‌লো। তার পর ভাঁড়ের মুখে জিভ ঠেকিয়ে মধু রয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখলো।

জিভে মধুর স্বাদ লাগ্‌লেই ভালুকরাম আরো খানিকটা জায়গা চেটে নিল। তার পর ভাবলো ভাঁড়ের তলায় মধু আছে কি না তাও জেনে যাওয়া দরকার।

ভালুকরাম গলা বাড়িয়ে ভাঁড়ের ভিতর মুখ গুঁজে শুঁক্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু তাতে মধু আছে কি না বোঝা গেল না। অগত্যা সে মুখ খানা হাঁড়ির ভিতর ঠেলে দিল। তলায় মধু অনেকখানি ছিল। তাতে ভালুকরামের জিভ ঠেকতেই সে চোঁ চোঁ শব্দে খানিকটা মুখে পুরে নিল। ভালুকের গলায় চোখে মুখে খানিকটা মধু মেখে মুখখানি আগেকার চেয়ে ভারি হয়ে উঠেছিল। কাজেই মধু খাওয়া শেষ হ'লে ভালুকরাম বুঝলো, হাঁড়ির ভিতর থেকে মুখ বের করা ভারি মুস্কিল হয়ে উঠেছে। মনে মনে ভয়—কখন হাতী এসে উপস্থিত হয়।

অগত্যা ভালুকরাম জোরে জোরে চেঁচাতে সুরু করলো। ভাঁড়ের ভিতর থেকে ভালুকরামের আওয়াজ বিকট ভাবে বেরুতে লাগ্‌লো। সেই আওয়াজ শুনে কোলারাম ঘুম থেকে ছট্‌ফটিয়ে উঠল। প্রথমে তার ভারি ভয় হোল। সেই গুম্‌ গুম্‌ আওয়াজ কাণে পৌঁছতেই সে ভাব্‌লো, হয়তো আকাশটা উল্টে পড়েছে কোথাও। তারপর মনে হোল, ইন্দ্রের ঐরাবত বুঝি রেগে আকাশের চাঁদোয়াখানা দাঁত দিয়ে পড়্‌ পড়্‌ করে ছিঁড়ে দু ফাঁক করে দিচ্ছে। কিন্তু উপরের দিকে চেয়ে দেখলো, আকাশ ভরা নক্ষত্র যেমন ছিল ঠিক তেম্নি রয়েছে। তবে এ কি?



কোলারাম ভয়ে ভয়ে গর্ত্তের কাছে গিয়ে নীচের দিকে উঁকি দিয়ে দেখ্‌লো, মস্ত বড় একটা গোলাকার মুখ মাটির উপর হুটোপুটি খাচ্চে আর

র বার তার ভিতর থেকে গুম্ গুম্ আওয়াজ বের হচ্ছে। হাতী কোনকালে সে খেনি, কেবল লোকের মুখে গল্প শুনেছে। ভাব্‌লো, নিশ্চয়ই হাতী ফাঁদে আট্‌কা ড়ে এমন চীৎকার কচ্ছে। ভয়ে সে কাছে যেতে সাহস করলো না। কিন্তু সেই ৎকার ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌লো।

সে তাড়াতাড়ি ছুটে ভালুকরামকে খবর দিতে গেল। বাড়ী পৌঁছে দেখে ালুকরাম অনুপস্থিত। এত বড় সুখবরটা তাকে দিতে না পেরে কোলারাম ভারি ঃখিত হোল। কাজেই সে নিরুপায় হয়ে ডলির কাছে ছুটে গেল।

ডলিও তখন ভোর বেলা বাগানে ফুল তুল্‌ছিল। কোলারামের ডাক শুনে াইরে এসে দেখে সে আনন্দে ছটফট কচ্ছে, মুখ দিয়ে কথা ফুট্‌ছে না।

ডলি জিজ্ঞাসা করলো,—কি হয়েছে কোলারাম?

কোলারাম হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল,—ফাঁদে হাতী পড়েছে।

ডলি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল,—হাতী?—সত্যিকার হাতী?

কোলারাম বল্‌ল,—হাতীই বটে। এলেই দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু সাবধান াতীটা ভারি চেঁচাতে সুরু করেছে।

ডলি কোলারামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁদের ধারে এসে উপস্থিত হ'ল।



এতক্ষণে ফাঁদসহ সেই প্রাণীটি উপরে উঠে ভাঁড়টা ক্রমাগত পাথরের উপরে ঠুক্‌তে সুরু করেছে। আর ভিতর থেকে প্রচণ্ড শব্দ বেরুচ্ছে।

হাতীটি দেখেই ডলি হো হো হি হি হে-হে শব্দে খানিকক্ষণ ধরে হাস্‌তে হাস্‌তে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে আর কি! কোলারাম ডলির মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

ডলির হাসি থাম্‌বার আগেই পাহাড়ের গুঁতোতে হাঁড়িটি ভেঙ্গে যেতেই ভালুকরামের মুখখানা বের হয়ে পড়েছে।

ভালুকরাম আর কারু দিকে না তাকিয়ে লজ্জায় মাথা নীচু করে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

(শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি)

আজ হইতে সে প্রায় ১৫০ বৎসরের কথা। দেশে তখনও রেলপথ বসে নাই। পথে ঘাটে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয় এবং আরো ভয় জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র ডাকাতের। এমনই ভীষণ সময়ের একদিন, দুর্গম হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর দারুণ শীত ও তাহার ভয়-সঙ্কুল নির্জ্জন গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া কে একটি বালক ভারতবর্ষ ছাড়িয়া তিব্বতের দিকে চলিয়াছে! উপরে ও দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর বিরাট ও গম্ভীর শৃঙ্গগুলিকে ঢাকিয়া ধূ ধূ-করা সাদা বরফের রাশি, আর নীচে বনজঙ্গল-ঢাকা নিবিড় নির্জ্জনতা। এই পথে ধীর ও স্থির পদে চলিয়াছে নির্ভীক সেই বালক। উন্নত তার ললাট, উজ্জ্বল তার চক্ষু, গৌর তার অঙ্গ, সুন্দর তার কান্তি।

ইনি আমাদের এই বাংলা দেশেরই একটি বাঙালী ছেলে। এই ছেলেটিই পরে আপন প্রতিভায়, জ্ঞানে ও গরিমায় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইনিই স্বনাম-ধন্য পুণ্যশ্লোক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন রায় যখন বালক, তখন বিদেশীয়গণ এদেশে আসিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিল। বালক হইলেও স্বাধীনতাপ্রিয় রামমোহন ইহাতে নিতান্তই মর্ম্মাহত হন। এদিকে আবার ভগবানের ধ্যান ধারণা ও পূজা পদ্ধতি লইয়া পিতামাতা ও অন্যান্য অনেকের সহিত তাঁহার মতান্তর হয়। এই সব কারণেই তিনি দেশ ও বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে বিদেশে ঘুরিতে থাকেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিব্বতে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে দুইটি বিশেষ কারণে রাজা রামমোহন রায় বিখ্যাত হইয়া আছেন। প্রথম হইতেছে সতীদাহ নিবারণ। তখন আমাদের দেশে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা অনুসারে স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সহিত এক চিতায় বাঁধিয়া দাহ করা হইত। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, স্ত্রী সহমৃতা হইতে যাইতেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অনেকে আগুনের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বাঁধন ছিঁড়িয়া পলাইয়া যাওয়া সম্ভব হইত না। বাঁধন ছিঁড়িয়া বা খুলিয়া গেলেও বড় বড় বাঁশ দিয়া তাঁহাদিগকে চাপিয়া রাখা হইত ও ঢাক

বাজাইয়া চীৎকার ও ক্রন্দনের শব্দ চাপা দেওয়া হইত। রামমোহন রায়ের প্রাণ-পাত-করা চেষ্টায় বাঙালীর কলঙ্কস্বরূপ এই অমানুষিক প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে লোকের ভুল ধারণা তিনি দূর করিয়াছিলেন। নিরাকার ঈশ্বর যে সব কিছু ছাপিয়া, সব কিছু ব্যাপিয়া ও সব কিছুতে অনুপ্রবৃষ্ট হইয়া আছেন, এবং তিনি যে এক ও অদ্বিতীয় একথা আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পণ্ডিতেরা জানিতেন ও সেই রকম ঈশ্বরেরই ধ্যান ও উপাসনা করিতেন। চর্চ্চার অভাবে ক্রমে ক্রমে এই জ্ঞান দেশ হইতে প্রায় চলিয়া গিয়াছিল। দেশের সাধারণ লোক সকলেই মনে করিত ঈশ্বর অনেক ও তাহাদের আকার ও হস্ত পদাদি অবয়ব আছে। রামমোহন রায় যুক্তি তর্ক ও আলোচনা দ্বারা লোকের মন হইতে এই অজ্ঞানতা দূর করেন ও একমাত্র ঈশ্বরের ধ্যান ও ভজনা করাই যে ঠিক তাহা প্রচার করেন।

সাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে এই দুইটি কারণ জানা থাকিলেও, বড় ও বিখ্যাত হইবার মত আরো অনেক অনেক কাজই রামমোহন করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন, পাশ্চাত্য গণিত-বিজ্ঞান শিক্ষার সূত্রপাত ও উদার ভাবে সব কিছু বিচার করিয়া দেখার সূচনা করিয়া দিয়া তিনিই যে এদেশে নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন তাহা আজকাল অনেকেই বুঝেন।

রামমোহনের প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। তাঁহার মহাপ্রাণতা ছিল সুবিরাট। তাঁহার এই সুমহান ব্যক্তিত্বের আলোচনা করা অল্প কথায় অসম্ভব। তবে যে কয়েকটি কারণে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া বিশেষ ভাবে মনে হয় তাহা হইতেছে তাঁহার উদার বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, পরম স্বাধীনতাবৃত্তি ও জ্ঞান ও সত্যের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ।

রামমোহন রায় জন্মিয়াছিলেন বাংলাদেশে, বাঙালীর গৃহে। কিন্তু সমগ্র পৃথিবী ছিল তাঁহার আপন দেশ। এখানে সেখানে এদেশে বিদেশে যেখানে যে মানুষ আছে, সকলকেই তিনি নিজেরই একজন বলিয়া মনে করিতেন।—সকলে ভাই ভাই, সবাই মানুষ। এদেশ কি ওদেশ, এজাতি কি ভিন্ন জাতি, পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের দুঃখকষ্টে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত ও সে কষ্ট দূর করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। তাহাদের আনন্দে নিজেও আনন্দিত হইতেন ও সকলে একত্রে মিলিয়া আনন্দ-প্রকাশ করিতেন।

ইহার সহিত ছিল তাঁহার স্বাধীনতালিপ্সা। তিনি নিজে মনে প্রাণে স্বাধীন ছিলেন এবং অন্য কেউ বা অন্য কোন দেশ অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙিয়া স্বাধীনতা লাভ করিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। কোন দেশ যদি আবার স্বাধীনতা হারাইত তাহা হইলে তাঁহার দুঃখের আর অবধি থাকিত না।

বিলাত যাইবার পথে উত্তমাশা অন্তরীপে ফরাসী জাহাজে তাহাদের নূতন স্বাধীনতার তিন-রঙা নিশান দেখিয়া তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। পায়ে আঘাত লাগায় তিনি তখন পঙ্গু হইয়াছিলেন, শরীরও অসুস্থ, তবু অপরের সাহায্যে ফরাসী জাহাজে গিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া ফরাসী স্বাধীনতার জয়ধ্বনি করিয়া আসিলেন।

সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা যখন স্পেনের অত্যাচার অবিচার হইতে নিষ্কৃতি পাইল তখন রামমোহন রায় আনন্দের আতিশয্যে আলোক-উৎসব করিয়া বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিলেন।

আবার য়ুরোপের কয়েকটি রাজশক্তি একত্র মিলিত হইয়া নেপ্‌ল্‌স্‌বাসীদের নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যখন কাড়িয়া লইল তখন দুঃখে রামমোহন রায় এত বেশী মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন যে লোকজন ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা-সাক্ষাত করিবার মত মনের অবস্থা তাঁহার ছিল না।

এই সর্ব্বাত্মবোধ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা ছিল বলিয়াই যখনই যেখানে কোন স্বাভাবিক অধিকার বা স্বাধীনতাকে খর্ব্ব হইতে বা খর্ব্ব থাকিতে দেখিয়াছেন সেইখানেই রামমোহন একান্ত তেজস্বিতার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদের অধিকারই হউক আর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাই হউক, বিচার কার্য্যে দেশবাসীর অধিকারের কথাই হউক আর বিদেশে চলাফেরার স্বাধীনতাই হউক, কিম্বা নেপল্‌স্‌বাসীদের বা দক্ষিণ আমেরিকাবাসী বা আয়র্ল্যণ্ডবাসীদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপই হউক, রামমোহন রায় সরল ও সবল ভাষায় উচিত কথা বলিতে কখনও ইতস্তত করেন নাই। বাংলা দেশের সামান্য একজন পণ্ডিতই হউন, আর প্রবল প্রতাপান্বিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় সাহেবই হউন, কিম্বা ফরাসী রাজ্যের রাজদূতই হউন, উচিত পথ সকলকেই তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় মনে করিতেন পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন ভাবে থাকিবার ও স্বাধীন ভাবে চলিবার অধিকার আছে। তাঁহার মনে এই আশা,

আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস ছিল যে এমন একদিন আসিবে যখন পৃথিবীর সব লোক দেহে ও মনে, আচারে ও ব্যবহারে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, চিন্তায় ও কল্পনায় স্বাধীন ভাবে চলিবে ও সকল রকম অজ্ঞানতা ও অলসতা ত্যাগ করিয়া ক্রমেই উন্নত ও সুন্দর হইয়া উঠিবে। সেদিন সকলেই অন্য সকলের স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুন্ন রাখিয়া নিজেরা নিজেদের স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিবে ও পরস্পরকে সাহচর্য্য দিয়া ভাবের ও আত্মীয়তার আদান প্রদান করিবে। যদি কখন দুই দেশের মধ্যে কোন মতভেদ হয় বা কলহ বাধে, তাহা হইলে বিভিন্ন দেশের লোক লইয়া একটি সালিসী-সভা গড়িয়া সে কলহ মিটাইয়া ফেলা হইবে।

রামমোহন রায়ের প্রায় শতবর্ষ পরে যদিও এখন এইরূপ একটি সভার (League of Nations) সৃষ্টি হইয়াছে, রামমোহনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এখনও সব পূর্ণ হয় নাই। মানুষের বহুবিধ অধীনতা এখনও দূর হয় নাই। তাঁহার বিশ্ব-ভ্রাতৃভাবকে সকলে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নাই। তবে রামমোহন রায় যে আদর্শ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, যে ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, শতবর্ষ পরে আজ সকলে দেখিতেছেন তাহাই সকলের লক্ষ্য হওয়া দরকার, সেই পথই প্রকৃত পথ।

রামমোহন রায় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হুগলির অন্তর্গত রাধানগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়, মাতা তারিণী দেবী বা ফুলঠাকুরাণী। বাল্যকালে রামমোহন আরবী ও পারশী ভাষা শিক্ষা করেন। পরে নিজে চেষ্টা করিয়া সংস্কৃত, ইংরাজি, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন ও ফরাসী ভাষা শিখিয়া লন।

রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করিবার জন্য সমস্ত জীবন লড়িয়াছেন। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি বহুঈশ্বর-বাদ, সতীদাহ-প্রথা, বহু-বিবাহ প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ও স্ত্রীলোকদের অধিকার ও উত্তরাধিকার, এদেশে ইংরাজি ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্ত্তন, মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা, বিচার কার্য্যে দেশীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া দিল্লির তৎকালীন বাদসাহ তাঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার রাজকার্য্য সম্পাদনের জন্য বিলাতে পাঠান। বিলাতে গিয়া রামমোহন বহু সম্মান লাভ করেন। বিলাতের গুণী ও জ্ঞানী বহু লোক আসিয়া রামমোহনের অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহাদের সহিত রামমোহনের

আন্তরিক বন্ধুত্ব হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার সম্মান জন্য একটি ভোজ দেন। বিলাতের তৎকালীন রাজা উইলিয়াম দি ফোর্থ রামমোহনকে সাক্ষাত দান করেন। রামমোহন ব্রাহ্মণের পোষাকে রাজার সহিত পরিচিত হন। রাজার করোনেশন সভায় রামমোহনকে অন্যান্য রাজদূতদের সহিত সম্মানের আসন দান করা হয়। ফরাসী দেশে গিয়াও তিনি যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছিলেন। ফরাসীদিগের রাজ তাঁহাকে একাধিকবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন।

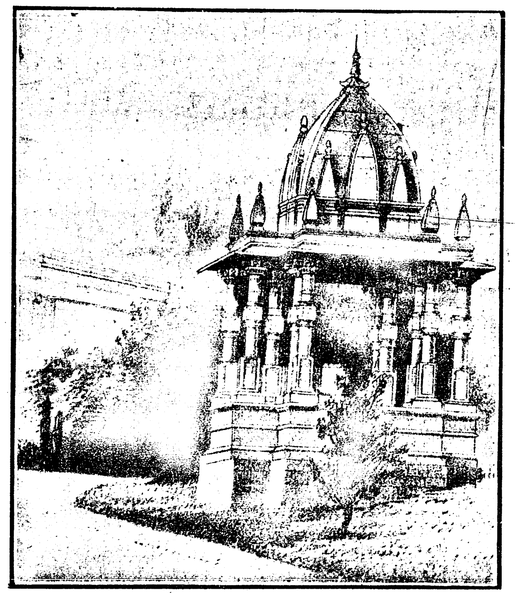

বৃষ্টল সহরে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি-স্তম্ভ

বিলাতে থাকিতে থাকিতেই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বৃষ্টল নগরে রামমোহন রায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

এই বছর তাঁহার মৃত্যুর শত বার্ষিকী। শত বর্ষ পরে এখন লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে রামমোহন রায় কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই নূতন প্রাণ দিয়া যান নাই; সমগ্র মানব সমাজের জন্যই নূতন বার্ত্তা ও উদার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই আজ ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর নানা স্থানে তাঁহার মৃত্যুর শতবার্ষিকী পরম শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করা হইতেছে।

রামমোহনকে কোলে করিয়া বাংলা মা ধন্য হইয়াছেন। আমরা ধন্য হইয়াছি। আরো ধন্য হইব যদি আমরা তাঁহার আদর্শ মত নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারি।

কাকাবাবু

(শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী, বি এ)

তখন সকাল ন'টা। মাণিক বন্ধু বান্ধব নিয়ে তার পড়বার ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছে। শ্যামল টেবিলটার ওপরে পা দুখানা তুলে দিয়ে দিব্য আরামে একখানা কবিতার বই আবৃত্তি করে চলেছে অনর্গল।

মাণিকের বাবা কিরণ বাবু কি একটা জরুরী কাজে মাসখানেকের মতন ভাগলপুরে গিয়েছেন। তাই মাণিক বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিশ্চিন্তে হল্লা জুড়ে দিয়েছে।

একটা পিক্‌নিকের পরামর্শ চল্‌ছিল। সলিল বল্লে—"সেবার আমাদের Botanical Gardenএ পিক্‌নিকটা তোফা হয়েছিল কিন্তু। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক —অমলের আত্মীয় না কে—যেন একটী জীবন্ত আনন্দের ফোয়ারা!" কি তাঁর কথা বলার ধরণ! তাঁর এক একটী···", সলিলের কথা মাঝ পথে থেমে গেল। ঘর্‌ঘর, ঘর্‌ঘর ৩ নম্বর ছ্যাঁকড়া গাড়ীখানাকে দু দুটো টাটকা পক্ষীরাজ ঘোড়া গলদঘর্ম্ম হয়ে টান্‌তে টান্‌তে ঠিক মাণিকদের বাড়ীর দোরগোড়ায় এনে ঘট্টর ঘট্টর করে দাঁড় করিয়ে দিলে।

গাড়ী থেকে যিনি নাম্‌লেন তাঁর বয়েস বোধ হয় চল্লিশের ওপর—মুখ কাঁচা পাকা গোঁফ দাড়িতে ভরা, পরণে আধময়লা ধুতি, গায়ে 'তথৈবচ' একটী হাঁটু পর্য্যন্ত দোদুল্যমান পাঞ্জাবী, বগলে একটী পুঁটুলি ও একটী হাতলভাঙ্গা Pal কোম্পানীর 'Best in the Market' ছাপ মারা ছাতা এবং তার টিকির চারিধারে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ একটা সাদা কাপড়ের তালি, এবং তাঁকে কেউ চেনে না।

আগন্তুক কিন্তু গাড়ী থেকে বেরিয়েই একগাল হেসে দু'বার কেশে, তিনবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে এক্কেবারে সর্‌ সর্‌ করে কলের পুতুলের মত মাণিকের দিকে এগিয়ে এসে বল্লেন, "তুমিই বুঝি আমাদের সুরেন দা'র ছেলে? তা খাসা···।"

মাণিক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আজ্ঞে আমার বাবার নাম শ্রীকিরণ চন্দ্র ব্যানার্জ্জি।"—"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ কিরণ দা'র কথাই তো বলছি। বয়েস হয়েছে—একটুতেই সব ঘুলিয়ে যায়, কি বল্‌তে কি বলি; তা নইলে আর ভাইএর নামটাই গোলমাল হয়ে যায়!" বলেই আগন্তুক থেমে থেমে কেঁপে কেঁপে হাস্‌তে লাগলেন।

মাণিক তো হতভম্ব! তার বাবার কাছেও তো সে কোন দিনই তার এই



কাকাবাবু সর সর করে এগিয়ে এলেন

কাকাটির কথা শোনে নি। তার একটী মাত্র কাকা। আর তিনি তো পশ্চিমবাসী। ফি বছর পূজোয় আসেন কলকাতায় তাদের বাড়ীতে। তবে এ আবার কোন্ কাকা? কিছু বুঝতে পারে না, বলতেও পারে না।

আগন্তুক আর একবার দমকা হাসি হেসে নিয়ে বললেন "হ্যাঁ বাবা, আশ্চর্য্য হচ্ছ বুঝি? তা হবারই তো কথা। সেকি আজকের কথা। প্রথম আমি যেবার আসি তোমাদের এখানে তখন তোমার মোটে একটী দাঁতই বেরিয়েছিল। আর সেবার ছিলামও মাত্র ঘণ্টাখানেক—বিশেষ কাজে আবার তক্ষুনি ছুটতে হয়েছিল হালুম পুরের রাজার বাড়ী। সেই আর আজ এই। কি করে চিনবে বল! আমার নাম নিধি বাঁড়ুয্যে, আমি তোমার কাকাবাবু হই। তোমার মাকে বল, তা হলেই চিনতে পারবে আমায়।"

ততক্ষণে ছেলের দল উধাও। বাঁড়ুয্যে মশাই তাদের আড্ডাটী ভেঙ্গে দিলেন বলে তাঁর ওপরে অজস্র ধারে শাপ বর্ষিত হতে লাগ্‌ল। ভাবলে তারা—কোথাকার কে একটা এসে সব গোল করে দিলে।

মাণিক ভাব্‌লে "ভালোরে ভালো—এ আবার কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লে? বাবা নেই বাড়ী আর অমনি আপদ এসে ঘাড়ে চাপলে।"

মা শুনলেন; কিছু বললেন না। অসম্ভবই বা কি? কিরণ বাবুর সম্পর্কে ভাই তো হতেও পারেন। কিন্তু তবু মনটা কেমন ছোঁক ছোঁক কর্ত্তে লাগ্‌ল তাঁর। ততক্ষণে কিন্তু নিধি বাঁড়ুয্যে বেশ আসর জমিয়ে ফেলেছেন। মাণিকের ছোট ভাই বোনরা সবাই বাঁড়ুয্যে মশাইকে ঘিরে বসে আছে আর তিনি একটা পুঁটুলি থেকে কত কি সব বার কচ্ছেন। যেন ভানুমতীর খেল্।

বাজি-বিভ্রাট

(শ্রীসুবিনয় রায়)



দীনু মিনু ভাইবোনেতে আতশবাজি ছাড়ে,
হরিখুড়োর বুড়ো ছাগল বাঁধা তারি ধারে।

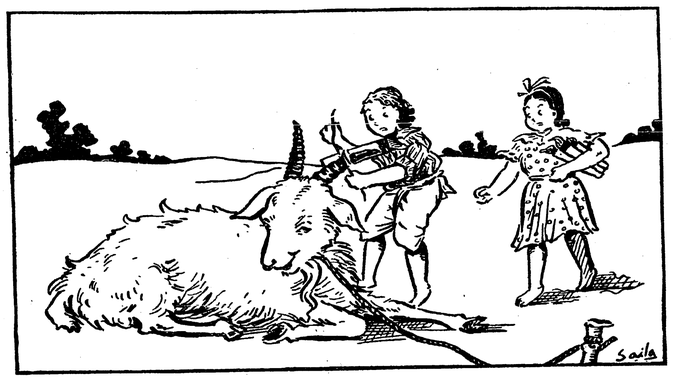

ভাব্‌ল দীনু, "ছাগলা দেড়ের বেরোয় জারিজুরি,
শিঙের সাথে বাঁধ্‌লে পরে জ্বলন্ত ফুলঝুরি।"

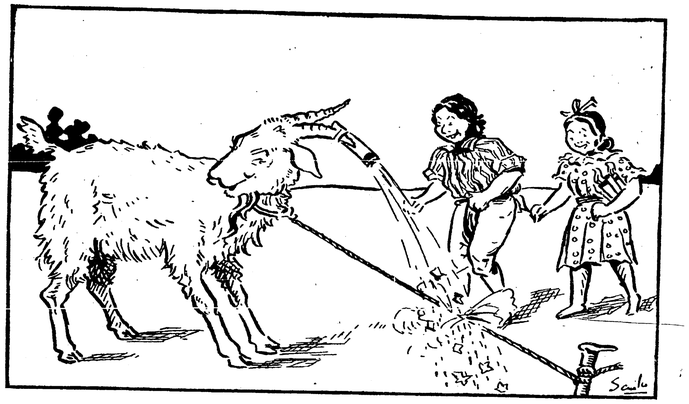

যেই না জ্বালা ফুলঝুরিটি, অম্নি ছাগলভায়া,
মুখ ফিরাল — কিচ্ছু যেন নেইকো প্রাণের মায়া।

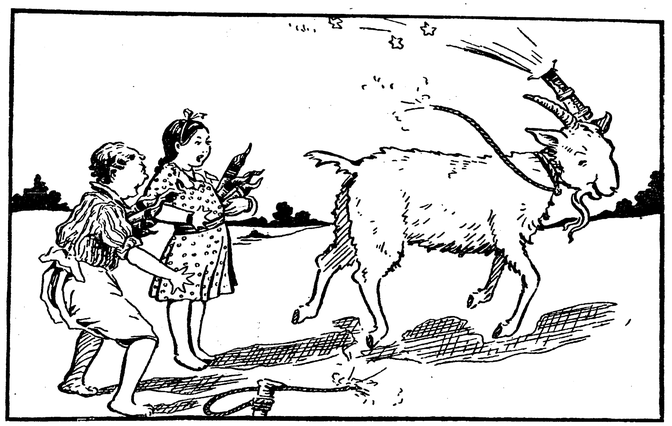

সর্ব্বনেশে ফুল্‌কি তখন পড়্‌ল দড়ির 'পরে,
পুড়্‌ল দড়ি, কাট্‌ল বাঁধন, চল্‌ল ছাগল ঘরে।



(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

তিন

নিশাচর

পূর্ণিমার রাত্রি। জগৎটা রুপালী চাঁদিমায় মোড়া। সামনের দিগন্ত জোড়া মাঠের অন্ধকার বুকে ক'রে জেগে আছে মস্ত মস্ত কয়েকটি গাছ। আর দূরে রায়দের ভাঙ্গা মস্ত বড় হানাবাড়ী—মনে হয় আলো ছায়া মাখানো রূপকথার এক স্বপ্নপুরী। চার নম্বর ঘরের মস্ত বড় কাঁচের জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকালেই ঐ চাঁদিমায় নাওয়া মস্ত বড় বাড়ীটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আঃ কি সুন্দর! সেদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত মধুর স্বপ্নের কথাই না মনে হচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক আগেই সব ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুদিকের দুই বিছানায় বীরেন, আর সত্য ঘুমুচ্ছে। কেবল আমারি চোখে ঘুম ছিল না। শুয়ে শুয়ে সুন্দর চাঁদের খেলা দেখ্‌ছিলাম।

দূরের সেই বাড়ীটা চারিদিকের শুভ্র চাঁদিমার মধ্যে এক কালো কলঙ্কের মত জেগে আছে। সারা পৃথিবীর স্তব্ধ বুকের উপর যে নরম ঘাস সুন্দর গালিচা পেতে বসে আছে, তারই মাঝখান দিয়ে হাওয়ার দুষ্টু খেলা চল্‌ছে—মধ্যে মধ্যে মস্ত মস্ত গাছগুলির বড় বড় ডালের ভিতর দিয়ে তাদের চঞ্চল হাতের তালি স্বপন-পুরীর পরীর ছোট্ট পায়ের নুপুরধ্বনির মত ভেসে আস্‌ছে জ্যোছ্‌না-ধোয়া পথ বেয়ে, ঘুমের গান গেয়ে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই। চম্‌কে উঠ্‌লাম একটা বিশ্রী চীৎকার শুনে। হঠাৎ বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না, একি সেই স্বপ্নে দেখা দৈত্যপুরের যে মস্ত

বড় দৈত্যটাকে মরণকাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে মেরে ফেলেছি তারই চীৎকার, না···। কিন্তু দেরী কর্‌তে হ'লোনা। পাশের বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সত্য আমায় জড়িয়ে ধর্‌লো। তার সারা শরীর কাঁপ্‌ছে; জান্‌লা দিয়ে যে মৃদু আলো আস্‌ছিল তাতে দেখ্‌লাম তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে সামনের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে।

"হু-উ-উ-স্‌-টক্‌-টক্‌—হু-উ-উ-স্‌! এই নিস্তব্ধ রাত্রে এমনি এক অদ্ভুত শব্দ! ভারী মৃদু—শরীর একটু কেঁপে উঠ্‌লো। সত্যকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কিরে সত্য, ব্যাপার কি?" সত্য আরো জোরে আমায় জড়িয়ে ধ'রে কি বল্‌তে গেল, কিন্তু স্বর বেরুলো না, শুধু শুন্‌লাম, "ঐ—ঐ! রমেনদা, শোন—ঐ—ঐ···"

ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, বুঝ্‌লাম সত্য ভয় পেয়েছে।

বল্‌লাম, "কি বল্‌ছো সত্য? স্বপ্ন দেখেছো নাকি?"

'উহু উহু, ভূ···ভূত।"

ভূত! ···চারিদিকের এই থমথমে জোছ্‌নায় শরীর কেমন ক'রে উঠ্‌ল, তবু জোর করে বল্‌লাম, "ভূত? দূর পাগল, ভূত আছে নাকি?"

"ঐ দেখ ঐ দেখ···আস্‌ছে, আস্‌ছে, ভিতরে আস্‌ছে"

ভয় জিনিষটা নাকি ছোঁয়াচে! এতদিন সহায়রামের সঙ্গে থেকে থেকে ভয়কে মন থেকে দূর করেছিলাম, তার সঙ্গে রাত বিরেতে কত জায়গায় গিয়েছি, কত শ্মশানের মাঝখান দিয়ে ফিরেছি, কিন্তু ভূতের ভয়ে শরীর কাঁপেনি কোন দিন। কিন্তু আজ তা হলো, সারা দেহখানা একবার কেঁপে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে আবার শব্দ হলো—হু-উ-উ-স্‌-টক্‌-টক্‌-হু-উ-উ-স্‌!

শরীর আর একবার শিউরে উঠ্‌ল;—কিন্তু সামলে গিয়ে বল্‌লাম, "কই সত্য, কে আস্‌ছে?"

সে একটা জানালা দেখিয়ে দিল। "ঐ দেখ, ঐ দেখ···একটা হাত···একটা কঙ্কাল—উঃ বাবা!" সে তাড়াতাড়ি একটা বিছানার চাদর টেনে নিয়ে মাথা ঢেকে বসে পড়ল। হঠাৎ কেমন যেন হক্‌চকিয়ে গেলাম। বাইরের দিকে চেয়ে দেখলাম জানালাটার উপর দিকে একখানা সাদামত যেন কি—দেখতে কতকটা হাতের মত, কিন্তু হাত যে নয়, সে কথা আমি হলফ করে বল্‌তে পারি। আস্তে আস্তে জানালাটা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়েই বুঝ্‌তে পারলাম আসল ব্যাপারটা কি।

মস্ত বড় একটা আম গাছের পাঁচটা পাতা এসে জানালাটার উপরে ঝুলে পড়েছে ; তার উপর পূর্ণিমার জ্যোছনা পড়েছে — দূর থেকে দেখাচ্ছে যেন একখানা হাত। মধ্যে মধ্যে মাতাল হাওয়া এসে তাকে জোরে নাড়া দিয়ে চলে যাচ্ছে আর ডালটা এসে জানালার গায়ে লেগে শব্দ হচ্ছে—"হু-উ-উ-স্-টক্-টক্-হু-উ-উ-স্।"

হেসে বল্‌লাম, "দূর পাগল, ও আমগাছ, কিছু নয়।

সে সেদিকে চেয়ে বল্‌ল, "না না রমেনদা একটা হাত···"



"দেখ্, ফের যদি একথা নিয়ে তর্ক কর্‌বি··· "

"আচ্ছা আমি দেখি আগে", বলে সে জানালার কাছে এগিয়ে এলো, আমি সেই পাঁচ পাতা ওয়ালা ডালটা দেখিয়ে দিলাম।

সে বল্‌ল, "উঃ, কি বোকাই না আমি! কিন্তু···"। বলে সে আর একবার শিউরে উঠল।

আমি বল্‌লাম, "আর কিন্তু টিন্তু কিছু নয়, চোখ মুখ বুজে ঘুমিয়ে পড়। ছোট বেলা যেন কে ভূতের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তোমার মাথা বিগড়ে দিয়েছে। নইলে এমন চমৎকার রাত্রি;—দেখতো, বীরেন ভায়া কেমন নির্ব্বিবাদে ঘুমাচ্ছে। নেও ঘুমিয়ে পড়।"

জানালাটা বন্ধ করে, বিছানাটা ঠিক করে নিলাম। তারপর জোর ক'রে সত্যকে বিছানায় পাঠাবো, হঠাৎ চোখ পড়ে গেল বাইরে—দেখলাম, সেই রায়েদের লোকজন-ছাড়া বাড়ীটা থেকে একটা ছায়ার মত কি যেন, সারা শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে বেরিয়ে এলো। বিশ্বাস হ'লো না, চোখ বেশ ভাল করে রগ্‌ড়ে আবার চাইলাম।—দেখ্‌লাম, একটা মূর্ত্তি আস্তে আস্তে হানাবাড়ীর

ভিতর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে। দূর থেকে ভাল করে কিছুই বোঝা যায় না, কেবল একটা ছায়ার মত কি যেন হাঁটতে লাগ্‌লো। এই হানাবাড়ীতে লোক—অত রাত্রে! কোন লোক এত রাত্রে হানাবাড়ীতে যেতে সাহস করবে? তবে?—তবে?—তবে? স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম, গা শির শির করে উঠল, চোখ বড় বড় হয়ে এলো, ঠোঁট দুটো দুদিকে সরে গেল—হাঁ করে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

সত্য আমায় ধরে বল্‌ল, "রমেনদা, ব্যাপার কি?—ব্যাপার কি?—ভূত?"

ঠিক হ'তে সময় লাগ্‌লো, একটু পরে বল্‌লাম, "না, ভূত নয়; কিন্তু দেখতো, হানাবাড়ীর ওখানে ঐ সাদামত একটা···"

সত্য চম্‌কে উঠল, তারপর বীভৎস চীৎকার করে বল্‌ল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ···ঐ দেখ—ভূ···ভূ···ভূ···"

বীরেন সত্যর চীৎকারে লাফিয়ে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বল্‌ল, "কিরে সত্য, রাত দুপুরে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস্ কেন, শুনি?"

সত্য বল্‌ল, "বীরেনদা, বীরেনদা ভূত—ভূত।"

"দুত্তোর ভূত! এঘরে তিন বছর ধরে আছি, একদিনও ভূতের 'ভ' দেখলাম না, আর তুই আস্‌তে না আস্‌তেই ভূত এসে হাজির?"

সে এতক্ষণ আমায় দেখেনি, বল্‌ল, "হ্যাঁরে রমেন, তোকেও কি ভূতে ধরেছে নাকি?" আমি আম্‌তা আম্‌তা করতে করতে বল্‌লাম, "ঠিক—ঠিক ভূত নয়, কিন্তু একটা ভারী আজব কাণ্ড দেখেছি।"

"কি আজব কাণ্ডখানা শুনি!"

প্রথমে বল্‌তে যেন কেমন একটু বাধ বাধ ঠেক্‌লো; একটু থেমে বল্‌লাম, "রায়েদের হানাবাড়ীতে কে যেন একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সে আর কথা শেষ কর্‌তে দিল না, বল্‌ল, "কই, দেখা দেখি।"

একটা কালো মেঘ এসে চাঁদকে ঘিরে দাঁড়ালো, অমন চাঁদের আলোতেও যার চেহারার ছায়া মাত্র দেখা যাচ্ছিলো, এখন তা দূর থেকে ধোঁয়ার মত মনে হতে লাগলো; সব একাকার হয়ে উঠলো। বল্‌লাম, "এখন দেখবি কি করে, মেঘ সরুক।"

"বেশ।"

মেঘ সর্‌লো, কিন্তু মানুষ আর দেখা গেলো না; বল্‌লাম, "কই, এখন ত

দেখছিনে, অথচ নিজের চোখে দেখেছি। তাইত! সেই অদ্ভুত লোকটা গেল কোথায়?"

বীরেন একটা পা চৌকির উপর তুলে দিয়ে কোমরে বাঁধা কাপড়টায় দুহাত ঢুকিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "হুঁ, বুঝতে পেরেছি, সহায় নেই কিনা তাই। আসল ব্যাপার কি জানো? সত্যর ত' চোখ খারাপই, তোমারও চোখ খারাপ হয়েছে।"

"না হে না, নিজের চোখে দেখলাম, একটা লোক নড়ছে।"

"অমন নিজের চোখে অনেকেই অনেক কিছু দেখে। কি না কি একটা নড়েছে — কোন গাছের ডাল হয়ত।"

সত্য বড় বড় চোখ করে বল্‌ল "না, সত্যি বল্‌ছি।"

"যা যা আর বেশী বল্‌তে হবে না; এখন ঘুমো, ফের যদি রাত্রে চেঁচিয়ে জাগাস্ তা হ'লে গোড়ায়ই বসাব কয়েক গাঁট্টা, তারপরে···"।

সত্য বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, আমি ব্যাপারটা কি হ'তে পারে ভাব্‌ছিলাম। হঠাৎ সত্য আমার হাত ধরে একটা টান দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লো। আমরা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম, সত্যি সত্যি,····· আবার একটা ছায়ার মত কি যেন হানাবাড়ীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বীরেন বল্‌ল, "তা···ই···তো···"

"এখন কেন? তোমার কোন চশমার·"

"কিন্তু ও বাড়ীতে তো শুন্‌ছি আজ পঁচিশ বছর ধরে কেউ থাকে না, অথচ··"

আমরা তিনজনেই তাড়াতাড়ি বিছানার চাদর টেনে নিয়ে পড়ে রইলাম।

চার

পিকনিক

ঈশান বাবু ডেকে পাঠালেন সত্য, বীরেন, আমাকে আর সহায়রামকে। আমাদের বসতে ব'লে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "রমেন, ব্যাপারখানা কি বলো দিকিন? কাল রাত্রে নাকি তোমাদের ঘাড়ে ভূত চেপেছিল!"

ভোর বেলা যখন উঠেছি, তখন রাত্রির শেষ চিহ্নটুকুও আর বেঁচে নেই। কাল রাত্রে ভূতের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা নিজেরাই

টের পাইনি। তাড়াতাড়ি উঠে সহায়রামকে সব খুলে বলেছিলাম, সহায় মোটেই আশ্চর্য্য হয়নি, এমন একটা কিছু ঘটবে এ যেন তার অনেক দিন থেকেই জানা ছিল। সে বলেছিল, "যা হবার হয়েছে। তবে এ খবরটা খুব রটিয়ে বেড়াস্‌নি, স্কুলের এত কাছে একটা ভূতের বাড়ী আছে খবর বেরোলে স্কুলের পক্ষে ভারী ক্ষতি হবে।" আমি বীরেনকে, সত্যকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, কিন্তু বেলা ন'টা নাগাদ বুঝলাম যে খবরটা স্কুলে জান্‌তে আর কারও বাকী নেই। তারপরে মাষ্টার মশা'র এই প্রশ্ন।

আমি যা জান্‌তাম বল্‌লাম। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌লেন, "হুঁ, তুমি যখন জেগে উঠলে তখন রাত কটা আন্দাজ হবে?"

হিসাব করে দেখলাম, আমার ঘুমুতেই প্রায় রাত বারোটা বেজে গেছিল, তারপর বড় জোর ঘণ্টা দুয়েক ঘুমুতে পেরেছিলাম; বল্‌লাম, "প্রায় দুটো হবে বলে মনে হচ্ছে।"

"বেশ! এবার আমি যা যা বল্‌বো কেবল তারই উত্তর বেশ ছোট ক'রে দাও দিকিন।" আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নের অপেক্ষা কর্‌তে লাগলাম। তিনি টেবিল থেকে পেপারওয়েটটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বল্‌লেন, "বেশ, তুমি ঘুমুতে ঘুমুতে হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে উঠে বস্‌লে?—কেমন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"চীৎকার করেছিল কে?"

সত্যগোপাল বল্‌ল, "আমি স্যর"।

"তুমি হঠাৎ রাত দুপুরে চীৎকার করে উঠতে গেলে কেন?"

সত্যগোপাল কি যেন বল্‌তে গেল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কিছুই বেরোল না, সে কেবল কতগুলি কথা যেন জড়িয়ে ফেল্‌তে লাগল। ঈশান বাবু কি বুঝলেন জানি না। তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বল্‌লেন, "আচ্ছা থাক্ সত্য, তুমি যা জানো গোড়া থেকে পরপর বলে যাও।"

সত্য আরম্ভ করলো, "আমি আর বীরেনদা আজ একটু আগেই শুয়ে পড়ি, আমরা যখন ঘুমুতে যাই তখন রমেনদা বসে বসে কি যেন লিখ্‌ছিলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়েই কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের গল্প চললো, তারপর আমি আর বীরেনদা ঘুমিয়ে পড়লাম। রমেনদা তখনও টেবিলের কাছে বসে রইলেন।

তারপর···তারপর যে কতক্ষণ কেটে গেছে তা বল্‌তে পারি না, আমার এক ঘুম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎ কাণে একটা খস্ খস্ শব্দ গেল। সেই নিস্তব্ধ রাত, চারিদিকে টুঁ শব্দটি নেই, পাশের এক খাটে রমেনদা আর এক খাটে বীরেনদা ঘুমুচ্ছেন, চারিদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ এই খস্ খস্ শব্দ—মনে হ'ল কারা যেন ঠিক আমার মাথার কাছে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে। সারা শরীর হিম হয়ে এলো।

"সেই ফিস্ ফিস্ শব্দ যেন আমার বুকে হাতুড়ী পিট্‌তে লাগ্‌ল। লাফিয়ে উঠ্‌তে গিয়ে জানালার দিকে চোখ পড়ে গেল, যা দেখলাম তা আমার কল্পনার থেকেও ভয়ঙ্কর—উঃ!" সে একবার শিউরে উঠ্‌লো, দেখলাম তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। সে খানিকক্ষন চুপ করে থেকে, আবার দম নিয়ে আরম্ভ কর্‌ল, "দেখি সেখানে একটা মুখ — উঃ কী মুখ! একদৃষ্টে যেন আমার দিকে চেয়ে আছে। চোখ ত নয় যেন দুই ভীষণ গোলা আমার দিকে চেয়ে আছে — উঃ!"

আমরা হাঁ করে শুন্‌ছিলাম, আমাদের শরীরও যেন হিম সিম হয়ে উঠ্‌ছিল, কাল রাত্রির কথা মনে পড়ে সারা গা শিউরে উঠ্‌ল।

সহায়রাম লাফিয়ে উঠ্‌লো; বল্‌ল, "আচ্ছা বল্‌তে পার, সেই মুখটা কেমন দেখতে?" সত্য চেয়ে চেয়ে সাম্‌নে কি দেখ্‌ছে বুঝ্‌লাম না, সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার সারা শরীর কাঁপছে, ভয়ে মুখ শুকিয়ে আম্‌সী হয়ে গেছে, হাত দু'টা ঝুলে পড়েছে, চোখ দু'টা ভয়ে বুজে আস্‌ছে, থেকে থেকে গা শিউরে উঠ্‌ছে! উঃ! সত্যর সে অবস্থা মনে পড়্‌লে আজও ভয়ে চোখ বুজে আসে, গা শিউরে উঠে! সহায়রাম তাড়াতাড়ি উঠে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল, আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ঈশান বাবু আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "সহায়, কোনার কুঁজোতে জল আছে, এক গ্লাস জল দাও সত্যকে।"

সত্য ঢক ঢক করে জল খেয়ে দম নিয়ে বল্‌তে আরম্ভ করলো, "স্যর দেখলাম, সেই জানালার ওদিকে একটা কঙ্কালের মুখ—উঃ কি ভীষণ!" একটু থেমে সে আবার আরম্ভ করলো, "আমি যেই সেদিকে চাইলাম অমনি সেই কঙ্কাল জানালা থেকে সরে গেল। আমি ভয়ে থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রমেনদার বিছানার দিকে যাবো, জানালায় আর একখানা মুখ এলো; খুব চেনা মুখ কিন্তু ঠিক বুঝে

উঠ্‌তে পারলাম না কার মুখ সেটা। মনে হ'লো একটী ছেলের মুখ; কিন্তু মাথা তখন আমার ঘুর্‌ছে, ঠিক ঠিক কিছুই বুঝতে পারলাম না। মুখটাও ঠিক ঠিক চিন্‌তে পারলাম না। মনে হ'লো এ বুঝি সেই কঙ্কালের অনুচর—উঃ", বলে সে আর একবার দুই হাত এক ক'রে চেপে ধরে চোখ বুজে শিউরে উঠ্‌লো। তারপর কপালের ঘাম মুছে বলে চল্‌লো, "একটা কালো মেঘ এসে চাঁদকে ঘিরে দাঁড়ালো, কিন্তু সে এক মুহূর্ত্ত। তারপরই সেই জোৎস্নার বুক চিরে বাতাস বইতে আরম্ভ কর্‌ল; শব্দ হলো—হু-উ-উ-স্-টক-টক্-হু-উ-উ-স। দেখ্‌লাম জানালার ঠিক উপরে একখানা হাত; পাঁচটা আঙ্গুলের পাঁচখানা হাঁড় জোড়া লাগানো। আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লাম।"

আবার সব স্তব্ধ! গল্প শুনে সারা শরীর আবার শিউরে উঠ্‌ল! আমরা সব চুপ করে বসে আছি, হঠাৎ সহায়রাম চম্‌কে উঠ্‌লো; বল্‌ল, "কি বল্‌লে, কি বললে, একখানা কঙ্কাল?"

আমরা সবাই জিজ্ঞাসু ভাবে তার মুখের দিকে চাইলাম।

সে বিড় বিড় করে বল্‌তে লাগ্‌লো, "প্রথম থেকেই ব্যাপারটা শুনে আমার একটু কেমন অদ্ভুত ঠেকছিলো।—সত্যর অসময়ে ভর্ত্তি হওয়া, এই একটা মুখ, তারপর আর একটা, তারপর ঐ হানাবাড়ীর মধ্যে লোক..."

আমি বিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম সত্যর মুখ খানা কালী হয়ে গেল, কিন্তু সে এক মুহূর্ত্ত—তারপরেই আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। হানাবাড়ীর সেই লোকের সঙ্গে সত্যের কি সম্পর্ক? সহায় একি বল্‌ছে?

ঈশান বাবু চিন্তিত ভাবে বল্‌লেন "হুঁ, রহস্য মোটেই সহজ নয়। আচ্ছা তোমরা যেতে পারো।"

আমরা উঠ্‌লাম, সহায়রাম বল্‌ল, "স্যর, একবার আমরা হানাবাড়ীতে গিয়ে পিকনিক করে এলে পারি। যদি সত্যি সত্যি কোন লোক এসে থাকে তাহলে আমাদের চোখ এড়াতে পার্‌বেনা।"

ঈশান বাবু রাজী হলেন। ঠিক হ'লো, প্রথম দুই ক্লাশের ছেলেরা রবিবার হানাবাড়ীতে পিকনিক করতে যাবে। থার্ড ক্লাসের একমাত্র সত্যগোপাল আমাদের সঙ্গে যাবে।

—(ক্রমশঃ)

আমরা নাচি

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)



আমরা নাচি গ্রাম্ ছাড়া ঐ
পাহাড়-তলীর পথে,—
আমরা নাচি খোস্-মেজাজে
বন্-ঘেরা পর্ব্বতে ;—
নদীর চরায়, শালের বনে,
মাঠের শেষে, খালের কোণে,
নাচের নেশায় বুঁদ্ হয়ে যাই
সকাল বেলা হতে ;—
মোদের গানের সুর ভেসে যায়
হাওয়ার স্রোতে স্রোতে।

বাপ্ পিতামো'র ভাঙ্গা মাদল,
ফাটা বাঁশের বাঁশী,
তাতেই করি আসর গরম
গ্রামের ধারে আসি',
গহন বনে,—গহিন সুরে
আমরা নাচি ঘুরে ঘুরে,
হাওয়ায় হাওয়ায় শালের ফুলের
গন্ধ আসে ভাসি'—
পথের ধারে উছ্‌লে পড়ে
বুনো ফুলের হাসি।

বিরাম-হারা মোদের নাচন্
সকাল হতেই সুরু,—
মোদের বাঁশী বেজেই চলে
'তুরু-রুরু-রুরু' —
'ডিমি ডিমি'—মাদল বাজে,
প্রাণ মেতে যায় সেই আওয়াজে,
বাঁশের ঝাড়ে দোল্ দিয়ে যায়
বাতাস ঝুরু ঝুরু ;—
নাচের তালে, গানের সুরে
মন্‌টি উড়ু উড়ু।

আমরা নাচি গ্রাম্ ছাড়া ঐ
পাহাড়-তলীর পথে,
আমরা নাচি ক্ষ্যাপার মতন
বন্-ঘেরা পর্ব্বতে।

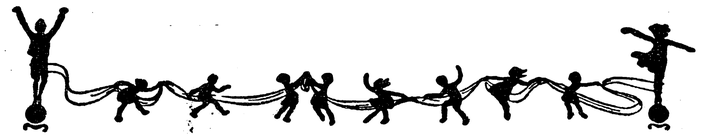

পণ্ডিতের খেলা

(শ্রীসুবিনয় রায়)

আশ্বিনের "সন্দেশ"এ "পণ্ডিতের খেলা" নাম দিয়ে, ১৪ টুকরা কাগজ সাজিয়ে যে কয়েকটি মজার ছবি তৈয়ারী করা হয়েছিল তা' তোমরা দেখেছ। এবার ঐ ১৪টি টুকরাকেই নানা রকমে সাজিয়ে আরো ৬টি মজার ছবি তৈয়ারী করার উপায় দেখিয়ে দেওয়া হলো। তোমরা এই খেলা খেলে দেখেছ কি? আরো অনেক রকমের মজার ছবি এই টুকরাগুলি থেকে তৈয়ারী করা যেতে পারে। ভাল ছবি যদি তৈয়ারী ক'রে "সন্দেশে"এ পাঠাও, আমরা সেটা ছাপ্‌তে পারি। মনে রেখো, ১৪টি টুকরার প্রত্যেকটিই ব্যবহার করা চাই—একটিকেও বাদ দিলে চল্‌বে না।

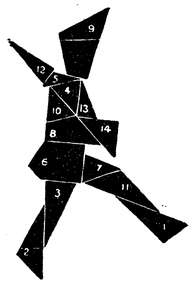

বন্দুক কাঁধে সৈনিক

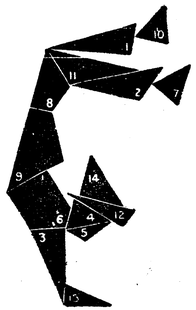

জিম্‌নাষ্টিক

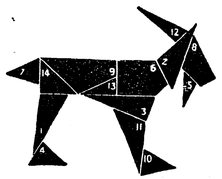

দাড়িওয়ালা ছাগল

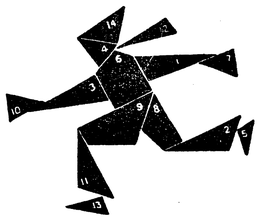

দে দৌড়

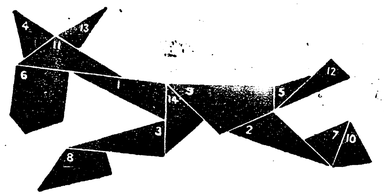

গাধার দৌড়

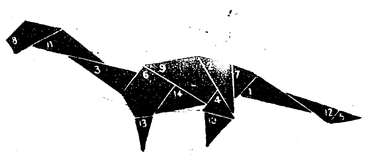

সেকালের 'ডাইনোসর'

ঘড়ি-রহস্য

(শ্রীদেবব্রত রায় চৌধুরী, এম্‌-বি)

আমার টাইম্‌-পিস্‌ ঘড়িটার যে কি হয়েছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। ঘড়িটা অদ্ভুত-কিম্ভুত কিছু নয়; এ্যালার্‌ম্‌ বাজে, তাছাড়া আর দেখতে শুনতে একেবারে হুবহু আরও দশটা বিশটা সাধারণ টাইম্‌-পিসের মতই। মাত্র কয়েক মাস হল আমাদের বাড়িতে এসেছে। কলকাতার একটী ভাল ঘড়িওয়ালাদের ওখান থেকে কেনা, তারা ত বলে অল্প দামের মধ্যে চলনসই বেশ ঘড়িটা। এত দিন চলছিলও বেশ। তাকে যত্ন করেই রাখা হত, নিয়মিত সময়ে দম দিয়ে তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় টাঙ্গিয়ে রাখা হত। এ্যালার্‌মের সময় ঠিক এ্যালার্‌ম্‌ বাজত, কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না। প্রথম গোলমাল আরম্ভ হল ৫।৬ দিন আগে। দুপুরে যখন খেতে বসেছি তখন আমার হিন্দুস্থানী চাকরটা বল্লে, "আজ ঘলিয়া থো বদ্দি বোলে থেলে।" চাকরটার বয়স তো পূরাই হয়েছে; তবুও এখনও আধো আধো কথা কয়, অনেক সময় বুঝতে ভারী মুস্কিল হয়। তবে অনেক দিন থেকেই আছে বলে আজ কাল আন্দাজে বুঝে নেই। এবারও বুঝলাম যে ঘড়িটার এ্যালার্‌ম্‌ কোনও সময় বেজে উঠেছিল। ভাবলাম যে এ্যালার্‌ম্‌ বাজার পিন্‌টা হয় তো বা সরে গিয়েছিল, তবু একবার নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লাম, কিন্তু কিছু ঠাহর করতে পারলাম না। আমি যতক্ষণ বাড়ি থাকি না, ততক্ষণ ঘরে তালা বন্ধ থাকে, কাজেই আমার অবর্ত্তমানে কেউ যে নেড়েছে চেড়েছে তাও না। যাহোক সে সময়ে আর এ বিষয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে আহারের দিকেই মন দিলাম।

খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করছি, একটু ঘুমিয়েও পড়েছি, এমন সময় কথা নাই বার্ত্তা নাই—আবার তার স্বরে এ্যালার্‌ম্‌ বেজে উঠ্‌ল। কি মুস্কিল! ধড়ফড়িয়ে উঠে বাজনা বন্ধ করবার চেষ্টা করলাম। তার একটা পিন্‌ টিপে দিলেই তো আগে আগে বন্ধ হয়ে যেতো; কিন্তু এবার যে আর কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। পিনটি যতক্ষণ টিপে রাখছি ততক্ষণ তো বন্ধ থাকে ঠিক, কিন্তু যেই পিনের উপর থেকে আঙ্গুল সরিয়ে নিচ্ছি আবার ঝনাঝন এ্যালার্‌ম্‌ বাজতে সুরু হয়। এমন জেদী ঘড়ি আমি আর কোথাও কখনও দেখি নি। ঠিক মনে

হচ্ছিল ঘড়িটা চেঁচাবেই চেঁচাবে; যতক্ষণ তার টুঁটি টিপে রাখব ততক্ষণ তো চুপ, আর যেই ছেড়ে দেব অম্নি আবার চেঁচাতে সুরু করবে। বন্ধ করবার পিন্ টেপা ছাড়াও এ্যালার্ম্ থামাবার আর যত কায়দা কানুন জানা ছিল সবই চেষ্টা করে দেখেছিলাম একে একে,—যেমন এ্যালার্মের কাঁটা সরিয়ে দেওয়া বা ঘড়ির সময় বদলে দেওয়া, কিন্তু তাতেও চিৎকার বন্ধ হয় নি। কি আর করি! আমি তো আর সারাদিন এ্যালার্মের পিন্ টিপে বসে থাকতে পারি না, কাজেই হাল ছাড়তে হল। যতক্ষণ এ্যালার্মের দম ছিল ততক্ষণ পুরা বেজে দম ফুরুলে শেষের দিকটায় বার কতক ছিড়িং ছিড়িং করে ফুঁপিয়ে ঘড়ি আপনি থাম্ল। বিশ্রামের ব্যাঘাত হল বলে মনটা খিট্খিটে হয়ে গিয়েছিল। দেখলাম তখন ২টাও বাজে নি। সত্যিই এ্যালার্ম্ যন্ত্রের কোনও দোষ হয়েছে কি না জানবার জন্য ৩টা ৩০ মিনিটে আবার যাতে এ্যালার্ম্ বাজে সেই মত কাঁটা সেট্ করে, এ্যালার্মে পুরা দম দিয়ে অন্য কাজে মন দিলাম। এবার কিন্তু ৩টা ৩০ মিনিটে মোটে বাজ্লই না। বেশ বোঝা গেল যে ঘড়িটার ভেতরে কোথাও কিছু নিশ্চয় বিগ্ড়েছে।

এর পর কিন্তু আরও অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘট্তে আরম্ভ কর্ল। লক্ষ্য করে দেখলাম ঘড়িটা থেকে থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আরও একটু বেশী মন দিয়ে দেখলাম, এম্নি ঘড়ি বেশ চলে, যেই কটা বেজেছে দেখ্তে যাব, অম্নি বন্ধ হয়ে যায়। তখন তাকে অল্প ঝাঁকুনী দিলে আবার চলতে থাকে। এম্নি তাকে ছুঁই না, ধরি না, রাগ করে তার দিকে তাকাই না, দাঁত খিঁচুই না; শুধু আমার দরকারের সময় দূর থেকে তাকে দেখি;—যেই দেখা অম্নি বাস্ আপ্সে আপ্সে বন্ধ!

কত রকম ভাবে যে তার দিকে দেখেছি তার আর সব এখানে বলা চলে না। তবে কয়েকটী উদাহরণ দিলেই বুঝা যাবে যে আমি চেষ্টা করতে কম করিনি। দাড়ি কামিয়ে টেরী কেটে, ফিট্ ফাট্ বাবু সেজে ঘড়ি দেখেছি; উস্কো খুস্কো চুল নিয়ে, খেঁচা, খেঁচা, ৩।৪ দিনের না-কামানো দাড়িশুদ্ধ পাগলের মত চেহারা করে দেখেছি; হেসে দেখেছি, কেঁদেও দেখেছি, ওস্তাদি কায়দায় এস্রাজ বাজিয়ে তার সামনে ধ্রুপদ রাগে গান গেয়ে দেখেছি, বকে ধমকে দেখেছি, কাকুতি মিনতি করেও দেখেছি, চুপি চুপি গিয়ে হঠাৎ আচম্কা ভাবে দেখেছি, আবার গট্ গট্ করে মার্চ করেও দেখেছি—সবেরই ফল সেই এক। আড়চোখেই তাকাই বা ঘুমোবার ভাণ করে চোখ বুঁজে মিটি মিটি তাকাই, ঘড়ি ঠিক বন্ধই হতে থাক্ল।

আর একটা চালাকী মনে এলো। ঘড়ি যে দেওয়ালে ছিল ঠিক তার সামনের দেওয়ালে একটা আয়না টাঙ্গালাম এমন ভাবে যে ঘড়ির ছায়াটা আয়নার উপর পড়ে। তার পর সময় দেখবার দরকার হলে আর ঘড়ির দিকে মুখ না ফিরিয়ে তার দিকে পিছন রেখেই আয়নাকে দেখতে লাগলাম। তাতে সব উল্টা দেখা যেত, কিন্তু আমার কাজ চলে যেতে লাগ্ল আর ঘড়িও বন্ধ হ'তো না। দেখে মনে মনে ভাবলাম, কেমন জব্দ করেছি! এবার নিশ্চয় জিতেছি!

কিন্তু হায়! আমার চাতুরী ঘড়ি তারপরেই ঠিক ধরে ফেল্লে; কেননা, আমার সঙ্গে আবার সেই আগেকার ব্যবহার আরম্ভ কর্লে। এতদিন নাছোড়বান্দার মত ওর পেছনে লেগেছিলাম, তবুও কিছুতে কিছু হ'ল না দেখে মনটা বড় দমে গেল। সামান্য একটা ৭৸০ আনা দামের ঘড়ির কাছে হেরে গিয়ে নিজেকে বড় হেয় মনে হতে লাগল। ভেবে ভেবে আমার চেহারা খারাপ হয়ে গেল, বন্ধুরা বলতে লাগলেন যে আমার ডিস্পেপ্সিয়া ব্যারাম হয়েছে; অন্যমনস্ক ভাব দেখে কেউ বললেন, পাগলামীর পূর্ব্বলক্ষণ। সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে এসব কথা ভাব্তে ভাব্তে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে সে রাত্রে আর ঘুমই এল না; সারাটা রাত জেগেই ছট্ফট ক'রে কাটালাম।

পরদিন সকালে ছেলেবেলার বন্ধু বিকাশ ডাক্তার এলেন দেখা কর্তে। আমার দিকে চেয়েই বল্লেন, "কিহে ভায়া! চেহারাখানা ও রকম ঝ'ড়ো কাকের মত বানিয়েছ কেমন ক'রে? রাত্রে কিছু মারামারি ধস্তাধস্তি করেছিলে নাকি?"

আমি একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বল্লাম, "না, বিশেষ কিছুই না।"

একটু পরেই তিনি ঘড়িটার দিকে তাকালেন। আমিও আর একটু বাদেই ঘড়ির দিকে তাকালাম। যেমন তাকানো অম্নি ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেল।

আমি বল্লাম, "দেখ্লে ভায়া ঘড়িটার কাণ্ড! যেমন আমি তা'র দিকে তাকিয়েছি, অম্নি সে থেমে গেল!"

বিকাশ ডাক্তার বল্লেন, "তোমার নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে। আমি ৮টা পাঁচ মিনিটে ঘড়ির দিকে তাকালাম, কারণ ঠিক তার আগের মুহূর্ত্তেই ঘড়ি চল্তে চল্তে বন্ধ হয়ে গেল। তার দু' মিনিট পর তুমি তার দিকে তাকালে, আর বল্লে কিনা ঘড়ির দিকে তুমি তাকাতেই সে বন্ধ হ'লো? পাগল না ক্ষ্যাপা?"

আমার এখন সত্যি সত্যিই রাগ হ'লো। মাথা খারাপ হলো আমার! ঘড়ির

কীর্ত্তির কথা বিকাশ বাবুকে সবই বল্‌লাম। তিনি শুনে বল্‌লেন, "ভাই হে! আমি কিছুদিন থেকে পাগলামী সম্বন্ধে গবেষণা কর্‌ছি। তোমার ওটা 'মনোম্যানিয়া' অর্থাৎ এক রকম পাগলামী বই আর কিছু নয়। অন্য কোন বিষয়ে তোমার পাগলামী না থাকতে পারে, শুধু ঐ ঘড়িটার বিষয় একটা পাগলামী হয়েছে। হ'তে পারে ঘড়ির কোন কলকব্জা বিগ্‌ড়েছে। তোমার মাথায় শুধু ঘড়ি ঘুর্‌ছে, তাই মনে কর্‌ছ সে তোমার সঙ্গে চালাকি খেল্‌ছে। যাক এর ওষুধ আমি খুব ভালরকম জানি। একটা প্রেসক্রুপ্‌সন দিচ্ছি; এর একটা বড়ি আজ রাত্রে খেয়ে নাও, কাল আর একটা খেও। দেখবে, ঘড়ি আর চালাকি কর্‌বে না তোমার সঙ্গে"। এ কথা বলেই তিনি একটা প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন লিখে দিলেন।

সে রাত্রে একটা বড়ি খেয়ে যে ঘুম দিলাম, একেবারে পরের দিন দশটার সময় ঘুম ভাঙ্গলো। উঠে দেখি, ঘড়ি দেয়ালে নাই। চাকর বল্‌ল ডাক্তার বাবু ঘড়ি নিয়ে গেছেন।

সেদিন রাত্রে আবার একটা বড়ি খেলাম। পরদিন আবার দশটায় জাগ্‌লাম। উঠে শুন্‌লাম, ডাক্তারবাবু এসে আমার বিছানার পাশে বসে শূন্যে হাত বুলিয়ে কি যেন মন্ত্র পড়েছিলেন। তিনি নাকি খুব ভাল "হিপ্‌নটিজম্" জানেন।

এর দুদিন পর ঘড়িওয়ালা চণ্ডীবাবু আমার সেই চালাকি-মারা ঘড়িটা মেরামত করে দিয়ে গেলেন আর বলে গেলেন, "ঘড়ির এ্যালারমের পিনটা খারাপ হয়ে ঘড়ি যখন তখন বেজে উঠ্‌ত। ভিতরে একটু দোষও হয়েছিল, তার দরুন কোন রকম ঝাঁকুনি পেলে আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যেতো! সব ঠিক করে দিয়েছি, আর কোন গোল হবে না।"

সেদিন থেকে ঘড়িও চল্‌ছে, আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছি। এখন বুঝেছি, ঘড়ির কারসাজিতে আমারই মাথায় গোল বেধে যখন তখন মনে কর্‌তাম ঘড়ি বুঝি তার দিকে তাকালেই বন্ধ হতো। আস্‌লে কিন্তু তা নয়। ঘড়ি যাঁহাতক বন্ধ হ'তো অমনি আমি তার দিকে তাকাতাম;—মনে ধারণা হ'তো ঘড়ি বুঝি তাকাবার পর বন্ধ হ'লো। এ্যালার্‌মের ব্যাপার তো বোঝাই গেল—পিন খারাপ হওয়ার দরুণ যখন তখন বেজে উঠ্‌ত, বন্ধ করারও কোন উপায় থাক্‌ত না। যাক্, বিকাশ ডাক্তারের হিপ্‌নটিজ্‌মের বলেই হোক্ বা ঘুমের ওষুধেই হোক্, সেদিন থেকে ঘড়ির বিষয় মাথায় আর কিছু গোল বাধে নি।

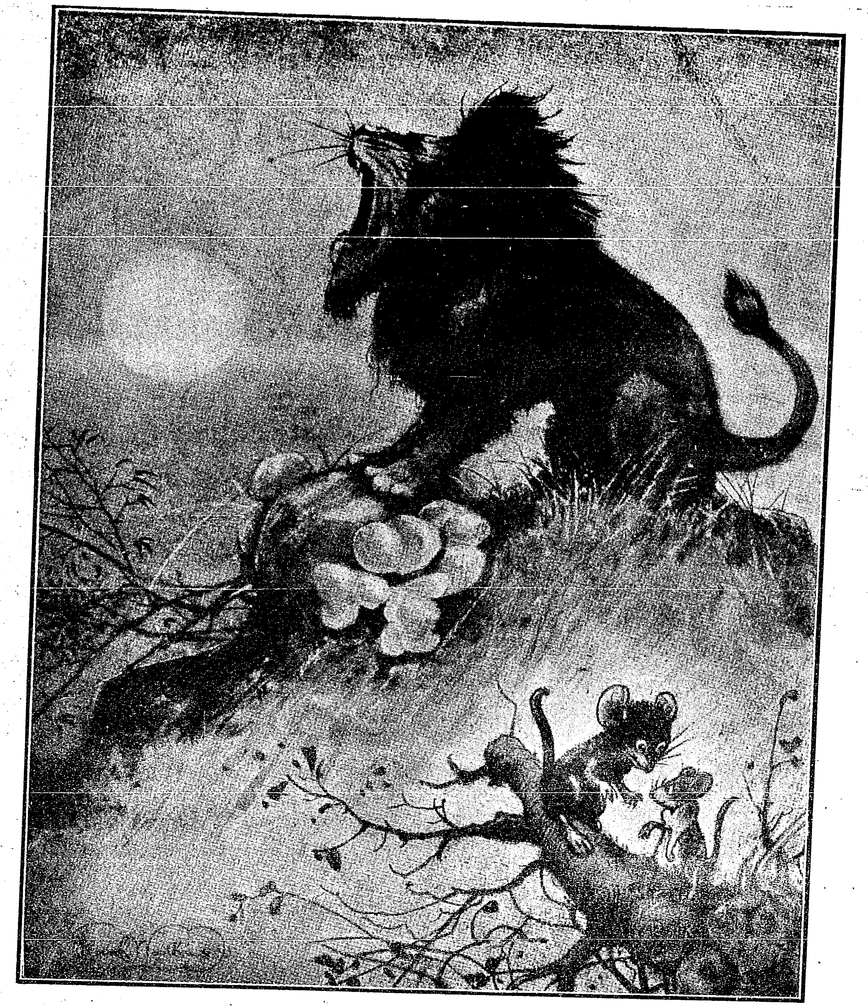

মুচ্‌কি হেসে ইঁদুর বলে, "বৃথাই হুহুঙ্কার,
পড়্‌লে ফাঁদে মোদের ছেড়ে নাইরে গতি আর।
সিংহ ও মুষিকের 'কথামালা'র গল্প,
পড়েনিকো এমন ছেলে আছে খুব অল্প।"

(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

শতদল

(কুমারী ঊষা মিত্র—গ্রাহিকা নং ২৭১)

(১)

শরতের সকাল। সমস্ত আকাশখানি রঙিন আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। সারা পৃথিবীতে জেগে উঠেছে আনন্দ চঞ্চল সজীবতার সাড়া। গাছে, পাতায়, ঘাসে, ফুলে, জলের কল্লোলে, পাখীর কাকলীতে যেন একটি অনাহত উৎসব রাগিনী বেজে চলেছে।

দীঘির কালোজল আলো ক'রে ফুটে উঠেছে অসংখ্য শতদল। তারই পাশে পাশে রাজহাঁসের দল খেলা ক'রে সাঁতার দিচ্ছে। কলরবে চারিদিক মুখরিত ক'রে ছেলে মেয়ের দল ছুটে এল পদ্ম তুল্‌তে। চোখে মুখে তাদের কি উৎসাহ ও আনন্দের দীপ্তি! কিন্তু দীঘির কাছে এসেই তাদের উৎসাহ কমে গেল।

প্রকাণ্ড দীঘি কাণায় কাণায় জলে ভরা, ফুলগুলো ফুটেছে তীর থেকে অনেক দূরে; জলে না নেমে ফুল নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। সবাই তো আর সাঁতার জানে না। যারা জানে তাদের মধ্যে কে জলে নাম্‌বে তাই নিয়ে হ'লো তর্ক সুরু

দীঘির পাড়ে প্রকাণ্ড একটি শিউলি গাছ, তারই তলাটা ঝরা ফুলে ছেয়ে গেছে। সেইখানে খেলা কর্‌ছিল, ছোট্ট ছেলে 'অমল'। বয়স তার মোটে ৮।৯ বছর, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মুখখানি, বড় বড় চোখ, প্রশস্ত কপালের উপর একরাশ কালো চুল এসে পড়েছে।

ওদের তর্ক শুনে এগিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে বল্‌লো, "তোদের কাউকে জলে নাম্‌তে হবে না; আমিই পদ্ম তুলে দোবো। সাঁতারে তো আমার সঙ্গে তোরা কেউ পারিস্ না।" কথাটা সত্য। যদিও সে ছিল অনেকের চেয়েই বয়সে ছোট, কিন্তু সাঁতারে তার দক্ষতা প্রায় সকলের চেয়ে বেশী। তাই কেউ আর আপত্তি কর্‌লো না

(২)

তখন আর সব ছেলের হাতে ফুল দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। ১।৪ জন ছেলে মেয়ে ফুল নিয়ে বাড়ী ফিরে গেছে। অন্য সকলে তখনও ঘাটে দাঁড়িয়ে জটলা কর্‌ছিল।

দীঘির জল যেখানে সবচেয়ে গভীর, সেইখানে পদ্মবনের একেবারে মাঝখানে, অমল এবার নিজের জন্য ফুল সংগ্রহ কর্‌ছিল। চোখে তার আনন্দভরা দৃষ্টি, পদ্মের মত সুন্দর মুখ খানি হাসিতে ভরে গেছে।

একটা ভারি সুন্দর পাখী আকাশের বুকে উড়ে যাচ্ছিল; ছেলের দল অবাক্ হ'য়ে চেয়ে দেখ্‌ছে, পাখীটা ক্রমশঃ অনেক দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল, ছেলেরাও তাদের দৃষ্টি নামিয়ে এবার দীঘির দিকে চাইল। প্রথমেই একজন চম্‌কে উঠে বল্‌ল, "কই অমল কোথায় গেল?" একটি মেয়ে বল্‌লো, "বাড়ী চলে গেছে নাকি?" সবাই গোলমাল ক'রে বলে উঠ্‌লো, "অসম্ভব, সে বাড়ী চ'লে গেল আর আমাদের একবার বলেও গেল না, একি কখন হ'তে পারে!"

এদিক ওদিক তাকে খোঁজার পর একটি মেয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, "অমল কি তবে…।" বাকী কথাটা সে আর উচ্চারণ করতে পারল না, ভয়ে সকলে শিউরে উঠ্‌লো। কিন্তু সে কথা যে বড় নিষ্ঠুর, কেউ ত বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না! আর সে যে সবার চেয়ে ভাল সাঁতার জানে, তার ডুবে যাওয়া কি কখন সম্ভব?

বিশ্বাস কর্‌তে না চাইলেও এবার কিন্তু তাদের বড় ভয় করতে লাগল। অনেক ছেলেমেয়ে জলের কিনারায় গিয়ে তার নাম ধরে ডাক্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু ওপার থেকে তাদের ডাকের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোনও উত্তর এল না। ডাক ক্রমে কান্নায় পরিণত হ'লো, তবুও অমলের উত্তর নেই। দু'চার জন ছেলেমেয়ে জলে নেমে সাঁত্‌রে চললো অমলকে খুঁজ্‌তে।

এর মধ্যে ছেলেদের চীৎকার শুনে আশপাশের বাড়ী থেকে লোকজন ছুটে এল এবং দু'তিন জন জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো। অল্পক্ষণের চেষ্টাতেই তার কচি কিশলয়ের মত কোমল শরীরখানি তুলে আনা হ'লো। হাতের মুঠায় তখনও তার ধরা আছে একগুচ্ছ শ্বেতপদ্ম। অনেকগুলো মৃণাল কি ক'রে যেন তার পায়ে জড়িয়ে গিয়ে উঠ্‌বার উপায় বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

(৩)

বছরের পর বছর যায়, শরৎ ফিরে ফিরে আসে, জলে স্থলে আকাশে বাতাসে তার আগমনী বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়ে। দীঘির ধারে সেই শিউলী গাছের তলায় আজও রাশি রাশি ফুল ঝ'রে পড়ে। বধূরা আসে কলস ভরে নিতে, স্নানার্থীরা এসে স্নান ক'রে যায় সেই দীঘিতেই; জলের বুকে শতদল মেলে কমল ফুটে উঠে' আবার গোধূলীর আলোয় ছাওয়া সন্ধ্যাকাশের নীচে আপনিই মুদে যায়; হাঁসের দল সেখানে আজও তেমনি খেলা করে। কিন্তু কোন ছেলেই আর ফুল নিতে জলে আজ নামে না। কোন অমল হাতের কোমল পরশ আর তাদের গায়ে লাগে না।

হেমন্ত

(শ্রীরণেন্দ্রনাথ সরকার—গ্রাহক নং ৯৯৬)

ঘেমে নেয়ে গেলে যে গো
ওগো শরৎ রাণী;
ঘরে ফেরার সময় বুঝি
বস্‌লে একটুখানি।

সারা গায় ঘাম ঝরছে
রোদ পড়েছে তায়,
দেখায় যেন অঙ্গ তোর
গড়া মুকুতায়।

বর্ষাকালে কাটা সুতার
রঙীন তোমার সাজ,
আঁচলখানি ধূলায় পড়ে
ধুসর হ'ল আজ।

ধানের ক্ষেত পাতা হ'ল
সোণার বিছানায়,
হাসি মুখে শরৎ রাণী
বস্‌ল উঠে তায়।

'কুঞ্জলতা' ঘোমটা দি'ল
'হাস্‌নাহানা' চুপ্;
'কুন্দ', 'কদম' শিশির মেখে
সাজ্‌ল অপরূপ।

ছেলেমানুষ 'কেয়া' ও 'কাশ'
বল্লে কেঁদে তাই,
"ছরৎ দিদি, মোদের কেন
ভিজিয়ে দিলে ভাই!"

ধরা গলায় অমনি 'চাঁপা'
বল্লে,—"আরে দ্যুৎ!"—
হীরের সাজে পোষাক তোদের
হ'য়েছে নিখুঁৎ।

"এবার বাড়ী যাই গো",—বলেন
শরৎ রাণী চেয়ে;
কৃষাণেরা কাস্তে লয়ে
চল্ল মাঠে ধেয়ে।

মুখে তাদের হাসি লেগে,
দেখ্‌ছে তারা কত,
অঘ্রাণেতে 'নবান্নেরই'
সুখের স্বপন যত।

বিদায় নিলেন শরৎরাণী
আঁচল উড়িয়ে,
ধীরে আসেন হেমন্ত তাঁর
হিমের পরশ নিয়ে!

গল্প-স্বল্প

ছোট পশুপাখীর হাঁসপাতাল—স্যান্ ফ্রান্সিস্‌কো সহরে ছোট পশুপাখীর একটা হাঁসপাতাল আছে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সেখানে রোগী আসে। তাদের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন; ভাল যন্ত্রপাতি আর দামী ওষুধ-পত্রের সাহায্যে তাদের চিকিৎসা হয়। ছবিতে দেখ, একটি ছোট্ট বানরকে (আফ্রিকার 'মস্' বানর) ডাক্তার একটি ওষুধের গুলি খাওয়াতে যাচ্ছেন; বানরটি নিতান্ত অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে ডাক্তারের দিকে চাইছে।

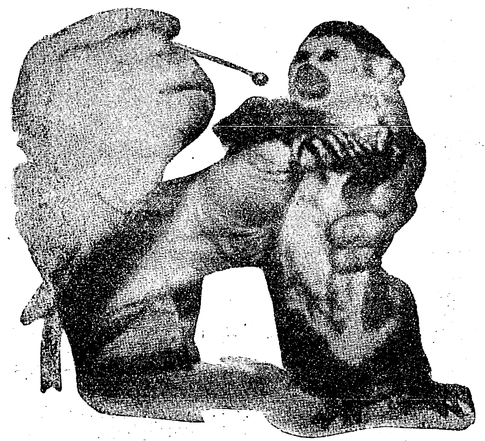

সময়-দেখার সময়—কখন যে ঘড়িতে সময় দেখার দরকার হবে কে বল্‌তে পারে? তাই মানুষ নানারকম সময় দেখার ব্যবস্থা করেছে। যাদের পয়সা আছে তারা বাড়ীতে হাত-ঘড়ি, টাইমসিস্, দেওয়াল-ঘড়ি ইত্যাদি রাখে। আফিসে, রেলষ্টেশনে, আদালতে, ঘড়ি থাকে; সখ ক'রে অনেকে ঘড়ি টাঙ্গায়, আবার বিজ্ঞাপনের জন্যও অনেক ঘড়ি টাঙ্গান হয়। ছবিতে দেখ, গীর্জ্জা-ঘরের প্রকাণ্ড ঘড়ি,—'ডায়াল'এর একটি কাঁচ খুলে ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন ঘড়ির কাঁটা ঠিক করে দিচ্ছে। তার নীচের ছবিতে একটা সূর্য্য-ঘড়ি দেখান হয়েছে। এর জন্য কোন কলকব্জার দরকার হয় না, চাবিও দিতে হয় না; কিন্তু সূর্য্যের আলো এর উপর না পড়্‌লে সময় জানা যায় না। কাজেই, মেঘলা দিনে আর রাতের বেলায় এ ঘড়ি অচল। আধুনিক চাবি আর কলকব্জাওয়ালা ঘড়ির আগে এই ঘড়িই চল্ ছিল।

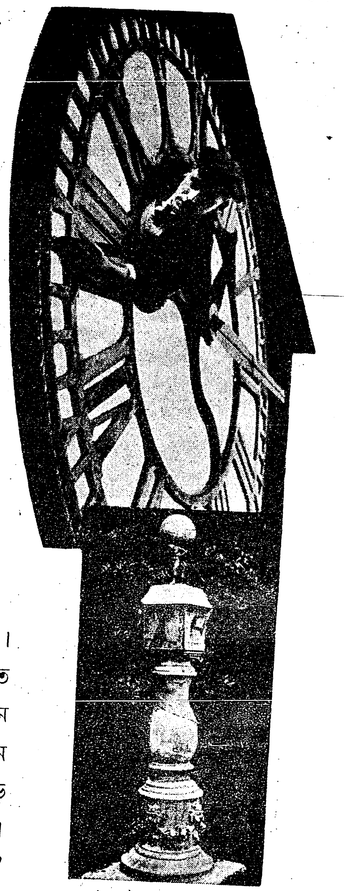

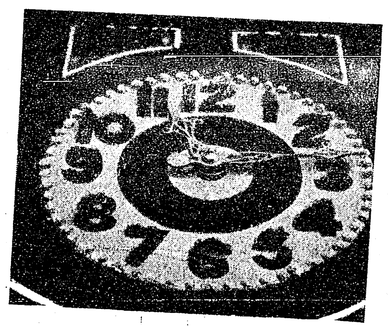

পাশের ছবিতে দেখ, একজন কারিকর কেমন সুন্দর ফুল ঘড়ি তৈরী করেছে। ফুলের 'ডায়াল' অবশ্যি একজন ওস্তাদ মালী বানিয়েছে। ঘড়ির কল-কব্জা মাটিতে লুকানো আছে। দেখ্‌তে ঘড়িটি ভারি সুন্দর।

এত লোক যায় কোথায়?—আমেরিকার অনেক সহর এত তাড়াতাড়ী বেড়ে চলেছে যে সহরবাসী লোকদের থাকাটা একটা সমস্যার ব্যাপার হয়েছে। বড়লোকেরা না হয় দূরে গিয়ে থাক্‌তে পারেন, আর মোটরে এসে কাজ কর্ম্ম করে আবার মোটরে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু গরীব লোকদেরই মুস্কিল।

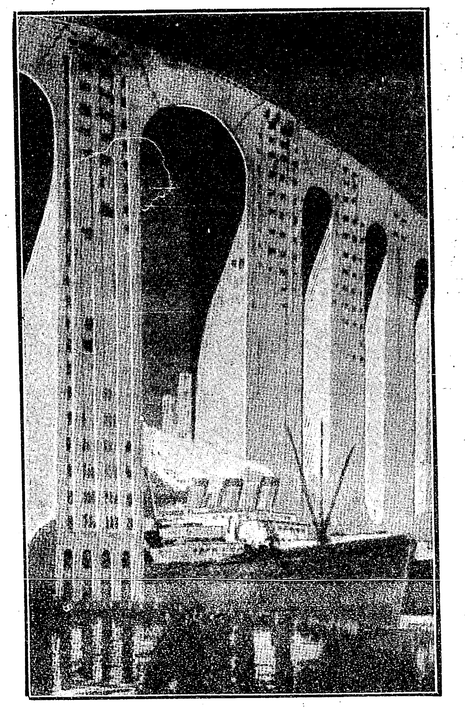

বাড়ীগুলো তো উঁচু হ'তে হ'তে আকাশে ঠেক্‌ছে,—আর উঁচু করা চলে না। অনেক সহর নদীর দু'ধারে বসান হয়েছে; নদীর উপর বড় বড় সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। সে দেশের একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার বলছেন, ভবিষ্যতে নদীর সাঁকোর থামগুলো ভেঙ্গে এক একটি বিরাট বাড়ী বসান হবে। তার মাথার উপর দিয়ে সাঁকো চল্‌বে। বড় নদীর উপর এ রকমের ২০।২৫টা বাড়ী বসালে, তাতে অন্ততঃ ২০।২৫ হাজার লোক অনায়াসে থাক্‌তে পার্‌বে। সহরে ৪টি সাঁকো হলেই তো একলক্ষ লোকের বাসের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ছবিতে দেখ ঐ রকমের এক সাঁকো, তার নীচ দিয়ে বড় সমুদ্রগামী জাহাজ চলেছে। এসব বাড়ীতে যারা বাস কর্‌বে, তাদের বাইরে যেতে হ'লে, নীচে না নেমে ছাতে উঠ্‌তে হবে; সেখানে তারা মোটর বাস্ ইত্যাদি চড়্‌তে পারবে, কারণ তাদের ছাতই তো হ'লো সাঁকো। নদীর উপর খোলা হাওয়ায় তারা আরামেই থাকবে। তবে, বন্যার সময় তাদের ভয় সব চেয়ে বেশী, কারণ জলের তোড় তারাই অনুভব কর্‌বে বেশী।

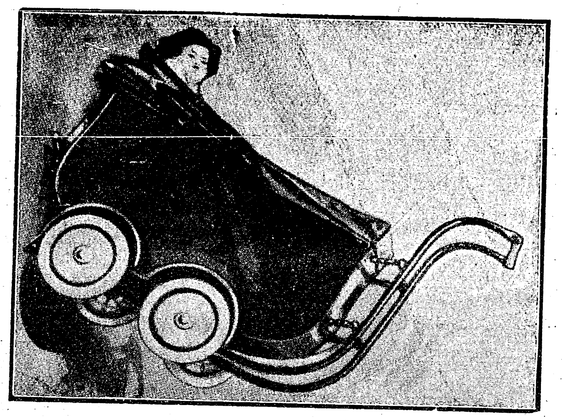

এ গাড়ী উল্টাবে না—ছোট ছেলেমেয়েদের প্যারাম্বুলেটার উল্টে গেলে বড় মুস্কিল। রাস্তা পার হয়ে ফুটপাথে গাড়ী উঠাবার সময়, কিম্বা পথের পাথর ইঁট ইত্যাদি ডিঙ্গাবার সময় গাড়ী উল্টাবার ভয় থাকে। কিন্তু এই গাড়ীটি উল্টায় না,—এক দিকের চাকা উঁচু হলেও গাড়ী কিছুতে উল্টাবে না।

ধাঁধার উত্তর

১। নূতন রকমের ছাপা—

ছাপাটিতে যতগুলি 'র' অক্ষর আছে তার অধিকাংশই ভাঙ্গা পুরাণো অক্ষর—নূতন 'র' অক্ষর কম। সুতরাং ছাপাটিকে নূতন রকমের ('র' কম) বলা যায়।

২। শব্দ পূরণ—

সতীশ, নবীন, শেষে, নবজীবন, নতুন, মহিম, কটক, সন্দেশ, সরেস।

[স্থানাভাবে এবার উত্তরদাতাদের নাম দেওয়া গেল না]

নূতন ধাঁধা

১। গুণের অঙ্কে বিভ্রাট—

ছাপাখানায় অঙ্কের বই ছাপা হচ্ছে। একজন কম্পোজিটারকে একটা গুণের অঙ্কের অক্ষরগুলি বসাতে দেওয়া হয়েছিল। তার অসাবধানতায় অঙ্কের অক্ষরগুলি একটি বাদে সব মাটিতে পড়ে গেল। মাটি থেকে অক্ষরগুলি কুড়িয়ে এই অক্ষর গুলি সে পেল — ১, ২, ৩, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৮, ৯ এবং ৯। ইতিমধ্যে বাতাস এসে অঙ্ক লেখা কাগজটিও যে কোথায় উড়ে গেছে তার পাত্তাই নেই।

সুখের বিষয় তার মনে ছিল যে, সেটা গুণের অঙ্ক, আর যে রাশিকে যা' দিয়ে গুণ করা হয়েছে, সে দুটোই দু'-অক্ষরের রাশি। তখন সে ঐ অক্ষরগুলি দেখে, ভেবে চিন্তে হিসাব ক'রে গুণের অঙ্কটি (ফল শুদ্ধ) ঠিক ভাবে সাজালো।

অঙ্কটি কি ভাবে সাজান ছিল তা' পাশে দেখান হ'লো। যে অক্ষরগুলি পড়ে গিয়েছিল তাদের জায়গায় '×' চিহ্ন বসান হয়েছে; শুধু একটি অক্ষর যথাস্থানে বসান রয়েছে।

```
      × ×
      × ×
    ------
      × ×
    × ×
  ---------
    × × ৮
```

তোমরা অঙ্কটি ঠিক ভাবে লিখতে পার কি ?

২। শব্দপূরণ—নীচের দুটি লাইনের প্রত্যেকটি থেকে দুটি অক্ষর তুলে নেওয়া হয়েছে। একটির বদলে '—' চিহ্ন, অন্যটির বদলে '=' চিহ্ন বসান হয়েছে। তোমরা অক্ষর দুটি বসিয়ে নিয়ে লাইন দুটি পড়তে পার কি ?

প্রথম লাইন থেকে যে দুটি অক্ষর তোলা হয়েছে, দ্বিতীয় লাইন থেকে সেই দুটি অক্ষর তোলা হয় নি, অন্য দুইটি অক্ষর তোলা হয়েছে।

১। —ি= — = অ — = — — = ষে —া =া —'য়ে — = — = কে— ।

২। ে— বে= , এ—াে= — ি= —াতার — ে= জে ে—া =া —ু= — ম চে= ?

—দেশনায়কগণের অভিমত—

যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য

দেশপূজ্য
৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির
অভিমত

"আমি মিঃ এইচ, বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে ইহাই ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।"

স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জননেতা
লালা লাজপৎ রায়ের
অভিমত

"আমি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি মিঃ এইচ, বসুর "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" বাস্তবিক ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধ অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"

স্বাঃ লালা লাজপৎ রায়

কেশতৈল—কুন্তলীন, কোকোলীন, ম্যাকেসার, চামেলীন প্রভৃতি।

হেয়ার লোসন—দেলখোস, দিলতোষ, হার্টস্ ডিলাইট, প্রভৃতি।

পমেটম—দেলখোস পমেড, গোলাপ ও বকুল পমেটম প্রভৃতি।

এসেন্স—দেলখোস, হোয়াইট রোজ, অপরাজিতা, বকুল, মাস্ক, যুঁই, বেলা, চামেলী, খস, অরিগ্যান প্রভৃতি নানা সিরিজের বিবিধ প্রকার সুগন্ধি।

নানাবিধ অটো, হেয়ারওয়াস, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, লাইম যুস ও গ্লিসারিন ক্রীম এবং স্নো প্রভৃতি।

সাবান—হোয়াইট রোজ, চন্দন, খসখস, মাস্ক, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ ফলের সিরাপ।

এইচ, বসু, পারফিউমার,
৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বিশ্ববরেণ্য
রবীন্দ্রনাথ
বলেন

"কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহারে একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক
৺ মতিলাল নেহেরুর
অভিমত

"ভারতবর্ষের প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এইচ, বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C 700.





উড্ ওয়ার্ডের
গ্রাইপ ওয়াটার

চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

ইহা শিশুদিগকে সুস্থ রাখে।

WOODWARD'S
GRIPE WATER

(WW 13-111)

W. WOODWARD LTD., LONDON, ENGLAND

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

সন্দেশ

অগ্রহায়ণ, ১৩৪০



সম্পাদক - শ্রীসুবিনয় রায়
শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম্, এস্, সি

২৷৷৵০ আনা

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

COLOURED DOCUMENT.

ছেলেমেয়েদের জন্য

কয়েকখানি বাছাই বই

এগুলির পরিচয় ছেলেমেয়েদের কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যেমনি সরস সুন্দর ভাষা, তেমনি চমৎকার চমৎকার এক রঙের ও ৩-রঙের ছবি। মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত, এবং ডিরেক্টর-অব-পাবলিক-ইনস্ট্রাকসন কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র	...	॥০	কথাসরিৎ সাগর	...	॥৵০
” বেতাল পঞ্চবিংশতি		॥০	রবিন্ হুড	... ...	॥৵০
” বত্রিশ সিংহাসন		॥০	ওডিসিয়ুস	... ...	।৵০
পুরাণের গল্প	...	॥০	ইলিয়াড	... ...	।৵০

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

নূতন সংস্করণ

স্বাস্থ্য

পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত

১। পড়া শুনা ।৵০
২। খেলার পড়া ।৶০

স্বাস্থ্যের কথা ছেলেমেয়েদের জন্য অতি সরল:: সরস ভাবে লেখা। ভাল কাগজে, বড় অক্ষরে, পরিষ্কার ছাপা। অনেকগুলি ছোট ছবি, সুন্দর মলাট। মূল্য—ছয় আনা

বই দুইখানির নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম-এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

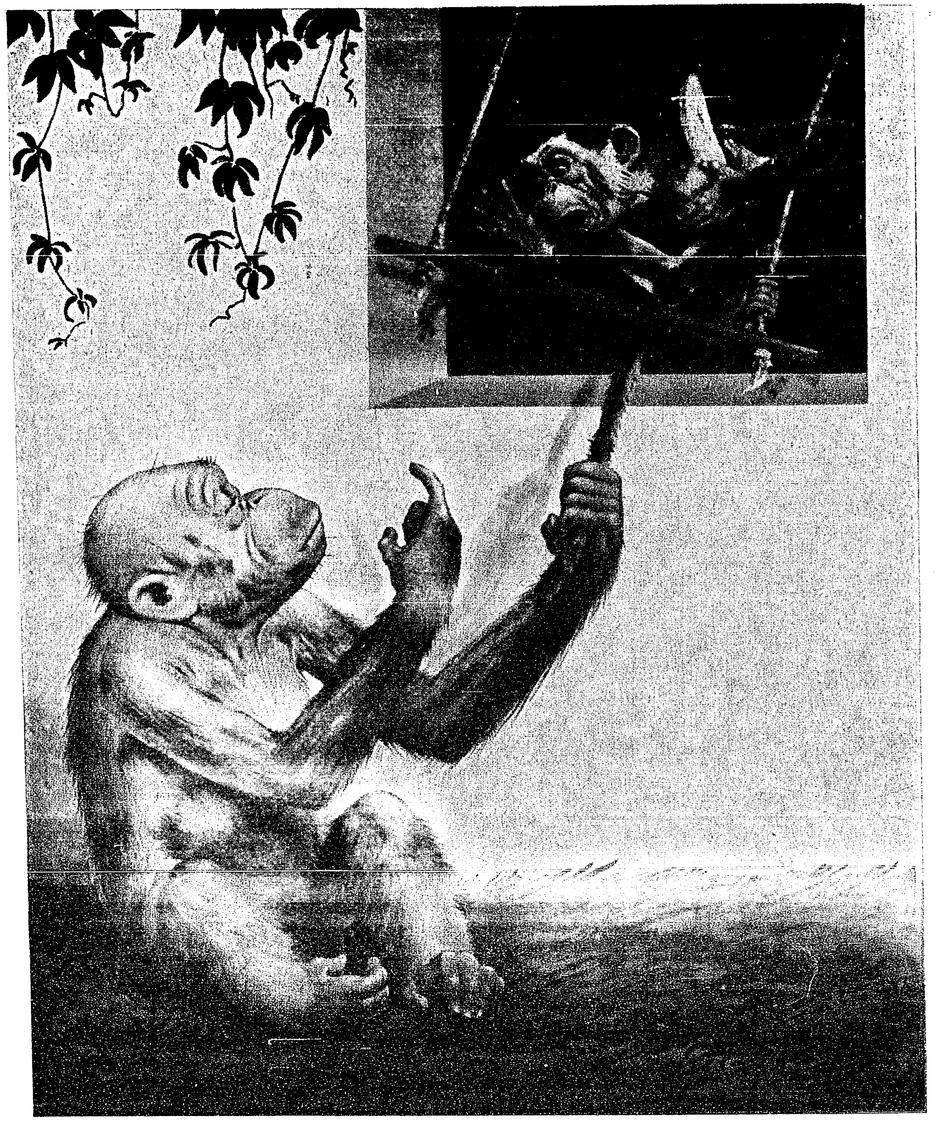

একলা ব'সে দোল্‌না চেপে কর্‌বি ফলার কি রে ?
একটি আমায় ভাগ্‌ না দিলে ল্যাজ্‌টি দেব ছিঁড়ে।—

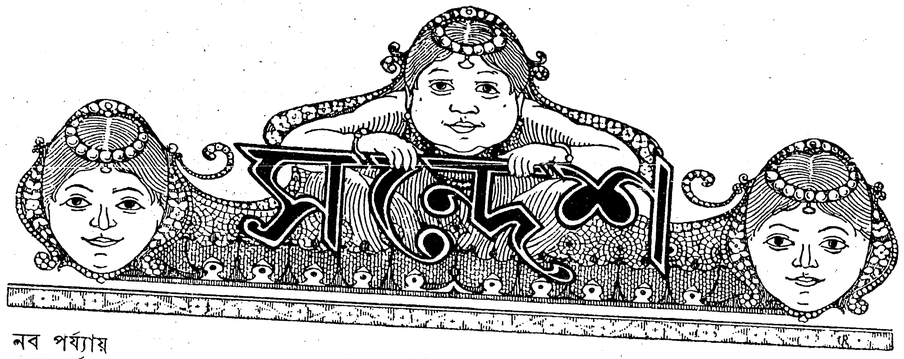

নব পর্য্যায়
৩য় বর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

৩য় সংখ্যা

চিঠি

(শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার)

মাথাজোড়া পাগড়ি, পায়ে আঁটা নাগ্‌রা,
খটাখট্‌ চলে আসে—এঞ্জিন নির্ধূম !
কাঁধে ঝোলা ব্যাগ যেন সাগরের কাঁকড়া !
চলে যায় চটাপট্‌, দুপদাপ্‌, দ্রুম্‌দুম্‌ !

কোট্‌ প্যাণ্টে কাটা ছাঁটা, তবু যেন রোজ কে
কেটে যেন নিচ্ছেই ! ক্রমে গেছে কুঁচ্‌কে' !
বেল্ট্‌ আর পট্টি রুখে থেকে দু'ভায়ে
শরীরটে ঠিক খাড়া রাখে কোন উপায়ে।

ওপাড়ার গলিতে যে বাড়ী তার, সে চিনি।
চোকে মুখে বাঙ্গালী, চেহারাতে বেহারী !
সব বাড়ী দেখি তারে, বাড়ীতেই দেখিনি !
হাসিটুকু মাখা গোঁফে, পার্ব্বণে নেহারি !

কতবার আসে যায়, নাম ওর নব্‌নে' ;
তবু মনে হয় যেন, আসে যেন স্বপনে !

COLOURED DOCUMENT.

"চি...ঠি-ই—ঈ-ঈ..." বলে' হাঁক দিয়ে হঠাৎ-এ
কভু আসে একটায়, কভু আসে ন'টাতে।

বৃষ্টি ও রোদে তার হার্ ও জিৎ কিছু নেই।
কুঁড়ে ঘরে, আপিসে কি হোষ্টেলে, আখ্ড়ায়—
সেই ব্যাগ ঝোলে পাশে, ছাতা ঝোলে পেছোনেই
প্যালেসে সে চলে যায় ধূলোব্রুষ নাগ্রায়!

তার পথ থাকে চেয়ে, যত কেউ, অপলক!
সে-ই জানে কোথা থাকে জগতের যত লোক!—
আধ্ ইঞ্চ্ পেন্সীল, আধো-নিব্ হ্যাণ্ড্ল্-এ
টুক্ করে' টুকে নেয়—লণ্ডন, ম্যাণ্ড্ল্যে!

যত থাক্ ভাবনা, পরশু, কি আজিকে,
ছট্ফট্, মন-ভার, দুটো চোকে নদীজল,
যেখানে যে আছে যার সব কথা ম্যাজিকে
ব্যাগ্ থেকে বের করে, এনে দেয় অবিকল!

কতযুগ কবেকার বন্ধু সে সকলের—
ব্যাগ্টি ও তাড়াবাঁধা চিঠি তার বগলের—
ওই নিয়ে চিরকাল চিরচেনা পোষাকে
মেঘলোক ঘুরে' ঘুরে' আসে যেন পোষা 'টে'!

কী খবর নিয়ে আসে, অজানারি হাওয়াতে!
ওঠেনি যে Seal টির ভালো করে' দুকোণও!
ফেলে গেছে 'বক্স'-এ, দিয়ে গেছে দাওয়াতে,
সোনার কাঠিটি যেন ওরি মাঝে লুকোনো!

ফোঁক্লাসে Seal গুলো হেসে কয় "কহ রে!
কে লিখেছে?—(দেখো না কো!)— থাকে কোন্ সহরে?"
পোষ্টকার্ড—বৌ দিদি, খামখানি—বঙ্কা,
আরখানি—সন্দেশের অভ্রাণের সংখ্যা!



(শ্রীযতীন সাহা)

স্বদেশের সমপাঠীরা স্বদেশকে বল্তো বোকা। মাষ্টার মশাইরাও অনেক সময় ওকে তাই-ই বল্তেন—এমন কি ওর মা-বাবাও। স্বদেশকুমার কিন্তু নিজেকে একটুও বোকা বলে ভাব্তো না; বরং ও যে খুব চালাক, সব কিছুতেই ও বিশেষ করে তারই পরিচয় দিতে চেষ্টা কর্ত।

সেই স্বদেশ স্কুলের পড়া শেষ কর্লে, থার্ড ডিভিসানে ম্যাট্রিক পাশ করে। যাক্, পাশ যখন স্বদেশ করেছে—তা' যে ডিভিসানেই হোক্—তার কলেজে পড়া তো এখন কেউ আট্কাতে পার্বে না! কলেজে পড়ার জন্যে স্বদেশকুমার একেবারে উতলা হয়ে উঠ্ল।

বাবা স্বদেশকে ডেকে বল্লেন, "জেলা কলেজ থেকে চিঠি লিখে একখানা 'প্রস্পেক্টাস্' আনা রে সহু!"—"জেলা কলেজ! তবে কি বাবা তাকে বর্দ্ধমানে পড়াতে চাচ্ছেন?"

স্বদেশকুমারের চোখ দু'টো ছল্ ছল্ করে উঠল। 'বর্দ্ধমান! ছিঃ ছিঃ, অমন কলেজেও লোকে পড়ে! স্বদেশ কত আশা করেছিল ও কোল্কাতা গিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়্বে! কিন্তু একি! থার্ড ডিভিশানে পাশ করে কি কেউ কোল্কাতা পড়্তে যায় না? স্বদেশ মার কাছে গিয়ে ধর্ণা দিলে। তাকে যে করেই হোক্ কোল্কাতা পাঠাতেই হ'বে। নইলে সে পড়াশুনো ছেড়ে মূখ্যু হয়ে থাক্বে।

বাবা বল্লেন—"যে আমার চালাক ছেলে, তায় আবার থার্ড ডিভিসানে পাশ দিয়েছেন। অমন বোকা ছেলের জন্যে কোলকাতার কলেজ খোলা হয় নি। কোল্কাতা সহর যেমন তেমন যায়গা নয় বাপু! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস।

ট্রাম, বাস্, ট্যাক্সী—রাস্তায় বেরুলে প্রতিপদে মর্‌বার ভয়। তার উপর চোর, জোচ্চোর, বদমায়েসের তো কথাই নেই। রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, ব্যাটারা রাত-দিন ওঁৎ পেতে বসে রয়েছে—জামা কাপড়ে ভদ্রলোক, চেন্‌বার জো-টি নেই।

কথায় কথায় যার তার মুখে 'বোকা' শুন্‌তে শুন্‌তে স্বদেশের কাণ দুটো একেবারে ঝালা-পালা ধরে গেছে। বোকা! সত্যিই কি ও বোকা! বোকামির কি এমন পরিচয় ওঁরা পেয়েছেন। স্বদেশ তো সব সময়ই 'স্মার্ট' ছেলের মতন চলা ফেরা কথাবার্ত্তা বলে। তবে ওর বোকামীটা এঁরা পেলেন কোথায়?

আর দশটা ছেলের বুদ্ধির চেয়ে স্বদেশের বুদ্ধি কি এতই মোটা যে, তাকে বোকা বলে সহজেই চিন্‌তে পারা যায়!

যাক্, বোকাই হোক্ আর যাই হোক্, উপদেশের উপর উপদেশ শুন্‌তে শুন্‌তে সত্যিই একদিন স্বদেশকুমার তার কাকাবাবুর সাথে চল্‌ল, কোল্‌কাতা কলেজে পড়্‌তে। প্রেসিডেন্সি কলেজে স্বদেশের স্থান হ'ল না। আর স্বদেশের কেন? স্বদেশের চাইতে ভাল ছেলে যারা আর এক ধাপ উঁচু দিয়ে পাশ করে গেছে, তাদেরও নয়।

যাক্ স্বদেশের তাতে দুঃখ নেই, কেন না সে মিশিনারী কলেজে সিট পেয়েছে। 'সেন্ট পল্' কলেজ, সে তো ভালই; সেখান থেকেও তো ইউনিভার্সিটিতে আই-এ, বি-এ পরীক্ষায় 'ষ্ট্যাণ্ড' করেছে।

'জানীয়ালী' হোষ্টেলে সিট ঠিক করে দিয়ে স্বদেশের কাকাবাবু চলে গেলেন দেশে। আর যাবার সময় বার বার করে বলে গেলেন যেন সে বোকার মত হাঁ করে রাস্তা দিয়ে না বেড়ায়। খুব হুঁসিয়ার হয়ে যেন থাকে এবং প্রতি সপ্তাহেই পত্র দেয়।

বই পুঁথি কিনে স্বদেশ পড়াশুনো আরম্ভ করে দিলো। আস্‌বার সময় বাবা যে কথা বলে দিয়েছেন স্বদেশ সে কথা ভুলে নাই। আর ভুল্‌বেই বা কি করে? ষান্মাসিক পরীক্ষায় ও যদি ভাল নম্বর না পায় তবে যে ওর আর পড়া হবে না। এই কথাটাই বাবা ওকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

স্বদেশের পাশের কামরায় থাকে অরুণ। অরুণের সাথে স্বদেশের আলাপ

হয়েছে কিন্তু তেমন ভাব হয়নি। যেচে স্বদেশ কারুর সাথে ভাব করাটা পছন্দ করে না।

অরুণ বড়লোকের ছেলে, সপ্তাহে তার দুদিন করে বায়স্কোপে যাওয়া চাইই চাই। অরুণ বলে—"ছিঃ ছিঃ স্বদেশবাবু, আপনি এখনও নেহাৎ স্কুলের ছেলেটি রয়েছেন দেখ্‌ছি!" স্বদেশ বলে—"তার মানে?"

—"তার মানে, রাত দিন বই সাম্‌নে করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে হোষ্টেল্ মাৎ করে দেন্! ফাষ্ট ইয়ারে আবার পড়া কি মশাই! শুধু লেক্‌চার হজম করে যাবেন। আর একটু রাস্তায় বের-টের হন, বায়স্কোপ দেখুন, সভাসমিতিতে যান, থিয়েটারে যান—মনটাকে একটু চাঙ্গা করুন। তা-না মশাই, শুধু বই নিয়ে প'ড়ে থাক্‌বেন। কোল্‌কাতা থাক্‌তে হলে সব রকম 'নলেজ' থাকা চাই, নইলে কথায় কথায় হেরে যাবেন মশাই—বোকা বল্‌বে সবাই!"

আবার সেই বোকা! এখানেও কি তবে ওর সেই সুনামটি রটে যাবে নাকি?

মাসে মাসে বাবার কাছ থেকে মনিঅর্ডার যোগে তিরিশটি করে টাকা আসে স্বদেশের কাছে।

সেবার স্বদেশ দুদিনের জন্য শ্রীরামপুরে ওর এক মাসীর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। হোষ্টেলে এসেই ও শুন্‌লে যে পর পর দু'দিন ওর নামে মনিঅর্ডার এসে ঘুরে গেছে। পাছে আবার টাকা ফিরে যায় এই ভয়ে, খেয়ে দেয়ে ১২টার সময় স্বদেশ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ডাকঘরে গিয়ে হাজির হ'ল।

মনিঅর্ডার পিয়নও ঠিক সেই সময় পোষ্টআফিস থেকে ডেলিভারি কর্‌তে বের হবে। দরজার কাছে স্বদেশের সাথে পিয়নের দেখা। সই করে দিয়ে স্বদেশ গুনে তিন খানি দশটাকার নোট নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজলো।

দুপুর বেলা রাস্তায় তখন বড় একটা লোকজন নেই। ডাক ঘর থেকে বেরিয়ে স্বদেশ কি যেন ভাব্‌তে ভাব্‌তে এগিয়ে চল্‌ল ফুট্‌পাথ ধরে হোষ্টেলের দিকে।

হঠাৎ একটা লোকের চীৎকার শুনে স্বদেশের হুঁস্ হ'ল। চাইতেই সুমুখের দিকে সে দেখ্‌লে একটা লোক কপাল চাপ্‌ড়ে বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছে—"হায় হায়! গেছে রে, আমার সব গেছে!"

স্বদেশ মুহূর্ত্তের জন্য সেইখানে দাঁড়িয়ে এর অর্থ কিছু বুঝতে পার্‌লে না। বিপরীত দিকেই মাড়োয়াড়ী হাসপাতাল—ভাব্‌লে হয়ত লোকটার কেউ

হাসপাতালে মারা গেছে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোকটা একটা গলি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তখনও তার মুখে সেই এক কথা—"হায়, হায় ……!"

স্বদেশ চল্‌তে সুরু করে দেবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আর এক কাণ্ড! হঠাৎ স্বদেশ দেখ্‌লে তার পায়ের সুমুখে কিসের যেন একটা পুঁট্‌লি। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে দু'টো লোক এসে ছোঁ মেরে স্বদেশের পায়ের সুমুখ থেকে পুঁট্‌লিটি তুলে নিলে।

স্বদেশ সেই দিকে চাইতেই দেখ্‌লে, এরই ভেতর তারা পুঁট্‌লিটি খুলে ফেলেছে। বেগুনি রং-এর কাগজে জড়ানো কি একটা জিনিষ লোকটা চট্‌করে মুঠোর ভিতর লুকিয়ে ফেল্‌লে।

অপর লোকটা বল্‌লে—"আমায় দাও শীগ্‌গির, নইলে এখনই সেই লোকটাকে ডেকে বলে দিচ্ছি কিন্তু,…নয় তো পুলিস!" স্বদেশ এর অর্থ কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে না। লোক দুটো অমন কচ্ছে কেন?

একটু এগিয়ে গিয়ে স্বদেশ বল্‌লে, "কি হয়েছে?" যে লোকটার মুঠোর ভেতর সেই কাগজের মোড়কটি ছিল সে লোকটা কিছু বল্‌বার আগেই অপর লোকটি বল্‌লে—"দেখুন বাবু ঐ যে……", আর সে বল্‌তে পার্‌লে না; পূর্ব্বের লোকটি বাঁ হাতে তার মুখ চেপে ধরে বল্‌লে, "চুপ্‌ চুপ্‌ এতে তোরও ভাগ আছে।" তার পর চুপি চুপি একটা গাছের আড়ালে স্বদেশকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এদিক সেদিক বারবার চেয়ে সেই কাগজের মোড়কটা খুলে স্বদেশকে দেখালে। স্বদেশ তো দেখে অবাক্!—এক তাল পাকা সোনা! আশ্চর্য্য, এ এরা পেলে কোত্থেকে?

লোকটা চুপি চুপি স্বদেশকে বল্‌লে—"বাবু, একটু আগে যে একটা লোক হায় হায় কর্‌তে কর্‌তে গেল, সেই লোকটার ট্যাক থেকে এই সোনার তালটি ঐখানে পড়েছিল। লোকটার ভাব দেখেই আমি বুঝেছি যে ওর নিশ্চয়ই কোন দামী জিনিষ হারিয়েছে! লোকটারও গলিতে অদৃশ্য হওয়া আর অম্‌নি আপনার পায়ের কাছে এই পুঁট্‌লিটা আমাদের দুজনেরই একসঙ্গে চোখে পড়া। আমিই তো কুড়িয়ে পেয়েছি বাবু, কিন্তু এ লোকটা আবার এতে ভাগ বসাতে চাচ্ছে। যাক্ বাবু আমরা গরীব মানুষ, দিন খেটে খাই, এত সোনা দিয়ে কি কর্‌বো! লোকে আমাদের হাতে দেখ্‌লে এক্ষুনি চোর বলে পুলিসে দেবে। আপনার কাছে টাকা আছে বাবু? যদি থাকে আমাদের দিন, দু'জনে ভাগ করে নিয়ে যাই।

এ সোনা আপনিই নিন্। সোনা আপনাদের মতন বড় লোকদের জন্যই।



তাই ত! একটু ভেবে স্বদেশ বল্‌লে, "না বাপু, ও চোরাই মাল আমি নিয়ে একটা ফ্যাসাদে পড়ব শেষে।"

—চোখ দু'টো কপালে তুলে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে লোকটা বল্‌লে—"কিচ্ছু ভয় নেই বাবু, আপনি নিয়ে যান্। এতো চোরাই মাল নয়, এ তো কুড়িয়ে পাওয়া। স্বচক্ষেই তো দেখ্‌লেন সব।"

"দরকার নেই" ব'লে স্বদেশ এক পা এগিয়ে এল। একবার ফিরে চেয়ে দেখ্‌ল লোক দু'টো তখনও গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঝগ্‌ড়া কর্‌ছে। স্বদেশের ভারি লোভ হ'ল। সত্যিইত! এক তাল পাকা সোনা! ঠিক অমনি একতাল সোনা সেবার তার বোনের বিয়েতে গয়না গড়াবার জন্য তার বাবা কোল্‌কাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন!

স্বদেশকে থাম্‌তে দেখে লোক দু'টো আবার এগিয়ে এসে বল্লে, "যদি নিতে হয় নিন্ বাবু, লোকজন এসে পড়্‌লে আবার……!"

ট্যাঁক থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে স্বদেশ বল্‌লে "নাও।"

লোকটা বল্‌লে—"মাত্র দশটাকা বাবু, এ মালের দাম পাঁচশো টাকা!" আর একখানা নোট বের করে স্বদেশ বল্‌লে—"আচ্ছা এই নাও!"

দু'খানা নোট দু'জন লোক নিয়ে সোনার তালটা স্বদেশের হাতে ফেলে দিয়ে বল্‌লে—"চট্‌পট্ সরে পড়ুন বাবু! হ্যাঁ, আর দেখ্‌বেন আমাদের নাম বল্‌বেন না যেন কাউকে।"

লোক দু'টো হন্ হন্ করে চলে গেল। সোনার তালটা ট্যাঁকে গুঁজে নেহাৎ ভাল মানুষের মত স্বদেশ হোষ্টেলের দিকে চল্‌ল। যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু মনের ভেতর তার আনন্দ উৎলে উঠ্‌ছে, কখন সে সেই কাগজের মোড়ক খুলে একবার এত লাভের ধন দেখ্‌বে! মনটা তার খুসীতে ভরে গেছে। আঃ, ভাগ্যিস্ সে মাসীর বাড়ী গিয়েছিল, নইলে তো টাকার জন্যে তাকে আর পোষ্টাফিসে আস্‌তে হ'ত না!

অদৃষ্ট! সবই অদৃষ্ট! নইলে দুনিয়ার এত লোক বাঁচিয়ে আমারই হাতে এসে পড়্‌বে কেন? স্বদেশের মনে আর স্ফূর্ত্তি ধরে না! বোকা!—স্বদেশকুমার বোকা! এবার বুঝ্‌বে সবাই যে কে বোকা আর কে চালাক! পাঁচশ টাকার মাল বিশ টাকায়, আর চাই কি!

স্বদেশ এসে তার ঘরের তালা খুল্‌লে। অরুণও ঠিক সেই সময় কলেজ থেকে ফির্‌ছিল। স্বদেশকে দেখে বল্‌লে—"স্বদেশবাবু, কাল তো কালীপুজোর ছুটি। একটা ভাল ফিল্ম আছে 'চিত্রায়', চলুন দেখে আসা যাক্। কি বলেন?—'সান্ রাইজ' ভারি চমৎকার ফিল্ম।"

স্বদেশের মনে আর স্ফূর্ত্তি ধর্‌ছিল না। এক গাল হেসে স্বদেশ বল্‌লে, "বেশ ত, চলুন না! কতর সিটে যাবেন?"

—"আট আনা, কেমন?"

—"দুর্ মশাই আট আনা! ভাল ফিল্ম দেখ্‌ব তো ভাল সিটে বসে। সেকেণ্ড ক্লাশের দু'খানা বুক্ করে রাখুন আগে থেকে। কি, ভাবছেন যে! টাকা?"

অরুণ একটু বিদ্রুপের হাসি হাস্‌লো। ট্যাক থেকে দশটাকার নোটটা বের করে অরুণের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে স্বদেশকুমার বড়লোকী মেজাজে বল্‌লে—"এই নিন।"

কথাটা অরুণের বিশ্বাস হ'ল না। নোটটা কুড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে—"সত্যি দিচ্ছেন তো?"

—"আলবৎ" ব'লে স্বদেশ ঘরের দোর ভেজিয়ে দিলে। সিঙ্গেল সিটেড্ রুম্, আর ভয় কি? স্বদেশ ট্যাক থেকে মোড়কটা বের করে দেখ্‌লে।

বাঃ, এ একেবারে খাঁটি সোনা! অনেকক্ষণ এপিঠ ওপিঠ করে দেখে, স্বদেশ যত্ন করে বাক্সে তুলে রাখ্‌ল।

রাত ৯টার সময় স্বদেশ আর অরুণ বায়স্কোপ দেখে ট্যাক্সি করে হোষ্টেলে ফির্‌ল। কিন্তু এত বড় আনন্দকে স্বদেশ কিছুতেই চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছিল না।

অরুণ ট্যাক্সির ভাড়া দিতে গেল, কিন্তু স্বদেশ তাকে কিছুতেই দিতে দিলে না। ব্যাপার কি! অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—"আজ বাড়ী থেকে টাকা পেয়েছেন বুঝি।"

—"টাকা, হাঁ হাঁ।" হাস্‌তে হাস্‌তে স্বদেশ অরুণের হাত ধরে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে দোর ভেজিয়ে দিলে।

—"সে কি, মার্‌বেন নাকি?" স্বদেশ বল্‌লে—"অরুণবাবু, একটা জিনিষ দেখুন তো এর দাম কত হতে পারে?"

বাক্স থেকে সোনার তালটা বের করে দূর থেকে সেটাকে দু'হাতে নাচাতে নাচাতে স্বদেশ বল্‌লে—"বলুন না অরুণবাবু, চুপ করে রইলেন যে। চুরি করিনি। দাম দিয়েই কিনেছি।"

স্বদেশের হাত থেকে সোনার তালটা হাতে নিয়েই অরুণ যেন কেমন আঁৎকে উঠ্‌ল। 'সোনা!'

—"হ্যাঁ মশাই সোনা! মাত্র কুড়ি টাকায় কিনেছি; বিশ্বাস হয়?"

—"আপনি মরেছেন স্বদেশবাবু। এত বোকা আপনি? সোনা কোনো দিন এত হাল্কা হয়? এ নিশ্চয় পেতল, নয় অন্য কিছু—সোনার কলাই করা। 'মাই গড্' আপনি নিশ্চয়ই জোচ্চোরের হাতে পড়েছিলেন। সর্ব্বনাশ করেছেন!"

মুহূর্ত্তে স্বদেশের মুখখানা যেন ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল—"অ্যাঁ, আপ্‌নি বলেন কি অরুণ বাবু!"

ঘরের এক কোণে কয়েকখানা বারবেলের ডিস্ক পড়েছিল। অরুণ একটার উপর তালটা রেখে আর একখানা দিয়ে সজোরে এক ঘা মারতেই সেটা দু' টুক্‌রো হয়ে ছিট্‌কে পড়্‌ল। দু'টুক্‌রোই পেতল, স্বদেশ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

—"ছিঃ ছিঃ ছিঃ স্বদেশবাবু, আপনি করেছেন কি?"

কাঁদ কাঁদ হয়ে স্বদেশ বল্‌লে, "আমায় সবাই বোকা বল্‌তো অরুণবাবু, কিন্তু আমি বোকারও অধম! যাক, আপনার পায়ে পড়ি অরুণ বাবু, যা হবার তা তো হয়েছেই, তার ওপর কথাটা যেন আর কারুর কানে না যায়!"

ফুলের ফসল

(শ্রীসুবিনয় রায়)

ফুলমেয়ে—
পারুল
চাঁপা
বেলা
অপরাজিতা
নলিনী

মালী—
যদু
মধু
চুনি
ননী
মতি

প্রথম দৃশ্য

(কল্‌সি, খুর্‌পি নিয়ে বাগানে মালীরা কাজ কর্‌ছে। ফুলমেয়েদের প্রবেশ।

ফুলমেয়েদের গান।
(ফুলমেয়েরা একসঙ্গে গাইবে)

মন কেন হয় এত খুসী বাগানেতে আসি' ?
প্রাণ ভরি যে সুরভি ফুল কুড়াই রাশি রাশি।
ফুল বিলায়ে সবার কাছে, তুষ্‌ব মোরা সবে,
চল না যাই ত্বরা করি', দেরি কেন তবে ?

যদু। আমাদের ঠাট্টা ক'রে বুঝি ঐ গানটা বানিয়েছ ?
পারুল। কেন ?
মধু। আমরা আর বাগানে কাজ কর্‌তে চাই না।
চাঁপা। কেন চাও না ভাই ?
চুনি। এর মত বিশ্রী কাজ আর নাই — একটুও ভাল লাগে না।
বেলা। কেন ভাই ভাল লাগে না ?
ননী। তোমরা কি বুঝ্‌বে তা'র ? তোমাদের কাজ তো হ'লো শুধু ফুল তোলা।
মতি। আয় ভাই, আমাদের গানটা শোনাই।

মালীদের গান— (মালীরা সকলে একসঙ্গে)

মনটা কেন যায়রে দ'মে যেই বাগানেতে আসি ?
এক শ' রকম কাজ যে জ'মে থাকেই রাশি রাশি।
বাছাবাছি খোঁড়াখুঁড়ি কতই কাজের ঠেলা,
গায়ে তাই আসে জ্বর, বাগান করার বেলা।

যদু। আমরা ছুটি নেবো ভাব্‌ছি।
ফুলমেয়েরা। ছুটি নেবে !
মধু। হ্যাঁ ! আমরা এখন আর মালী নই।
মালীরা। আমরা হচ্ছি কাজ-ফাঁকির দল।

মালীদের গান —(মালীরা সকলে একসঙ্গে)

কাজে ফাঁকির দল গো মোরা কাজে ফাঁকির দল,
মিথ্যে কেন কাজের ঠেলা সাম্‌লে চলি বল্‌ ?
এই বারেতে দিয়ে ফাঁকি, দলে বলে সবে,
সারাটা দিন খেল্‌ব সবে কত মজা হবে !

অপরাজিতা। তোমরা মালীর কাজ না কর্‌লে বাগানে কি ফুল ফুট্‌বে না ?
মধু। না, একটাও না।
নলিনী। কি সর্ব্বনাশ !
ফুলমেয়েরা সকলে। বল না মালী ভাই, বল একবার,
এই বাগানেতে ফুল হবে না কি আর ?
মালীরা সকলে। মোরা যে ছেড়েছি কাজ আজ থেকে সবে,
এ বাগানে ফুল তবে কেমনে গো হবে ?
পারুল। তোমরা সবাই দুষ্টু ছেলে !
ফুলমেয়েরা সকলে। দুষ্টু ছেলে !
মালীরা সকলে। ব'য়ে গেল !
('কাজে ফাঁকির দল' গানটি গাইতে গাইতে মালীদের প্রস্থান। কল্‌সি, খুর্‌পি প'ড়ে রইলো)।

চাঁপা। বল না ভাই কি করি এখন ?
বেলা। তাই তো ; কি করা যায় ?

অপরাজিতা। কি আর করা? আমাদেরই এখন বাগানের কাজ চালা'তে হবে।
নলিনী। তা' ছাড়া আর উপায় কি?
পারুল। চল্ ভাই, এখনই কল্‌সি খুর্‌পি নিয়ে কাজে লেগে পড়ি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মালীরা সকলে ছিপ নিয়ে ব'সে মাছ ধর্‌ছে)

যদু। কই ভাই, একটাও যে মাছ আস্‌ছে না।
মধু। না রে, একটাও না।
চুনি। একটা বুড়্‌বুড়িও তো দেখছি না।
ননী। মাছগুলো গেল কোথায়?
মতি। টোপ ভাল না হ'লে কি মাছ আসে? ফুলমেয়েরা বাগানে কাজ আরম্ভ করার পর থেকে টোপের কেঁচোও পাবার জো নেই।
যদু। চুপ্—চুপ্! ফুলমেয়েরা আস্‌ছে।

(কল্‌সি খুর্‌পি নিয়ে ফুলমেয়েরা এসে, মালীদের দিকে একবারও না তাকিয়ে নিজের কাজ কর্‌তে আর গান কর্‌তে লাগ্‌ল)

ফুলমেয়েদের গান।

এক যে ছিল মালীর দল, কুঁড়ে এম্‌নি ধারা,
সব কাজেতেই ধ'রে খুঁৎ, কর্‌ত না কাজ তা'রা।

(এই গানটি গাইতেই মালীরা আস্তে আস্তে চ'লে গেল)

নলিনী। ওরা ভীষণ চটেছে!
অপরাজিতা। কাজে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে ওদের হয়তো আর ভাল লাগ্‌ছে না।
বেলা। আমারও কিন্তু ভাই আর এ কাজ ভাল লাগ্‌ছে না।
চাঁপা। আমারও না! পিঠ যেন একেবারে ধ'রে গেছে।
পারুল। আমার পায়ে ভাই ফোস্কা পড়ে গেছে।
নলিনী। কিন্তু ভাই, ছেড়ে দিলে তো আর চল্‌বে না! আর কিছুকাল আঁক্‌ড়ে থাক্‌লেই মালীরা ঠিক ফিরে আস্‌বে।
অপরাজিতা। ঐ শোন যদুর শিশ্ শোনা যাচ্ছে—ও নিশ্চয় আস্‌ছে। তোমরা সকলে সরে যাও. আমিই ওর সঙ্গে বোঝাপড়া কর্‌ব।

(সকলে চ'লে গেল; শুধু অপরাজিতা কাজ করতে লাগ্‌ল। যদু 'কাজে ফাঁকির দল' গানটা গাইতে গাইতে এল)

যদু। কে, অপরাজিতা নাকি?
অপরাজিতা। এই যে, যদু যে! কাজ ফাঁকির দলের খবর কি?
যদু। খবর ভালই।

(বাগানের ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে আবার বল্‌ল, বেশ সুন্দর গোলাপফুল ফুটেছে তো!)

অপরাজিতা। বেশ, ব'লে বেশ! এয়া এয়া ফুল! চমৎকার দেখ্‌তে; ভুর্-ভুরে সুগন্ধ—আবার সময়ের এক হপ্তা আগেই ফুটে উঠেছে।

(যদু গালে হাত দিয়ে গম্ভীর হ'য়ে কি যেন ভাবছে)

অপরাজিতা। কি হয়েছে ভাই? (ব্যস্ত ভাবে) শরীর ভাল নেই?
যদু। কাজে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে যেন কি রকম লাগ্‌ছে;—গা ম্যাজ্ ম্যাজ করছে, ঘুম পাচ্ছে (হাই তোলা); উৎসাহ যেন মোটেই নাই কোন কাজে—আমাদের কা'রও নাই।
অপরাজিতা। তবে ভাই, বাগানে এসে কাজ কর না কেন? আমরা তো জানিই শুধু শুধু ঠাট্টা কর্‌ছিলে তোম্‌রা।
যদু। ঠিকই বলেছ ভাই! এক্ষুনি সবাইকে ডেকে আন্‌ছি।
অপরাজিতা। আমিও গিয়ে মেয়েদের ডেকে আন্‌ছি।

(অপরাজিতা আর যদু চ'লে গেল। তার পরই মালীরা আর ফুলমেয়েরা দু'দিক দিয়ে এসে হাজির হ'লো)

যদু। ফুল মেয়েদের হ'লো কি?
মালীরা সকলে (উৎসাহভরে)। দেখ চেয়ে, ফুল মেয়ে হাসিমুখে যায়, আনন্দে বিলায়ে ফুল তুষিয়ে সবায়।
অপরাজিতা। মালীদের কি হ'লো?
ফুলমেয়েরা সকলে (উৎসাহভরে)। হাসিমুখে খাটে দেখ মালীদের দল, ফসলের কাজে এরা হবে গো সফল।

(এক একজন ফুল মেয়ে এক একজন মালীর হাত ধরে, পাঁচটি জোড়া হবে। তারপর, ফুল মেয়েদের প্রথম গানটি গাইতে গাইতে অর্দ্ধেক ছেলেমেয়ে একদিকে, অর্দ্ধেক অন্যদিকে চ'লে যাবে)

ভাগ্যিস্

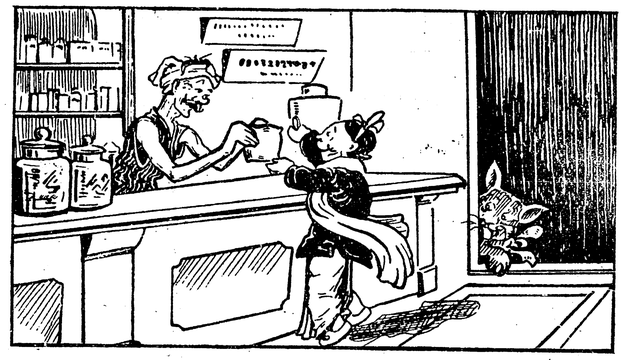

একটি ঠোঙা মিষ্টি কিনে বড্ড খুসী হাবু,
ভাব্‌ছে বাঘা কাড়্‌বে ঠোঙা, কর্‌বে তারে কাবু।

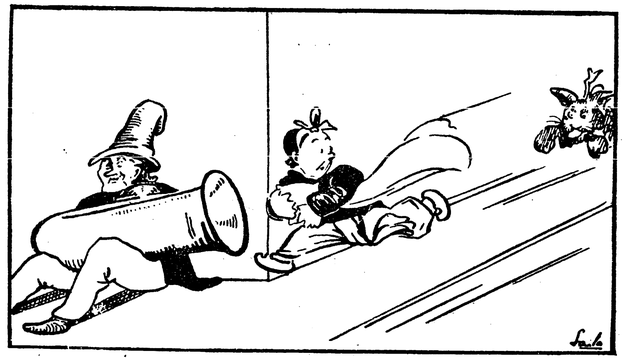

প্রমাদ গ'নে ছুট্‌ছে হাবু, বাঘাও ছোটে পিছু,
ঠেক্‌বে যে কে কোথায় গিয়ে, কেউ জানে না কিছু।

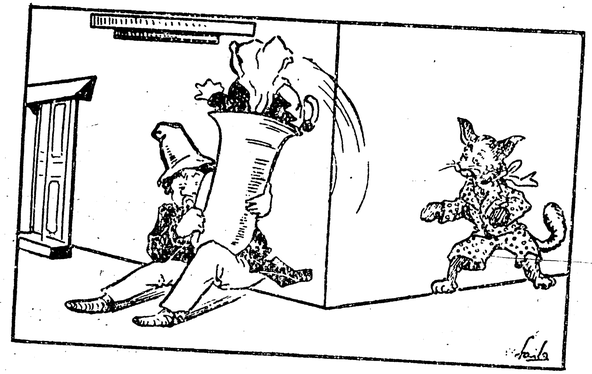

ব্যাণ্ড-বাজানার চেঙায় হাবু পড়্‌ল গিয়ে শেষে,
চম্‌কে জেগে বাজন্‌দারও বাজ্‌না ফোঁকে ঠেসে।

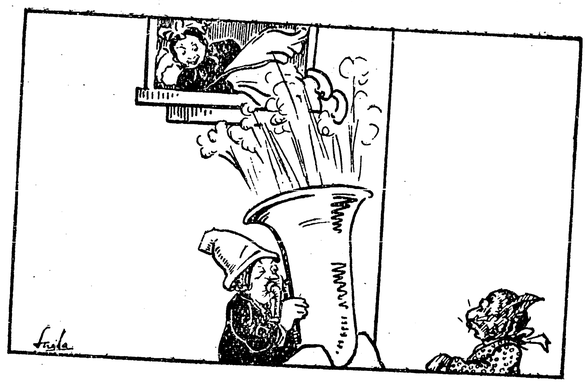

বুড়ো মিঞার ফুস্‌ফুসেরই দারুণ ফুঁ-এর তোড়ে,
ছিট্‌কে হাবু পৌঁছে গেল দোতালারই ঘরে।

যাদুকরের কুত্তা

(শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী)

রণপতি যে মস্ত বড় ম্যাজিসিয়ান তা কে না জানে? দেশজোড়া তার খ্যাতি, সবার মুখে মুখে তার নাম। সে নাকি কামরূপ কামাখ্যায় গিয়ে নানারকম আশ্চর্য্য ভোজবাজী শিখে এসেছে। শুধু তাই নয় আমেরিকায় গিয়ে সে ভেন্‌ট্রিলোকিজম্‌ও শিখে এসেছে। 'ভেন্‌ট্রিলোকিজম্‌' কি জান না বুঝি? 'ভেন্‌ট্রিলোকিজম্‌' এক রকম যাদুবিদ্যা—এতে শুধু মুখের সাফাইয়ের দরকার। ভেন্‌ট্রিলোকিজমের সাহায্যে মুখ বন্ধ করেও নানা রকম স্বরে কথা বলা যায়। দর্শকরা ভাবে বুঝি বা ভুতুরে কাণ্ড।

রণপতি প্রসিদ্ধ যাদুকর, দেশজোড়া তার নাম, সব মেনে নিলাম; কিন্তু শুধু মেজিক দেখিয়ে তো আর পেট চলে না। একেই লোকের টাকা কড়ির অভাব, তারা নিজেরাই কষ্টে শিষ্টে সংসার চালায়, তাই রোজ রোজ কেই বা ইচ্ছা থাকলেও পয়সা খরচ করে ম্যাজিক দেখে?

বাজার মন্দা! কেউ ম্যাজিক দেখতে ডাকে না,—রণপতির ভারি মুস্কিল হ'ল। অভাবে পড়ে সে টেবিল, চেয়ার, ঘটি, বাটি সবই বেচে দিল। কিন্তু তাতে আর কতদিন চলে! শেষে একদিন রণপতির সব ফুরিয়ে গেল। ঘরে তার একমুঠো চাল নেই, পকেটে একটাও পয়সা নেই, অথচ ক্ষিদের জ্বালায় তার পেট চোঁ চোঁ করছে; দুদিন সে কিছু খায় নি।

ঘরে একটা চৌকীর উপর শুয়ে রণপতি কড়িকাঠ গুণতে আরম্ভ করে দিল—কি করা যায়। হঠাৎ তার মাথায় এক মতলব এলো। যাঁহা ভাবা তাঁহা কাজ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পরিষ্কার জামা কাপড় প'রে, তার কুকুর ভুলোকে নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল শিষ দিতে দিতে।

রণপতি চলেছে, সঙ্গে তার ভুলো কুকুর। রণপতির আনন্দ আর ধরে না। পথে যেতে যেতে রণপতি দেখল, রাস্তার বাঁ পাশে একটা মস্ত বড় সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—"পবিত্র হিন্দু হোটেল (সুলভ ভোজনাগার)।"

সাইন বোর্ডে হিন্দু হোটেল লেখা থাকলেও, বন্দোবস্ত সব সাহেবী ধরণের,

দিব্বি টেবিল চেয়ার পাতা, ফ্যান ঘুরছে অনবরত। হিন্দু হোটেল হ'লেও চপ কাটলেট সেখানে চ'লে থাকে, অনেক অহিন্দুরাও খায়। যাই হোক, ভুলোকে সঙ্গে নিয়ে রণপতি হোটেলে ঢুকে প'ড়ে কোণের দিকে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসল, কুকুরটা টেবিলের নীচে রইল।

হোটেলের বয় এসে সেলাম করে বলল, "কি চাই হুজুর?" রণপতি একটু হেসে কুকুরটাকে জিজ্ঞাসা করল, "কিরে ভোলা, কি খাবি?" টেবিলের নীচ থেকে কে যেন বলে উঠল, "পাঁঠার ঠ্যাং আর মাংস।" রণপতি বলল—"ওহে, কুকুরের জন্য খানিকটা পাঁঠার মাংস, আর আমাকে কিছু মাংস আর রুটি এনে দাও।"

হোটেলের বয় বা চাকর এতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল আশ্চর্য্য হয়ে। সে ভাবছিল, কলিকালে হোল কি,—কুকুরেও কথা বলে! তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে টেবিলের নীচ থেকে কে যেন ধমক দিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি কর, হাঁ করে দেখছ কি,—ক্ষিদেয় যে নাড়ি ভুড়ি হজম হবার জোগাড় হয়েছে।"

বয় কিছুক্ষণ বাদে নির্দ্দিষ্ট খাবার এনে বলল, "কুকুরকে কোথায় দেব হুজুর?" টেবিলের নীচ থেকে কে যেন রেগে বলে উঠল—"কেন? টেবিলের নীচে দাও আমার মাংস।" হোটেলে আরও অনেকে খাচ্ছিল; তারা কাণ্ডকারখানা দেখে তো অবাক! তাজ্জব ব্যাপার! কুকুরেও যে কথা কয়।

ব্যাপার শুনে হোটেলের মালিক ভুঁড়ি দুলিয়ে এসে হাজির হয়ে, রণপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মশাই, শুনলাম নাকি আপনার কুকুরটা কথা কয়!" টেবিলের নীচ থেকে কে যেন বলে উঠল—"আঃ খাবার সময় বিরক্ত কোরো না আমায়।"

হোটেলওয়ালা আশ্চর্য্য হয়ে বলল,—"কি চমৎকার! এর আগে কখনও এ রকম শুনিনি। মশাই কুকুরটা বিক্রী কোরবেন? কুড়ি টাকা দিতে রাজি আছি।"

হোটেলওয়ালা লোকটা ছিল ভারি লোভী। সে ভাবল, কুকুরটাকে কিনে সে কুকুরের কথা বলা শুনিয়ে অনেক রোজগার করবে। রণপতি কিন্তু তার চেয়েও চালাক। সে বলল,—"না মশাই, কুকুর আমি বেচবো না।"

হোটেলওয়ালা বলল,—"দেখুন পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি।"

টেবিলের নীচ থেকে কুকুরটা বলে উঠল,—"আমায় বিক্রী কোরো না বলে দিচ্ছি।" রণপতি একটু মাথা চুলকে বলল, "দেখুন কুকুরটা এতদিনের, তাছাড়া সবই বোঝে।" হোটেলওয়ালার তখন ঝোঁক চেপে গেছে, এ কুকুর তার চাই-ই চাই।

তাই সে বলল,—"শেষ কথা বলে দিচ্ছি মশাই, একশো টাকার চেয়ে এক আধলা বেশী দিতে পারবো না।"

কুকুরটা এবার টেবিলের নীচ থেকে আর্ত্তস্বরে বলে উঠল,—"দোহাই প্রভু, দুটী পায় পড়ি তোমার, আমায় বিক্রী কোরো না হোটেলওয়ালার কাছে।" রাগের মাথায় হোটেলওয়ালা বলল,—"দু'শো টাকা মশাই, আর কত চান?"

রণপতি দেখল যে, দু'শোর বেশী চাইলে দাঁও ফস্‌কে যাবে, কাজেই মুখে একটু অনিচ্ছা দেখিয়ে দু'শো টাকাতেই রাজী হয়ে গেল।

গলাটা কান্নার মত ভারী করে রণপতি বলল,—"বিদায়, ভুলো! এখন থেকে আমি আর তোমার মনিব নই, হোটেলওয়ালা তোমার মালিক।"

টেবিলের নীচ থেকে এবার শোনা গেল—"যেমন শুধু টাকার লোভে প'ড়ে তুমি আমায় বিক্রী করে দিলে, আমিও প্রতিজ্ঞা করলুম, আজ থেকে আর আমি কখনও কথা বলব না, এই মুখ বন্ধ করলাম।"

রণপতি দু'শো টাকা নিয়ে বাড়ী চলে গেল। ভুলো কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা রেখেছিল, এজন্মে সে আর কথা কয়নি।

আসলে কিন্তু ভুলো মোটেই কোন কথা বলে নি, ভেন্‌ট্রিলোকিজমের সাহায্যে রণপতিই তার হয়ে বলেছিল। মন্দ নয়, ম্যাজিকের জোরে রাতারাতি দু'শো লাভ!

এক মিনিটের হাসি

একটি মেসের বাসায় কয়েকটি বন্ধু ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। একদিন তারা ঘুম থেকে উঠে একটা মোটা খাম পেল, তাতে প্রত্যেকের নামে একটি করে থিয়েটারের টিকিট ছিল। চিঠিতে কে পাঠিয়েছে তা লেখা ছিল না; শুধু লেখা ছিল, "কে পাঠিয়েছে রাত্তিরে জানতে পারবে।"

সন্ধ্যাবেলা সকলে পোষাক পরে থিয়েটারের টিকিটের সদ্ব্যবহার করতে গেল। রাত্রে থিয়েটার থেকে ফিরে দেখল প্রত্যেকেরই জিনিষপত্র ছত্রাকার; কারুর আংটি নেই, কারুর বা মনিব্যাগ হারিয়েছে, কারুর বা সোনার বোতাম উধাও হয়েছে। টেবিলের উপর একটা কাগজে লেখা রয়েছে,—"কে টিকেট পাঠিয়েছিল বুঝলে তো!"



(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

পাঁচ

হানাবাড়ী

এই ঘটনার প্রায় দশ বারো বছর পরে, আজ কলম ধ'রে, সহায়রামের বাল্য-জীবনের গুটি কয়েক কথা যখন বল্‌তে বসেছি, তখন রায়েদের সেই হানাবাড়ীর ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। রায়পুরের প্রত্যেক বাড়ী, প্রত্যেক মাঠ, প্রত্যেক পুকুর ছিল আমার বন্ধু, আমার প্রিয়। সমস্ত রায়পুর যেন আমার স্নেহে জড়িয়ে ছিল; কাজেই রায়পুরের কাহিনী লিখ্‌তে বস্‌লে, ছবির মত আজও তার প্রত্যেকটি ঘটনা আমি চোখের সামনে দেখতে পাই।

যাক, সে কথা।

হানাবাড়ীর চারিদিক ঘিরে বিরাট প্রাচীর, মধ্যে মধ্যে দু' এক জায়গায় ধ্বসে পড়েছে, এখনও মেরামত করবার মতলব দেখছি না কারও। জমিদারদের কেউই নেই, বংশ তাদের লোপ পেয়েছে, কেমন করে তা আমি ঠিক জানিনে। শুনেছি, সমস্ত সম্পত্তিটা নাকি ট্রাষ্টিদের হাতে আছে, তাদেরই মাইনে-করা ভোজ-পুরী দারোয়ানরা বাড়ীটা পাহারা দেয়। কিন্তু সে দিনের বেলা; সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলেই সবাই বাইরের মস্ত বড় দেউড়ীতে প্রকাণ্ড এক তালা লাগিয়ে চম্পট দেয়; কাজেই তেমন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবার চাড় কারও নেই। ঈশান বাবু ট্রাষ্টিদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলে সব ঠিক করলেন, দারোয়ানরা সেদিন দিনের বেলাও আর এলো না।

ফটক থেকেই একটা সোজা রাস্তা চলে গেছে দালান অবধি। চারদিক ঘিরে যে বাগান ছিল আজ তার চিহ্নও নেই। আমরা সেই রাস্তা ধরে দালানে গিয়ে উঠ্‌লাম। সামনেই একটা প্রকাণ্ড বারান্দা। তারপরেই একটা মস্ত বড় ঘর, হলঘর হবে বোধ হয়; দেয়ালে খুব পুরণো পুরণো ছবি —ধূলায় ঢেকে গেছে, তবুও তারই ভেতর থেকে যে চমৎকার রঙের আভা ফুটে বেরুচ্ছে, তাতেই আঁচ কর্‌তে পারছি যে কত দামী, আর কত সুন্দর ছবি সেগুলি।

ঈশান বাবু বল্‌লেন, "তাইত হে, গোড়ায় ভেবেছিলাম, বাগানটায় একটু উনুন কর্‌বার মত জায়গা মিল্‌বে, কিন্তু এ যা অবস্থা দেখ্‌ছি। নাঃ, দরোয়ানগুলি দেখ্‌ছি কেবল ফাঁকিই দেয়।" সবাই মিলে কতগুলি ইট জোগাড় করে এনে উনুন কর্‌লাম, তারপর এক একজনকে এক এক কাজ দেওয়া হলো। একদল গেল রান্নার কাজে, আর একদল কুট্‌নো কুট্‌তে লাগলো, আর একদল জল আন্‌তে লাগলো। আমি কেবল পালাবার সুযোগ খুঁজতে লাগ্‌লাম। যখন সময় হ'লো, তখন আর সহায়রামকে খুঁজে পাই না। সামনে দিয়ে বেড়িয়ে গিয়ে বাড়ীটার চারিদিকে একবার ঘুরে এলাম, এক জায়গার দেয়ালটা একেবারে পড়ে গেছে। পেছনে দেখলাম ভীষণ জঙ্গল হয়েছে। ঘুরে দালানের পিছন দিকে উঠলাম। বাড়ীটার অন্যদিকে ছেলেরা হৈ চৈ করছে কিন্তু এজায়গাটা কি রকম নির্জ্জন!—বড় বেশী নির্জ্জন, কোন দিকে একটু টু শব্দটিও নেই। সর্ব্বত্র যেন কেমন একটা থমথমে ভাব। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ কর্‌তে লাগ্‌লাম, সারা বাড়ীটার এই বিষণ্ণ মূর্ত্তি আমার মনে ভয় জাগিয়ে দিল। আস্তে আস্তে গিয়ে দালানে উঠ্‌লাম।



সামনের মতই একটা বারান্দা, তার পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট সরু গলির মত রাস্তা যেন এপাশ থেকে ওপাশ গেছে। দোতালায় যাবার সিঁড়ির পথ ভেবে ঢুক্‌তে যাবো হঠাৎ কেমন যেন একটা বিশ্রী শব্দ! চমকে উঠ্‌লাম, পিছনে হেঁটে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর একবার বেশ ভালো করে শুন্‌লাম। কই, কোন কিছু নয় তো! আবার সেই আঁধার-ঘেরা রাস্তায় ঢুক্‌তে গেলাম, হঠাৎ পরিষ্কার শব্দ হলো—খট্‌-খট্‌-খট্‌।

এই হানাবাড়ী, চারিদিকের এই প্রেতমূর্ত্তি, তার বুক চিরে এই আঁধার-ঘেরা ছোট্ট পথ, তার মধ্যে এই অদ্ভুত ভূতুড়ে শব্দ, খট্‌-খট্‌-খট্‌। সারা শরীর শিউরে উঠ্‌ল। আঃ, এখন যদি সহায়রাম থাক্‌তো!

হঠাৎ মনে হ'লো, সেই আঁধারের মাঝখানে কে একজন যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। —আব্‌ছায়া আব্‌ছায়া মূর্ত্তি, কেবল পরণের সাদা কাপড়টা···এই কি সেই ভূত! ওকি!—গান গাইছে, গুণ গুণ করে! আবার মধ্যে মধ্যে দেয়ালে হাত লাগিয়ে কি দেখছে কে জানে? কিন্তু এতো ভূত নয়। ভূতে কি কাপড় পরে! কি ভেবে চোখ বুজ্‌লাম। চোখের সামনে জেগে উঠ্‌ল এক কঙ্কাল, —মাথা থেকে আরম্ভ করে পায়ের নখ পর্য্যন্ত কেবল হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। ভয়ে একটু সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু···কিন্তু এতো ভূত নয়;—এই আমাদের রহস্যের মূল সূত্র; একে ছাড়লে আমাদের আসাই বৃথা হয়ে যাবে। ছেলেদের ডেকে আনবো? কিন্তু এর মধ্যে যদি পালিয়ে যায়? আস্তে আস্তে সাহসে বুক বেঁধে সেই ছোট্ট গলিতে ঢুকলাম। অন্য দেয়ালটার গা দিয়ে আস্তে আস্তে সেই লোকটার দিকে এগোতে লাগ্‌লাম। হঠাৎ শব্দ হলো খট্‌-খট্‌-খট্‌। দাঁড়িয়ে পড়লাম, গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়লো, আবার



এগোতে লাগলাম। ঠিক···ঠিক লোকটার ঠিক পেছনে দাঁড়ালাম। পারবোনা ···পারবোনা কি জোরে? একবার ভালো করে সমস্ত শরীরটার দিকে চেয়ে দেখলাম;—বুক একটু ফুলিয়ে নিয়ে লোকটার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। লোকটা হঠাৎ এই বেগ সামলাতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আমি তার বুকের উপর চেপে বসলাম। হঠাৎ নীচের লোকটা গোঁ গোঁ করে উঠ্‌ল; বল্‌ল, "ছাড় ছাড় রমেন"।

তাইতো এ যে সহায়রাম!

ছয়

সহায়রামের আবিষ্কার

আমি বিস্ময়ে হয়তো চীৎকার করে উঠ্‌তাম, সহায়রাম ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকিয়ে জানাল, 'চুপ'। আমি চুপ করলাম, কিন্তু বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না, এত বড় বাড়ীটার এতগুলি ঘর থাকতে সে এখানে কি কর্‌তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন নতুন রহস্যের সন্ধান সে পেলো কি?··· হানাবাড়ীর সেই ভূতের খবর সে কি কিছু জানতে পেরেছে? উদ্বেগে তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে আমার হাত ধ'রে বল্‌ল, "রমেন সাবধান, কেউ যেন টের না পায়। আমি হলপ্ করে বলতে পারি, সত্য যা বলেছে সে তার থেকে নিশ্চয়ই অনেক কিছু বেশী জানে। এখানে যে ভূতকে তোমরা ঘুর্‌তে দেখেছ, আমার মনে হয় তার আসল খবর সত্যর কাছে অজানা নয়; সে নিশ্চয়ই জানে হঠাৎ এই সুদূর রায়পুরে কেন এক ছায়া মূর্ত্তির আবির্ভাব হলো। সব জেনেও যে সে কেন কিছু বলতে চায় না তাই আমি জান্‌তে চাই।—আয়।"

বাড়ীটার চারিদিক্ ঘিরে যে সখের বাগান ছিল, সে বাগান আজ আর নেই। সেখানে ছোটবড় লতাগাছ হয়েছে। তেমন যত্ন নেওয়া হয় না; দারোয়ানেরা মধ্যে মধ্যে ঘাস কেটে বিক্রী করে, তা না হলে এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে হয়ত সেখানে একটা জঙ্গল হ'য়ে যেতো। দূরে দূরে ছোট ছোট লতা গুল্মের ঝোপঝাড়, সহায়রাম বেরিয়ে এসে সেই ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে চল্‌ল। দুদিকে ছোট ছোট ঝোপ—কোথাও কাঁটাগাছ, কোথাও ফুলের চারা; মস্ত মস্ত গোসাপগুলো এক ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে ছুটে ছুটে যাচ্ছে। সে আমার হাত ধরে টেনে

এনে দেয়ালের অন্য একটা ফাঁক দিয়ে বাইরের রাস্তায় পড়্‌লো; বল্‌ল, "দেখ্‌ছিস?"

আমি অবাক হয়ে বল্‌লাম, "কি দেখবো?"

"সে কিরে?" ব'লে সে আমরা যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সে পথটা দেখালো; দেখ্‌লাম, একটা ইলেক্‌ট্রিকের তার সেখানে মাটী থেকে উপরে উঠেছে, তারপর দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে; তা'রই একটা ধরে আমরা আবার ভেতরে ঢুকলাম। সহায় বল্‌ল, "এই তারটাই তোমার সেই ছোট রাস্তা দিয়ে গেছে, গিয়ে দেয়ালে ঢুকে গেছে, এখন দেখা যাক্ অন্য দিক কোথায় যায়।

ডান দিকের তারটা ধরে আমরা চল্‌তে লাগ্‌লাম, কদ্দুর গিয়ে সে তারটা মাটীর ভেতর ঢুকে গেছে। সহায় নিরাশ হয়ে বল্‌লো, "নাঃ, শত্রু এখানে আমাকে হারিয়েছে, কিন্তু রমেন একটা জিনিষ আমি পেয়েছি। এ বাড়ীতে যে কেউ এসে লুকিয়ে থাকে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, তোমাদের ভূত বাপু কিছু নয়। কিন্তু, কিন্তু, মুস্কিল হ'ল এই কঙ্কাল নিয়ে—সেই কঙ্কাল এলো কোত্থেকে?"

আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা সহায়রাম, তুমি কি জানতে, ঐ যে কঙ্কালই হোক্ আর যাই হোক্,—যে নাকি দু'দিন আগে আমাদের স্কুলে এসেছিল,—তার সঙ্গে সত্যর যোগ আছে?" —"নিশ্চয়ই! কিন্তু কথা হ'লো এই যে, সে কি ওর দলে না বিপক্ষে? বিপক্ষেই মনে হয়।

"তা না হলে তার এখানে আসার মানে কি?" ব'লে সে একটা আঙুল তার ঠোঁটে লাগিয়ে খানিক ভেবে বললো, "হ্যাঁ, আর একটাও হ'তে পারে, কিন্তু তার কারণ বের করা বড় মুস্কিল।—ছেলেদের ভূতের ভয় দেখানো···। রমেন, রায়পুরে শিগ্‌গিরই সাংঘাতিক কিছু ঘটবে তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাক।" আমি তার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভূত দেখানোর একমাত্র কারণ হলো, এবাড়ীতে ডাকাতের দল থাকা। তাহলে তারা আজ গেল কোথায়, তাদের সাজ সরঞ্জামই বা কই! বল্‌লাম, "কিন্তু—"

সে হঠাৎ পাশের একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সেই গাছের পাতার রং, আগা, ডাঁটা বোঁটা সব বিষয়ে গভীর আলোচনা আরম্ভ করে দিলো। আমি অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম, কিন্তু কারণ বুঝতে দেরী করতে

হ'লো না। আমার পিছন থেকে সত্য আমার দিকে এগিয়ে এলো ; বললো,—"বোটানী পড়া হচ্ছে বুঝি সহায়দা ?"

সহায় মৃদু হেসে বললো, "হ্যাঁ, এত গাছ তো আর এক জায়গায় পাওয়া যায় না, তা ছাড়া এ একেবারে একাধারে বোটানিকেল আর জুওলজিকেল (Zoological) গার্ডেন কিনা, ঐত পাশের ঝোপে দু'টো নেউলের বাসা, পাঁচটা ছোট ছোট ছানা হয়েছে। ঐ যে দূরে বড় ঝোপটা দেখছো, তার ভেতরে একটা মস্ত বড় সাপের গর্ত্ত, বোধ হয় গোখ্‌রো কিম্বা অন্য কিছু হবে। ঐ যে মস্ত বড় গাছটা দেখছো যার পাতা কতকটা আম গাছের মত, তার ডালে আছে মস্তবড় একটি পাখীর বাসা, তাতে ডিম আছে…।"

সত্য বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করলো, "বাস্‌রে, এত খবর এরি মধ্যে জোগাড় করলে কোত্থেকে সহায়দা ?"

"কেন চোখ দিয়ে দেখে। ছেলেরা সব কি করছে ?"

"খেলা-ধূলো, গল্পগাছা ; একদল গেছে জায়গাটার চারিদিক এক্সপ্লোর করতে।"

"তা তোমার ভূতের কোন হদিস্ মিল্‌ল ?" সত্যের মুখ হঠাৎ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেলো, সে ঢোক্ গিলে বললো, "না, না, ভূত … ভূত কিসের ?"

"কেন, যে তোমায় সেদিন তাড়া করেছিলো ?" ব'লে সহায়রাম তার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে তাকালো। সত্য বললো, "চল সহায়দা, ঘরে চলো। এখানে এই জঙ্গলে দাঁড়াতে আমার ভয় কচ্ছে।"

"বেশ চলো।"

আমরা বাড়ীর সিঁড়িতে পা দিয়েছি মাত্র, অজয় ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে এসে হাজির, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "সহায়দা সহায়দা,…শীগ্‌গির এসো, শীগ্‌গির এসো,…নতুন খবর, নতুন খবর আছে।"

"কোথায় ?—কোথায় রে ?"

"স্কুলে। এ—সো।" ব'লেই অজয় আবার স্কুলের দিকে ছুট দিলো। সহায় সত্যর দিকে চেয়ে বললো, "সত্য তুমি স্যরকে বলে দিও আমরা স্কুলে গেছি এক্ষুণি আসবো। আয় রমেন।"

আমরা অজয়ের পেছনে পেছনে ছুটলাম।

—(ক্রমশঃ)

ছোট্ট-বেলায়

(শ্রীসুবিনয় রায়)

পৃথিবীর পশুরা কত রকমের খাবার খায় তা'র হিসাব রাখ্‌তে হ'লেই মুস্কিল। কেউ খায় ঘাস, কেউ খায় বীজ, কেউ খায় পাতা, কেউ খায় ফল, কেউ খায় শিকড়, কেউ খায় ছাল, কেউ খায় পোকা-মাকড়, কেউ খায় মাংস, কেউ খায় মাছ, কেউ খায় ডিম। মানুষ কিন্তু সবই খায় ;—তা'র আর কিছুই বাদ যায় না। ওষুধের হিসাবে মানুষ লোহা-লক্কড়ের মত জিনিষও অনেক-কিছু খায়।

কিন্তু যদি খুব ছোট-বেলার হিসাব নেওয়া যায় তা'হলে দেখা যাবে যে, সব পশুরই খাদ্য এক। ছোট্টবেলায় সকলেই দুধ খায়। মানুষের খোকাখুকিরা যদি দুধ খেয়ে বড় হয়, অন্যান্য জীবেরাই বা হবে না কেন? হিংস্র বাঘ আর সিংহ, তারাও ছোটবেলায় দুধ খেয়েই বাঁচে। ছোট থেকে বড় সব পশুই ছেলেবেলায় দুধ খেয়েই 'মানুষ' হয়।



দু'টি ভালুক ছানাকে দুধ খাওয়াতে নিয়ে চ'লেছে

চিড়িয়াখানায় যে সব জন্তু পোষা হয়, তা'দের ছোট ছানাদের অনেক সময় দুধ খাওয়াতে হয়। অনেক সময় ছোট ছানাই ধরে আনা হয় ; তাদের মাকে হয়তো ধরাই যায় নি, অথবা তা'কে খুঁজেই পাওয়া যায় নি, বা মারাই গেছে। এ রকম অবস্থায় তা'দের জন্য দুধের

ব্যবস্থা ক'রে বোতলের সাহায্যে সেই দুধ খাওয়ান হয়। কারো জন্য গরুর দুধ, কা'রো জন্য ছাগলের দুধ, কা'রো গাধার দুধ বা ঘোড়ার দুধ — এ রকমের অনেক দুধের ব্যবস্থা করতে হয়। কা'রো আবার শুধু দুধ সয় না; তা'কে পাতলা জল-মিশান দুধ বা ওষুধ-মিশান দুধ খাওয়াতে হয়।



হাতীর বাচ্চা কড্‌লিভার অয়েল মিশান দুধ খাচ্ছে।

নিতান্ত ছোট জন্তু হ'লে তা'কে বোতলে খাওয়ান যায় না; তা'র জন্য পল্‌তে বা ছোট ওষুধ-ঢালা Dropperএর ব্যবস্থা করতে হয়; — তা'র সাহায্যে ফোঁটা ফোঁটা দুধ খাওয়ান হয়। আবার, খুব বড় জন্তু হ'লে (যেমন, হাতী, হিপ্পো ইত্যাদি) তা'র জন্য বড় বোতলের ব্যবস্থা করতে হয়। এক একটা হিপ্পোপটেমাসের বাচ্চা ২০।২৫টা ছাগলের দুধ একদিনে খেয়ে শেষ করে। একটা হাতী তা'হলে কতটা দুধ খাবে আন্দাজ ক'রে দেখ! সুখের বিষয়, হাতীর বাচ্চার খাবার ক্ষমতা শরীরের তুলনায়, হিপ্পোর বাচ্চার চেয়ে অনেক কম।

মাঝারি আকারের জন্তুদের (যেমন সিংহ, বাঘ, ভালুক) সাধারণ বোতলেই (Feeding Bottle) দুধ খাওয়ান হয়। সিংহের ছানাকে বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছে ছবিতে দেখ। যেন কতই ভালমানুষ! কোণায় আরেকটি ছানা শুয়ে আছে; — নিরীহ ভাল মানুষটি! এরাই কিন্তু বড় হ'লে মাংস ছিঁড়ে খাবে, এক থাবায় দফা শেষ ক'রে দেবে।

ছোট জন্তুরাও বোতলে দুধ বেশ আরাম ক'রেই খায়। কাঠবেড়ালীকে



সিংহের ছানা দুধ খাচ্ছে

দুধ দিলে সেও দিব্য আরামে শুয়ে দুধ খাবে। কুকুর বেড়াল এরা তো অনেক সময়েই বোতলে দুধ খেয়ে 'মানুষ' হয়।



বাদলা রাতে

(শ্রীদেবব্রত রায় চৌধুরী, এম্-বি)

১৯২৪ সালে গরম পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেহারের অনেক জেলায় কলেরা রোগের মহামারী হয়েছিল। কলেরার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য বেহার সরকার অনেকগুলি ডাক্তার নিযুক্ত করেছিলেন। আমি ঐ রকম একটী কাজ নিয়ে মজঃফরপুর জেলায় যাই। যাতে কলেরা না বাড়তে পারে তার জন্য চেষ্টা করা, গ্রামবাসীদের কলেরার বিষয় বক্তৃতা দেওয়া, আর যতদূর পারা যায় কলেরা রোগীদের চিকিৎসা করা, এই গুলি আমাদের কাজ ছিল। সেই কয়েক মাসের মধ্যে হাসি আর দুঃখের অনেক দৃশ্য দেখেছিলাম; তা'র মধ্যে একটা ঘটনা একটু আশ্চর্য্য রকমের, সেটাই আজ বলছি।

সেবার ওদিকে খুব বেশী বৃষ্টি হয়েছিল। যেদিনকার কথা বলছি সেদিন আমি মজঃফরপুর সহর থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে, দ্বারভাঙ্গা-মজঃফরপুর সদর রাস্তার উপর, গয়ঘট্টি বলে একটী ছোট্ট জায়গার ডাকবাংলায় ছিলাম। আমার সঙ্গে মিথিলা দেশবাসী দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ করা একটী ডাক্তার ছিলেন আর একদল 'গ্যাং মেন' (Gang men) ছিল। এখানে 'গ্যাং মেন্' মানে এক দল লোক, যারা কূয়া, পুকুর, নালী নর্দ্দমা, পরিষ্কার করত, কলেরা জীবাণু নাশক ওষুধ ছিটাত, আর ঘরে ঘরে কলেরার ওষুধ বিলিয়ে বেড়াত। তাছাড়া একটী এক্কা গাড়ীও এসেছিল, এতে করে আমরা ওষুধ পত্র বোঝাই করে এনেছিলাম। সেই দিন আমাদের প্রায় ১২ মাইল দূরে একটা গ্রামে যেতে হবে। এই ১২ মাইলের অর্দ্ধেকটা সদর রাস্তা দিয়ে গিয়ে, বাকী অর্দ্ধেক কাঁচা রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। সকাল থেকে আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা ছিল, আর অবিরাম বৃষ্টি আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করে আমরা সদলবলে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামটীতে পৌঁছে, কাজ সেরে ফিরতে, প্রায় ৫টা বেলা হয়ে গেল। দুপুরের দিকে বৃষ্টি একটু কমলেও, বিকেলের দিকে আবার জাঁকিয়ে পড়তে সুরু করলে। দেখতে দেখতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি ডাকবাংলা মুখো ফিরতে আরম্ভ করলাম। সেই ৬ মাইল কাঁচা রাস্তা প্রায় শেষ

করে এনেছি, এমন সময় দেখলাম যে একটা নালার ওপরকার পোল ভেঙ্গে গেছে। সেই নালা দিয়ে তখন জলস্রোত ভীষণ গর্জ্জন করতে করতে চলছে। অন্ধকারে ভাঙ্গা পোল কি করে ডিঙ্গিয়ে যাব তারই চিন্তা আমাদের ভাবিয়ে তুল্লে। সকালের খাওয়া দাওয়ার পর আর আমরা কেউ কিছু খাই নাই, কেন না যেখানে কলেরা হয় সেইখানে খাওয়া ঠিক নয় বলে আমরা খাবার নিয়ে যেতাম না। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ক্ষিধে পেটে সারারাত মাঠের মধ্যে পড়ে থাকতে কারো ইচ্ছা ছিল না। সবাই অনেক রকম পরামর্শ করতে লাগল। শেষে আমাদের গ্যাংএর একটী লোক বল্লে, "রাস্তার ডান দিকে খুব কাছেই প্রায় আধ মাইলের ভেতরেই একটা গ্রাম আছে। সেখানে একজন জমিদার থাকেন। সেখানে গিয়ে রাতটার মত আশ্রয় নেওয়া হ'ক। তারপর কাল সকালে যা হয় করা যাবে। সে গ্রামে কলেরাও নেই, সব দিক দিয়ে সেখানে যাওয়াই ভাল।" তখন আমরা এক্কাটাকে সেখানে একটা গাছতলায় রেখে, ঘোড়াটাকে নিয়ে সবাই মাঠ ভেঙ্গে ডান দিকে যেতে আরম্ভ করলাম। সমস্ত জলে ডুবে রয়েছে, কোথাও বা হাঁটু অবধি জল, কোথাও আবার বুক পর্য্যন্ত জল। গণ্ডক আর বাঘমতী নদী উপ্‌চে এই জল এসেছে। বড় বড় মাছ তড়াং তড়াং করে লাফাচ্ছিল। গ্যাংএর লোকেরা বলাবলি করছিল যে এইসব মেঠোজলে মাছ খাবার জন্য মেছো কুমীরও অনেক সময় রাত্রে আসে। আমাদের সঙ্গে মেছো কুমীরের দেখা অবিশ্যি সে দিন হল না। সেই আধ মাইল বড় সর্ব্বনেশে আধ মাইল ছিল। চলেছি তো চলেইছি, কিছুতে যেন আর শেষ হয় না। শুনেছিলাম রাত্রে এই রকম জল ভেঙ্গে যেতে যেতে দিকভুল হয়ে যায় অনেক সময়, তখন সারারাত লোকে গোল হ'য়ে ঘুরতেই থাকে। আমাদেরও সেই দশা হবে নাকি? কিম্বা এই রকম অজানা পথে চলতে চলতে যদি কোনও পুকুর কি খানা, কি কোনও গভীর গর্ত্তের জলের মধ্যে চলে যেতাম আরও বিপদ হ'ত। যা'হোক আমরা খুব সাবধানেই এগুতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে একটা আম বাগানের ভিতর দিয়ে দূরে কতকগুলা আলো মিট্ মিট্ করে জ্বলছে দেখতে পেলাম। গ্রামের কাছে এসে পড়েছি বুঝতে পেরে সবাই দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে লাগলাম।

আম বাগান পার হয়ে অল্পদূর গিয়েই একটা মন্দির দেখতে পেলাম—তারপর আরও কয়েকটী আমগাছের পরই জমিদার মশাইএর বাড়ী। আমরা যেটা প্রথমে

দেখতে পেলাম, সেটা বা'র বাড়ী, তার পেছনে ভেতর বাড়ী বলে মনে হ'ল। সমস্তই পাকা। বা'র বাড়ীর বারাণ্ডায় কয়েকটী লোক বসে ছিল। হঠাৎ আম বাগানের ভেতর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে সেই ঘোর বর্ষায় রাত্রে এতগুলি লোককে আসতে দেখে তারা ভাব্‌লে যে ডাকত পড়েছে। হুড়োমুড়ী করে তারা পটাপট্ ঘরের ভেতর ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে ভেতর থেকে "ডাকু আয়া! ডাকু আয়া!" বলে তার স্বরে চেঁচাতে আরম্ভ করে দিলে। আমরা দেখলাম ভাল বিপদ হ'ল! ওদের চিৎকারে গ্রামসুদ্ধ লোক এসে যদি মারামারি আরম্ভ করে দেয় তো আরও চমৎকার কাণ্ড হবে! এমন সময় ভেতর বাড়ী থেকে জমিদার মশাই বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাদের দেখেই বুঝতে পারলেন আমরা ডাকু নই। তিনি তার বীরপুরুষদের খুব ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন আর বেরিয়ে আসতে বল্লেন। তারপর আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম, আর কি মুস্কিলে পরেছি তাও বল্লাম। তিনি খুব যত্ন করে আমাদের বা'র বাড়ীতে উঠিয়ে বসালেন। আমার আর ডাক্তার বাবুর জন্য কাপড় জামা আনিয়ে দিলেন। বা'র বাড়ীর একটী ঘরে একটী খাটিয়ায় বিছানা করিয়ে মশারী টাঙ্গিয়ে দেওয়ালেন। আমরা হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে খুব আরাম বোধ করতে লাগলাম। তারপর আমরা দুজনে খাটিয়া দুটীতে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম। জমিদার মশাই সবাইকার খাবার আয়োজন করবার জন্য ভেতরে চলে গেলেন। গ্যাংএর লোকেরা আর কাপড় ছাড়তে পারে নি; তারা পরণের কাপড়ই নিংড়ে শুকিয়ে নিয়ে বারাণ্ডার দুই কোণে ২ দল হয়ে শুয়ে পড়ল। আমাদের ঘরের সামনের বারাণ্ডার ধারে একটী হ্যারিকেন বাতি জ্বলছিল। ঘর থেকে সামনের মাঠ, আমগাছগুলি আর মন্দিরটী অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল।

আমরা দুজনে দুই খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ গল্প কর্‌তে থাক্‌লাম। গ্যাংএর লোকেরা এর ভেতরই নানা জনে নানান্ সুরে নাক ডাকাতে আরম্ভ করে দিয়ে ছিল। আমারও খুব শ্রান্তি বোধ হচ্ছিল—আমিও ঘুমিয়ে পরেছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম বলতে পারি না, হঠাৎ একটা গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখি, পাশের খাটে ডাক্তার বাবুটী গোঁ গোঁ শব্দ করছেন। তাঁকে ছুঁয়ে দেখি যে তাঁর গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আর খুব ঘাম্‌ছে। বাহিরেও এই রকম গোঁ গোঁ করে গোঁঙানির শব্দ আর অনেকের চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিলাম। ডাক্তার বাবুর মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা মারায় আর মাথায় বাতাস করায় তিনি চোখ খুলে

চেয়ে উঠে বসলেন। তখন আমি বাহিরে বারান্দায় গিয়ে দেখলাম যে মেওয়ালাল বলে একজন গ্যাং ম্যান্ অজ্ঞান হয়ে ঐ রকম গোঁগাচ্ছে। পাখা করায়, ঠাণ্ডা জল লাগানয় আর স্মেলিং সল্ট শোকানয় তারও জ্ঞান ফিরে এলো।

ডাক্তার বাবু বল্লেন, "আমার ঘুম হচ্ছিল না, বাহিরের দিকে তাকিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিলাম। এমন সময় দূরে ঐ আম গাছগুলার তলায় পরিষ্কার জামাকাপড় পরা একটি মূর্ত্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পেলাম। রাত্রে অন্ধকার বৃষ্টির ভেতর পরিষ্কার ধব্‌ধবে সাদা জামাকাপড় প'রে কে আম বাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই ভাবছি, এমন সময় দেখি যে মূর্ত্তিটা এই দিকেই এগিয়ে আসছে। তার আসাটা দেখেই আমার ভয়ানক ভয় হ'তে লাগল। সে যেন ভেসে ভেসে চলে আসছিল। মানুষ হাঁটলে যেমন এক পা এক পা করে হেলে দুলে এগিয়ে আসে, এ কিন্তু তেমন করে আস্‌ছিল না। বরাবর এগিয়ে এসে সিঁড়ির কাছে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে উপরে উঠে এল। আমাদের ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ আপনার বিছানার কাছে দাঁড়ায়ে থাক্‌ল। তারপর আমার খাটের কাছে এসে আস্তে আস্তে মশারী উঠাতে লাগল। মশারী তুলে সেটা অনেক ক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। দেখলাম একটি ১৬।১৭ বছরের ছেলের মূর্ত্তি। প্রতিমার মত বড় বড় ভাব-বিহীন চোখ। হাত মুখ সব খড়ির মত সাদা। পরণে পিরাণ আর ধুতিও ধব্‌ ধবে সাদা, মূর্ত্তিটা পাতলা কুয়াসার মত খানিক স্বচ্ছ; তার ভেতর দিয়ে বাহিরের আলো বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। আমার এত ভয় হচ্ছিল যে একটু নড়তে পারছিলাম না, কিম্বা একটু শব্দ করতে পারছিলাম না। ওটা যখন আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল তখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারপর আর কি হয়েছে জানি না। মেওয়ালাল শুধু বল্লে যে সে দিব্বি আরামে ঘুম দিচ্ছিল। হঠাৎ কে যেন তার বুকের উপর চেপে বসে তার গলা টিপতে আরম্ভ করে দিলে। এর অল্প পরেই সেও অজ্ঞান হয়ে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই মেওয়ালালের গলায় বাস্তবিক কয়েকটা নখের টাট্‌কা চিহ্ন রয়েছে দেখতে পেলাম।

এই সময় জমিদার মশাই বাহিরে এলেন। সব কথা শুনে তিনি বল্লেন, "বাবুজী! ডাক্তার বাবু যা দেখেছেন আর মেওয়ালাল যা বলছে তার মধ্যে খানিক সত্য আছে। আমার একটী সুন্দর ছেলে ছিল। গত বছর এই বর্ষায় সে একটা কুঁয়ার ভেতর পরে গিয়ে মারা যায়। তার ১৭ বছর বয়স হয়েছিল। অনেকে

ওকে দেখতে পেয়েছে। পণ্ডিতজীরা বলেন তিনটী পিণ্ডস্থানে গিয়ে পিণ্ড দিলে ওর আত্মা শান্ত হবে। এই কথা বলতে বলতে মৃত ছেলেটির কথা মনে হওয়ায় তাঁর চোখ দুটী ছল্ ছল্ করে উঠল।

সে রাত্রে আর কোনও উপদ্রব হয় নি। পরদিন জমিদার মশাইএর সাহায্যে ভাঙ্গা পোল পেরিয়ে আমরা সদর-রাস্তায় এসে পড়লাম।

ভূত প্রেত আমি নিজে কখনও দেখতে পাই নি। একলা নির্জ্জন জায়গায় নির্জ্জন বাড়িতে দিনের পর দিন কেটে গেছে, কিন্তু কিছুই দেখিনি কখনও। ডাক্তার বাবু যা দেখেছিলেন আর মেওয়ালালের যা হয়েছিল তা স্বপ্নও হ'তে পারে। স্বপ্নে লোকে নিজের গলা নিজেই টিপে ধরতে পারে। কিন্তু, জমিদার মশাই যা বলেছিলেন, ডাক্তার বাবু ও মেওয়ালালের একই সঙ্গে বিশ্রী স্বপ্ন দেখে অজ্ঞান হওয়া, এসবের ভেতর আসল কারণ কি থাকতে পারে তা অনেক বার ভেবে দেখিছি, কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারি নি।

সূর্য্যমুখীর গল্প

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

পাতাল রাজার মেয়ে ছিল আঁধার পাতালপুরে,
ঘুমের মায়া জাগ্‌ল হঠাৎ সেদিন পাতাল জুড়ে।
মায়ার কাজল পরিয়ে দিল কে সব আঁখে আঁখে,
মাটীর ওপর পড়ল ঢ'লে সবাই ঘুমের ডাকে।
পাতালবালা ফুল কুড়োতে চল্ল সেদিন বনে,
সবাই ঘুমায়, কেউ ছিলনা পথের সে নিজনে।
ঘুমিয়ে আছে ফুলের শাখে ঘুমের নিঝুম কলি,
পাখীর বাসায় জাগেনিক সুরের কোলাহলই।
থেমে আসে নদীর বারি ঘুমায় কেয়া বন,
মাঝি ঘুমায় নৌকা বাঁধা কূলে অগণন।

একলা জেগে আছে শুধু পাতাল রাজার মেয়ে
পথের মাঝে অবাক হ'য়ে দেখল হঠাৎ চেয়ে।—
কোন দেশেরি সোনার কুমার দাঁড়ায় সেথা আসি'
ঝরছে যেন তিন ভুবনের উজল রূপের রাশি!
ললাটে তার চাঁদের ফালি চোখের কোণে ফুল,
দু'কানে তার দুল্‌ছে যেন ভোর শিশিরের দুল্!
বল্লে কুমার ঘুমের দানব এলো পাতাল পুরে,
ঘুমের মায়া নিয়ে দানব ফিরছে জগৎ জুড়ে'।
আলোর সোনার কাঠিখানির মোহন পরশ ক'রে
জাগাই সবায় ঘুমের থেকে নতুন সুখে ভ'রে।
গলায় যদি দাও মোর আজ চিকণ ফুলের মালা,
ঘুমের থেকে সবায় আমি জাগিয়ে দেব বালা।—
পাতাল বালার মুখে শরৎ মেঘের আলো জ্বালা
পরিয়ে দিল খুলে গলার সপ্তমনির মালা।
ঘুমের মায়া হরণ কর—বল্লে না আর কিছু,
বারেক চেয়ে মুখের পানে করল মাথা নিচু।
তার পরেতে পাতালপুরে হঠাৎ সবাই জাগে,
পাতার কোলে ফুলে ফুলে ফোটার হরষ লাগে।
বাতাস কাঁপে পাতায় পাতায় ভোম্‌রারা গায় গান,
কেয়া ফোটা নদীর পারে বাজে ঢেউয়ের তান।
নিজন পুরির নিজন ঘরে পাতাল পুরির মেয়ে
হাতে নিয়ে সোনার কবচ দেখ্‌ছে শুধু চেয়ে।
আলোর কুমার দিয়ে গেছে সোনার কবচখানি,
বলে গেছে—ওরি মাঝে শুন্‌বে আলোর বাণী।
তারি কথা ভাব্‌ছে ব'সে একা পাতাল বালা,—
তার গলাতে দিলে কখন সপ্তমনির মালা।
আছে যে সে অনেক দূরে সোনার পৃথিবীতে,
সেথায় যেতে পাতাল বালার সাধ হ'ল যে চিতে।

দিবস নিশি চেয়ে থাকে সোনার কবচ পানে,
সোনার কুমার কোথায় আছে কে তার খবর জানে!
নিঝুম রাতে সোনার কবচ রেখে নিজের কোলে
পাতালবালা পড়ল সেদিন ঘুমের মাঝে ঢ'লে।
সকাল বেলা অবাক হ'য়ে দেখ্‌লে চেয়ে চেয়ে,
সূর্য্যমুখী ফুটেছে সে মাটীর ফুলের মেয়ে।
সবুজ পাতার স্নেহের কোলে নীরব সুরে ফোটে,
দলে দলে পাতায় পাতায় রঙের লহর ছোটে।
চারদিকে তার আকাশ বাতাস পায় না খুঁজে কূল,
মাটীর বুকে ফুটেছে সে সূর্য্যমুখী ফুল।
আকাশ পানে মেলে আঁখি সোনার ফুলের মেয়ে,
অবাক হ'য়ে সেদিন ভোরে রইল শুধু চেয়ে।
আলোর মুকুট প'রে পূবের দ্বারে দাঁড়ায় এসে
জ্যোতির সাগর মাঝখানে সেই সোনার কুমার হেসে'।
গলায় পরা তারি দেওয়া সাত-মাণিকের মালা;
অবাক হ'য়ে রইল চেয়ে সূর্য্যমুখী বালা।
সূর্য্য বলে—ফুলের রাণী ফুট্‌লে তুমি ভোরে,
আমার কিরণ তোমার শিরে পড়বে নিতি ঝ'রে।
দিনের শেষে ফিরব আমি দূর আকাশের কোলে,
তখন তুমি পাতাল পুরে পড়বে ঘুমে ঢ'লে।
ভোরের আলোর পরশ লেগে ঘুম যাবে যেই টুটে'
সোনার বরণ ফুলটী হ'য়ে উঠ্‌বে বনে ফুটে'।—
থাক্‌ব আমি দূর আকাশে তুমি মাটীর মাঝে,
চিরদিনের রইবে বাঁধন নিত্য সকাল সাঁঝে।

—০—

স্বর্গীয়া কামিনী রায়

গত আশ্বিন মাসে বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীমতী কামিনী রায় ৬৯ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে মারা গিয়েছেন। তাঁর লেখা "আলো ও ছায়া" প্রভৃতি কয়েকটি অতি সুন্দর বই আছে। তিনি যে কেবল সুন্দর কবিতা লিখ্‌তে পার্‌তেন তা' নয়; তাঁর কবিতার ভাষা যেমন সুন্দর ছিল, তেমনই সুন্দর ভাব আর তেজস্বিতা ছিল।



তিনি বি-এ পাশ করেছিলেন বহু বৎসর আগে —যখন মেয়েদের মধ্যে বি-এ পাশ খুব কম জনেই করতেন। বহুকাল থেকেই তাঁর কবিতা নানা কাগজে এবং বইএর আকারে বেরিয়ে আমাদের বাংলা দেশের লোকের কাছে পরিচিত ছিল।

ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি অত্যন্ত ভালবাস্‌তেন। যেখানে ছোটদের সভা হ'তো, সেখানেই তিনি যেতে চেষ্টা কর্‌তেন। কত বার নিতান্ত অসুস্থ শরীরেও 'বালক বালিকা সম্মিলন'এ তিনি গিয়েছেন। সর্ব্বদাই তিনি তা'দের সুন্দর কথায় মধুর উপদেশ দিতেন; কত উৎসাহের কথা বলতেন।

সব রকম ভাল কাজেই তাঁর সহানুভূতি আর উৎসাহ ছিল। যেখানে তিনি

BLEED THROUGH.

গিয়েছেন, সব জায়গাতেই তাঁর উৎসাহপূর্ণ আশার কথা সকলের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। তিনি নীরবে কাজ করতেন; নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা ভেবে দেখতেন না। নিতান্ত অসুস্থ শরীরেও তিনি নানান কাজে যোগ দিতেন। শেষ অসুখের দু'তিন দিন আগেও একটি সভায় যোগ দিয়েছিলেন।

সকলের জন্য তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকত। অনেক সময় খুব দুঃখ পেয়েছেন তিনি, কিন্তু তাতেও তাঁর হাসিকে ম্লান করে নি। ভগবানে তাঁর বিশ্বাস অটল ছিল, এবং সেই বিশ্বাসই তাঁর মুখে হাসি জাগিয়ে রেখেছিল। সকলকে তিনি আপনার মনে কর্‌তেন; সকলের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার ক'রে আপনার মত ক'রে নিতেন।

একটি মেয়ের খাতায় (Autograph বইতে) তিনি কয়েক লাইন কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। সেটি এখানে দিয়ে লেখাটি শেষ কর্‌ছি।—

তরুণ হৃদয় এলে কাছে দিতে চাই যত কিছু আছে
দরিদ্র ভাণ্ডারে আপনার,
ফুলে ফুলে করেছি সঞ্চয় যতটুকু জ্ঞান, মনে হয়
ওটুকু লাগিবে কাজে তার।
শিখাই পাখীরে যেন বুলি, বুঝিবে, না যায় যদি ভুলি,
মনে এই আশাটুকু থাকে।
গূঢ় মন্ত্র, কবিতা সঙ্গীতে খেলা-সাজি চাই ভ'রে দিতে
খেলানাগুলির ফাঁকে ফাঁকে।
বাছা, তোর ছোট খাতাখানি ধরেছিস্ মোর কাছে আনি'
এ হাতের রাখিতে অক্ষর ?
খেলা-লেখা ? —তবু তার মা'ঝে এ সঙ্গীত যেন কানে বাজে
"মোরা কেহ নহি কা'রও পর।"



(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

পাঁচ টাকা

(শ্রীঅসীম বসু, গ্রাহক নং ১৯৭৯)

গ্রামের মধ্যে দাদামশায়ের বেশ একটু খাতির ছিল। আর সকলে জান্‌তো যে কিছু টাকাকড়িও তাঁর জমান ছিল।

প্রথম প্রথম যখন আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পাড়ায় আড্ডা মারতে যেতাম, তখন তিনি জান্‌তে পারলে বক্‌তেন, কিন্তু আজকাল আর কিছু বলেন না। তাই এখন আমি বেশ একটা বড় গোছের দলে যোগ দিয়েছি।

একদিন দলের নন্দদা, পট্‌লা, বিনয়, অমল ও আর সকলে আমায় বললে যে দাদুর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা যোগাড় করে দিতে, কারণ পূজোর ছুটীতে একটা কিছু করা হবে। এই 'একটা কিছু করার' টাকা চেয়ে না দিলে নাকি আমায় দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমার ওপরেই এই রকম হুকুম চল্‌তো, কারণ আমি ছিলাম দলের মধ্যে সব চেয়ে ছোট।

চারদিনের মধ্যে টাকা চেয়ে দিতে হবে, সেই জন্যে আমি রোজই গিয়ে দাদুর ঘরে ধন্না দিয়ে বসে থাকতাম। দাদু বলতেন, "আজ না, কাল আসিস্।" চারদিনের দিন রবিবার; দাদুর কোন কাজ নেই, সেইজন্য আমি ভোর না হ'তেই দাদুর ঘরে গিয়ে বসে আছি। প্রায় একটার সময় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে টাকা আদায় হলো। আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না যে তখনও আমার নাওয়া খাওয়া হয় নি। আমি টাকাগুলো পেয়েই নন্দদার বাড়ীতে ছুটে গেলাম। নন্দদা তখন বাইরের বারান্দায় বসে ছিল, বোধ হয় আমার জন্যেই। আমাকে দেখেই দৌড়ে এল। তারপর দলের আর সকলে মিলে চৌধুরীদের পাঁচিল টপ্‌কে সেই পুরাণো আম গাছটার নীচে আমাদের সভা বস্‌ল। ঠিক হলো যে, একাদশীর দিন ঐ টাকায় কল্‌কাতায় গিয়ে চিত্রায় "পল্লীসমাজ" দেখা হবে আর এতদিন টাকাটা থাকবে নন্দদার কাছে, কারণ তিনিই ছিলেন দলের সর্দ্দার। প্রায় আড়াইটার সময় সভা ভাঙ্গল আর আমরাও সকলে একে একে বাড়ী ফিরে এলাম।

ঠিক হবার দু' এক দিন পরে থেকেই নন্দদার চাল চলনের উপর আমার যেন কি রকম একটা সন্দেহ হ'ল। সেই জন্য আমি তার উপর বেশ একটু কড়া নজর রাখ্‌তে লাগলাম। একদিন দেখি নন্দদা সেজেগুজে ষ্টেসনের দিকে চলেছে। আমি তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বল্‌লাম, "কোথায় চলেছ নন্দদা?" সে একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লে, "একটু বিশেষ কাজ আছে, তাই বাড়ী থেকে আমাকে কল্‌কাতায় যেতে বল্লেন।" সেদিন নন্দদা প্রায় রাত্তির বারটার সময় বাড়ী ফিরেছিল। পরের দিন হাটে নন্দদার বড়দার সঙ্গে আমার দেখা হলো। আমি তাঁকে নন্দদার কল্‌কাতায় যাওয়ার বিষয় জিজ্ঞেস কর্‌লাম, কিন্তু উত্তরে তিনি বল্‌লেন, "নন্দ কাল কল্‌কাতায় গিয়েছিল নাকি? বাড়ীর তো কোন রকম কল্‌কাতায় যাওয়ার মতন কাজ ছিল না।" তখন বুঝলাম নন্দদা একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। তারপর এ কথাটা আর কাউকে বলিনি। আর একদিন দেখি ঠিক অমনি করেই ষ্টেসনের দিকে গেল। সে দিন আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

একাদশীর দিন সকালে আমি একবার দলের সকলকে মনে করিয়ে দিতে বেরচ্ছিলাম, এমন সময় সর্দ্দার সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি বল্‌লেন, "তোরা সব ষ্টেসনেই থাকিস্‌। আমি ঠিক বারটার সময় যাব, তখন সকলে মিলে স'বারটার ট্রেণে ওঠা যাবে।" আমি তখন সকলকে খবরটা দিয়ে এলাম।

প্রায় সাড়ে ১১টার সময় ষ্টেশনে গিয়ে দেখি দলের সকলেই প্রায় হাজির, কেবল নন্দদা নেই। তারপর প্লাটফরমে ব'সে গল্প করতে করতে বারটা বাজল। আমরা সকলে নন্দদার জন্যেই শুধু অপেক্ষা করছি। একটু পরেই ট্রেণ এলো, তখনও নন্দদার দেখা নেই। স'বারটা হ'ল, ট্রেণও হুইসিল্‌ দিয়ে ছেড়ে দিল। তখন আমরা সকলেই প্রায় রাগে ফুল্‌ছি। সকলে মিলে তাড়াতাড়ি নন্দদার বাড়ীতে গেলাম, গিয়ে সটান্‌ উপরে নন্দদার ঘরে উঠে গেলাম। গিয়ে দেখি নন্দদা নেই। তখন সকলে মিলে পরামর্শ করতে লাগ্‌ল, আর আমিও এই ফাঁকে একবার নন্দদার পকেটটা হাতড়ে নিলাম। পকেট থেকে যা বেরুল তা দেখে তো আমি অবাক! দেখি, কতকগুলো বাসের টিকিট আর গোটা দুই তিন বায়স্কোপের টিকিট। দেখেই আমি তো ব্যাপারটা বুঝে নিলাম।

তারপর জল্পনা করে সকলে মিলে ছাতের ওপর উঠলাম। গিয়ে দেখি

ছাতের ঘরের দরজাটা বন্ধ। এ ঘরের দরজার খিল তো কোন কালেই ছিল না, তবে কি করে বন্ধ হ'ল? একটু ঠেলাঠেলি করবার পরই দরজা খুলে গেল, ঘরে ঢুকে বুঝলাম মূর্ত্তিমান দরজা ঠেলে বসে ছিলেন, আর আমাদের দেখেই দাঁত বা'র করে হাসতে হাসতে বল্লেন, "খরচ করে ফেলেছি।"

সেই দিনই বিকালবেলা আমাদের একটা পরামর্শ সভা বসল—অবশ্য নন্দদাকে বাদ দিয়ে। এবং নন্দদাকে কি করে জব্দ করা হবে তাই ঠিক হলো।

দু' একদিন পরে নন্দদার সঙ্গে আমার, পটলার আর বিনয়ের দেখা। আমি ভাবলাম, আমরা নিজেরা যদি প্রথমে ওর সঙ্গে কথা না বলি তাহ'লে নন্দদাও আমাদের সঙ্গে কথা বলবে না, আর আমাদের প্ল্যানটাও পণ্ড হয়ে যাবে। তাই আমিই প্রথমে বললাম, "নন্দদা, তুমি কিন্তু ভাই খুব চালাক। বেশ মজার ঠকানটাই ঠকালে। যাক্‌, ওসব বাজে কথা বলে লাভ নেই, আজ দুপুর বেলা আড্ডায় ঠিক এসো। আমাদের পরের প্রোগ্রাম কি তাই ঠিক করা হবে।" এই বলে তো আমরা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌তে হাস্‌তে চল্‌তে সুরু করলাম। একটু দূরে গিয়ে পেছন ফিরে চেঁচিয়ে বললাম, "আস্‌ছ তো ঠিক?" নন্দদা বললে, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আস্‌ব।"

দুপুরবেলা সকলেই উপস্থিত হ'লো। আমিই প্রথমে বললাম, "এ রকম করে দিনগুলো মাটি করলে তো আর চলবে না, চল পরশু দিনই কিষণপুরে বিনয়দের বাগান বাড়ীতে পিকনিক করে আসা যাক।" আগেকার পরামর্শ মত সবাই আমার কথায় সায় দিল। তারপর সব চাঁদার ব্যাপার ঠিক হয়ে গেল। সভাভঙ্গ হবার আগে আমি বললাম, "আগেকার মতম নন্দদাই আমাদের সর্দ্দার থাকবেন কিন্তু এবারে টাকাকড়ি সব বিনয়ের কাছে থাক্‌বে।"

ঠিক দিনে দেখি সকলে ষ্টেসনে হাজির, এমন কি নন্দদা পর্য্যন্ত। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেণ এলো। নন্দদা আমায় বললে, "চল উঠি গিয়ে।" আমি বললাম, "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একটু দাঁড়াও না। ছেলে ছোকরা মানুষ আমরা, আমাদের উঠতে আর কতক্ষণ বা লাগে? আর টিকিটও তো কেনা আছে।" নন্দদা চুপ করে গেল। ঘণ্টা দেবার পর তাকে বললাম, "চল, এইবার ওঠা যাক, আর তুমিই দেখে ঠিক করো কোন্‌ কামরাটায় ওঠা যাবে।" নন্দদা দু' একটা দেখবার পর একটায় উঠে বললে, "এইটায় আয় তোরা, একেবারে খালি।" আমি বললাম,

"নন্দদা, একটু দাঁড়াও। বিনয়টাকে দেখি কোথায় আবার পান কিন্‌তে গেল। আর সকলেই তো হাজির। একটুখানি দাঁড়াও, আমি এক মিনিটে তাকে ধরে আন্‌ছি, তার কাছে আবার টিকিটগুলোও আছে।" এই ব'লে আমি তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম। একটু পরে আমি আর বিনয় পান খেতে খেতে ফিরে এসে দেখি ট্রেণটা আস্তে আস্তে চলতে সুরু করেছে আর নন্দদা আমাদের সকলকে তাড়াতাড়ি উঠতে বলছে। আমরা যেতে না যেতেই ট্রেণটা একটু জোরে যেতে সুরু করল আর আমরা চুপ করে নন্দদার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু দূরে গাড়ীটা গেলে আমরা সকলেই রুমালগুলো বা'র করে ওড়াতে ওড়াতে বললাম, "Good-bye নন্দদা। কবে ফিরছ?" তারপর তো দঙ্গল বেঁধে খুব হৈ চৈ করতে করতে প্ল্যাটফরম্ থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় অরুণের সঙ্গে দেখা। আমি বললাম, "ষ্টেসনে গেলি না কেন? কি হয়েছিল?" ও বললে, "কি হবে তাতো জানতাম, সেইজন্য আর গেলাম না।" আমি বললাম, "না গিয়ে ভারী কাজই কর্‌লি! চলন্ত গাড়ীতে নন্দদার অমন মুখখানা তো আর দেখ্‌তে পেলি নে!"

দিন দুই বাদে নন্দদাকে দেখ্‌তে পেলাম। যাবার পর ওর কি হলো সেই খবরটা আমি তাড়াতাড়ি যোগাড় করলাম। তারপর ছুটতে ছুটতে আড্ডায় গিয়েই খুব এক চোট হেসে নিলাম। সকলে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "কি হয়েছে রে?" আমি বললাম, "আমরা তো নন্দদাকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর বেচারীকে পরের ষ্টেসনে টিকিট দেখাতে বলে, আর দেখাতে না পারায় ওকে দুদিন আটকে রেখে দেয়। আজ সকালে ওর দাদা খবর পেয়ে ওকে খালাস করে এনেছে।" এই শুনে সকলেই চেঁচিয়ে খুব হেসে নিল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে, বাৎসরিক বিজয়া সম্মিলনীতে আমরা সকলেই জড় হ'লাম, নন্দদাও ছিল। নন্দদা ছোটবেলা থেকেই একটু গানটান গাইতে জান্‌তো, সেইজন্যে সকলেই ওকে একটা গান গাইতে বলল। নন্দদা তখন হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে গাইতে সুরু করল,—

"লাজের মানা মান্‌বো নাকো,
আজ মিলনের কোলাকুলি ....."

আর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হো হো করে হেসে উঠ্‌লাম।

গল্প-স্বল্প

খেয়াল—ছবিতে যে লোকটি হাতে হেঁটে যাচ্ছে দেখ্‌ছ, এর খেয়াল হয়েছে, এক সহর থেকে অন্য সহরে (ভিয়েনা থেকে গ্রাজ্—১০০ মাইলেরও



বেশী) এই ভাবে যাবে। সঙ্গের লোকেরা গায়ের জামা, খাবার ইত্যাদি নিয়ে এর সঙ্গে যাবে, আবশ্যক মত জামা গায়ে দেবে, খাবার খাবে। হাতের জন্য কি রকম জুতো বানিয়ে পরেছে একবার দেখ।

চলন্ত স্কুল—"ভঁ-অ-অ-প্"—"ঐ স্কুল আস্‌ছে!" কালিফোর্ণিয়ার

এক গ্রামে এই রকমের একটি স্কুল আছে। মোটরে করে স্কুলবাড়ীকে টেনে নিয়ে সুবিধামত একটি খোলা জায়গায় বসিয়ে দিলেই হ'লো! রোজ এক জায়গায় স্কুল হ'লে একঘেঁয়ে মনে হ'তে পারে, তাই ক'দিন এ জায়গায়, ক'দিন ও জায়গায় স্কুল বসান হয়। তা'ছাড়া খোলা স্বাস্থ্যকর জায়গা বেছে স্কুল বসাবার পক্ষেও সুবিধা হয়। বলা বাহুল্য, ছোট স্কুলের বেলাই এটা সম্ভব হয়; বড় স্কুলে চলে না।

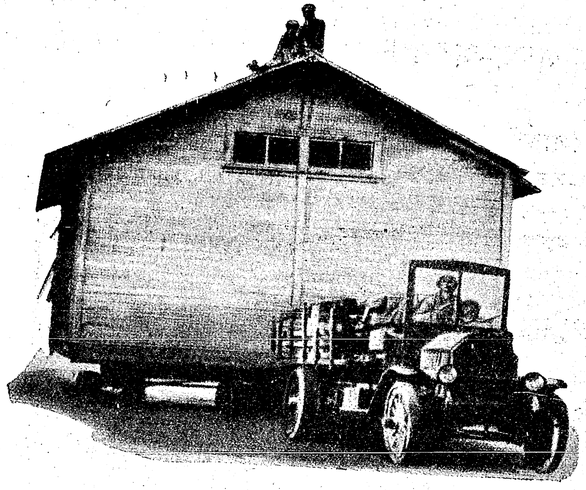

ডাকটিকিটের বাহার—

এই যে সুন্দর খাটটির উপর আশ্চর্য্য কারিকুরি দেখা যাচ্ছে, এই কারিকুরী শুধু ডাক-টিকিটের সাহায্যে করা হয়েছে। খাটের উপর হাজার হাজার নানা রঙের ডাক-টিকিট যত্ন ক'রে লাগিয়ে এই রকম সুন্দর কাজ করা হয়েছে। দেখ্‌লে মনে হয় যেন বহুমূল্য খাট।

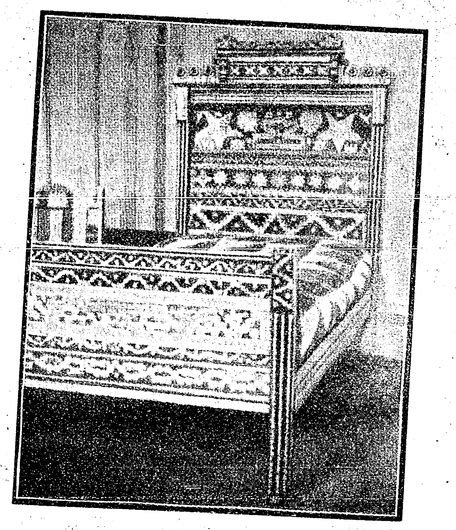

কুড়ের বাদ্‌শা ঃ—ছবিতে যে অদ্ভুত জীবটি দেখ্‌ছ, এর নাম হাতী-সীল (Elephant-Seal)। জার্ম্মানীর এক চিড়িয়াখানায় এই জন্তুটি প্রায় বছর তিনেক ধরে আছে। বছরে এ প্রায় এক ফুট লম্বায় বাড়ে; খায়ও নাকি রাক্ষসের মত। কিন্তু, এ নাকি কুঁড়ের বাদ্‌শা। শুয়ে পড়্‌লে নড়্‌তেও চায় না। এর লম্বার মাপ নেবার জন্য দুটি লোক ফিতে নিয়ে দাঁড়িয়ে, মুখের সাম্নে একটা মাছ ধরেছে, তবে এ সোজা হ'য়ে মুখ হাঁ ক'রে মাছ খেতে চাচ্ছে। নইলে কা'র সাধ্যি ছিল একে সোজা হ'য়ে শু'তে বাধ্য করে? মাপ নিয়ে দেখা গেল, এ জন্তুটি লম্বায় প্রায় ১৩ ফিট;—অর্থাৎ ৯ হাত! ওজনেও প্রায় ৭০।৮০ মণ!

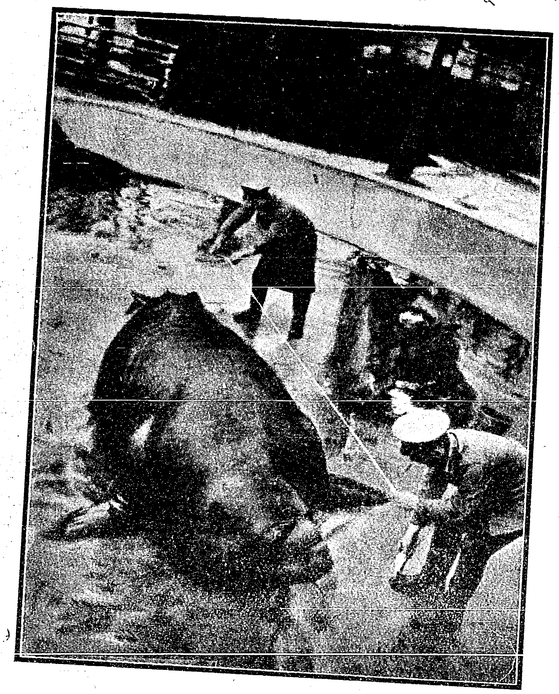

—০—

ধাঁধার উত্তর

১। গুণের অঙ্কে বিভ্রাট—

গুণের অঙ্কটি যেমন ছিল পাশে দেখান হলো।

৩৯
১২
৭৮
৩৯
৪৬৮

২। শব্দ পূরণ—

(১) হরিহর অহরহ হরষে হারা হ'য়ে হর হর কহে।

(২) কে বলে, একালে কলিকাতার কলেজে কোলাকুলি কম চলে?

নূতন ধাঁধা

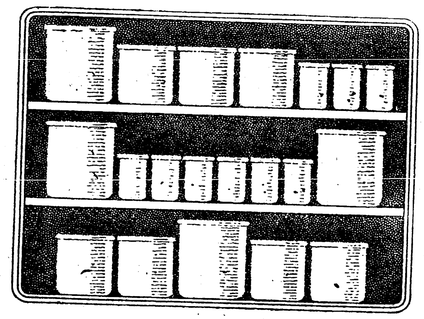

১। তিনটি তাকে সারি সারি কুড়িটি বৈয়াম সাজান আছে। বৈয়াম তিন রকমের আছে—বড়, মাঝারি, ছোট। প্রত্যেক তাকের বৈয়ামগুলিতে মোটের উপর সমান জিনিষ ধরে। ছোট বৈয়ামে যদি তিন সের ধরে, সবগুলি বৈয়ামে মোট কত সের জিনিষ ধর্‌বে এবং বড় আর মাঝারি বৈয়ামে কত জিনিষ ধর্‌বে বল্‌তে পার কি?

২। রামবাবু একটা জমি কিনেছেন, তা'র আকার ঠিক একটা T-এর মত। পাঁচটি সমান ভাগে ভাগ করে তিনি জমির একটি নক্সা আঁক্‌লেন; কিন্তু, কাজের সময় দেখা গেল, ৪ জনকে ৪টি সমান এবং একই আকারের জমি দিতে হবে—পাঁচ জনকে নয়। কি ভাবে ভাগ করা হবে বল্‌তে পার কি?

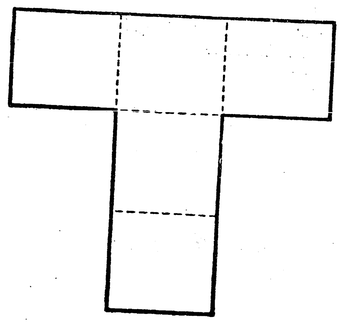

দি সান্ অপ্‌টিকাল কোম্পানি

নিখুঁত চোখ পরীক্ষা
এবং চশমা ফিটিংএর
— জন্য অদ্বিতীয় —

২৪।১ কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—বড়বাজার ১২৬৫

নূতন বাহির হইল! নূতন বাহির হইল!

সচিত্র
মহাভারতের গল্প

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত
৩য় সংস্করণ। দাম—১।০

মহাভারতের ৬৬টি বাছাই সুন্দর সুন্দর গল্প, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অতুলনীয় সরস ভাষায় লেখা। তাঁহার নিজের আঁকা একখানি ৩-রঙের ছবি ও অনেক গুলি এক-রঙের ছবিতে বইখানি আরো মনোরম হয়েছে। ছেলেমেয়েদের অতি সুন্দর বই। ঝকঝকে পরিষ্কার ছাপা; চমৎকার বোর্ড বাঁধাই।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,
১১৭।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"জোড়া-কথা-ছাড়া বই" সিরিজের প্রথম পুস্তক

ভেক রাজকুমার

শ্রীবিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ, বি-এ প্রণীত

বাংলা দেশের শিশুসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব জিনিষ

এই বইখানির পরিকল্পনা এবং রচনা করিয়া বিনয়বাবু বাংলা দেশের শিশুসম্প্রদায়ের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এমন কৌশলে এ বইখানি রচিত হইয়াছে যাহাতে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকবালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাদের মাত্র অক্ষর পরিচয় হইয়াছে তাহারাও এ বইখানির দ্বারা জ্ঞান এবং আনন্দ লাভ করিবে। সমস্ত পুস্তকটিতে এমন একটি কথাও ব্যবহার করা হয় নাই যাহাতে যুক্তাক্ষর আছে। যুক্তাক্ষর-যুক্ত কথাকে হসন্তের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া অযুক্ত করিয়া লইলে শিশুদের মনে বানান সম্বন্ধে পরে গোলযোগ ঘটিতে পারে। এ পুস্তকে সে প্রথা অবলম্বন করা হয় নাই, কারণ এ পুস্তকে ব্যবহৃত সকল কথাই যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত। কিন্তু তাহাতে ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও বাধা পায় নাই।

এই বইখানি শিশুদের হস্তে পড়িলে এক সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি এবং কল্পনাবৃত্তি উন্মেষিত হইবে। বইখানিতে যে রেখাচিত্রগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রঙ্ লাগাইবার প্রণালীও নির্দ্দেশ করা আছে। ছবিগুলিতে রঙ্ ফলাইবার সুযোগে শিশুদের শিল্প-বোধ বিস্তার লাভ করিবে। মূল্য তিন আনা।

প্রকাশক—বিচিত্রা নিকেতন, ২৭।১ ফরিয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

—যা এর আগে আর কোনো দিন পড়নি—

যতীন সাহার লেখা — সমর দের ছবিতে ভরা

যতীন বাবুর লেখা আরও তিন খানা ভাল বই—

যাদুকর

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

—আট আনা—

চিচিং ফাঁক

—আট আনা—

সোণার ঘড়া

—চৌদ্দ আনা—

সেই অদ্ভুত গল্পের বই—



আঁধার রাতের মুসাফির

শিগ্‌গিরই বেরুবে!

পড়ে সবাই হয়ে যাবে অবাক্!

বেরুলেই একখানা কেনা চাই কিন্তু

—দাম আট আনা—

বড় বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

ধূলো বালি ঘাঁটা ছেলেদের স্বভাব।



ধূলাবালি থেকে নানা রকম সংক্রামক চর্ম্মরোগের সৃষ্টি হয়। ছেলেপিলেদের গা হাত পরিষ্কার কর্‌তে ও স্নান করাতে

মার্গো সোপই

সব চেয়ে ভাল। এতে বীজাণু নষ্ট হয়, অথচ অন্য ওষুধযুক্ত সাবানের মত গা জ্বালা করে না।

ছোটদের নরম শরীরের জন্য স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর ফেনাযুক্ত মার্গোসোপই উপযোগী; মার্গো-সোপ সুন্দর গন্ধযুক্ত ও ব্যবহারে আরামদায়ক।

ক্যালকেমিকো'র

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট—সর্দ্দিজ্বরের জন্য।
মাগুয়েণ্টাম—ঘা পাঁচড়ার জন্য।
টাইকোসোডা ট্যাবলেট—অম্বল ও পেটফাঁপা প্রভৃতিতে।

ছেলেমেয়েদের ঘরে সব সময় রাখা দরকার—বিশেষ করে শীতের দিনে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড।

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ উপহারের বই

রত্নদ্বীপ (সচিত্র)

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত

প্রাইজের জন্য ডিরেক্টর কর্ত্তৃক অনুমোদিত

২য় সংস্করণ—মূল্য ॥৵০ আনা

গৃহে, জঙ্গলে, সাগরে, দস্যু তস্করের মধ্যে বালকের অসীম সাহসিকতা ও কর্ম্মতৎপরতার কাহিনী পড়িয়া ছেলেদের মন সাহসে ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিবে। R. L. Stevenson এর Treasure Island-এর গল্প—অতি চিত্তাকর্ষক। ভাল কাগজে ঝকঝকে ছাপায় ও সুন্দর ছবিতে বইখানি সুশোভিত।

সচিত্র

সাঁওতালী উপকথা

শ্রীমতী নির্ম্মলা রায় প্রণীত

কত যে সুন্দর তাহা না পড়িলে বোঝান যায় না। সরল সিধা সাঁওতালদের উপকথাগুলি অতি মনোরম। তাহার উপর গল্পের ভাষা ও পদ্ধতি এমন চমৎকার যে, পড়িলে মন আনন্দে ও শান্তভাবে ভরিয়া উঠে। বহু সুন্দর সুন্দর ছবিতে, উৎকৃষ্ট কাগজে ও ঝকঝকে ছাপায় বইখানি ছেলেমেয়েদের উপহারের পক্ষে অতুলনীয়। মূল্য ॥০ আট আনা।

সচিত্র

২য় সংস্করণ **ছেলেদের কাদম্বরী** মূল্য ।৵০

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত

বাণভট্টের সুবিখ্যাত পুস্তক হইতে ছেলেদের অনুপযোগী স্থানগুলি বাদ দিয়া, অতি সুন্দর সরল ভাষায়, ছেলেদের মত করিয়া লেখা। সমস্ত গল্পটি একখানি ছবির মতই সুন্দর। পরিষ্কার ছাপা ও চমৎকার চমৎকার ছবিতে বইখানি অতি মনোরম।

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—দেশনায়কগণের অভিমত—

যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য

দেশপূজ্য
৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির
অভিমত

"আমি মিঃ এইচ, বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে ইহাই ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।"

স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জননেতা
লালা লাজপৎ রায়ের
অভিমত

"আমি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি মিঃ এইচ, বসুর "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" বাস্তবিক ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধ অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"

স্বাঃ লালা লাজপৎ রায়

কেশতৈল—কুন্তলীন, কোকোলীন, ম্যাকেসার, চামেলীন প্রভৃতি।

হেয়ার লোসন—দেলখোস, দিলতোষ, হার্টস্ ডিলাইট, প্রভৃতি।

পমেটম—দেলখোস পমেড, গোলাপ ও বকুল পমেটম প্রভৃতি।

এসেন্স—দেলখোস, হোয়াইট রোজ, অপরাজিতা, বকুল, মাস্ক, যুঁই, বেলা, চামেলী, খস, অরিগ্যান প্রভৃতি নানা সিরিজের বিবিধ প্রকার সুগন্ধি।

নানাবিধ অটো, হেয়ারওয়াস, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, লাইম যুস ও গ্লিসারিন ক্রীম এবং স্নো প্রভৃতি।

সাবান—হোয়াইট রোজ, চন্দন, খসখস, মাস্ক, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ ফলের সিরাপ।

এইচ, বসু, পারফিউমার,
৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বিশ্ববরেণ্য
রবীন্দ্রনাথ
বলেন

"কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহারে একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক
৺মতিলাল নেহেরুর
অভিমত

"ভারতবর্ষের প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এইচ, বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C 700.





উড্ ওয়ার্ডের
গ্রাইপ ওয়াটার

চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

ইহা শিশুদিগকে সুস্থ রাখে।

WOODWARD'S
GRIPE WATER

I-WW 9-111A W. WOODWARD LTD., LONDON, ENGLAND

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

সন্দেশ

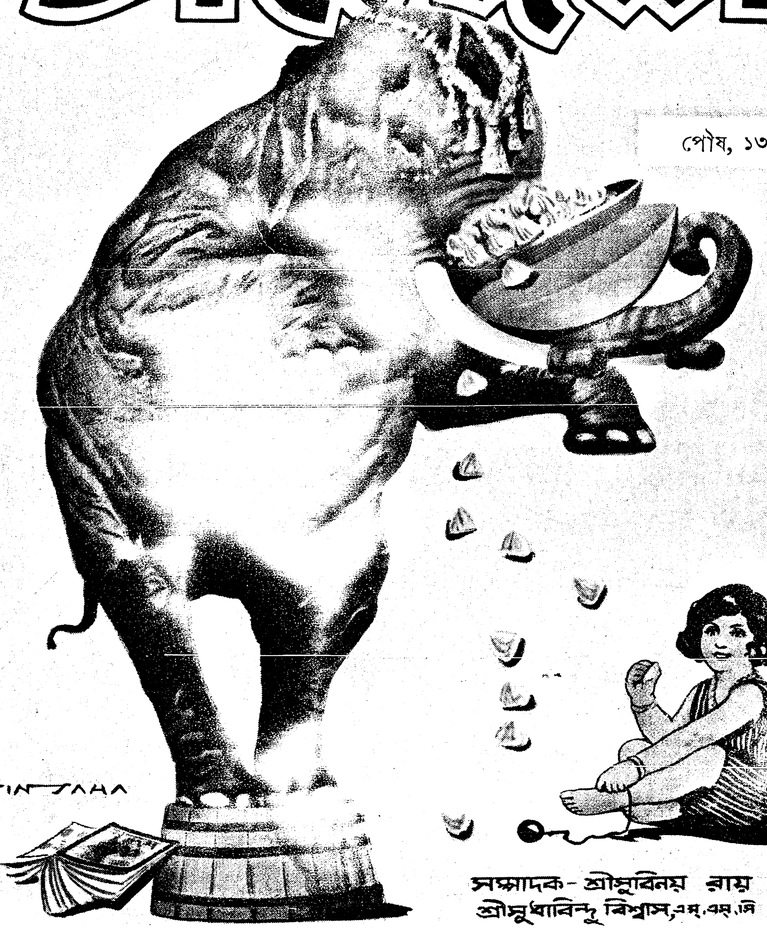

পৌষ, ১৩৪০

সম্পাদক - শ্রীসুবিনয় রায়
শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম্.এস্.সি

বার্ষিক ২৷৷৵০ আনা

COLOURED DOCUMENT.

ছেলেমেয়েদের জন্য

কয়েকখানি বাছাই বই

এগুলির পরিচয় ছেলেমেয়েদের কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যেমনি সরস সুন্দর ভাষা, তেমনি চমৎকার চমৎকার এক রঙের ও ৩-রঙের ছবি। মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত, এবং ডিরেক্টর-অব-পাবলিক-ইনস্ট্রাকসন কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

ছেলেদেরদ পঞ্চতন্ত্র	...	॥০	কথাসরিৎ সাগর	...	॥৵০
,, বেতাল পঞ্চবিংশতি		॥০	রবিন্ হুড	... ...	॥৶০
,, বত্রিশ সিংহাসন		॥০	ওডিসিয়ুস	... ...	।৶০
পুরাণের গল্প	...	॥০	ইলিয়াড	... ...	।৶০

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

নূতন সংস্করণ

স্বাস্থ্য

পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত

১। পড়া শুনা ।৵০
২। খেলার পড়া ।৶০

বই দুইখানির নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

স্বাস্থ্যের কথা ছেলেমেয়েদের জন্য অতি সরল সরস ভাবে লেখা। ভাল কাগজে, বড় অক্ষরে, পরিষ্কার ছাপা। অনেকগুলি ছোট ছবি, সুন্দর মলাট। মূল্য—ছয় আনা

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম-এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা



দুন্তোর হাওয়া!



নব পর্য্যায়
৩য় বর্ষ

পৌষ, ১৩৪০

৪র্থ সংখ্যা

আকাশ ও মা

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

আলোয় জাগা ভোরের আকাশ
আমায় ভালবাসে
পাত্‌লা মেঘের রাঙা রঙে
কোন্ হাসিটী হাসে!

সেই হাসিটী মা যে হাসেন
আমায় চুমো খেয়ে,
তাই যে আকাশ হাসে আমার
মুখের পানে চেয়ে!

বাদল দিনে মেঘ করেছে
দূরের মাঠের কোণে,
ঘির্‌ছে মেঘের কোমল ছায়া
কাজল ঘন বনে।

COLOURED DOCUMENT.

কোলে রেখে মা আমারে
দেখেন স্নেহ ভরে,
মায়ের চোখের কাল বরণ
ফুট্‌ল মেঘের 'পরে।

তালের বনে মর্ম্মরিয়া
ও কারা গান গায়!
সুপুরিরা সারি দিয়ে
আকাশ পানে চায়।

আলোর স্নেহ পরশ দিয়ে
আকাশ তাদের ডাকে,
সেই ডাকটী শুনেছি মার
রাতে ঘুমের ফাঁকে।

মায়ের মায়া ছড়িয়ে আছে
নীল আকাশের গায়,
বাতাস নাচে তাই যে বনে,
ভোরের পাখী গায়।

নীল নয়নে আমার পানে
তাই সে চেয়ে থাকে,
ভালবাসি আকাশকে আর
ভালবাসি মাকে।



মিতালি



(শ্রীসুকুমার দে সরকার, বি-এস-সি)

বট,অশথ, তেঁতুল, আশশেওড়া গাছগুলো গলাগলি ভাব করে বড় হয়েছে। তাদের পাতাগুলোর ফাঁক দিয়ে সবে মেটে মেটে আলো উঁকি মারছিল। হঠাৎ কলুদের খোকা কেঁদে উঠল। অশথ গাছের বুড়ো কাগটা ডানা ঝটপট ক'রে জেগে উঠল; ছাতারে পাখীটা চোখ মেলে বললে—কট্ টক্ টক্ কর্‌র্ কঃ।

কালো বেড়ালটা পা টিপে টিপে ছোট্ট টুনটুনি যেখানে ঘুমচ্ছিল সে দিকে এগচ্ছিল। তার চোখদুটো জ্বলছিল যেন ভাঁটা। খোকা আবার কেঁদে উঠল। আর দুটো ছাতারে পাখী জেগে বললে,—টক্ টক্ কর্‌র্ কর্‌র্।

বুড়ো কাগটা বললে— কা-আ-আ

কালো বেড়ালটার পা গেল ফস্‌কে, ছোট টুনটুনি জেগে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। একটু খানি ঝিরঝিরে হাওয়া এসে গাছের পাতাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে গেল। তারা মাথা দুলিয়ে বললে—খোকা উঠেছ?

খালি আশশেওড়া গাছের পাতাগুলোর মধ্য থেকে লক্ষ্মী পেঁচা তার ডানার পালকের মধ্যে ঠোঁটটা গুঁজে গোল গোল চোখ দুটো বুজতে বুজতে বললে—আরে ছোঃ, এতক্ষণ আলো ছিল, যেই অন্ধকার হ'তে সুরু হয়েছে অমনি লোকগুলো গোলমাল সুরু করেছে যত সব, হ্যাঁঃ—

খোকার মা বললে—কাল অনেক রাত অবধি ধান ভেনেছি, খোকা একটু ঘুমুতে দে।

খোকা যখন হামা দিয়ে দাওয়ায় বেরিয়ে এল বুড়ো কাগটা বললে—ক্কঃ, অর্থাৎ কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এত দেরী!

খোকা বললে—ম্-মা, অর্থাৎ মা যে ঘুমুচ্ছে,

ছাতারেরা টক্ টক্ কর্র্ ক'রে বললে—ছুয়ো খোকা ছুয়ো!

টগর গাছের একটা নরম ডালে বসে দুলতে দুলতে ছোট্ট টুনটুনি বললে—বা রে, খোকাই ত সবচেয়ে আগে উঠে কাঁদল, আর তাই ব'লেই ত যম বেড়ালটার পা ফস্‌কে গেল আর আমি বেঁচে গেলাম, নইলে—

খোকা বললে— তা-তা-তা অর্থাৎ তাইত।

খোকার সাড়া পেয়ে গোয়ালের ভেতর থেকে বাছুরটা ডেকে উঠল—ম্মা-মা-আ-আ। বেচারী বাঁধা আছে বেরতে পারলে না। খোকা বললে—ম-ম-ম্মা, অর্থাৎ দাঁড়া, মা উঠে খুলে দেবে।

এমন সময় কালো বেড়ালটাকে সেদিকে আসতে দেখা গেল। মিশমিশে কালো রং, চোখ দুটো তামাটে জ্বলছে যেন ভাঁটা। সে খোকার দিকে একবার চেয়ে বললে—ফর্র্ ফ্যাঁচ!

খোকাদের মজলিস ভেঙ্গে গেল্। বুড়ো কাগ বললে—যাইগে বেলা হ'ল, পেটের চিন্তা করিগে; বোসেদের বাড়ী কাল খাওয়ান দাওয়ান হয়েছে, পাতা টাতা অনেক ফেলেছে বোধ হয়।

ঘাড়টা বেঁকিয়ে কট কট করে বেড়ালটার দিকে চেয়ে বুড়ো কাগ উড়ে গেল।

ছাতারেরা বললে—খোকা তোমার বাবার ঘানি গাছে উই ধরেছে, সেগুলো সাবাড় করে আসি।

ছোট্ট টুনটুনি ফুড়ুৎ করে উড়ে যেতে যেতে বললে—খোকা বাদার বিলে অনেক দূর থেকে সব হাঁসেরা এসেছে। তারা নাকি তীর্থ করতে যাচ্ছে মানস সরোবরে, তাদের কাছে বিদেশের খবর শুনে আসি, তোমায় বলব।

খোকার মা এসে বললেন—খোকা দুধ খাবি আয়।

কুণ্ডুদের পোড়ো বাড়ীটার ধার দিয়ে দিনেও লোক হাঁটে না। ওটা নাকি ভূতের বাড়ী! দক্ষিণ পাড়ার একেবারে ঈশেন কোণ ঘেঁসে বাড়ীটা ইট কাঠের ভাঙ্গা দাঁত বা'র করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে জমিটায় উলুঘাস আর শরের বন; আর আম ও লিচুতে জড়াজড়ি ক'রে জঙ্গলের মাথায় যেন

চাঁদোয়া খাটিয়ে রেখেছে, দিনের আলোতেও জায়গাটা অন্ধকার।

শরবনের মধ্যে গোটাকতক পোড়ো ইঁটের ওপর ব'সে কালো বেড়ালটা থাবাগুলো চাট্‌ছিল, শরবনের মধ্যে একটা খস খস শব্দ হোল। কালো বেড়ালটা মুখ ফিরিয়ে বললে—মেঁ-আ-ও অর্থাৎ কেও? ঘাস আর শরের ভেতর থেকে একটা ভাম উঁকি মারলে;—কি সাঙ্গাৎ খবর কি?

বেড়াল বললে—খবর ভাল নয় ভায়া। কাল ভোর রাতে চুপি চুপি টুনটুনেকে শিকার করতে গেছি, কলুদের খোকাটা সব জাগিয়ে দিলে। একদিন ওকে যা আঁচড়ে দেব,...ব'লে লেজ মোটা করে, ঘাড়ের রোঁয়া সব ফুলিয়ে, ঘর্র্ ফ্যাঁচ ক'রে বেড়ালটা মাটিতে একবার আঁচড়ে কাটলে।

—আজ আর একবার চেষ্টা দেখবে নাকি?

—আরে চুপ চুপ, নিশ্চয় দেখব, অমনি ছেড়ে দেব নাকি! ওদিকে লিচু গাছের পাতার মধ্যে বসে বুড়ো কাগ যে সব শুনছিল ওরা কেউ টের পায়নি।

দুপুর বেলা খোকার মা ঘুমিয়েছে, খোকা হামা দিয়ে জানলার ধারে গেল। বাইরে কেমন উদাস আলো! পেহ্লাদী বাছুরটা মাঠে দৌড়ে নেচে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে, তার মা এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে চোখ বুজে জাবর কাটছে। চীলগুলো কত উঁচুতে উড়ছে; ছোট্ট টুনটুনি জানালার ধারে নুয়ে পড়া একটা সরু ডালে বসে গান করছিল—চীপ্, চীপ্, চীপ্! খোকাকে দেখে সে বললে—এস খোকা, আজ ওপাড়ায় গেছলাম, হাঁসেরা সব প্যাঁক প্যাঁক করে গান জুড়েছে; কাল ওরা আবার যাওয়া সুরু করবে— কতদূর কতদূর!

খোকা জিজ্ঞেস করলে—কতদূর?

—সে অনেক দূর! কত নদী পেরিয়ে, কত পাহাড়ের হিমে ভারী বাতাস ডানার ঘায়ে কাঁপিয়ে দিয়ে, কত দেবদারুর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যাবে—সেই মানস সরোবরে; যেতে যেতে গান ধরবে—প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক! নদীগুলো সব ছল ছল ছলাৎ করে বলবে—একবার নামোনা ভাই, বিদেশের খবর শুনি। ওরা বলবে—সময় নেই, সময় নেই, প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক!—কি মজা না খোকা?

খোকা বললে—উঃ

—দেবদারুগুলো মাথা নেড়ে বলবে—একটু বসে যাওনা হাঁস ভাই, দুটো কথা শুনি। ওরা বলবে—সময় নেই, সময় নেই, প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক! ডানার

বাতাসে আকাশ কাঁপিয়ে ওরা চলে যাবে কতদূর কতদূর! কি মজা না খোকা?

খোকা বললে—তা তা তা।

এমন সময়ে বুড়ো কাগ উড়ে এসে বসল সামনে বট গাছে।—কা, কা, ক্কঃ!

ছোট্ট টুনটুনি বললে—চীপ্, চীপ্, চীপ্।

গলাটা দুলিয়ে আমীরি চালে বুড়ো কাগ বললে—তোমরা শুনেছ, যম বেড়াল আজ রাত্তিরে আবার আসবে টুনিকে ধরতে? ছোট্ট টুনটুনির মুখ শুকিয়ে গেল।

—যমটা আরো বলেছে খোকাকে আঁচড়ে দেবে; কি করা যায় বলত খোকা?

খোকা বললে—কাঠঠোকরাকে খবর দাও।

ছোট্ট টুনটুনি জিজ্ঞেস করলে—কেন?

এদিক ওদিক ঘাড়টা দুলিয়ে বুড়ো কাগ বললে—ঠিক বলেছ খোকা, ঠিক!

শুপুরী গাছের তলায় বসে কাঠবেড়ালী কুটুর কুটুর করে শুপুরী খাচ্ছিল, সে বললে—আমি ডেকে আনছি। ব'লে লাফাতে লাফাতে দৌড় মারলে।

একটুখানি পরে কাঠঠোকরারা এসে ছোট্ট টুনটুনির বাসার সামনের ডালটা কাটতে লেগে গেল—ঠক্ ঠক্ ঠক্।

বুড়ো কাগ উড়ে উড়ে যতরাজ্যের কাঁটা যোগাড় করে এনে সেই ডালটার নীচে মাটিতে পেতে রাখতে লাগল।

ডাল প্রায় যখন সব কাটা হয়ে একটু খানিক মাত্র বাকী রইল, তখন কাঠঠোকরারা কাজ বন্ধ করলে—সূর্য্যি তখন ডুবুডুবু। লাল আকাশের কোল ঘেঁসে কাঠঠোকরারা উড়ে গেল।

রাত নিশুতি। চারিদিক নিঝুম। শুধু একটা ঝিঁ ঝিঁ অনবরত ডাকছে, আর মাঝে মাঝে লক্ষ্মী পেঁচার হুম হুম শোনা যায়। গাছের আড়াল দিয়ে প্রতিপদের চাঁদ উঠেছে, মৃদু বাতাস ভয়ে ভয়ে কেঁপে কেঁপে বইছে। কালো বেড়ালটা পা টিপে টিপে ছোট্ট টুনটুনির দিকে এগচ্ছিল। তার চোখ দুটো জ্বলছে যেন ভাঁটা!

ছোট্ট টুনটুনি জেগে চুপ করে বসেছিল। তার নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় হচ্ছিল—যদি ডালটা না ভাঙ্গে!

ঐত যমটা দু'পা কাটা ডালে দিয়েছে। ডালটা একটু নুয়ে গেল বটে, ভাঙ্গল না ত! ভয়ে টুনটুনির গলা শুকিয়ে গেল। ঐত তিন পাও পড়ল, আজ আর

রক্ষে নেই। ঐ চারটে পাই পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হ'ল, মড় মড় মড়াৎ! ছোট্ট টুনটুনি ফুড়ুৎ করে উড়ে আর একটা ডালে বসল। কালো বেড়ালটা সেই উঁচু থেকে কাঁটার ওপর সশব্দে পড়ে গেল। বাছাধনকে আর মাথা তুলতে হ'ল না।

ও ডাল থেকে বুড়ো কাগ গেয়ে উঠল—ক্ক-ক্ক-কা-আ।

ছোট্ট টুনটুনি বললে—চীপ্ চীপ্ চীপ্, কি মজা!

ছাতারেরা বললে—কট্ টক্ কট্ ক্-র্-র্।

খোকা তখন মায়ের বুকে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিল—মানস সরোবরে যাচ্ছে, কত নদী, কত পাহাড়, কত খাড়া উঁচু উঁচু দেবদারু বন।

চোখের ভুল

(শ্রীসুবিনয় রায়)

চোখে যা' দেখি তাকে ভুল বল্‌ব কেমন করে?—সেটা যে স্পষ্ট দেখ্‌ছি! কিন্তু আমরা তো জানি আমাদের চোখ অনেক সময়ই ভুল দেখে; অর্থাৎ চোখে দেখে যে ধারণাটি হয়, আসলে ব্যাপারখানা কিন্তু তা' নয়। যে রাতকাণা, সে যদি বলে 'রাত্রে কোন জিনিষ দেখতে পাওয়া যেতে পারে না', তা'হলে তা'কে সকলেই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেবে। কোন কোন লোক এমন আছে, যারা একটা বিশেষ রং চোখে দেখে ধর্‌তে পারে না; সেটা তাদের চোখেরই দোষ। লাল রংকে সে হয়তো মেটে বা ছেয়ে রংএর দেখ্‌বে। সে যদি বলে, 'লাল রং আবার কি? রক্ত তো ছেয়ে রংএর; জবাফুলও ছেয়ে', তবে তাকে আমরা বিশ্বাস করব কি? এ রকমের বর্ণান্ধ লোকও দুনিয়ায় অনেক আছে।

এ তো গেল চোখের দোষের কথা; সাধারণ লোকের অনেকেরই চোখে এ দোষ নাই। কিন্তু দোষ না থাক্‌লেও যে চোখ ভুল দেখে তা'ও তোমরা অনেকে জান। "চোখের ধাঁধা" নাম দিয়ে অনেক রকমের ছবি অনেকবার "সন্দেশে"এ বেরিয়েছে; তা' থেকে তোমরা বুঝ্‌তে পেরেছ, অনেক সময় আমরা চোখে দেখে

যা' মনে করি, আসল ব্যাপার তা' নয়; অর্থাৎ গোল জিনিষটি হয়ত ডিম্বাকার দেখি, ছোট জিনিষটিকে বড় দেখি, ইত্যাদি। ঐ ধরণের আরো চারটি ধাঁধা এবার দিচ্ছি।

১। ছবিটিতে লম্বা দুইটি লাইন বাঁ দিকে লম্বা ক'রে টেনে দিলে যেন মিলে যাবে মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে লাইন দুটি সমান্তর (Parallel)। ঐ ট্যারচা ছোট ছোট লাইনগুলি থাকার দরুন সমান্তর লাইন দু'টি ঐ রকম দেখাচ্ছে। একবার মেপে দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে।



২। এই ছবিতেও কোণাকুণি লাইনগুলি সমান্তর; একবার মেপে দেখলেই বুঝ্‌তে পারবে। কিন্তু দেখে কি তাই মনে হচ্ছে? ঐ যে খাড়া এবং শোয়ানো ছোট ছোট লাইনগুলি, ওরই দরুন কোণাকুণি লাইনগুলি সমান্তর দেখাচ্ছে না।

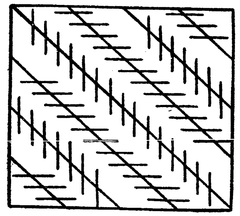

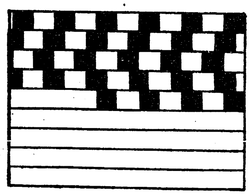

৩। এই ছবিটিতে কতগুলি সমান্তর লাইনের মাঝখানে কালো এবং সাদা চৌখোপী রয়েছে। এই চৌখোপীগুলো থাকার দরুন সমান্তর লাইনগুলি কেমন আঁকাবাঁকা দেখাচ্ছে, একবার দেখ।

৪। পাশের এই ছবিটিতে উপরে দেখান হয়েছে কয়েকটি ছোট ফুট্‌কির মাঝখানে একটি বড় ফুট্‌কি; নীচে, কয়েকটি বড় ফুট্‌কির মাঝখানে ছোট ফুট্‌কি। মাঝের ফুটকি দুইটিই সমান, কিন্তু উপরেরটি যেন অনেক বড় বলে মনে হচ্ছে।

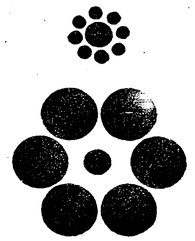

আরেকটি ব্যাপার এবার পরীক্ষা ক'রে দেখ। ক'খানা সাদা কাগজে ঘোর কালো কালী দিয়ে একটা বড় কিছু ছবি আঁক। বাঁ হাতে ছবির কাগজখানা ধর, আর ডান হাতে আরেকটি সাদা কাগজ ধর। এবার কালো ছবি খানির দিকে এক দৃষ্টে মিনিটখানেক তাকিয়ে সাদা কাগজটির দিকে চোখ ফিরাও; দেখ্‌বে, —সাদা কাগজে যেন কালো জিনিষটির ছায়া পড়েছে। কিন্তু জিনিষটি সাদা ও তার চারিদিকের জমী কালো। একটি টক্‌টকে লাল জিনিষের দিকে ঐ ভাবে তাকিয়ে থেকে, সাদা কোন দেয়াল বা অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি ফি'রালে সেই জিনিষটির একটি সবুজ ছায়া দেখ্‌বে। কট্‌কটে সবুজ জিনিষকে ঐ ভাবে দেখ্‌লে তা'র লাল ছায়া দেখা যায়।

"মরীচিকা"র কথা তোমরা অনেকেই জান। আমরা ছেলেবেলায় "পদ্যপাঠ"এ প'ড়েছিলাম।—

"মার্ত্তণ্ড ময়ুখমালা মৃত্যুর কিঙ্করী,
মায়াবিনী মরীচিকা যা'র সহচরী।"

উপরের দুটি লাইন মরুভূমির বিষয়ে লেখা হয়েছে। শুধু মরুভূমি কেন, শীতের দেশেও মরীচিকা দেখা যায়। মেরুর দেশে অনেক সময় ডবল মরীচিকা দেখা যায়। দূরে জাহাজ দেখা যাচ্ছে; আকাশে তা'র একটি উল্টো আর একটি সোজা ছায়া অনেক সময় দেখা যায়।

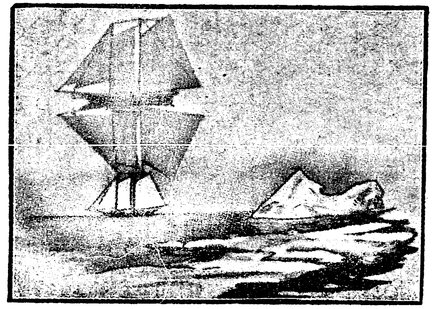

ডবল মরীচিকা—
জাহাজের উল্টো ও সোজা ছায়া
আকাশে দেখা যাচ্ছে

ইউরোপের সিসিলি দ্বীপের কূলে অনেক সময় আকাশে মরীচিকা দেখা যায়। সেখানে কাছেই সুন্দর সুন্দর মন্দির ও ঘরবাড়ী প্রভৃতি

আছে। আকাশে সেই সব ঘরবাড়ী প্রভৃতির ছায়ার মত দেখতে পাওয়া যায়।

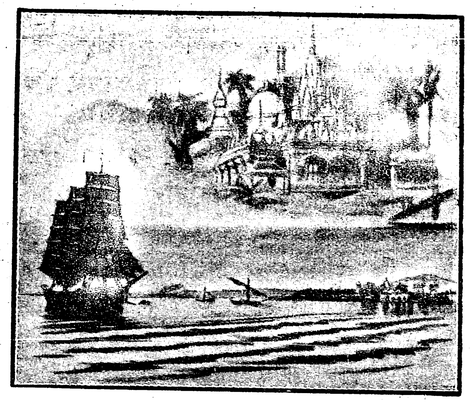

আকাশে ঘর-বাড়ীর ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে

এরোপ্লেনে আকাশপথে চলার সময় এরোপ্লেনচালক কোন কোন সময় মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এরোপ্লেনের একটি বিরাট ছায়া দেখ্‌তে পান। তা'র চারিদিকে রামধনুর মত সুন্দর রং দেখা যায়।

এই সব ছায়ার কারণ তোমরা সকলে এখন ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌বে না। তবে এইটুকু এখন জেনে রাখ, যে পর-পর গরম-ঠাণ্ডা হাওয়া থাক্‌লে এই ধরণের ছায়া দেখার সম্ভাবনা থাকে।

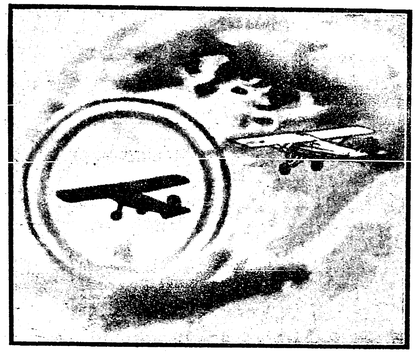

মেঘে এরোপ্লেনের ছায়া

শুধু চোখে দেখার উপর যদি বিশ্বাস করা যায় তা'হলে 'মরীচিকা'র পিছনে ছুটে গিয়ে মরুভূমিতে বিপদগ্রস্ত হবার খুবই সম্ভাবনা। সিসিলির আকাশ-ছায়া দেখে যদি মনে কর্‌তে হয় যে ইন্দ্রজালের সাহায্যে আকাশে ঘর বাড়ী মন্দির প্রভৃতি তৈরী করে সহর বসান হয়েছে, তা' হ'লে বোকা-বনা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

মুণ্ডু-ভাঙা কোম্পানী

(শ্রীপঙ্কজকুমার দাশগুপ্ত)

ঘনশ্যাম বললে,—"ন'পাড়ায় ভাল বাড়ী পেয়েছি, এ বাড়ী ছেড়ে ন'পাড়ায় যাবো।" যে কথা সেই কাজ! পরদিনই বিছানা-বাক্স বেঁধে রওয়ানা!

কিন্তু তিন দিন যেতে না যেতেই যখন ও আবার ফিরে এলো, তখন তো সবাই অবাক! মনে ভারি ফূর্ত্তি হ'লো; ওকে ছাড়া যে আমাদের আড্ডাই জমে না! জিজ্ঞেস করলুম—"কিহে ব্যাপার কী, ফিরে এলে যে?"

ঘনশ্যাম দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললে, "আর বলোনা ভাই! পিণ্টু হতভাগা কি আর থাকতে দিলে!" পিণ্টু ওর আদরের পোষা টিয়ে; তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম,—"কেন পিণ্টু কী করলে আবার?"

—"একশোবার করেছে! ওর জন্যেই তো পালিয়ে এলুম! কিন্তু সে অনেক কথা; কালকে বলবো 'খন।"

"আহা! এখনই বলোনা!"



ঘনশ্যাম খুব খানিকটা হেসে বললে,—বাড়ি পেয়েছিলুম সত্যিই ভাল, বিশেষ ক'রে শো'বার ঘরটা। খাট, বিছানা, জিনিষ-পত্তর সব গুছিয়ে নিলুম, আর পিণ্টুকে ঝুলিয়ে দিলুম বাইরের দিক্‌কার জানালার কাছে। ভেবেছিলুম ক'টা দিন থাকবো বেশ, কিন্তু তা'র কি আর যো আছে? বিকেলে আপিস থেকে ফিরেই দেখি, ঘরে ব'সে আছেন — মানুষ নয় যেন আস্ত একটি ওরাং-ওটাং। বয়েস আন্দাজ চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ হবে—ইয়া মোটা, কয়লা-কালো গায়ের রঙ, চুল

ছোট-ছোট ক'রে ছাঁটা, গলায় কম্পর্টার, আর বিশেষ ক'রে দেখবার জিনিষ হচ্ছে ওর গোঁফ-জোড়াটি ; তা' দিয়ে কমসে কম আঠারটা টুথ্-ব্রাস তৈরী হ'তে পারে !

খানিকক্ষণ শুধু আমার দিকে কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে রইল—চোখ দিয়েই যেন গিলে খাবে ! তারপর বাজখাঁই গলায় বললে, 'পাখী পোষা হচ্ছে যে ! বড় সৌখীন লোক হ'য়েছ দেখছি—কী হ্যাঃ, অ্যাঁ !' একথা বলেই হ্যাঃ হ্যাঃ ক'রে বিশ্রী রকম হাসতে লাগলো। হাসি শুনে অবশ্যি পিলে চম্‌কে ওঠে ! ভাবলুম, কথা নেই বার্ত্তা নেই একটা বনমানুষ এসে ঘাড়ে চেপে ব'সে বলছে 'পাখী পোষা হচ্ছে যে', পাগল নয়তো !

যা'হোক, গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস কর্‌লুম, 'কে ম'শাই আপনি ? পাখী পুষবো আমি তা আপনার কী ?'

দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, 'বটে ! এ পাড়ায় নতুন আসা হ'লো বুঝি ? হ্যাঃ হ্যাঃ, ঘটোৎকচ ভট্‌চায্যির নাম এখনও কানে পৌছায়নি তা'হলে ! তারপর রাগে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তার উল্টো দিকের বাড়ীটা দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঐ-ঐ-ঐদিকে একবারটি তাকাও তো বাছাধন ! ওটা দেখনি এখনো ? কেন, চোখের মাথা খেয়ে ব'সে আছ নাকি ?'

সত্যিই এর আগে বাড়ীটা নজরে পড়েনি। চেয়ে দেখি ছোট একটা দোতালা বাড়ী, তার সামনে এক সাইনবোর্ড ঝুল্‌ছে ; তা'তে লেখা আছে, 'অসহায় পশু-পক্ষীদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভা (ন'পাড়া ব্রাঞ্চ)।' আর তার নিচে বড় বড় অক্ষরে লাল রঙে লেখা—'রক্ত চাই, রক্ত চাই, পশু-পক্ষী নির্য্যাতনকারী নর-পশুদিগের মুণ্ড-মালা চাই !'

দেখেই প্রাণটা আঁৎকে উঠলো। বনমানুষের দিকে ফিরে চাইতেই সে হাত দিয়ে বুক চাপ্‌ড়ে বললে, 'সেক্রেটারী—আমি সেক্রেটারী—সব দেখেছি, নিজের চোখে আমায় সব দেখতে হয়েছে। আহা হা-হা, পিপাসায় সারা দুপুরটা ছট্‌ফট্ করে'ছে আর মাথা ঠুক্‌রে মরেছে রেঃ !' প্রায় ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদে আর কি !

ভাব্‌ছি কি কর্‌বো এই পাগলা শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে, এমন সময় হঠাৎ রুখে উঠে বললে, 'খুন কর্‌বো ! মানুষ খুন কর্‌বো ! খুন যে দু'চারটে না করেছি তাও নয়।' ব'লেই জামার হাত গুটোতে আরম্ভ কর্‌লে।

এবার রীতিমত ঘাব্‌ড়ে গিয়ে বল্‌লুম, 'তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কার কথা বল্‌ছেন, কে মাথা ঠুক্‌রে···?'

'কে ! কে !—যে বেচারীর ওপর অত্যেচার হয়েছে, যার ওপর গুণ্ডামী করে'ছ, যে নিরীহ পাখী—ওঃ হোঃ হোঃ··· !'

মনে হ'লো পিণ্টুর কথা বলা হচ্ছে। বল্‌লুম, 'কী পাগলামো কর্‌ছেন মশাই, আমার পাখী মর্‌বে বা বাঁচবে তাতে কার কী ?'

—'আর যদি তোমার মুণ্ডুটা থেৎলে দিই তাতে কার কী ? গুণ্ডামীর আর জায়গা পাওনা,—না ? ফের যদি দেখি ওকে না খেতে দিয়ে রাখা হয়েছে, ওর গায়ে হাত দিয়েছ, বা মনে কষ্ট দিয়েছ, তবে···তবে···' ব'লেই পকেট থেকে একটা হাতুড়ী বার করে টেবিলের ওপর ঠকাঠক্ ঠুক্‌তে লাগলো।

এবার সত্যিই চটে গিয়ে বললুম, 'বাঃ রে মশাই ! আমার পাখী আমি যা খুসী তাই করবো। আপনি আবার কোত্থেকে উড়ে এসে জুলুম করছেন ! আমি পাখী পুষবো আর উনি এলেন···'

—'চোপ্‌রাও ইস্‌টুপিট্—ছুছুন্দর ! পাখী আবার পোষা হচ্ছে ! পাখী যদি পুষবেই তবে দয়া দেখাবে কার ওপর শুনি—তোমার ওপর ? আজ শুধু সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আর এই দিয়ে যাচ্ছি আমার "কার্ড" আর আমাদের "নিয়মাবলী"। কিন্তু খবরদার ! পাখীকে শুধু দয়া দেখাবে—ওসব পুষতে টুষতে পারবে না বলে দিচ্ছি ; ন'ইলে—হাতুড়ী ঘোরাতে ঘোরাতে বললে,—'ন'ইলে দেখতেইত পাচ্ছ "খুলি চুর্ণকারী" প্যাঁচটা এখনও ভুলিনি !' আর পর সেই প্যাঁচটা প্রাক্‌টিস্ করতে করতে ঝড়ের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"নিয়মাবলীর" ওপর লেখা, "How To Show Kindness To Animals." আর তার নীচে ইংরেজীর বাংলা তর্জ্জমা। "কার্ড"এর ওপর লেখা, 'Ghatoth Kach Bhattacharjee, Branch Secretary, N.A.P.C.A. (First Prize Winner, Head-mashing competition).

মনটা গেল খারাপ হ'য়ে। ওপরে গিয়ে দেখি সত্যিই পিণ্টুর খাঁচার বাটিতে জল নেই। যাহোক ওকে জল খাইয়ে নিচের ঘরে নিয়ে এলুম। ঘটোৎকচের চোখের সামনে কিছুতেই আর রাখা হবে না। রাত্তিরে শুয়ে ভাবলুম এখন থেকে হয়তো নিশ্চিন্দি হওয়া যাবে। কিন্তু কপালে দুঃখু থাকলে অমন অনেক ঘটোৎকচ

মাটি ফুঁড়ে বেরোয় যে! তা'কি আর আগে জানতুম! সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই হারু এসে খবর দিলে কে একজন আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। দুর্গা নাম জপ্‌তে জপ্‌তে নিচে গিয়ে দেখি এক বুড়ো ভদ্রলোক চুপ্‌টি ক'রে ব'সে আছেন। আমায় দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এই যে নেড়াহরি, বেশ বাবা বেশ! দেখে বড্ড খুসী হলুম; কদ্দিন দেখিনি যে!'

এ আবার কি নূতন বিপদে পড়া গেল! জিজ্ঞেস করলুম, 'কে আপনি? আমিতো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছিনে, আর আমার নাম···'

'তা আর কী ক'রে পারবে বল! আজকালকার ছেলেরা যা সব হচ্ছে, কিছু কি আর মনে রাখতে পারে! তা আমি তোমার বাবার বিশেষ বন্ধু। রোজই ত একসঙ্গে হাওয়া খেতে যাই। কিন্তু তুমি তোমার নিজেদের বাড়ী ছেড়ে···'

'আজ্ঞে, আপনার একটু ভুল হয়েছে। কলকাতায় আমাদের নিজেদের কোনও বাড়ী নেই। আমি এখানে এখন কাজ করছি। আর আমার বাবা অনেক কাল হ'লো মারা গেছেন। কাজেই কী ক'রে আপনি তাঁর সঙ্গে এই ইয়ে—মানে হাওয়া খেতে যান সেটা বুঝ্‌তে···'

'হেঃ হেঃ হেঃ! তা আর কী ক'রে বুঝবে বলো? আজকালকার ছেলেদের বুদ্ধি নিয়েই তো জন্মেছ! বলি তোমার বাবা মারা গেলেন ব'লে কি আমার মুখটাও খেৎলে গেল? মুখ আছে হাওয়া খাও, দাঁত আছে চিবোও—বাস্! ল্যাঠা চুকে গেল! তা আবার বুঝবে কী? সে যাহোক, নিজের বাড়ী ছেড়ে এসেছ বলে তো আমি আর চুপটি ক'রে ব'সে থাকতে পারিনে! আমায় দু'বেলা এসে তোমার খোঁজ খবর নিতেই হবে—বিশেষ ক'রে তোমার বাবা যখন আমার বন্ধু! কী বলো হে নেড়াহরি?'

'আজ্ঞে আমার নাম নেড়াহরি নয়,—ঘনশ্যাম। আপনার নিশ্চয়ই একটু ভুল···'

'খালি তর্ক আর তর্ক! বলি নেড়াহরি সন্ধি-বিচ্ছেদ করলে ঘনশ্যাম দাঁড়ায় কিনা? ঘনশ্যাম না বলে যদি নেড়াহরি বলি তবে অন্যায়টা কী? থাক সে কথা—এখন থেকে তুমি···'

'চোর-র্-র্, চোর-র্-র্—'

দুজনেই চম্‌কে তাকিয়ে দেখি পিণ্টু ধেই ধেই করে নাচ্‌ছে আর বলছে—

চোর-র্-র্, চোর-র্-র্। হটাৎ বুড়োর মুখ খানা অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে, 'ওটা আবার কী?' মুখ কাঁচুমাচু করে বল্‌লুম, 'আজ্ঞে ওটা আমার পোষা পাখী।'

'হুঁ—এসব বিদ্যে শেখানো হচ্ছে বুঝি! নিজেরা তো জাহান্নমে গেছই, সঙ্গে সঙ্গে পাখীগুলোরও মাথা খাওয়া হচ্ছে,— না?'

'পাড়ায় বড্ড চোরের উপদ্রব বেড়েছিল কিনা, তাই ওকে চোর-চোর বলতে শেখানো হ'য়েছে। এখন লোক দেখলেই চোর বলে। আর ইয়ে··'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওসব ফাজলামো রাখো। তোমার ওটাকে শিগ্‌গির বিদেয় কর বলছি; আর তা ছাড়া কালই তোমার বাবাকে···'

'আজ্ঞে, আমি তো আগেই বলেছি আমার বাবা বেঁচে নেই। আর এই ধরুন···'

'আরে রাখোনা তোমার ধাপ্পা বাজী। কথাগুলো শেষ করতে দেবে না! এ-তো মহা-ন্যা-য়···'

'আজ্ঞে আমি জিজ্ঞেস করছিলুম আপনি কি রোজই আমার এখানে···'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তোমার এখানে আসবো না-তো যাবো কোন চুলোয়? আর এক কথা, এখানেও বড্ড চোরের উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, বুঝলে? তা তুমি আমার কাছেই না হয় তোমার টাকা কড়ি সব···'

'ট্যাঁ ট্যাঁ চুক্, চোর-র্-র্ চোব-র্-র্ ··'

এবার বুড়ো বিষম ক্ষেপে গিয়ে, মাথার ওপর ছাতা ঘোরাতে ঘোরাতে পিণ্টুর দিকে তেড়ে এলো, 'তবে রে ইষ্টুপিট, গোঁয়ার, ছুঁচো, আমি চোর? অ্যাঁ আমি চোর? এস না তোমার মুণ্ডুটা একটু ভেঙে দিই···!' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিহে, মতলব খানা কী শুনি? যত সব ইষ্টুপিট্···'

'আজ্ঞে আমার কি অপরাধ বলুন? এই পাখীটা···'

'দুত্তোর তোমার পাখী! কেন, ওটার মুণ্ডুটা বেশ ক'রে গুঁড়িয়ে দিতে পার না?'

'আজ্ঞে, মুণ্ডু গুঁড়োতে গেলে ওর বড্ড কষ্ট···'

'ফের জ্যাঠামো হচ্ছে! কিন্তু এই ব'লে গেলুম—হ্যাঁ! কাল যদি ওটাকে

দূর না কর, তবে আমি অনর্থ ঘটাব। হ্যাঁ, লম্বোদর মজুমদারকে এখনও চেনোনি দেখছি!' ব'লে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

ঘুম থেকে উঠেই এই কাণ্ড। মনটা যাচ্ছে-তাই রকম খারাপ হ'য়ে গেল। এক এক সময়ে নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল পিণ্টুটার মুণ্ডু দিয়ে ঝোল বেঁধে খাই। কিন্তু কী করবো! সারাদিন মন খারাপ ক'রেই বসে রইলাম।

পরদিন দুপুর বেলা বাইরের ঘরে ব'সে বই পড়ছি, এমন সময় একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখি, রাস্তা থেকে ছোট্ট একটি ছেলে পিণ্টুর দিকে চেয়ে তুড়ি দিচ্ছে আর বলছে, 'পড় রাধাকৃষ্ণ—চুক্-চুচুঃ—বল শ্রীরাম চন্দ্র।' ছেলেটিকে দেখে ভারি আনন্দ হ'লো। ও তো যাহোক পিণ্টুকে একটু আদর ক'রে ডাকলো। বুড়োগুলো কী যাচ্ছেতাই হয়েছে আজকাল; কথায় কথায় মেজাজ তিরিক্ষি হ'য়ে ওঠে, আর সুবিধে পেলেই মাথা গুঁড়িয়ে দিতে চায়। বললুম, 'এসোনা খোকা, ভেতরে খেলবে আমার পিণ্টুর সাথে।'

'হিঁ-ই-ই...'

'তা, তোমার নামটি কী?'

'হিঁ-ই-ই-...'

'হিঁ কিগো? আমি যে তোমার নাম জিজ্ঞেস করছি।'

'না-া-া-া-ম? নাম ক্যাবল কান্ত।'

'ক্যাবল-কান্ত! বাঃ বেশ নামটি তো!

'হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ, আর তোমার পাখীর নাম?'

'পিণ্টু।'

নাম শুনেই ছেলেটা চম্‌কে উঠলো। খানিকক্ষণ আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে হটাৎ 'ফুর-র্-র্ পিণ্টু ফু র্-র্' ব'লে তিনটে তুড়ি দিয়ে, তিনবার বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরে, ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর আমি ফ্যাল্-ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলুম। এ আবার কী নতুন কায়দা! পাড়াটা ছাড়তেই হবে দেখতে পাচ্ছি।

কতক্ষণ ওরকম ক'রে বসে ছিলুম ঠিক মনে নেই; হটাৎ রাস্তা থেকে হুস্ করে একটা হোঁৎকা মতন লোক ঘরে এসে উপস্থিত; আর পেছন পেছন এলেন শ্রীমান্ ক্যাব্‌লা। আমি কিছু বলবার আগেই লোকটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'নিয়ে এসো আমার পাখী, জল্‌দি—জল্‌দি, ন'ইলে ফ্যাসাদ ঘটবে বলে দিচ্ছি!

তা ছাড়া তোমায় যে অমনি ছাড়বো তা মনে কোরোনা; পুলিশে দেবো তবে আমার নাম বিরিঞ্চি সরকার। নাও এখন তাড়াতাড়ি কাজ কর দেখি।' ব্যাপারটা বুঝতেই আমার প্রায় পাঁচ মিনিট চলে গেল! তারপর জিজ্ঞেস কর্‌লুম, 'আপনার পাখী কী রকম ম'শাই? আপনি কোন পাখীর কথা বল্‌ছেন?'

'আহা-হা—বটে! ন্যাকা, যেন কিছুই জানেন না! বলি ম'শাই, যে পাখীটা তোমার ঘরে ঝুল্‌ছে তার কথাই বল্‌ছি, বুঝতে পার্‌ছেন এখন? না মুণ্ডুতে দু'ঘা দিয়ে বোঝাব?'

রাগে এবার আমার জ্ঞান হারাবার যোগাড় হ'লো। একদম ক্ষেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার পাখী তার প্রমাণ কি? এখানে জুচ্চুরি পেয়েছেন ম'শাই! খবরদার! আমার পিণ্টুকে ছোঁবেন তো আমিই আপনাকে পুলিশে দেব। বলা নেই কওয়া নেই অমনি পিণ্টুকে নিয়ে ভাগ্‌লেই হ'লো—না?'

'কি! ছোট মুখে বড় কথা হচ্ছে যে! প্রমাণ চাও? কেন, প্রমাণ দিতে পারবোনা মনে করেছ? এই নে তোর প্রমাণ, ড্যাম্-ফুল্ ছ্যাঁচ্‌ড়া কোথাকার! এই এক নম্বর—আমার পাখী ছিল নীল, তাকে সবুজ রঙ করে নিয়েছ। দু'নম্বর—আমার পাখী ছিল ময়না, তাকে একটা বাঁকা ঠোঁট লাগিয়ে করেছ টিয়ে। তিন নম্বর—আমার ভাগ্নে ক্যাবলার নাম আড়াই বছর আগে ছিল পিণ্টু, তাই এ পাখীকে পিণ্টু নাম দিয়েছ। হ'লো? দাও বলছি! দাও এখন পাখী—জল্‌দি লা'ও...'

'এই যে দিচ্ছি' ব'লে চেয়ারটা নিয়ে হতভাগাদের তাড়া করলুম। হোৎকা পালালো আগে, আর তার পিছু পিছু 'ফুর-র্-র্ পিণ্টু ফুর-র্-র্' বল্‌তে বল্‌তে পালালো ক্যাব্‌লা। পিণ্টু বললে চোর-র্-র্।

তারপর দিনই আবার বিছানা বাক্স গুছিয়ে এক্কেবারে সটান পুরোনো বাড়ীতে।

গল্প শুনে বললুম, পিণ্টুকে সবাই মিলে একজোড়া রূপার মল গড়িয়ে দেব। ঘনশ্যাম জিজ্ঞেস করলে 'কেন?'

বললুম, 'ওর জন্যেইত তুমি আবার আমাদের কাছে ফিরে এলে।'

"পারুল"

(শ্রীআহম্‌দ নওয়াজ, বি-এ, বি-টি)

ফুলের মতন সুন্দর সে যে
গুণের গন্ধে ভরা,
তাই বুঝি তার নামটী পারুল
পরাণ পাগল করা !

নামটী যেমন পারুল তেমনি
দেখিতে পারুল ফুল ;
শত গুণে ভরা লক্ষ্মী মেয়েটী
রূপের নাহিক তুল !

অমাবস্যার রজনীর প্রায়
কৃষ্ণ মাথার চুল,
পরিধানে লাল টুকটুকে সাড়ী
দুই কানে দুটি দুল।

'কুল কুল' আর 'মৃদুলা' 'মুকুল'
কেহ কেহ ডাকে তারে,
আরও কত নামে ডাকে কতজন
যাহা ভাল লাগে যারে।

সত্যি এখনও 'পারুল' মুকুল
বয়স নয় কি দশ্‌,
এত কচি মেয়ে তবু নিজ গুণে
করেছে সবারে বশ্‌।

বিষ্ণুপুরেতে পারুলের বাড়ী
শহরের যত মেয়ে,
পারুলের করে কত গুণ গান
অন্য সবার চেয়ে।

পারুলের মুখে সদা হাসি ভরা
পরাণে নাহিক রোষ ;
সকলেই তারে ভালবাসে তাই
রায়, সাহা, বোস, ঘোষ।

পারুল সদাই পাঠে দেয় মন
কখনো কুকথা জানে না,
এত কচি মেয়ে, সৎ চিন্তায়
তবু সদা নিমগনা।

ভোর না হতেই ফুল তুলে আনে
শিবের পূজার তরে,
লক্ষ্মীর মত ঘর আলো করি'
বিরাজিছে সুখে ঘরে।

মহাপুরুষের জীবনী শুনিতে
শুনিতে ধর্ম্মবাণী,
কোন দিন তার নাহিক ক্লান্তি
বুদ্ধিতে বীণাপাণি।

যুক্তি তর্কে মাথা কত তার,
কিছুতেই নহে কম,
প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করে সে
অবিরত,—হর্দ্দম।

পারুলের মত শুভ্র 'পারুল'
চিত্তে আবিল নাই ;
অফুরন্ত সুখে সদা করে স্নান
পুণ্যের ঝরণায়।

আহা যদি হতো বাঙ্‌লা দেশটী
এম্‌নি মেয়েতে ভরা,
ঘরে ঘরে তবে বহিত মধুর
গন্ধ পাগল-করা !

ভারতে বিলাতের ক্রিকেট দল

ইংলণ্ডের বিখ্যাত এম্-সি-সি ক্রিকেট-দল (Marylebone Cricket Club) সম্প্রতি ভারতবর্ষে ক্রিকেট্ খেল্‌তে এসেছেন। যদিও একটি ক্লাবের নাম নিয়ে তাঁরা খেল্‌তে এসেছেন, বাস্তবিকপক্ষে এঁরা ইংলণ্ডের বিভিন্ন দল থেকে বাছাই করা খেলোয়াড়ের দল। এঁদের সকলেই ব্যাটিং বা বোলিংএ বিলাতে খুব নাম করেছেন।

ক্রিকেটের জন্ম ইংলণ্ডে এবং বহুকাল ধ'রে ইংলণ্ডের লোক ক্রিকেটের চর্চ্চা করে আস্‌ছে; কাজেই এটি তাদের জাতীয় খেলা বলা যেতে পারে। সেখানে বহুলোকের ক্রিকেট খেলাই জীবিকা; ভাল খেল্‌তে পারেন ব'লে বড় বড় ক্লাবরা মাইনে দিয়ে তাঁদের নিযুক্ত করে। রীতিমত অভ্যাসের ফলে তাঁদের খেলারও খুব উন্নতি হয়। তা' ছাড়া, প্রতিবৎসর ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রতিযোগীতার খেলা হয় (County Cricket), এবং অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ্ প্রভৃতি দেশ থেকে বাছাই-করা দলও ইংলণ্ডে খেল্‌তে যায়। তা'র ফলে, ইংলণ্ডের খেলোয়াড়েরা খুব অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে থাকে। সেই দেশ থেকে বাছাই-করা খেলোয়াড়েরা এলে আমাদের দেশে তাঁরা যে প্রায় সব খেলাতেই জিত্‌বেন সে কথা বলাই বাহুল্য। এ পর্য্যন্ত যত খেলা হয়েছে তা'র একটিতেও এই দলের হার হয় নি। কেবল, পাতিয়ালার দল এম্-সি-সির চেয়ে বেশী 'রাণ্' করা সত্ত্বেও খেলা 'ড্র' (সমান সমান,—হার-জিত কা'রও নয়) ব'লে ধরা হয়েছে, কারণ খেলাটি শেষ হয়নি।



ডি, আর জার্ডিন

এম্-সি-সি দলের ক্যাপ্টেন ডি. আর জার্ডিন (D. R. Jardine) সাহেব।

এঁদের ভাল ব্যাট্স্-ম্যান্‌দের মধ্যে জার্ডিন, ওয়ালটার্স (Walters), ভ্যালেন্টিন (Valentine), বার্ণেট (Barnett), মিচেল (Mitchell), গ্রেগরী (Gregory), বেকওয়েল (Bakewell) প্রভৃতির, এবং বোলারদের মধ্যে ক্লার্ক (Clarke), নিকল্‌স্ (Nichols), ভেরিটি (Verity), ম্যারিয়ট (Marriott), টাউনসেণ্ড (Townsend), ল্যাংগ্রিজ্ (Langridge) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।



সি, কে, নাইডু

এম্-সি-সির দল ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ঘুরে সেই সব প্রদেশের বাছাই করা দলের সঙ্গে খেল্‌ছেন। তা' ছাড়া, তিনটি 'টেষ্ট-ম্যাচ' হবে;—বাছাই-করা ভারতীয় খেলোয়াড়-দলের সঙ্গে এই খেলা হয়। দুটি টেষ্ট ম্যাচ ইতিমধ্যে খেলা হয়ে গেছে। প্রথমটি বোম্বাইএ খেলা হয়; তা'তে এম্-সি-সির জয় হয়। এই খেলায় ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন সি, কে, নাইডু আর অমরনাথ খুব ভাল খেলেছিলেন; অমরনাথ একটি সেঞ্চুরিও (century) করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় দলের বল-ধরা (fielding) খুব ভাল হয়নি এবং ভারতীয় বোলারেরা ব্যাটিংএ কিছুই সুবিধা কর্‌তে পারেন নি। তা'র ফলে, প্রথম কয়জন খেলোয়াড় ব্যাট ক'রে 'আউট' হবার পর শেষের কয়জন খুব অল্প রাণ করেই আউট হয়েছেন এবং ফিল্ডিংএর দোষে এম্-সি-সির রাণও খুব বেশী হয়ে গেছে। ভাল খেলোয়াড় যখন বল্ মার্‌তে গিয়ে বল্‌টিকে শূন্যে তুলে দেন, তখন সে বল ধর্‌তে না পার্‌লে কেমন ক'রে চলে? হয়তো ৮।১০ রাণ করার সময় এই ঘটনা হ'লো; তারপর ব্যাট্স্ম্যান সাবধান হয়ে খেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, আর ৭০।৮০ রাণ ক'রে ফেল্‌লেন। বল্ মার্‌বার পর সেটিকে ধর্‌তে না পার্‌লে অনেক সময় অনর্থক ১ রাণের জায়গায় ৪ রাণ হয়ে যায়। এম্-সি-সির দলের ফিল্ডিং একটা দেখ্‌বার-মত জিনিষ। শুধু ক্যাচ

(catch) ধরায় নয় ;—মাটীতে বল্ থামাতে এবং বলের পিছনে দৌড়ে রাণ বাঁচাতে তাঁরা প্রত্যেকেই ওস্তাদ। ব্যাটিংএ তাঁদের প্রায় সকলেই কিছু না কিছু রাণ কর্‌বেন ব'লে ভরসা করা যায়। ৭।৮ জন আউট হ'য়ে গেলেও শেষের ২।৩ জনে প্রায়ই ১০০।১৫০ রাণ তুলে দেন।

দ্বিতীয় টেষ্ট-ম্যাচ্ কল্‌কাতায় হওয়ায় আমরা সেটি দেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই খেলায় ভারতীয় দলে খেলেছিলেন—

(১) সি, কে, নাইডু (C. K. Nayudu), ক্যাপ্টেন—জবরদস্ত ব্যাট্‌স্‌ম্যান ; বেশ ভাল বোলার।
(২) অমর সিং (Amar Singh)—খুব ভাল বোলার ; ব্যাট্‌স্‌ম্যানও মন্দ নন্।
(৩) ওয়াজির আলি (Wazir Ali)—ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যান ; খুব টিকে থাকতে পারেন।
(৪) নাউমল (Naomal)—ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যান ; দরকার হ'লে বল্‌ও দিতে পারেন।
(৫) দিলাওয়ার হোসেন (Dilawar Hussain)—উইকেট-কিপার ; ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যান —খুব হাঁক্‌ড়াতে পারেন।
(৬) মার্চ্চেণ্ট (Merchant)—ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যান।
(৭) সি, এস, নাইডু (C. S, Nayudu)—(সি, কে, নাইডুর ভাই) ; ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যান।
(৮) অমরনাথ (Amarnath)—জবরদস্ত ব্যাট্‌স্‌ম্যান ; বলও দিতে পারেন।
(৯) গোপালন্ (Gopalan)—ভাল বোলার।
(১০) মুস্তাক্ আলি (Mustaque Ali)—ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যান ; বলও দিতে পারেন।
(১১) নিসার (Nissar)—ভাল বোলার।

অনেকে বলেন, এমন খেলা তাঁরা জীবনে আর কখনও দেখেন্ নি। শেষের দুটি দিন অনেক লোকে যেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লোকের আগ্রহ, উৎসাহ, আনন্দ যেন সপ্তমে চ'ড়ে ছিল, খেলার ফল শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অনিশ্চিত ছিল। প্রথমে এম-সি-সি ব্যাট্ ধ'রে ৪০৩ রাণ্ করেন। তা'র পর দেশীয় দলেরা ব্যাটিং কর্‌তে গিয়ে খেলার প্রথমেই দিলাওয়ার হোসেন মাথায় সাংঘাতিক চোট পেয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন্। তারপর ক্রমে ক্রমে প্রথম টেষ্টের দুই বীর অমরনাথ আর ক্যাপ্টেন নাইডু আউট হন্ (অমরনাথ 'গোল্লা' করেন), এবং ওয়াজির আলিও আউট হন্ তখনও ১০০ রাণ উঠ্‌ল না, এবং আমাদের সকলের আশা একেবারে নিভে এল। পরদিন

সকালে মার্চ্চেণ্ট আর দিলাওয়ার হোসেন আবার খেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। ক্রমে খেলা জম্‌তে সুরু কর্‌ল। তখন সকলেই যেন ভারতের মান বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে খেল্‌তে লাগ্‌লেন। সি এস্ নাইডু, দিলাওয়ার হোসেন, মার্চ্চেণ্ট—এঁরা সকলেই খুব ভাল খেল্‌লেন ;—ফলে মোটের উপর ২৫৭ রাণ্ হ'লো। কিন্তু দুই পক্ষের রাণে ১৫০এরও বেশী তফাৎ থাক্‌লে কম-রাণ্-করা পক্ষকে রাণ পুরাবার জন্য আবার খেল্‌তে হয়। তাকে ইংরাজীতে বলে follow-on। দেশীয়দের এখন তাই কর্‌তে হ'লো। এখন এই আশা রইল যে মোট রাণ্ এম্-সি-সির প্রথম বারের রাণের চেয়ে বেশী ক'রে, এম্-সি-সিকে মোটের উপর তত রাণ করতে না দেওয়া। কিন্তু সেটা কি সহজ? একে মাথার উপর অত রাণের বোঝা, তা'র উপর এম্-সি-সির দারুণ বোলিং আর ফিল্ডিং!

শেষ দিনের খেলা আমাদের সকলের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ক্যাপ্টেন নাইডু, দিলাওয়ার হোসেন, সি-এস্-নাইডু, নাউমল, মার্চ্চেণ্ট—এঁরা সকলে মিলে সেদিন ভারতের মান বাঁচালেন। নাইডু আর দিলাওয়ার হেসেনের খেলা সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। নাইডু ঠুক্‌ঠাক ক'রে খেল্‌ছেন টিকে থাক্‌বার জন্য, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক খেলা ঠিক তার উল্টো। তিনি জানেন, টিকে থাক্‌লে তবে মান থাক্‌বে। দিলাওয়ার হোসেনের মাথায় পট্‌কা বাঁধা, দুদিন আগে চোট্ লেগেছে ; হাতে পট্টি, আঙ্গুলে বল লেগে জখম হ'য়েছে ; পায়েও চোট্,—কিন্তু তাই নিয়েই খেল্‌ছেন আর সুযোগ পেলেই বল পিটিয়ে ছাতু কর্‌ছেন! একবার তো এক মারে একেবারে বল্ বউণ্ডারি পার ক'রে ৬ রাণ্ কর্‌লেন! এইভাবে এম্-সি-সির চেয়ে মোট ৮০ রাণ বেশী হ'ল ; ভারতীয় দল আউট্ হ'য়ে গেলেন। আর আধ ঘণ্টা বাকি, এখন এম্-সি-সির খেলার পালা। তখন লোকের মনের অবস্থা সহজেই বুঝতে পার।



দিলাওয়ার হোসেন

এম্-সি-সিরা খেলা আরম্ভ ক'রতেই, প্রথম বলেই যখন গোপালন বার্ণেটকে 'ক্যাচ্' ধ'রে আউট কর্‌লেন তখন চারিদিকে যে হৈ চৈ আনন্দের সাড়া পড়্‌ল তা' একটা দেখ্‌বার মতন জিনিষ। তারপর আবার যখন ভ্যালেন্টিন আউট হলেন—মোট ৩ রাণ মাত্র হ'য়েছে—তখন আনন্দের চীৎকারে মাঠ ফাটার যোগাড়! তারপর আর অল্প সময়ই বাকী ছিল; আর মাত্র চার রাণ হ'লো। খেলা শেষ হ'তেই সকলে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে লাফালাফি, ছুটাছুটি, চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিল,—সকলেরই মনে "সাবাস দিলাওয়ার! সাবাস নাইডু! সাবাস খেলোয়াড়েরা! আজ তোমরা ভারতের মান বাঁচালে!" এইভাবে দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচ্ 'ড্র' রয়ে গেল।

এবারের টেষ্টম্যাচ্ দেখে মোটামুটি এ কথা বোঝা গেল যে বোলিংএ দেশীয় দলের লোক কম, অর্থাৎ খুব ভাল বল্ দিতে পারেন এমন লোক দেশীয় দলে কম আছে। নিসার এবার ভাল বল দিতে পারেন নি; অথচ, তিনিই নাকি আজকাল ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী জোরে বল দিতে পারেন (fastest bowler)। অমরসিং এবার খুব ভাল বল্ দিয়েছেন; সি, কে, নাইডু আর গোপালন্‌ও ভাল বল্ দিয়েছেন।

ফিল্ডিংএও মোটের উপর দেশীয় দল খুব ভাল কর্‌তে পারেন নি। এম্-সি-সিরা এ বিষয়ে অনেক ভাল। তাঁদের ফিল্ডিং বাস্তবিকই দেখ্‌বার মত জিনিষ।

ব্যাটিংএ কিন্তু দেশীয়েরা ভালই করেছেন। তাঁহাদের ব্যাটিং দেখ্‌তে এম্-সি-সির চেয়েও ভাল লাগ্‌ল আমার—বিশেষতঃ ২।৪ জনের খেলা। তবে অনেক সময় অসহিষ্ণু হ'য়ে এঁরা চট্ ক'রে আউট হয়ে যান, আর এম্-সি-সির খেলোয়াড়েরা খেলেন যেন সময়ের পরোয়াই নাই। 'সুবিধা পেলেই মারব, নইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মারবই না'—এইভাবের খেলা।

দেখা যাক, মান্দ্রাজে তৃতীয় টেষ্ট-ম্যাচের ফল কি হয়! আশা করি, দেশীয়েরা সেবার আরো ভাল খেলা দেখাবেন।

এম্-সি-সির অন্যান্য ম্যাচ্‌গুলির বিষয়ও পরে "সন্দেশে" কিছু লিখ্‌বার ইচ্ছা আছে। এবারে শুধু দুটি টেষ্ট-ম্যাচের বিবরণ কিছু দিলাম।



(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

সাত

টেলিফোনের তার

সহায়রাম চীৎকার করে বল্‌ল, "অজয় রাস্তা ছেড়ে মাঠ দিয়ে ছোট্, তাড়াতাড়ি যাবি।" অজয় মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটতে লাগল। সবুজ ঘাস, তার উপর দিয়ে আমি আর সহায় ছুটে চলেছি, সামনে ছুটছে অজয়। ইচ্ছা করেই আমরা জোরে ছুটিনি, তাহ'লে অজয় বেচারার অবস্থা যে কি হ'তো বুঝতেই পার।

সমস্ত ব্যাপারটা এদিকে মাথায় তালগোল পাকাচ্ছে। সহায় বল্‌ছে সত্যর সঙ্গে এর সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ঐ অতটুকু ছেলের এর সঙ্গে কি সম্পর্ক থাক্‌তে পারে? ব্যাপারটা যতই ভাবছি, দেখছি ততই জটিল হয়ে উঠছে। সত্যর কি সম্পর্ক থাক্‌তে পারে? যদিও হানাবাড়ীর বদ্‌নাম ছিল যথেষ্টই, কিন্তু সত্যি কেউ কোনদিন সাদা কাপড়ে ঢাকা লোক দেখেছে এ তো কেউ বলে নি, অথচ হঠাৎ এই ভূতের বাড়ীর উপরেই রোখ এত কেন? তা ছাড়া ··· অজয় আবার কী সংবাদ আন্‌ছে! ···এও কি এ রহস্যের একটা অংশ, না অন্য কিছু?

হঠাৎ অজয় একটা বুনো লতায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, সহায় ছুটে গিয়ে অজয়কে দাঁড় করালো। অজয় হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লো, "উঃ, যত তাড়াতাড়ি কর্‌তে চাই! উঃ·····"

সহায় কিন্তু বসে পড়ে লতাটাকে টেনে খুল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। অজয় অসহিষ্ণু হয়ে বল্‌লো "সহায়দা শীগ্‌গির!" সহায় মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লো, "রমেন, যা ভেবেছি ঠিক তাই, এই দেখ্, সেই তার মাটী থেকে উপর

দিকে উঠ্‌ছে।" বল্‌লাম, "তাহলে এসো দেখা যাক্ এ গেছে কোথায়।"—"নিশ্চয়ই" ব'লে সহায়রাম লাফিয়ে উঠ্‌ল, তারপর শীকারী কুকুর যেমন অপরাধীর পায়ের দাগ শুঁক্‌তে শুঁক্‌তে চলে সহায়ও ঠিক তেম্নি ভাবে সেই তার ধরে চল্‌লো। দেখা যাক্ এই টেলিফোনের তার এই শ'খানেক বছরের পুরাণো বাড়ীর ভেতর কেন? এযে দেখছি বরাবর আমাদের স্কুলের দিকেই ছুটে চলেছে; তবে কি—তবে কি—সত্য সত্যই সত্যগোপাল এই রহস্যের অনেক কিছু জানে? তবে কি সত্য এক বিরাট ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু—কিন্তু কি সে ষড়যন্ত্র?

সেই তার ধরে ছুটতে ছুটতে মাঠ ছেড়ে ছোট একটা ফুলবাগানে এসে পড়লাম, স্কুলের ঠিক পিছনে। স্কুলের আগের রেক্টরের বড় সখের বাগান ছিল ওটা। এখন মালীরা দয়া করে জল দিয়ে গাছগুলি মাত্র বাঁচিয়ে রেখেছে এই যা। একটা মস্তবড় বটগাছের নিচে এসে সেই তার শেষ হয়েছে। দেখি ঠিক একটা লতা বটগাছের আগার দিকে উঠে গেছে। সহায় বল্‌লো, "সাবধান, সব সরে দাড়াও।" আমরা তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, আমাদের সামনে ছোট কতকগুলি গাছ পুতবার জন্য মাটী আল্‌গা করে দেওয়া হয়েছে, সেখানকার কাদায় একটি পায়ের দাগ। সহায়ের দিকে চাইতেই সে অজয়কে বল্‌লো, "এই নে আমার চাবি, আমার টেবিলের নীচে প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস্ আছে, নিয়ে আয়; আর রমেন, শিগ্‌গির তোর চাবি দে।" আমি আমার চাবিটা অজয়ের হাতে দিলাম। সহায় অজয়কে বললো, "চার নম্বর ঘর থেকে সত্যর একপাটী জুতো··· হ্যাঁ, দাঁড়া···", ব'লে সে সেই দাগের কাছে গিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগ্‌লো; বল্‌লো, "হুঁ, বাঁ পাটীটা নিয়ে আয়। যা, ছুট্টে যা।"

অজয় ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ব্যাপারটা দেখছিলো, বল্‌লো, "সহায়দা···"

—"ফের বক্‌বক্ কর্‌বিতো মার খাবি, শীগ্‌গির যা।"

অজয় জান্‌তো যে সহায় একবার চটে গেলে আর রক্ষে নেই, হাতের কাছে যাকে পায় তা'রই পিটে দু'ঘা বসিয়ে দ্যায়। সে মারের ভয়ে স্কুলের দিকে ছুট্‌লো।

সহায় গাছটার চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে বল্‌লো "রমেন! এখন বুঝতে পারছি সত্য 'ভুদেবে' কেন এসেছে।" সত্য বলেছিল 'রেক্টর লিখেছেন,—না? আর আমি বলছি সত্য লিখেছিলো তাকে যেন ভুদেবে দেওয়া হয়। দেখেচিস, চার নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে, প্রিফেক্টের ঘরের পাশের ছোট রাস্তাটা দিয়ে বাইরে

বেরুলেই এই গাছটা। ওঃ তা'র কি সুবিধেই, কিন্তু·····

অজয় হাঁপাতে হাঁপাতে এলো, এক হাতে সত্যর একটা টেনিস সু আর অন্য হাতে একটা প্ল্যাষ্টার অব্ প্যারিসের টিন। সহায় প্ল্যাসটার বার করে আমার পিঠের ফ্লাস্কটা থেকে জল নিয়ে কাদার মত তৈরী ক'রে ঢাল্‌তে লাগলো, একবার দুবার, তিনবার; এ রকম ক'রে বার কয়েক ঢেলে সে বল্‌লো "এতেই হবে, কিন্তু আমি যা ভেবেছি নিশ্চয়ই তাই।" তারপর জুতার সোল (Sole) ভাল করে দেখতে দেখতে মৃদু হেসে বললে, "বাঃ, যা ভেবেছি তাই। দু জোড়া জুতোর যে জোড়া পায়ে দিয়ে সে এখানে আসে, সে জোড়া সে অন্য সময় পরে না, পাছে তার পায়ের ছাপ অন্য লোকের কাছে জানা হ'য়ে যায়। কিন্তু তাই তার কাল হ'লো।" তারপর সে আস্তে আস্তে প্ল্যাষ্টারের ছাপটা তুলে নিলে। সেটাকে ভাল ক'রে মেলাতে মেলাতে ব'ললো, "বা, দেখ্ রমেন, এই দেখ্ তিন নম্বর ফুট্‌কী একটু অস্পষ্ট, এতেও একটু অস্পষ্ট। তারপর এই দেখ পা ঠিক মিলে যাচ্ছে। হিল্‌টার এদিক একটু ক্ষয়ে গেছে, ছাপেও বল্‌ছে তাই। বাঃ, এ সত্যের না হ'য়েই যায় না।" সে সগর্ব্বে আমার দিকে চাইলে। তবে কি সত্য সত্যই সত্য-গোপালের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে এই ভূতের? কিন্তু কেন? কি তার মতলব?



সহায় ব'ললো, "বেশ, এবার দেখা যাক উপরে কি আছে।" সে তড় তড় ক'রে গিয়ে উপরে উঠলো, ঠিক যেখানটায় চার পাঁচটা ডাল বেরিয়ে গেছে চারিদিকে ; সেখানটায় জায়গা আছে, বেশ বসা চলে। সহায় সেখান থেকে একটা টেলিফোনের কল তুললো, তার উপরে একটা সদ্য নূতন রিসিভার। আমি আর অজয় হ'া ক'রে তাকিয়ে রইলাম।

সহায় অট্টহাস্য ক'রে ব'ল্লো, "হাঃ হাঃ, যা ভেবেছি তাই, এখন দেখতে হবে বাছাধন, কার কাছে টেলিফোন করেন। অজয় তুই উপরে উঠে আয়, দেখ্‌ছিস্, এখান থেকে পোড়োবাড়ীর উপরটা বেশ দেখা যায় ? যখন আমি সেখান থেকে রুমাল নাড়্‌বো তুই তখন এই রিসিভার তুলবি, ঘড়ি দেখে ঠিক দুমিনিট ব'সে থাকবি। তারপরে আবার ঠিক জায়গায় রিসিভার রেখে হোষ্টেলে চলে যাবি। আমি এখুনি যাচ্ছি।" তারপর আমার দিকে চেয়ে ব'ললো, "আয় রমেন।"

আমি আর সহায় ছুটতে লাগ্‌লাম সেই বাড়ীর দিকে। কদ্দূর গিয়ে সহায় ব'ল্‌লে, "রমেন, এবার আমরা মেন গেট দিয়ে ঢুক্‌বো না। পেছন দিয়ে ঢুক্‌তে হবে, কেউ না দেখতে পায় ; চল্!" আমি তার পিছন পিছন চ'ললাম। উঃ, পোড়ো বাড়ীটার পেছনে কি জঙ্গল! দিনের বেলাতেও কী ভীষণ অন্ধকার! পথতো নেইই। অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে ডালপালা সরিয়ে এগোতে লাগলাম্। কি ভীষণ ভাবে যে সেদিন সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটেছি তা আমরাই জানি, সারা শরীর ছ'ড়ে গিয়ে একেবারে গা রক্তময় হ'য়ে উঠলো। সহায়রামের এসব দিকে লক্ষ্য নেই, সে এগিয়েই চল্‌লো!

ঘুরে ঘুরে যেখানে এসে পড়লাম সেখানেই সেই তার মাটিতে ঢুকেছে। তারটা কোন্‌দিক দিয়ে আস্‌তে পারে তাই দেখছি, হঠাৎ সহায় "পেয়েছি" ব'লে লাফিয়ে উঠ্‌লো। দেখি কতদূরে ঠিক আগের মত আর এক খণ্ড ঝুতা। কিছুদূর গিয়ে দেখি সেই তারটাই ঘুরে আবার পোড়ো বাড়ীটার দিকে গিয়েছে। সহায় খানিকক্ষণ তা'র দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হেসে বল্‌লো, "উঃ, আমি কি বোকা রমেন, একটা তারই ঘুরে গেছে, তা'রই দুমাথা দুদিকে গেছে। এই তার এ বাড়ী থেকে ঐ গাছ পর্য্যন্ত। আর ..."

সে আমায় নিয়ে ছোট্ট ঘরটায় ঢুকিয়ে বললো, "তুই এখানে থাক্, কোন শব্দ হয় কিনা শুনবি, আমি উপরে চল্‌লাম।" এতক্ষণ পরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম,

কিন্তু আবার সেই—সেই অনিশ্চিতের প্রতীক্ষা!...একমিনিট...সারা শরীর জ্বালা ক'রছে ;...উঃ...সময় যেন আর যায় না! ওকি, ঝন্ ঝন্ ঝন্ ক'রে মৃদু আওয়াজ হ'চ্ছে না ? কিন্তু কোথায় ... কোথায় ? সহায়রাম এসে দেওয়ালে কান দিয়ে শুনতে লাগ্‌লো ; বললো, "পেয়েছি, যা ভেবেছি ঠিক তাই। এবার চলো হোষ্টেলে।" আমি বললাম, "স্যার... ?"—"স্যার কিছু বলবেন না, চলো।"

আট

নতুন রহস্য

হোষ্টেলে এসেই সহায়রাম আমায় ঠেলে পাঠিয়ে দিল বাথরুমে, নিজে অজয়কে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুক্‌লো। যখন বেরিয়ে এলাম বাথরুম থেকে, তখন দেখি সহায়ও স্নান ক'রে তৈরী।

আমি বললাম, "খবর কিহে সহায়রাম ? অজয় এমন কি সংবাদ দিল ?"

"তেমন বিশেষ কিছু নয়—আয়।" ব'লে তা'র ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়তে ব'লে, তা'র একটা ড্রয়ার ধ'রে টান দিলে। কিন্তু ড্রয়ারটা খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠলো।—মুখখানা একেবারে সাদা। আমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম্ ; বললাম্, "ব্যাপার কিহে সহায়রাম ? হঠাৎ....."

সে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো, তা'র মুখখানা কঠিন হ'য়ে উঠলো, রাগে সারা শরীর কাঁপতে লাগলো, দরজাটা খুলে ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে গেল ; সোজা গিয়ে উঠলো অজয়ের ঘরে।

অজয়ের ঘাড় ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনী দিয়ে বল্‌ল "অজয়, আর কারও কাছে তুই চিঠির কথা বলেছিলি ?" অজয়ের মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো, ভয়ে বেচারার মুখ শুকিয়ে গেল। সে ভয়ে ভয়ে বললো, "আমার কোন দোষ নাই সহায়.....।"

সহায় আর একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনী দিয়ে বললো, "ভূমিকা শুন্‌তে চাইনা ; বল্, সত্যকে বলেছিস্ কিনা ?"

—"হাঁ—এ—এ"

সহায় আর কোন দিকে চাইলো না, ছুটে চল্‌লো আমাদের ঘরের দিকে। ব্যাপারখানা কি ? সহায় পাগলের মত সারা হোষ্টেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন ?

অর্দ্ধেক পথ গিয়ে সহায় যেন কি ভাব্‌লো, হঠাৎ ঘুরে বল্‌লো, "আঃ, কী বোকা আমি।" তারপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার ঘরে ফিরে চলল।



আমি শঙ্কিত ভাবে সুধালাম, "ব্যাপার কিহে সহায়, পাগলের মত এরকম ঘুরছই বা কেন, আর .. ..?"

সহায় একদৃষ্টে কতক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলো। সে যেন মনে মনে কি একটা মতলব ঠিক ক'রছে। তারপর হঠাৎ ব'ললো, "রমেন, ব্যাপারটা আমি যা ভেবেছিলুম, ঠিক তাই।— সত্যগোপালকে নিয়ে যে একটা ভারী ষড়যন্ত্র চ'লছে তাতো বুঝ্‌তেই পারছো। অজয় তোমাদের কাছে একটা অদ্ভুত কার্ড প'ড়ে থাকতে দেখে তারই খবর দিতে আমার কাছে ছুটেছিল। চিঠিটাও সে দিয়েছিল আমার কাছে—তাতে ছিল কয়েকটা ছবি। কিন্তু সে ছবি চুরি হ'য়ে গেছে ; আমার এখানে ছিল, এখন আর নাই।" আমি অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম ; বল্‌লাম, "আচ্ছা সহায়, কে নিয়েছে চিঠিটা— ?"

সহায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো, টেবিলে একটা চড় দিয়ে ব'ল্‌লো, "সব জানতে পারবি, এখন একটা নোটিশ দিতে হবে ;—ঘরে যা, সবই জানতে পারবি। হ্যাঁ,—আর একটা কথা—," ব'লে সে একেবারে আমার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ল, তারপর কানে কানে ব'ললো, "হঠাৎ কোন দিন তোদের ঘরে রাত্রে আমায় দেখলে কিন্তু চম্‌কে যাস্‌নে ;- যা।"

আমি অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

সে একটু রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বল্‌লো,—"যা "।

—(ক্রমশঃ)

বড়দিনের উপহার

(শ্রীকুমারেন্দ্রনাথ সরকার, বি-এ)

কাল 'বড়দিন'। ভগবান যীশুর জন্মোৎসবে প্রত্যেক খৃষ্টানের বাড়ী আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে। আমোদ আহ্লাদের যেন আর শেষ নেই। শুধু 'ডেলা'র মুখখানি ভার। সহরে প্রান্তে একটা জীর্ণ এঁদোপড়া বাড়ীর দোতলার ঘরে, ভাঙ্গা একখানি কোচে ব'সে সে আকাশ পাতাল কত কী ভাব্‌ছে। সব চেয়ে তাকে ব্যথা দিচ্ছে—কাল সে 'জিম্‌'কে কি উপহার দেবে, এই ভাবনা। কাল যে বড়দিন।

জিম্‌ হ'ল ডেলার স্বামী। ঐ এক জিম্‌ ছাড়া ডেলার সংসারে আর কেউ নেই। সদাগরী আফিসে সামান্য কেরাণীর কাজ ক'রে জিম্‌ মাস গেলে গোটা কুড়ি টাকা আনে,—আর তাইতে কোন রকমে তাদের দুটীর সংসার চ'লে যায়। জিমের বাপ-ঠাকুর্দ্দার অবস্থা বেশ ভালই ছিল শুন্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁরা নাকি জিমের জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। জিমের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে কেবল একটা জিনিষ সে পেয়েছে—তার ঠাকুর্দ্দার একটা জমকালো সোণার ঘড়ী। সেটা জিম্‌ নিত্যই ব্যবহার করে—আর বেশ গর্ব্বের সঙ্গে।

ডেলা মেয়েটীও ভারী লক্ষ্মী। তার ছোট্ট সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটী কাজ সে হাসিমুখে ক'রে যায়। দুঃখু যেন তার কাছে ঘেঁস্‌তে সাহস পায় না। তার ওপর তার কী সুন্দর চেহারা—কী সুন্দর ঘন কালো চুল, আর সে চুলই বা কী লম্বা! যখন সে এলোচুলে থাকে, মনে হয় যেন কে তাকে একটা কালো ঘাঘ্‌রা পড়িয়ে দিয়েছে। তার ঐ লম্বা চুলগুলি জিমের ভারী প্রিয়।

আজ কিন্তু ডেলার দুঃখের আর সীমা নেই। কাল কত মেয়ে তাদের স্বামীকে কত সুন্দর সুন্দর দামী দামী জিনিষ দেবে! ডেলার কিনা আজ সম্বল মাত্র একটী টাকা আর গণ্ডা দু'য়েক পয়সা—যা' সে জল খাবারের খরচ থেকে বাঁচিয়েছে। হায়, এত কম দামের তুচ্ছ জিনিষ কি কাউকে দেওয়া যায়—বিশেষত জিম্‌কে, যে যাকে এত ভালবাসে! ডেলার চোখের জল তার গাল দুটী বে'য়ে প'ড়তে লাগ্‌ল।

"হা ভগবান্‌!" ব'লে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ডেলা রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ল—

জিনিষ কেন্‌বার জন্যে। "এই আঠারো আনা দামের যা পাই তাই কিনে নিয়ে আস্‌ব। কম দাম ব'লে কি স্বামী আমার সে দান প্রত্যাখ্যান ক'রবেন—না, না, কখনও না। ভালোবাসার দানের মূল্য কি টাকা পয়সা দিয়ে হিসেব করা যায়?"

হঠাৎ তার চোখে প'ড়ল একটা দোকানের সাইন বোর্ড। তাতে লেখা আছে, "মাদাম্ সফ্‌রোনী, আমরা চুল ক্রয় বিক্রয় করি"।—"বাঃ, এইত ঠিক হ'য়েছে। আমার লম্বা লম্বা চুল আছে—বিক্রী ক'রলে নিশ্চয়ই অনেকগুলো টাকা পাব"। ডেলা তাড়াতাড়ি দোকানে ঢুকে মাদাম্‌কে বল্লে, "ওগো, তোমরা আমার চুল কিন্‌বে? আমার খুব লম্বা চুল।"

—"কৈ দেখি কি রকমের লম্বা চুল তোমার। টুপিটা খোল দেখি।"

টুপি খুল্‌তেই ডেলার চুল তার হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত এলিয়ে প'ড়ল। বাঃ, কী সুন্দর কোঁকড়ান চুল! ঠিক যেন নদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউ ভেসে যাচ্ছে।

—"কত চাও বাপু? আমি কিন্তু পঁচিশ টাকার বেশী দিতে পারব না ব'লে দিচ্ছি।"

পঁচিশ টাকা! ডেলা স্বপ্নেও পঁচিশ টাকা এক সঙ্গে দেখেনি।

—"বেশ, তাই দাও আমায় শীঘ্র ক'রে মাদাম্। আমি ওর বেশী চাই না।"

নিমেষের মধ্যে মাদামের কাঁচিজোড়া কচ্ কচ্ ক'রে ডেলার চুলগুলো কেটে ফেল্লে। আহা! চুলগুলো জিমের কত আদরেরই ছিল!

পঁচিশটী টাকা নিয়ে ডেলা হন্ হন্ করে বাজারের দিকে ছুটলো। পাকা দুটি ঘণ্টা ঘুরে একটা সোনার ঘড়ীর চেন্ কিন্‌লে। দোকানী দাম নিলে ছাব্বিশ টাকা। দু'আনা পয়সা ও ঘড়ীর চেন্‌টী নিয়ে ডেলা বাড়ী ফিরলো।

এখন তার প্রাণে ভারী স্ফুর্ত্তি! মনটাও বেশ হাল্কা হয়েছে—জিমের উপযুক্ত উপহার সে যোগাড় ক'রেছে কিনা। চেন্‌টা জিম যখন ঘড়ীতে লাগিয়ে পড়বে, তখন তার কী আনন্দই না হবে!

দেয়ালে টাঙ্গানো ভাঙ্গা আর্শিটায় চোখ পড়তে ডেলা চম্‌কে উঠলো—নিজেরই রূপ দেখে। ছি, ছি, সে ক'রেছে কি? তার স্বামী ঐ রূপ দেখে কি বল্‌বেন? মাদাম, তাকে কি কুশ্রীই ক'রে দিয়েছে। ভাল ক'রে চুল আঁচ্‌ড়ে আবার আয়নার সাম্নে দাঁড়ালো। আয়নাখানা যেন বিদ্রূপ ক'রে ব'লে উঠল, "ডেলা, স'রে যাও। তোমার মুখে মেয়েলি ভাব আর নেই। তোমার সমস্ত

সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'য়ে গেছে। এখন তোমার মুখটী দেখাচ্ছে ঠিক একটী দুষ্টু ইস্কুল-পালানো ছেলের মত। ছি, ছি, ছি!" ডেলা আর কী করে? কোনও উপায় ত' আর এখন নেই। প্রাণ থাক্‌তে সে যে জিম্‌কে আঠারো আনার জিনিষ দিতে পারত না।

সন্ধ্যা হয়েছে, জিমের বাড়ী ফেরারও সময় হ'য়েছে। ডেলা টেবিল্‌টার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লো। হাতে তার সেই চেন্‌টা—জিম্ ঘরে ঢুক্‌লেই তার ঘড়ীতে পরিয়ে দেবে। সিঁড়িতে জিমের পা'য়ের শব্দ শোনা গেল। ডেলার বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠলো—"ছি, ছি! জিম আমার এই পোড়ামুখ দেখে কি ভাব্‌বে! হয়ত কত বক্‌বে।"

দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই জিম থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল—যেন কাঠের পুতুল! মুখে কোনও কথা নেই; আর তার চোখ দুটো হতভম্বের মতন ডেলার চুলকাটা মাথাটার দিকে একদৃষ্টে চে'য়ে রইলো। কিন্তু কই, জিম্ ত রাগ করলে না। ডেলাকে বক্‌লেও না ত'। ডেলার বড় ভয় ক'রতে লাগ্‌লো।

ছুটে জিমের কাছে গিয়ে ডেলা বল্লে, "জিম্, আমাকে ক্ষমা করো। বড়দিনের দিন তোমাকে একটা ভাল উপহার না দিলে আমি কিছুতেই থাক্‌তে পারতুম্ না; তাই আমি আমার চুলগুলি কেটে বিক্রী ক'রে টাকার যোগাড় ক'রেছি। আমাদের 'বড়দিন' সুখের হোক্—কি বল জিম্? জান, তোমার জন্যে কী সুন্দর একটা জিনিষ এনেছি?"

"য়্যাঁ! তুমি চুল কেটে ফেলেছ, ডেলা?"

"হ্যাঁ জিম্, কেটে বিক্রী ক'রেছি। তুমি অত ভাব্‌ছ কেন, জিম্? আমার চুল ত' আর নষ্ট হ'য়ে যায়নি; আবার বাড়বে, দেখো।"

জিম্ গম্ভীর হ'য়ে রইলো, কোনো কথা বল্লে না।

"জিম্, তুমি কি আমায় ভালবাস না? তুমি বুঝি আমার চুলগুলোকেই ভালবাস্‌তে?" ডেলা আর থাক্‌তে পারলে না। মুখ নীচু ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল।

"ছি ডেলা, কেঁদ না।" পকেট্ থেকে কাগজে মোড়া একটা জিনিষ বের ক'রে জিম্ ডেলাকে কাছে টেনে নিয়ে তার হাতে গুজে দিলে। "জানো ডেলা, ঐ জিনিষটার জন্যে আমি সারা সহরটা আজ চ'ষে বেড়িয়েছি।"

চক্ষের নিমেষে ডেলার কোমল আঙ্গুলগুলি মোড়কের বাঁধন খুলে ফেল্লে, আর তার থেকে বেরিয়ে এল কী সুন্দর একখানা মাথার চিরুণী! সোণা দিয়ে বাঁধানো, আর তার মাঝখানটায় কতকগুলো চুণী, পান্না আর মুক্তো জ্বল্‌জ্বল্ ক'রছে। ঠিক্ এমনি একখানা চিরুণী ডেলা একদিন একটা দোকানের 'শো-কেসে' বার বার দেখেও আশ মেটাতে পারে নি; মনে মনে কত ভেবেছিল, "আহা অমন চিরুণী আমার যদি একখানা থাক্‌ত!" সেই সাধের চিরুণী আজ ডেলার মুঠোর মধ্যে; কিন্তু হায়, আজ আর সে তা' প'রতে পারবে না—তার যে চুল নেই!

"ওঃ, জিম্‌কে ত আমার উপহারটা দেখান হয়নি!" চকিতের মধ্যে ডেলা হাতের মুঠো খুলে জিম্‌কে ঘড়ীর চেন্‌টা দেখালে। "কেমন, সুন্দর না? দাও দেখিনি তোমার ঘড়ীটা, আমি পরিয়ে দি।"

"ঘড়ী?"—একটু হেসে জিম্ ডেলার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো।

"আমিও কি তোমায় একটা ভাল জিনিষ না দিয়ে থাক্‌তে পারি ডেলা? কাল যে বড়দিন। ঘড়ী বেচে তোমাকে আমার বড়দিনের উপহার দিলুম, বুঝ্‌লে।" *

(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

আত্মদান

(শ্রীমতী বেণু গুপ্ত—গ্রাহক নং ১)

হল্‌দিঘাটের প্রান্তরেতে
রাজপুতেরা উঠলো মেতে
জন্মভূমির মান রাখিতে
করতে আত্মদান।

(* ও হেন্‌রীর ইংরাজী গল্প "দি গিফ্‌ট অব্ দি মেগাই" অবলম্বনে)

ছুটিয়ে ঘোড়া পাহাড় 'পরে
রক্ততিলক ভালে ধ'রে
মহান্ শপথ হৃদে ক'রে
চল্‌ছে দিতে প্রাণ।
জীবন যেন খেলার জিনিষ
নেইকো কোন দাম।

এরা মিবার মায়ের ছেলে
তাইতো আজি অবহেলে
গৃহ ছাড়ি' যুদ্ধে চলে
হস্তে তরবার।
শ্বেতাশ্বেতে আরোহিয়া
চিরতরে বিদায় নিয়া
চল্‌ছে মহা উল্লাসেতে
দুলাল মিবার মা'র;
মরণ সনে এতো প্রীতি
কাহার আছে আর?

রক্তে মাটি সিক্ত ক'রে
জন্মভূমির অঙ্ক 'পরে
করলো শয়ন সন্তান তাঁর
হাস্যমুখে আজ;
জন্মভূমির দুলাল এরা
অঙ্গে বীরের সাজ।

ছুটলো ঘোড়া শত্রু মাঝে
জিনের 'পরে বীরের সাজে
মিবার রাণা প্রতাপসিংহ
স্থির ও অটল ধীর।

রাজছত্র শোভে মাথে
লক্ষ্য করি উল্লাসেতে
বাঁধভাঙ্গা ঐ জলের মতই
ছুটলো মোগল বীর।
একা রাণা প্রতাপসিংহ
মাঝে অরাতির।

এমন সময় রাণার পাশে
কে দাঁড়ালো মৃদু হেসে
ঝালাকুলের মুকুটমণি
তুচ্ছ করি' প্রাণ!
বল্লে রাণায় "হে মহারাজ,
অনুগ্রহ চাইতেছি আজ
স'রে তুমি দাঁড়াও, আমায়
ছত্র করি' দান,
সেবক তোমার মান্না আমি
দিব আমার প্রাণ।

"মহান্ তুমি, রাণা তুমি,
স্বাধীন করো জন্মভূমি,
অসময়ে মরণে আজ
কেন বরি' লবে?
যাচ্ছি আমি, আমার মত
অনেক মান্না হবে।"

সূর্য্য তখন পশ্চিমেতে,
হল্‌দিঘাটের প্রান্তরেতে
বাইশ হাজার বীরের সনে
শায়িত সেই বীর,
বিজয় মুকুট মাথে, গলে মালা
জয়শ্রীর।

গল্প-স্বল্প

কতখানি টক—সব জিনিষ মাপার যন্ত্র বেরিয়েছে, টকের কম-বেশী মাপার জন্যই বা যন্ত্র থাক্‌বে না কেন? হ্যাঁ, তা' তো আছেই। হিচ্‌কক্ সাহেব নামে একজন এঞ্জিনিয়ার একটি যন্ত্র আবিষ্কার



করেছেন, তা'র দুটি ছুঁচের মত 'মুখ' লেবু, কমলা প্রভৃতি টক ফলের উপর বসিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রের কাঁটায় দেখা যাবে কতটা টক সেই ফল। এবার ফলওয়ালাদের মুস্কিল হবে দেখ্‌ছি। লোকের জিভের উপর এ যন্ত্র বসিয়ে দেখা হয়েছে, অনেকের মুখের থুথুর মধ্যে অল্প টক ভাব আছে।

এক চাকার গাড়ী—কোরিয়া দেশে এক চাকার গাড়ীর চল্ আছে—বিশেষতঃ সে দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেদের মধ্যে। যখন কোন বড়-গোছের দরবার বা সভা হয় তখন সেখানকার কোন-কোন সেনাপতি টোপর মাথায় দিয়ে,

জাঁকজমক পোষাক প'রে এক চাকার গাড়ীতে চ'ড়ে সেখানে যান্। চার জন কুলিতে সেই গাড়ী টেনে নিয়ে (দু'জনে টানে আর দু'জনে ঠেলে) যায়! চীন



দেশেও এক চাকার গাড়ীর চল আছে, কিন্তু সে গাড়ী অনেক হাল্কা এবং দু'জন কুলিতে অনায়াসে তা'কে নিয়ে যেতে পারে।

মাছির চাষ—কেউ চায় মাছি তাড়াতে—চেষ্টা ক'রেও তাড়াতে পারে না,—আবার কেউ কেউ মাছি পোষে আর মাছির চাষ করে! শীতের দেশে মাছির উৎপাত নাই; কিন্তু সেখানকার চিড়িয়াখানার ব্যাং, গিরগিটি প্রভৃতি মাছি-ভুকেরা তো আর তা' ব'লে মাছি খাওয়া ছেড়ে দিতে পারে না। তাই তা'দের জন্য ঐ সব জালের খাঁচায় মাছির চাষ করা হয়। খাঁচার উপরে ছোট্ট

ছেঁদা আছে, তার উপর কাঁচের বোতল উপুড় ক'রে রাখা হয়। মাছিরা সেই বোতলে আশ্রয় নিলেই বোতলের মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। আর বোতল শুদ্ধ মাছি নিয়ে ব্যাঙ গিরিগিটিদের খাঁচায় রেখে দেওয়া হয়। মাছিরা বোতল থেকে বেরিয়ে এলেই ব্যাঙ গিরিগিটিরা তাদের ধরে টপ্ ক'রে গিলে ফেলে।

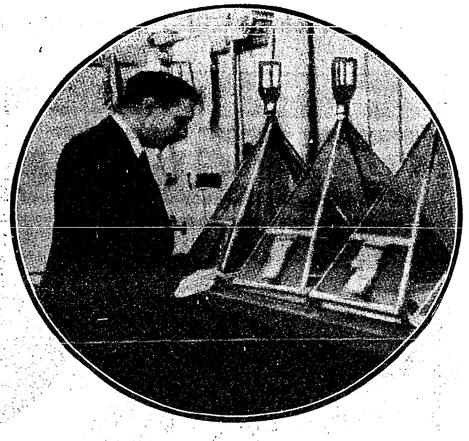

ধাঁধার উত্তর

১। প্রত্যেক বড় বৈয়ামে ১৮ সের ও মাঝারি বৈয়ামে ৯ সের জিনিষ ধরে। প্রতি তাকের বৈয়ামগুলিতে মোট ১ মণ ১৪ সের জিনিষ ধরে।

২। পাশের ছবিতে যে ভাবে দেখান হয়েছে, সেইভাবে জমিটা সমান ৪ ভাগে ভাগ করতে হবে।

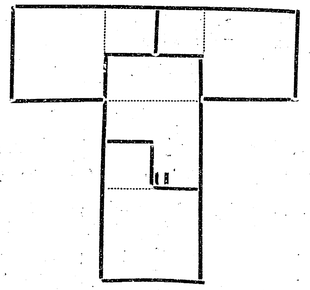

BLEED THROUGH.

নূতন ধাঁধা

নীচের ছবির লুকানো মাছগুলির নাম বাহির কর।—



—দেশনায়কগণের অভিমত—

যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য

দেশপূজ্য
৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির
অভিমত

"আমি মিঃ এইচ, বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে ইহাই ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।"

স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জননেতা
লালা লাজপৎ রায়ের
অভিমত

"আমি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি মিঃ এইচ, বসুর "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" বাস্তবিক ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধ অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"

স্বাঃ লালা লাজপৎ রায়

কেশতৈল—কুন্তলীন, কোকোলীন, ম্যাকেসার, চামেলীন প্রভৃতি।

হেয়ার লোসন—দেলখোস, দিলতোষ, হার্টস্ ডিলাইট, প্রভৃতি।

পমেটম—দেলখোস পমেড, গোলাপ ও বকুল পমেটম প্রভৃতি।

এসেন্স—দেলখোস, হোয়াইট রোজ, অপরাজিতা, বকুল, মাস্ক, যুঁই, বেলা, চামেলী, খস, অরিগ্যান প্রভৃতি নানা সিরিজের বিবিধ প্রকার সুগন্ধি।

নানাবিধ অটো, হেয়ারওয়াস, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, লাইম যুস ও গ্লিসারিন ক্রীম এবং স্নো প্রভৃতি।

সাবান—হোয়াইট রোজ, চন্দন, খসখস, মাস্ক, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ ফলের সিরাপ।

এইচ, বসু, পারফিউমার,
৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বিশ্ববরেণ্য
রবীন্দ্রনাথ
বলেন

"কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহারে একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক
৺মতিলাল নেহেরুর
অভিমত

"ভারতবর্ষের প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এইচ, বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C 700.





উড্ ওয়ার্ডের

গ্রাইপ ওয়াটার

চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

ইহা শিশুদিগকে সুস্থ রাখে।

WOODWARD'S
GRIPE WATER

WW 13-111a

W. WOODWARD LTD., LONDON, ENGLAND

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

সন্দেশ



মাঘ, ১৩৪০

সম্পাদক- শ্রীসুবিনয় রায়
শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম্.এস্.সি

COLOURED DOCUMENT.

ছেলেমেয়েদের জন্য

কয়েকখানি বাছাই বই

এগুলির পরিচয় ছেলেমেয়েদের কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যেমনি সরস সুন্দর ভাষা, তেমনি চমৎকার চমৎকার এক রঙের ও ৩-রঙের ছবি। মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত, এবং ডিরেক্টর-অব-পাবলিক-ইনস্ট্রাকসন কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র ...	॥০	কথাসরিৎ সাগর ...	॥৵০
,, বেতাল পঞ্চবিংশতি	॥০	রবিন্ হুড	॥৶০
,, বত্রিশ সিংহাসন	॥০	ওডিসিয়ুস	।৶০
পুরাণের গল্প ...	॥০	ইলিয়াড	।৶০

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

নূতন সংস্করণ

স্বাস্থ্য

পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত

১। পড়া শুনা ।৶০

২। খেলার পড়া ।৶০

স্বাস্থ্যের কথা ছেলেমেয়েদের জন্য অতি সরল সরস ভাবে লেখা। ভাল কাগজে, বড় অক্ষরে, পরিষ্কার ছাপা। অনেকগুলি ছোট ছবি, সুন্দর মলাট। মূল্য—ছয় আনা

বই দুইখানির নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম-এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা



নব পর্য্যায়
৩য় বর্ষ

মাঘ, ১৩৪০

৫ম সংখ্যা

ভোরের পাখী ডাকে

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভোরের গানে পাখী মাগো
আমায় নিতি ডাকে
কৃষ্ণচূড়ার শাখে ;

থোপা থোপা রাঙা ফুলে
ভোরের হাওয়া যায় মা দুলে,
গুণ্‌গুণিয়ে আমের বনে
ভোম্‌রা ফেরে লাখে,
ভোরাই পাখী তখন মোরে
মধুর সুরে ডাকে।

ঝলমলিয়ে আলো কাঁপে
চপল বেণু বনে
মাঠের কোণে কোণে ;

ঝিকি মিকি নদীর জলে
রূপার ডিঙা ও কা'র চলে!
সারি সারি নাও শাল্‌তি
ছুট্‌ছে বাঁকে বাঁকে,
ভোরের পাখী তখন মোরে
মধুর সুরে ডাকে।

ভোরের পাখী ডাক্‌ছে মাগো,
তাই কি কুঁড়ি টুটে'
উঠ্‌ল চাঁপা ফুটে!

তাই কি দিঘীর কালো জলে
শতদলের দলে দলে
আকাশ রাজা আলোর মাণিক
লুকিয়ে তাহার রাখে!
মল্লিকারা ফুট্‌লে কি তাই
ভোরের পাখী ডাকে!

ভোরের পাখীর রাঙা পাখায়
সোনার আলো ঝরে
মন যে আমার হরে!

নিথর আকাশ কাণ্‌টি পেতে
গান শুনে ওর উঠ্‌ল মেতে
ঘাসের মেয়ে চম্‌কে ওঠে
শিশির নোলক নাকে,
ভোরের পাখী সবারে আজ
মধুর সুরে ডাকে!



মুক্তার মূল্য

(শ্রীঅতুলভূষণ সরকার)

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুলতান্ মামুদ্ গজ্‌নী রাজ্যের বাদসাহ ছিলেন। একদা তিনি একটি মহামূল্যবান্ মুক্তা হস্তে তাঁহার আম দরবারে আসিলেন। তথায় তাঁহার রাজ্যের আমীর ওম্‌রাহগণ ও মন্ত্রীবর্গ উপস্থিত। তিনি তাঁহার সম্মুখস্থ এক মন্ত্রীর হস্তে ঐ মুক্তা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ওহে মন্ত্রীবর, তোমার বিবেচনায় এই মুক্তার মূল্য কত হইবে?" তিনি সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "জাঁহাপানা, এই অধীনের বিবেচনায় এই রত্নের মূল্য কোটি কোটি মুদ্রা অপেক্ষা বহু গুণে অধিক।" সুল্‌তান্ তাঁহাকে ঐ মহামূল্যবান্ মুক্তা চূর্ণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। ঐ মন্ত্রী এই আবেদন করিলেন, "বাদ্‌সাহের কোষাগার হইতে একটি পয়সা হারাইলে আমার মন ক্ষুব্ধ হয়; আমি এহেন রত্ন কি প্রকারে ধ্বংস করিব?" সুল্‌তান উত্তর দিলেন, "বেশ বলিয়াছ; তুমি একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী।" এই বলিয়া তিনি মন্ত্রীকে পুরস্কার দিলেন ও মুক্তাটি তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন।

বাদ্‌সাহ কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর একজন ওম্‌রাহের হস্তে মুক্তাটি প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তো একজন গুণী ব্যক্তি; তোমার বিবেচনায় এই মুক্তার মূল্য কত হইবে?" ওম্‌রাহ উত্তর করিলেন, "মহামহিম বাদ্‌সাহের প্রশ্নের উত্তরে আমি অবনত মস্তকে নিবেদন করিতেছি যে এই অধীনের বিবেচনায় এই মুক্তা-রত্নের মূল্য জাঁহাপানার অর্দ্ধ সাম্রাজ্যের তুল্য।" সুল্‌তান্ বলিলেন, "তাহাই বটে; ইহা চূর্ণ কর।" ঐ ওম্‌রাহ উত্তর করিলেন, "এই অধীন ইহা কখনও চূর্ণ করিতে পারিবে না; এই কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে যেন তাহার মৃত্যু হয়।" সুল্‌তান্ তাঁহাকেও সম্মান সূচক পরিচ্ছদ দান করিলেন।

তিনি মুক্তাটি গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের হস্তে প্রদান করিয়া ঐ প্রকার প্রশ্ন পূর্ব্বক তাহা চূর্ণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু সভাস্থ কেহই মহামূল্যবান্ বোধে ঐ মুক্তাকে চূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন না।

অবশেষে সুল্‌তান্ মামুদ্ তাঁহার পরিচারক আওয়াজ্‌কে আহ্বান করিলেন এবং তাহার হস্তে মুক্তাটি দিয়া বলিলেন, "ওহে আওয়াজ, এই মুক্তার মূল্য কত

হইবে ?" আওয়াজ জোড় হস্তে কহিল, "হে প্রভু, এই মুক্তাটি একটি দেশবিখ্যাত মহামূল্য বাদ্‌সাহী রত্ন ; ইহার মূল্য নির্ণয় করিবার ক্ষমতা দাসের নাই।" উত্তর শুনিয়া সুল্‌তান্ আওয়াজ্‌কে মুক্তা চূর্ণ করিবার আদেশ দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ নতজানু হইয়া ঐ মুক্তা এক খণ্ড প্রস্তরের উপরে রাখিল ও অপর এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা এমন সবলে পেষণ করিল যে মুক্তাটি মুহূর্ত্তে চূর্ণ হইয়া গেল।

সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইল। ক্ষণকাল পরে সভাসদগণ একবাক্যে এই বলিয়া আওয়াজ্‌কে ধিক্কার দিতে ও র্ভৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন, "হে মুর্খ, এত কাল বাদ্‌সাহী মহলে থাকিয়াও এই প্রকার পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিলে! তুমি যে প্রকার গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছ, তাহার আর ক্ষমা নাই। তোমার সাহসও অদ্ভুত। এ রাজ্যের কেহই এই কর্ম্ম করিতে সাহসী হইবে না। শত ধিক্ তোমাকে! এ হেন মুক্তারত্নের মর্য্যাদা জানিয়া শুনিয়াও তুমি এই কর্ম্ম করিলে! এক্ষণে মহামান্য বাদ্‌সাহের চরণে পতিত হইয়া নিজ জীবন ভিক্ষা কর ; তাঁহার দয়াই তোমার একমাত্র ভরসা।"

সভাতে কোলাহল কিছু কমিলে আওয়াজ্‌ সকলকে সম্বোধন করিয়া এই কথাগুলি বলিতে লাগিল, "হে অমাত্য ও ওম্‌রাহ মণ্ডলি! আপনারা এই অধীনের বক্তব্য অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন। আপনারা সকলেই মহা বিদ্যান্, মহা পণ্ডিত ও মহা রাজনীতিবিদ্ ; আপনাদের সদসদ্ বিবেচনাও প্রসংশনীয় ; এই মহামূল্য মুক্তারত্নের মূল্যের বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই আপনারা ইহা ধ্বংস করিবার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে আমার পৃথিবীমান্য প্রভুর আদেশ আমার নিকটে পৃথিবীর সকল রত্ন অপেক্ষা মূল্যবান রত্ন। আমার যদি আপনাদিগের আচরণের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে, আমার যদি সত্য বলিবার সাহস ও অধিকার থাকে, তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হইবে যে মহামহিম বাদশাহের আদেশ অমান্য করিয়া আপনারা সকলে তাঁহার আদেশ-রত্নকে হেলায় চূর্ণ করিয়াছেন এবং অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছেন।"

আওয়াজ্‌ নিস্তব্ধ হইলে সুল্‌তান্ মামুদ্ তাহার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং ওম্‌রাহগণের প্রতি তদনুরূপ অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলেন। আওয়াজের কাতর প্রার্থনায় সুল্‌তান্ অবশেষে ওম্‌রাহগণকে ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার বাধ্য পরিচারক আওয়াজ্‌কে প্রভূত পুরস্কার দিলেন। *

(* গল্প-ই-পখ্‌তো হইতে)

পণ্ডিত বিদায়

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

পদ্মলোচন পোষ্টাপিস থেকে ফিরছে, মানসের সঙ্গে দেখা হোলো পথে।

—তোর হাতে ওসব কি রে ?

পদ্মলোচন বল্ল,—যত রাজ্যের খবরের কাগজ। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্, বঙ্গবাসী, এডুকেশন গেজেট্ এইসব। বাবা পড়েন। হ্যাঁ রে মান্‌কে, পণ্ডিতমশাই আমাদের খাতা দেখেছেন ? কত নম্বর পেয়েছি আমি ?

মানস গম্ভীর ভাবে জবাব দিল,—বোধ হয় এগারো।

—মোটে ? আর তুই ?

—পাঁচ কি সাত। তবে আমি বাবার অজান্তে নম্বরের পাশে সংখ্যা বসিয়ে পঞ্চান্ন কি সাতচল্লিশ করে নেব 'খন। ভাগ্যিস্ এগারো পাই নি, তাহলে কি মুস্কিল যে হোতো! একশর মধ্যে একশ দশ তো আর পাওয়া যায় না!

—আর সব ছেলেরা ?

—তিন, দুই, জিরো। অনেকে আবার মাইনাস্ পাঁচ, মাইনাস্ সাত পেয়েছে ; তারা সব 'ফ্রিজিং পয়েন্টে'—সব 'বিলো জিরো'!

পদ্মলোচন হাস্‌তে পারল না।—তোর আর কি, তুই পণ্ডিতের ছেলে ; তোকে ত আর কিছু বল্‌বেন না। মার খেয়ে মারা যাব আমরা।

পদ্মলোচন বাড়ী ফিরে যেন ভাবনার অকূল পাথারে পড়ল। সংস্কৃতে মোটে এগারো পেয়েছে! তার ওপর পণ্ডিতমশা'র আবার সব চেয়ে বেশি রাগ তারই ওপর —তাঁর কথার চোট্‌পাট্ জবাব দেয় ব'লে। সেদিন তো বেঞ্চির নড়বোড়ে পায়াটা ভেঙে নিয়েই কয়েক ঘা তাকে কসাবেন এমনি প্রচণ্ড উৎসাহ দেখিয়েছিলেন ; পদ্মর সৌভাগ্যক্রমে বেঞ্চিটা তার পক্ষ নিয়েছিল তাই রক্ষা—অনেক টানাটানিতেও কিছুতেই পায়াটা ছাড়তে সে রাজি হয় নি। অবাধ্য বেঞ্চিটাকে পদচ্যুত করতে না পেরে সে যাত্রা তাদের দুজনকেই তিনি পরিত্রাণ দিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর যা রাগ সে দেখেছে, এর পরে আর ইস্কুলে গেলে কি তার নিস্তার আছে ?

খবরের কাগজগুলো বাবাকে দেওয়া তার হোলো না, নিজের পড়ার টেবিলে ফেলে রেখে, নাওয়া খাওয়া ভুলে সে ভাব্‌তে বসলো। ভাব্‌তে ভাব্‌তে সমস্ত যখন

তার এলোমেলো হয়ে এসেছে এমন সময়ে হঠাৎ তার মনে হোলো একটা পথ যেন পাওয়া গেছে, পণ্ডিতমশাইকে জব্দ করার একটা উপায় যেন সে আবিষ্কার করেছে। সংবাদপত্রগুলো খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে সে হাসিমুখে টেবিল থেকে উঠ্‌ল।

ইস্কুলে গিয়ে শুন্‌ল, সংস্কৃত পরীক্ষায় তাদের নম্বরের বহর দেখে হেডমাষ্টার মশাই এমনই হতভম্ব হয়ে গেছেন যে তিনি স্বয়ং আজ পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাশে আস্‌বেন। খবর পেয়ে পদ্মলোচন খুসীই হোলো। সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে—আজ একটা বিহিত সে করবেই; তাকে নাম পাল্‌টে ধূম্রলোচন ব'লে ডাকার, যখন তখন বেধড়ক্ পিটন দেওয়ার প্রতিশোধ আজ তাকে নিতেই হবে। ক্লাশে ঢুকে নাকে নস্যি গুঁজে চল্লিশ মিনিট তিনি ঘুমিয়ে সুখ করবেন, আর বাকি দশ মিনিট সুখ করবেন পড়া নেবার অছিলায় তাদের পিটিয়ে—এটি আর হচ্ছে না। পদ্মলোচন আজ মরিয়া।

হেড্‌পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে হেড্‌মাষ্টার মশাই ক্লাশে ঢুকলেন। ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন—সবাই মিলে তোমরা সংস্কৃতে ফেল্ করলে কি করে?

ছেলেরা নিরুত্তর। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—তোমাদের কোন ষড়যন্ত্র ছিল না কি? পদ্মলোচন জবাব দিল—পণ্ডিতমশাই আমাদের পড়ান না সার্।

পণ্ডিতমশাই চোখ পাকিয়ে বল্লেন—কি? অধ্যাপনা করি না? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! হেডমাষ্টার মশাই পণ্ডিতকে বাধা দিলেন—আপনি থামুন। কি বল্‌বার আছে তোমার বলো।

—সেদিন আমি পণ্ডিতমশাইকে একটা শ্লোকের মানে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, অবশ্য পড়ার বইয়ের বাইরে। আন্‌সীন্ প্যাসেজ্ তো আমাদের থাকে য়্যাডিশনালে। তা পণ্ডিতমশাই তার মানেই বল্লেন না।

পণ্ডিতমশাই রাগে ফুল্‌তে লাগ্‌লেন—কি? কোন্ শ্লোকের অর্থ আমি করি নাই? শ্লোকার্থ জানিনা—আমি!

দাঁত কিড়মিড় করে পণ্ডিতমশাই যেন ফেটে পড়তে চাইলেন—নিয়ে আয় তোর কোন্ শ্লোক আমি অর্থ করিতে পারি নাই!

হেড্‌মাষ্টার আশ্বাস দিলেন—বলো, ভয় কি! তোমার মনে নেই বুঝি?

পদ্মলোচন ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ, আছে। এই শ্লোক্‌টা সার্—

হবার্ত্তাবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেডুয়ে।
আণ্ডীবঃ অণ্ডফ্রয়েণ মানষ্টেটঃ শিবাঙ্গবঃ॥

শ্লোক শুনে পণ্ডিতমশায়ের চোখ কপালে উঠ্‌ল। ভুরু কুঁচ্‌কে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন তাঁর সারা জন্মে এমন অদ্ভুত শ্লোকের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন কি না। পণ্ডিতকে নিঃশব্দ দেখে হেড্‌মাষ্টার মশাই বুঝতে পারলেন শ্লোকটা তেমন সহজ নয়; তাই তাঁকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন—একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যেন; উপনিষদ কিম্বা পাঁজির বোধ হয়, কি বলেন?

পণ্ডিতমশাই মাথা চুল্‌কাতে লাগ্‌লেন—কোনো উদ্ভট শ্লোক। উদ্ভট গ্রন্থ থেকে এর মর্ম্মোদ্ধার করতে হবে। আমি আজ বৈকালেই এর অর্থ ক'রে দেব, ও যেন মান্‌কের সমভিব্যাহারে আমার বাড়ী যায়।

পদ্মলোচন বল্ল—না সার্, সাম্‌নে দুর্গাপূজা, আমি বিছানায় শুয়ে থাক্‌তে পারব না।

পণ্ডিতমশায়ের প্রহারের ভয়ানক প্রসিদ্ধি ছিল। হেড্‌মাষ্টার পদ্মলোচনের ভয় দেখে হাস্‌তে লাগ্‌লেন—পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি কাল স্কুলে বল্‌বেন তাহলেই হবে। আমারও জানার কৌতূহল হয়েছে। একটু ঘেঁটে দেখ্‌বেন, পাঁজির কিম্বা উপনিষদের হবে—ওই দুটাই ত যত রাজ্যের শ্লোকের আড়ৎ কি না!

পণ্ডিতমশাই গম্ভীর হয়ে বল্লেন—বেশ, আমার স্মরণে রইল।

বাড়ী ফিরে পণ্ডিতমশাই শব্দকল্পদ্রুম নিয়ে পড়লেন; উদ্ভটসংগ্রহটাও পাতি পাতি ক'রে খুঁজলেন। কোনোদিকেই শ্লোকটার কোনো সুরাহা হোলো না। নাকে এক টিপ্ নস্য দিয়ে তিনি দারুণ মাথা ঘামাতে লাগ্‌লেন—'হবার্ত্তাবা'? সংস্কৃত বলে বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু অভিধানে তো এ শব্দ নাই! বার্ত্তা মানে তো সংবাদ কিন্তু 'হ···বা'র মাঝখানে পড়ে এতো বোধগম্য হবার বহির্ভূত হয়েছে। 'কহিপ্তাশা?' হিপ্ত ছিল আশা হোলো হিপ্তাশা! কিন্তু হিপ্ত মানে কি? একি আমাকে ক্ষিপ্ত করার চক্রান্ত? 'শিবাঙ্গবঃ'—কেবল এই শব্দটার অর্থ অনুধাবণ করা কঠিন নয়, কিন্তু 'টজেগেণঃ'ই বা কি আর 'শকেডুয়ে··· ?'

পণ্ডিতমশাই অসুখের অজুহাতে তিন দিন ছুটি নিলেন—কিন্তু তিনদিনের জায়গায় সাত দিন হয়ে গেল তবু ইস্কুলে তাঁর পদার্পণ নেই। তখনো তিনি শ্লোকটার কিনারা করে উঠ্‌তে পারেন নি। সেদিনও সকালে উদ্ভটকল্পতরু নিয়ে পাতা ওল্‌টাচ্ছেন, এমন সময়ে নেপথ্যে পায়ের আওয়াজ কানে যেতেই হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন—কে যাচ্ছিস্ ওখান দিয়ে? টেটো?

—উহু।

—মান্‌কে নাকি? টেটোকে তামাক দিতে বল্‌ত। কিঞ্চিৎ ধূম্রপান আবশ্যক।

মানস বল্ল—টেটো এখন কোথায় টো টো করছে কে জানে।

—তবে তুই সাজ। গড়্‌গড়াটা আমায় দিয়ে ধূম্রলোচনকে ডেকে আন্ একবার।

—সে আস্‌বে না।

—বলিস্, মাভৈঃ। আমি অভয় দিয়েছি। কোনো ভয় নেই।

বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগলে কিছু সুবিধা হবার আশা করেছিলেন কিন্তু ক্রমশঃই তাঁর কাছে সমস্ত ধোঁয়াটে ঠেকতে লাগ্‌ল। "আণ্ডীবঃ অণ্ডফ্রয়েণ" এ যে কি বস্তু তার রহস্য ভেদ করা দূরে থাক্ অনুমান করতেও তিনি অপারগ!

—এই যে ধূম্রলোচন, এসেছ? বাবা পদ্মলোচন, আর প্রণাম করতে হবে না, বোসো। তুমি কি শ্লোকটার অর্থ জানো? জানো না কি?

—জান্‌লে কি আর জিজ্ঞাসা করি সার্?

—তাত বটে, তাত বটে। আচ্ছা, তোমার কি ঠিক স্মরণে আছে কথাটা আণ্ডীব, গাণ্ডীব নয়? গাণ্ডীব কথার অর্থ হয়; গাণ্ডীবী মানে অর্জ্জুন, সব্যসাচী।

—কথাটা আণ্ডীব, আমার বেশ মনে আছে।

পণ্ডিত মশাই ঘন ঘন তামাক টান্‌তে লাগ্‌লেন,—সমস্ত শ্লোকটাই তোমার বেশ স্মরণ আছে, কোথাও ভুল করো নি? তাই ত—তবে,—তাইত!

পদ্মলোচন চলে গেলে পণ্ডিতমশাই এবার বৃহৎ শব্দার্থসংগ্রহ নিয়ে পড়লেন। মানস সাহস সঞ্চয় ক'রে বল্‌ল—আমি ওর একটা লাইনের মানে করতে পারি।

বাবা অভিধানের পাতা থেকে চোখ তুল্লেন—কোন্ লাইনের?

—দ্বিতীয় লাইনের, যদি 'আণ্ডীব'-এর জায়গায় হয় আণ্ডিল আর 'শিবাঙ্গব'-এর জায়গায় হয় গবাংগব।

পণ্ডিতের বিস্ময়ের অবধি রইল না, তিনি মহোপাধ্যায় হ'য়ে হিম্ সিম্ খেয়ে গেলেন আর কিনা এই দুগ্ধপোষ্য বালক—মূঢ়তা দেখ! আগে হলে তিনি মেরেই বস্‌তেন, কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা অনেকটা মজ্জমান লোকের মত, তাই কুটো হলেও মানসকে তিনি আশ্রয় করলেন।

—কি শুনি? মানস তথাপি ইতস্ততঃ করতে থাকে—বল্‌ব?

—বল্‌তেই ত বল্‌ছি।

—আণ্ডিল! মানে এক আণ্ডিল্, কিনা এক গাদা, অণ্ডফ্রয়েণ অর্থাৎ অণ্ড মানে ডিম্ব, ফ্রয়েণ মানে ফ্রাই করে অর্থাৎ কিনা এক ঝুড়ি ডিম ভেজে নিয়ে···, মানষ্টেটঃ মানষ্টেটঃ ···

—ওইখানে ত আমরও আট্‌কাচ্ছে রে! পণ্ডিতমশাই বিজ্ঞের মত এক টিপ্ নস্য নিয়ে বল্লেন,—ওই মানষ্টেটই হলো মারাত্মক।

—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি বাবা! মানষ্টেটঃ···বল্‌ব? ওটাতে পদ্ম হতভাগা আমাদের ওপর কটাক্ষ করেছে, অর্থাৎ কিনা মানস আর টেট, আমি আর আমার ভাই।

—বটে? গম্ভীরভাবে পণ্ডিতমশাই বল্লেন—সমস্তটা জড়িয়ে মানে কি হোলো তবে?

—অর্থাৎ কিনা, এক গাদা ডিম ভেজে মানস আর টেট গবাংগবঃ—গব্ গব্ ক'রে গিল্‌ছে। বোধ হয় ও দেখেছিল।

পণ্ডিতের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি অকস্মাৎ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লেন—কি? আমার পুত্র হয়ে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে তোদের এই জঘন্য কীর্ত্তি? তোরা কিনা ডিম্ব গলাধঃকরণ করিস্? হংসডিম্ব কি কুক্কুটাণ্ড কে জানে!

বলেই তিনি মানসের পৃষ্ঠ-পোষকতার মৎলবে তাঁর পাদুকা উত্তোলন করলেন। মানস নিরাপদ ব্যবধানে স'রে গিয়ে বল্‌ল—ওই জন্যেই তো আমি বল্‌তে চাই না। আপনার মস্তক ঘর্ম্মাক্ত হচ্ছিল বলেই ত বল্লাম।

—মস্তক ঘর্ম্মাক্ত হচ্ছিল! এখন যে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হোলো, তার কি!

পণ্ডিত মশায়ের আস্ফালন কানে যেতেই পণ্ডিতগৃহিণী রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন। তিনি যে ভাবে ও যে ভাষায় মানসের পক্ষ সমর্থন করলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে অণ্ড-ফ্রয়েণের ব্যাপারে কেবল তার সহানুভূতিই নয়, দস্তুরমত সহযোগিতাও আছে। অগত্যা মানসকে মার্জ্জনা ক'রে দিয়ে পণ্ডিত মশাই আবার শ্লোকে মনোনিবেশ কর্‌তে বাধ্য হলেন।

ইস্কুল থেকে হেড্‌মাষ্টার মশাই লোক পাঠিয়েছিলেন, পণ্ডিত মশায়ের খবর নিতে। আটদিন হয়ে গেল, কেন তিনি ইস্কুলে আস্‌ছেন না—তাঁর কি হয়েছে?

পণ্ডিতমশাই উত্তর দিলেন—সমস্তই হয়েছে, কেবল বাকি আছে 'শকেড়ুয়ে' ; ওইটা হলেই হয়ে যায়।

উত্তর পেয়ে হেড্‌মাষ্টার হতভম্ব! শ্লোকটার কথা তিনি কবে ভুলে গেছলেন ; আর তাছাড়া সংস্কৃত তাঁর আদপেই মনে থাকে না—তা উপনিষদেরই কি আর পাঁজিরই কি! তিনি ভাব্‌লেন—পণ্ডিতের মাথা খারাপ হয়ে গেল না ত? কাল নিজে গিয়ে দেখ্‌তে হবে।

পরদিন পণ্ডিতের বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লেন, সদর দরজায় তালা লাগানো, তারই ওপরে ঝুল্‌ছে—To LET। পণ্ডিতের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না, কোথায় গেছেন কেউ জানে না, বাড়ীওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে, প্রতিবেশীদের কিছু না বলে রাতারাতিই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

পদ্মলোচন পোষ্টাপিস থেকে ফির্‌ছে, সরিতের সঙ্গে পথে দেখা হোলো। যত রাজ্যের খবরের কাগজ তার হাতে। সরিৎ বল্ল—আচ্ছা শ্লোক ঝেড়েছিলি ভাই! পণ্ডিত বেচারা পালিয়ে বাঁচ্‌ল।

পদ্মলোচন শুধু হাসে।

—দারুণ শ্লোক বাবা! পণ্ডিতমশাই একেবারে 'টজেগেণঃ'! লাভের আশা ত্যাগ করে উধাও হলেন!

পদ্মলোচন তবু হাসে।

—অবশ্যি মান্‌কে একটা মানে করেছিল বটে, অর্থাৎ তুই নাকি তাকে আর তার ভাইকে লক্ষ্য করে ওটা বেঁধেছিস্‌।

পদ্মলোচনের হাসি আর থামে না।—মান্‌কের ছাই মানে। ও তো ডিমের মানে!

উৎসুক হয়ে সরিৎ জিজ্ঞাসা করে—তবে আসল মানেটা কি ভাই? আমাদের বল্‌বিনে?

—মানে এই যে আমার হাতেই রয়েছে।

—ও তো সব খবরের কাগজ।

—আরে, এই নামগুলোই তো ওলোট্‌ পালট্‌ করে দিয়েছি! উল্টো দিক থেকে একটু এদিক ওদিক করে পড়লেই ওর মানে হবে, এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, বঙ্গবাসী, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ আর ফ্রেণ্ডস্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া।

চিড়িয়াখানার পলাতক



(শ্রীসুবিনয় রায়)

চিড়িয়াখানার জন্তু যদি সুযোগ পায় তো পালাবে না কেন? এই পালানর অর্থ এই নয় যে, সে বন্ধ থেকে নিতান্ত মনের দুঃখে ছিল, তাই পালিয়েছে। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, চিড়িয়াখানার লোকদের চেষ্টায় তা'রা মানে মানে আবার নিজের খাঁচায় ফিরে এসেছে। তবে পালাবার পর সে একটিবার চারিদিকের ব্যাপারটা দেখ্‌বার চেষ্টা প্রায়ই ক'রে থাকে। অনেক সময় হয়তো খাঁচার বাইরে খোলা জায়গায় ব'সেই সে একটু হাওয়া খায়; আবার কোন কোন সময় একটু ঘুরে ফিরেও দেখে নেয়।

আলীপুরের চিড়িয়াখানায় একবার দুটি নেকড়ে বাঘ খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে পালিয়েছিল। তারা কিন্তু একেবারে পালিয়ে বেরিয়ে যাবার কোন চেষ্টাই করে নি। দিব্য, খোলা মাঠ পেয়ে, খাঁচার কাছেই দু'জনে মনের আনন্দে খেলা কর্‌ছিল। রক্ষকেরা টের পেয়ে তাদের আবার খাঁচার বন্দী ক'রে ফেল্‌ল।

চিড়িয়াখানার যত জন্তু পালায় তার মধ্যে বানরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। তাদের বুদ্ধি বেশী, কাজেই পালাবার ফন্দিটিও জানা আছে। দরজা যদি ভেজিয়ে দেওয়া থাকে, অন্য জন্তুরা হয়তো ভাব্‌বে যে দরজা বন্ধই আছে; কিন্তু, বানরের কাছে সে চালকি খাট্‌বে না। সে তখনই বুঝ্‌বে যে দরজা আটকান নাই, এবং তখনই পালাবার সুযোগ দেখ্‌বে।

লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় জ্যাকব নামে একটি ওরাংওটান্ বাস কর্‌ত। তা'র খাঁচার সাম্নে একটি মিস্ত্রী কাজ কর্‌তে কর্‌তে একটি বড় লোহার ডাণ্ডা ফেলে গিয়েছিল। জ্যাকব কোন রকমে হাত বাড়িয়ে সেই ডাণ্ডাটি হস্তগত করে। তারপর আর কি! তখনই সেই ডাণ্ডার চাড়ে খাঁচার দুটি লোহার শিক বাঁকিয়ে কোন রকমে তা'র শরীরটি গলাবার মত ব্যবস্থা ক'রে নিল; তারপর আস্তে আস্তে খাঁচার বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু খাঁচার বাইরে এসে দেখে ঘরের দরজা শার্শি সব বন্ধ। এখন করে কি? ডাণ্ডাটিও খাঁচার মধ্যে ফেলে এসেছে। সাম্নে ছিল একটা ছোট ফুলের টব। সেটিকেই তুলে নিয়ে সে শার্শির কাঁচে দিল এক ঘা। ঝম্‌ঝম্ ক'রে কাঁচ ভেঙ্গে গেল আর আমাদের জ্যাকব মশাইও সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। ছোট ফুলের টবটি কিন্তু তখনও সযত্নে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন।

বাইরে এসে জ্যাকব দেখল, বেজায় শীত! সেখানকার আবহাওয়া তা'র নিজের দেশ সুমাত্রার মত মোটেই নয়। তা'র খাঁচা একটা ঘরের ভিতরে; সেই ঘরটিকে আবার কৃত্রিম উপায়ে গরম রাখা হয়; কাজেই বাইরে এসে সেই গরমের অভাবটি বিশেষভাবে বোধ হ'তে লাগ্‌ল।

বেচারা করে কি? সটান্ একটা গাছের উপর চ'ড়ে কয়েকটা ডালপালা জোগাড় ক'রে নিয়ে একটা বিছানার মত তৈরী ক'রে নিল। তার উপর চুপটি ক'রে ব'সে চারিদিকের শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তখনও সেই টবটি তা'র বগলে।

এদিকে চিড়িয়াখানার বানর-ঘরে হৈ হৈ প'ড়ে গেছে — "জ্যাকব পালিয়েছে!" চারিদিকে খোঁজ খোঁজ—কোথাও তা'কে পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ দেখা গেল, জ্যাকব্ গাছের উপর থেকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে দেখ্‌ছে—বগলে ফুলের টব।

কত রকমে চেষ্টা হ'লো জ্যাকবকে নামিয়ে আনার জন্য; কিন্তু ভবি ভোলবার

নয়। সেখানে সে গ্যাঁট্ হ'য়ে বসে রইল তো রইলই। শেষটায় নিরুপায় হয়ে, তা'র গায়ে রাস্তায় জল-দেওয়া নল (বা hose-pipe) দিয়ে জল দেবার জোগাড় করা হ'লো।

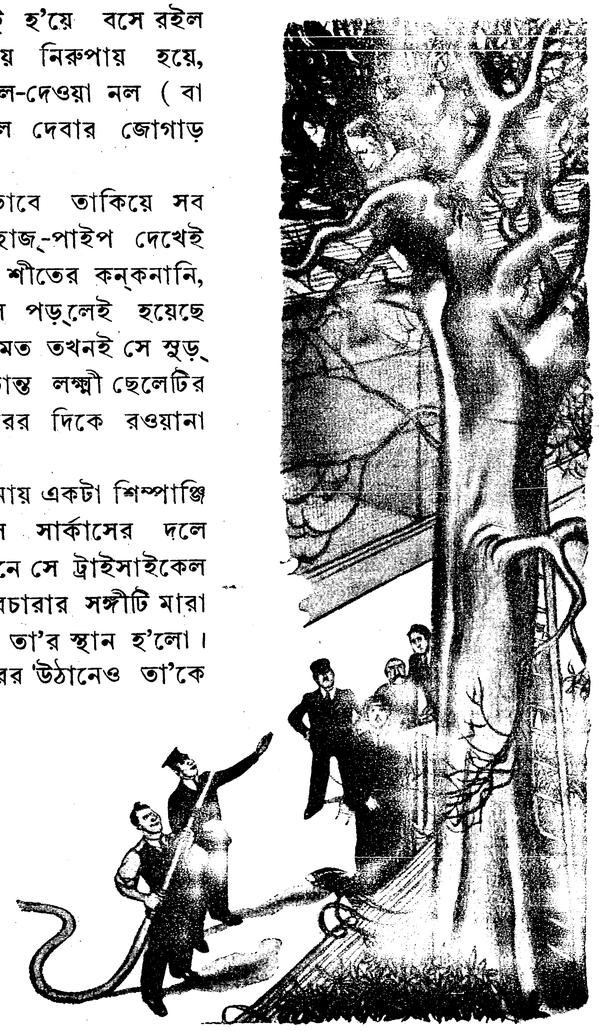

জ্যাকব্ গম্ভীরভাবে তাকিয়ে সব ব্যাপার দেখ্‌ছিল। হোজ্-পাইপ দেখেই তা'র চক্ষুস্থির! একেই শীতের কন্‌কনানি, তা'র উপর গায়ে জল পড়্‌লেই হয়েছে আর কি! বুদ্ধিমানের মত তখনই সে সুড়্ সুড়্ ক'রে নেমে, নিতান্ত লক্ষ্মী ছেলেটির মত আস্তে আস্তে ঘরের দিকে রওয়ানা হ'লো।

আরেক চিড়িয়াখানায় একটা শিম্পাঞ্জি ছিল; ছেলেবেলায় সে সার্কাসের দলে খেলা দেখা'ত। সেখানে সে ট্রাইসাইকেল চালাতে শিখেছিল। বেচারার সঙ্গীটি মারা যাওয়ায় চিড়িয়াখানায় তা'র স্থান হ'লো। চিড়িয়াখানার বানর-ঘরের উঠানেও তা'কে মাঝে মাঝে সাইকেল চালাতে দেওয়া হ'তো; — লোকেরা সেই তামাসা দেখ্‌ত। একদিন সে সাইকেল চালা'তে গিয়ে দেখ্‌ল দর্শকেরা কেউ নেই; তা'র রক্ষকও জানি কোথায় গিয়েছে,—

আবার, সাম্নের দরজাটিও খোলা ; বাঃ! এমন সুযোগ জোটে কোথায় ?

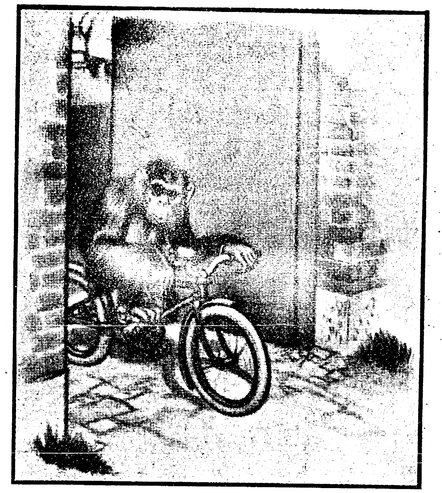

অম্নি শিম্পাঞ্জিভায়া গম্ভীরভাবে সাইকেল চালিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়্লেন—আর, একেবারে সটান্ রাস্তায় হাজির। তারপর, দু' চারটা ফলের দোকান থেকে পছন্দসই গোটাকয়েক ফল যোগাড় ক'রে, রসদ নিয়ে আবার গম্ভীরভাবে সাইকেল চালিয়ে, রক্ষক হৈ চৈ তোলার আগেই সে চিড়িয়াখানায় ফিরে এল।

বানরের পরেই, ভাল্লুকেরা খাঁচা থেকে পালান সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী বুদ্ধির পরিচয় দেয়। একটি চিড়িয়াখানায় প্রকাণ্ড এক শ্বেত-ভাল্লুক ছিল। একদিন তা'র রক্ষক ভুলে তার দরজাটি শুধু ভেজিয়ে রেখে চ'লে যায়। ভাল্লুকও বুঝতে পার্ল, এই তা'র সুযোগ। অম্নি, আর যাবে কোথায়! তখনই সে দরজা ঠেলে বেরিয়ে প'ড়ে সটান্ বাইরের দিকে রওয়ানা হ'লো। অত বড় জীবকে আস্তে দেখ্লে কা'র না ভয় হয়? একটি মজুর কয়েকটি বড় তক্তা কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে ভাল্লুকভায়াকে দেখ্তে পেল। অম্নি সে তক্তাগুলিকে ফেলে, প্রাণ নিয়ে চোঁচা দৌড় দিল। অতগুলি তক্তা হঠাৎ মাটিতে ফেলে দিলে তা'র আওয়াজও তো কিছু কম হয় না। ভাল্লুক সেই আওয়াজ শুনে এতই ঘাব্ড়ে গেল যে, কোন উচ্চবাচ্য না ক'রে সটান্ তা'র খাঁচার দিকে দৌড় দিল ;—একেবারে খাঁচায় না ঢুকে সে একবারও থামে নি।

একদিন এক-বেচারা বেজি কেমন ক'রে জানি চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়েছিল। অম্নি সে রাজ্যের যত বেড়াল তা'র পিছনে লাগ্ল। বহু কষ্টে তা'কে বেড়ালের হাত থেকে বাঁচিয়ে, জাল দিয়ে ধরা হ'লো। আরেকটি বেজি বেড়ালের হাতে না প'ড়ে একেবারে এক কুকুরের পালের মধ্যে গিয়ে প'ড়েছিলো।

তখন তা'র রাগ দেখে কে! ফ্যাস্-ফোঁস ক'রে সে এত তাড়াতাড়ি লড়াই আরম্ভ ক'রে দিল যে, কুকুর বেচারারা দলে ভারি হয়েও কিছু সুবিধা কর্তে পার্ল না—সবাই 'চাচা আপনা বাঁচা' নিয়ে ব্যস্ত। মাঝখান থেকে কুকুরেরাই কয়েকজন জখম হ'লো।

ক্যাঙ্গারু একবারই চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়েছে ব'লে শোনা গেছে। তখন তা'র এত ফূর্ত্তি—কিম্বা ভয়ও হ'তে পারে—হয়েছিল যে সে লাফে লাফে পগাড়-পার। মোটর-কারে চ'ড়ে তাড়া ক'রে, তবে তা'কে ধরা হয়েছিল।

উটপাখী পোষ মানে জান তো? হল্যাণ্ডের এক চিড়িয়াখানায় একটি পোষা উটপাখী রোজ দর্শকদিগকে পিঠে চড়িয়ে ঘুরিয়ে আন্ত—তা'র জন্য ৬ আনা পয়সা দিতে হ'তো। একদিন এক সাহেব উটপাখীর পিঠে চ'ড়ে বেড়াচ্ছিলেন,—উটপাখীর হঠাৎ খেয়াল হ'লো, সে পৃথিবীটা একটু দেখে নেবে। সুযোগও ছিল সে সময় বেশ,—কারণ, চিড়িয়াখানার ফটক তখন খোলা ছিল।



বাস্! তখনই সে পিঠে দর্শককে নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়্ল, আর মনের আনন্দে পন্ পন্ ক'রে খোলা রাস্তায় দৌড় দিল। পিঠের সোয়ারির অবস্থা একবার ভেবে দেখ! বেচারার এ রকম দুর্দ্দশা হবে সে স্বপ্নেও ভাবে নি। না হ'লে কি সখ ক'রে ঐ বেয়াড়া পাখীর পিঠে পয়সা দিয়ে চড়্ত? যা' হোক্, মাইল দশেক গিয়ে উটপাখী ক্লান্ত হ'য়ে থেমে গেল ; সাহেবও ত্রাহি ত্রাহি ডেকে মানে মানে নেমে পড়্লেন।

পালাবার পক্ষে সাপের শরীরের গড়ন যেমন সুবিধাজনক, এমন আর কা'রও নয়। সামান্য একটু ফাটল পেলেই হ'লো। সে জন্য চিড়িয়াখানায় সাপদের খুব সাবধানে রাখা হয়। তবুও কি তা'রা পালা'তে ছাড়ে? একদিন চিড়িয়াখানায়

একটি সাপের আমদানী হ'লো—একটি কাঠের বাক্সে। সাপটি বিষাক্ত নয়। বাক্সে একটি ফাটল ছিল, তা'রই মধ্য দিয়ে কেমন ক'রে জানি বেড়িয়ে সে স'রে পড়্ল—তা'র আর কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া গেল না। বিষাক্ত নয় ব'লে কেউ আর কোন পরোয়া কর্‌ল না। এক বৎসর পর, অন্য একটি সাপের ঘরে হঠাৎ তাকে দেখা গেল। সে সাপেরা নিজের জাত-ভাইদেরই গিলে খায়, অন্যের কথা কি আর বল্‌তে হবে! ঠিক সেই সময়েই নিরীহ সাপটিকে তাদের একজন গিল্‌তে যাচ্ছিল—শেষ মুহূর্ত্তে সাপটিকে বাঁচান হ'লো।

এ তো গেল সামান্য কথা। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে একটি ৭ ফিট লম্বা অজগর সাপ এক চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে পালিয়েছিল। চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ প'ড়ে গেল—"অজগর পালিয়েছে"। কত খোঁজাখুঁজি করা হ'লো—বাগানে, গাছে, ঘরের কোণায়, ফাটলে, নর্দ্দমায়—কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। সর্ব্বনাশ! কোথায় সে লুকিয়ে আছে; কোন্‌দিন কা'কে ধরে গিলে খাবে কে জানে? হঠাৎ ৬ মাস বাদে চিড়িয়াখানার এক দর্শক সাপ-ঘরের ছাতে লাগান লোহার এক ডাণ্ডায় জড়ান একটি বিরাট সাপ-মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেল। প্রথম সে মনে ক'রেছিল, সাপের ঘরে বুঝি সাপ-মূর্ত্তি খোদাই ক'রে দেওয়া আছে; কিন্তু পর মুহূর্ত্তে যখন সে সেই জীবটিকে নড়্‌তে দেখ্‌ল, তখন আর তা'র সন্দেহ রইল না। সে তখনই গিয়ে চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষকে জানা'ল, কিন্তু অধ্যক্ষ প্রথমে তা'র কথা হেসেই উড়িয়ে দিল। "ঐ ঘরেই অজগর লুকিয়ে আছে আজ ৬ মাস ধ'রে, আর আমরা তা' জানিই না!—এ কখনও হ'তে পারে? আমরা কি কানা, না হাঁদা!" কিন্তু দর্শকও ছাড়্‌বার পাত্র নয়; সে অধ্যক্ষকে সেখানে নিয়ে যাবেই যাবে। অনেক পীড়াপীড়ির পর অধ্যক্ষ সেখানে গিয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর্‌লেন এবং তখনই এক দল লোক হৈ হৈ ক'রে সাপকে তাড়া কর্‌ল এবং সাপও বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা আপত্তিতে গম্ভীর ভাবে তা'র পুরানো খাঁচায় ফিরে এল।

সুখের বিষয়, চিড়িয়াখানার পলাতকেরা প্রায়ই ধরা দেয়, অথবা ধরা পড়ে। একেবারে পালিয়ে জন্মের মত নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা বড় একটা শোনা যায় না। এটাও সুখের বিষয় যে বাঘ সিংহ জাতের হিংস্র জীবদের চিড়িয়াখানা থেকে পালাবার কথা বড় একটা শোনা যায় না।

স্বপ্নের ফল

(শ্রীনবেন্দু সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়)

স্বপ্ন-সফল বড়ি
আদ্যরাজের বদ্যিমশাই নিজের হাতে গড়ি'
রাজার হাতে তুলে দিয়ে ব'লে দিলো কানে,—
লুকিয়ে রেখে দেবেন কোথাও খবর না কেউ জানে,
তারপরেতে সময় বুঝে স্বপ্ন ভালো দেখে
একেবারে বাসি মুখে ঘুমের থেকে জেগে
ঘোলের সাথে এক চুমুকে নেবেন হুজুর খেয়ে,
দিন না যেতেই অবাক হবেন ফল দেখ্‌তে পেয়ে;
দক্ষিণাটা হুজুরকে আর বল্‌ব কি ছাই তবু
ভাল মতই মেলে যেন নজর করবেন প্রভু,
একটা কথা ভাল ক'রে মনে রাখ্‌বেন তবে
ভোর বেলাকার শেষ স্বপ্নই সফল শুধু হ'বে।

এই না ব'লে সেলাম ঠুকে বদ্যি গেল চ'লে,
রাতের আহার চুকিয়ে রাজা ঘুমে পড়লেন ঢ'লে।
পরের দিনে সবাই দেখে রাজা বেজায় খুসি
আদর ক'রে মন্ত্রীবরের পিঠে লাগান ঘুসি,
রাজসভাতে উঠ্‌লো সেদিন আনন্দেরই রোল,
বন্দীরা সব মুক্তি পেলো লাগ্‌লো গণ্ডগোল,
খাজাঞ্জিরে হুকুম হোলো রাজভাণ্ডার হ'তে
রত্ন দিয়ে রাজ্যটারে ভাসাও সুখের স্রোতে,
দুঃখ যেন রয় না কোথাও কোনও ঘরের কোণে,
প্রার্থীরে দাও পূর্ণ ক'রে চাওয়ার বেশী ধনে।

উঠ্‌ছে রাজার জয়ধ্বনি বাজ্‌ছে নহবৎ,
মন্ত্রী সেপাই সার দিয়ে সব কর্‌ছে দণ্ডবৎ,
ভিক্ষুরা সব ভিক্ষা নিয়ে ফির্‌ছে দুহাত পাতি',
এমনি তরো চল্‌ছে যখন বিষম মাতামাতি,
মন্ত্রীমশাই চম্‌কে হঠাৎ ওঠেন ব্যাপার দেখি, —
আসন থেকে নেমে রাজা চার পা হ'লেন একি !
মাথায় রাজার সিং বেরোলো খুর বেরোলো পায়ে,
বড় বড় লোম বেরোলো রাজার সারা গায়ে ;
মন্ত্রী যতই শুধান—'হুজুর কাণ্ডখানা কি ?'
ব'লতে গিয়ে রাজা কেবল ওঠেন 'ব্যা-ব্যা' ডাকি' !
এক নিমেষেই থেমে গেল সকল কোলাহল,
সভাশুদ্ধ লোকের চোখে ঝরল দুখের জল,
বুঝ্‌ল না কেউ জান্‌ল না কেউ কোন অভিশাপ ব'য়ে
আস্ত মানুষ রাজামশাই গেলেন ভেড়া হ'য়ে।

বুঝ্‌ল কেবল বদ্যিমশাই, তাই ফেলে নিশ্বাস
বল্‌লে আপন মনে মনে—এই ছিল মোর ত্রাস,
উৎসাহেতে রাজামশাই শেষ স্বপ্ন ভুলে
মধ্য রাতের স্বপ্ন নিয়ে তাই প'ড়েছেন গোলে ;
স্বপ্ন-সফল বড়ি আমার অক্ষরে অক্ষরে
গুণটি তাহার প্রমাণ ক'রে দিল রাজার 'পরে।
গোলমালে আর কাজ নেইকো, এখন মানে মানে
প্রাণটি নিজের বাঁচানো যাক্ পালিয়ে কোনও খানে,
নইলে পরে মুণ্ড যাবে অপরাধের লাগি',—
এই না ব'লে বদ্যিমশাই হ'লেন দেশত্যাগী।

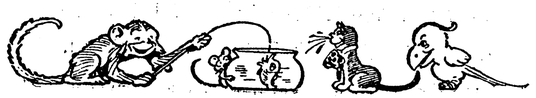

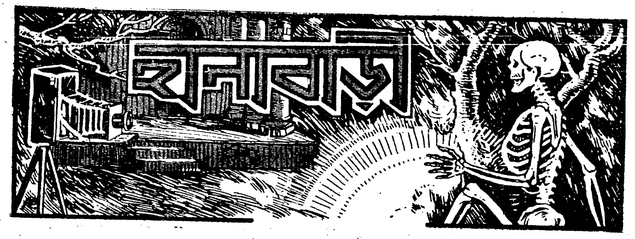

(শ্রীননী গোপাল মজুমদার)

নয়

ত্রিমূর্ত্তি

দিন কয়েক পরে হঠাৎ ন-টার সময় ঘুমুতে যাবার আসল কারণটা যে কি আর সাড়ে ন-টার মধ্যেই যে 'লাইটস্ আউট' কেন হ'লো, তার কারণটা যে কি সবাই জানতে পেতো, যদি তারা ঠিক দশটার সময় মেথরের রাস্তার কাছে আসতো। তিনটী মূর্ত্তি—সারা শরীর তাদের মোটা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা, মিশকালো আঁধারের মধ্যে সাদা তিনটী ছবি। ধীরে ধীরে ত্রিমূর্ত্তি সেই ছোট গলি দিয়ে বাইরের বাগানে বেরিয়ে প'ড়লো। তাদের আগে আগে ত্রস্ত পদে আর এক বালক যেন কি এক কাজে খুবই তাড়াতাড়ি চলেছে, তারই পাছে পাছে এই ত্রিমূর্ত্তি চোরের মত পা টিপে টিপে চলেছে। বালক গিয়ে উঠ্‌ল সেই টেলিফোন-ওয়ালা গাছে, টেলিফোনটি তুলে নিল, ব'ললো, "সুরেনদা,..."।

ত্রিমূর্ত্তি আস্তে আস্তে তিনটি গাছের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদের প্রত্যেকের কাছে একটা ক'রে টেলিফোনের রিসিভার। সবাই আস্তে আস্তে সেটা কাণে তুলে নিল।

বালক আর সুরেন কথা ক'ইছে। বালক ডাকলো, "সুরেনদা..."

উত্তর হ'লো "বল..."।

"কদ্দুর ক'রলে ? কোনো হদিস হ'লো কি ?"

"এখনও সবতো ঠিক ক'রে উঠতে পারিনি ভাই।"

"কিন্তু সুরেনদা, এমন ভাবে কারাগারে বন্ধ থাকতে ইচ্ছা করে কি ? আমি আর পারি না।" —"আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর ভাই।"

"কিন্তু সুরেনদা, রোজ রাত্রে আমায় সেই বিভীষিকা দেখতে হচ্ছে কেন ?"

"কি ? কি সত্য ?" —"সেই মুখ রোজ আসে। উঃ, কি প্রতিহিংসার ছবি, তারপর সেই হাত ! উঃ অসহ্য ! সেই কঙ্কাল··· !"

আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। রোজ সেই লোক—না কঙ্কাল, সেই ভূত··· আসে আমাদের ঘরে ! ফিস্ ফিস্ ক'রে বললাম, "সহায়"। সহায় ব'ল্‌লো, "চুপ !"

কথা চলছে। —"কিন্তু তুমি আমার কথা মেনে চ'লছো নিশ্চয় ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে যে কি কষ্ট যদি তা তুমি বুঝতে সুরেনদা ! হঠাৎ হয়তো কবে চেঁচিয়ে উঠবো।" —"সত্য, আর ক'টা দিন··· ।"

"সুরেনদা একটা কথা ; সেই লোকটা আমার কোন··· ?"

"সেটাই হ'লো ভাবনা সত্য। কে যে এসেছে তা বলতে পারছি না যে। কখন আসে সে ?" —"প্রায় বারোটায়।"

"আজ যদি সে কিছু না করে তবে আর তোমার কোন ভয় নাই। আজ আমি যেতে পারবো না, কিন্তু কাল রাত্রে সে ভূতই হোক আর যাই হোক একবার ল'ড়ে দেখব।"

সহায় একটু হেসে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ললো, "মূর্খ !" আমি বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। কতদূরই বা জানে সে ! হঠাৎ তবে তার এই কথা কেন ?

কথা চলছে—"হ্যাঁ ভালো কথা, সেই যে ছেলেটি তোমায় সন্দেহ করেছিল, তার খবর কি ?" —"সে ভারী গোল বাধিয়েছে ; তার যে কি উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারছি না ; সেদিন কে যেন একটা চিঠি লিখে ছিলেন···"

"চিঠি—কে লিখেছিল ?"

"তাতো ব'লতে পারিনা সুরেনদা, তাতে একটা মড়ার মাথা, আর কিছু নেই।" সুরেন যেন চ'মকে উঠল। ব্যাকুল হ'য়ে ব'ললো, "এ্যাঁ মড়ার মাথা ? রঙ্—চিঠির রঙ্ কি রকম্ ?"

"নীল।" —"জয় ভগবান, তবে ভয় নাই। আজ ধৈর্য্য ধরে থাক।"

"কিন্তু — কিন্তু ! তাছাড়া, আমার ভারী ভয় করছে।"

"আচ্ছা যাও, আজ রাত্রে সাবধান।"

"আচ্ছা" ব'লে সত্য গাছ থেকে নেমে আবার স্কুলে ফিরে গেল। সহায় এক লাফে গাছে উঠে রিসিভারটা তুলে নিলে। সুরেন ব'ল্‌ল, "ব্যাপার কি ?"

"সাবধান, শীগ্‌গিরই রহস্য শেষ হবে।"

"কে ? কে তুমি ?" বুঝলুম তার স্বরে উদ্বেগ।

"যেই হই, তোমাদের বন্ধু। আসি নমস্কার।" সহায় রিসিভারটা রাখতে গিয়ে আবার মুখে লাগিয়ে ব'ল্‌লে, "হাঁ আর একটা কথা ; আজ রাত্রে সত্যর ভারী বিপদ ব'লে দাঁড়াতে পারছি না ; তা না হ'লে আমি কে ব'লতে পারতাম।"

সহায় রিসিভারটা রেখে এক লাফে মাটিতে নেমে প'ড়লো। তারপর হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠলো। বল্‌লো, "অজয়, রমেন, আজ দিনটা ধৈর্য্য ধ'রে থাক্, কেবল দেখে যা আমি কি করি, তারপর কাল সব জানতে পারবি।" ব'লে যে পথে আমরা ত্রিমূর্ত্তি ঢুকেছি, সে পথে ছুটে চল্‌লো। সে তার ঘরে ঢুকে ব'ল্‌লো, "অজয় তুই ঘরে চ'লে যা, আজ রাতের কথা যেন কেউ না জান্‌তে পারে। সকালে যদি কারও মুখে একথা শুনতে পাই তা' হ'লে এক চাটিতে তোর মাথা ঘুরিয়ে দেবো, বুঝলি ? যা।" অজয় বল্‌লো, "আমায় শুধু শুধু বল্‌ছো সহায়দা, আমার কাছে যে কথা··· ··"

"হ্যাঁ হ্যাঁ খুব হ'য়েছে, পালা।" অজয় এক দৌড়ে পালালো।

সহায় বল্‌ল, "রমেন, আজ একটা কাজ কর্ত্তে হবে, পারবি ?"

আমি বল্‌লাম, "কি কাজ শুনি"। সহায় বলল, "সত্যকে তার বিছানা থেকে তুলে এনে তোর বিছানায় রাখতে হবে, পারবি ?

"অর্থাৎ··· !"

"তুই এখনি ঘরে যা, সত্য যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে জাগাবি। তারপর তাকে বলবি, আমার হুকুম সে আজ তোর বিছানায় ঘুমুবে। সে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে, বল্‌বি, তুই কিছু জানিস্‌না, এ আমার হুকুম। হ্যাঁ, তুই ঘরে যাবার আগে এ চাদরটা খুলে যা। সত্যকে বিছানায় শুইয়ে রেখে, তোর বালিশে এ শিশিটার ঔষধ খানিকটা ঢেলে আস্‌বি ; এ ক্লোরোফর্ম্ম ; খুব মাইল্‌ড্—আস্তে আস্তে সত্য ভায়া এতে ঘুমিয়ে পড়্‌বে মাত্র। যা শীগ্‌গির।"

হঠাৎ, রাত দুপুরে এ কসরৎ কেন কর্‌তে হবে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। সহায়ের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌বার সাহসও আমার হলো না। ঘরে চলে এলাম। দেখি, সত্য নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। দারুণ হাসি পেল। হায়রে ! বেচারা জানে না যে আমার বিছানায় শুয়ে আছে আমার পাশ-বালিশ। মনে মনে একটু

হেসে আমার বিছানায় খানিকটা ক্লোরোফর্ম্ম ঢাল্‌লাম, তারপর তাকে কোন রকমে তুলে আমার বিছানায় শুইয়ে রেখে চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে দিলাম। সত্য একটু গোঁ গোঁ করলো, কিন্তু একটু পরেই বিছানায় এলিয়ে পড়ল। বিছানার ক্লোরোফর্ম্মের মিষ্টি গন্ধ আমার নাকেও আস্‌ছিল, আমি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে সরে গেলাম। বেরুতে যাবো, এমন সময় সহায় ঘরে ঢুক্‌লো। তার কাঁধে একটা মানুষ! আমি চম্‌কে একেবারে এক পা পিছিয়ে গিয়ে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এ কি রহস্য? সে কোন দিকে না চেয়ে, সত্যর বিছানায় মানুষটাকে শুইয়ে রেখে, চাদর দিয়ে ঢেকে রাখ্‌লো। তারপর আমার হাত ধরে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। আমি বল্‌লাম, "সহায়, এ যে কি করলে তা ত ..."



সহায় হেসে বল্‌লে, "বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিস না—না? কাল ভোরে সব বুঝ্‌বি। মনে আছে, আমি বলেছিলাম সত্যর আজ ভারী বিপদ!"

তবে কি, তবে কি—আজ রাত্রে আবার সেই কঙ্কাল আসবে? আমার চোখের সামনে কতগুলি হাড়ের একখানা মুখের মধ্যে সারি সারি দুপাটি দাঁত ভেসে উঠ্‌লো। গা শিউরে উঠ্‌ল। কিন্তু সত্যকে বিছানা থেকে সরানোর দরকার কি ছিল? তবে কি ভূত সত্যকে খুন কর্‌বে? ভূতে কি খুন করে? করলেও সত্যর বদলে এ কাকে বলি দেবার আয়োজন হচ্ছে? যতই ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, মাথায় ততই ব্যাপারটা গোল পাকাতে লাগ্‌ল। সহায়রামকে আমি চিনতাম বেশ ভালো করেই, সে যখন বলেছে যে কাল ভোরে সব জান্‌তে পার্‌বো, তখন শত চেষ্টা কর্‌লেও তার আগে আর ওর মুখ খুল্‌তে পার্‌বো না।

নিজের ঘরে ঢুকে সহায় বল্‌ল, "আমার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়। আমি একটু কাজ করি।" আমি বল্‌লাম, "কিন্তু সহায়রাম ... "

"কিন্তু টিন্তু নয়, যা বল্‌ছি তাই শোন।"

আস্তে আস্তে গিয়া সহায়ের বিছানায় শুয়ে পড়্‌লাম। সে যা যা বলেছে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম; সমস্ত ব্যাপারটা জপে একেবারে উলট পালট ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, কোন 'হদিসই' এর আমি পেলাম না। ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই; উঠ্‌লাম হঠাৎ একটা শব্দ শুনে। চোখ মেলে চেয়ে দেখি, সহায়রাম চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তার টেবিলের উপর একটা ছোট্ট 'ইলেক্‌ট্রিক বেলের' দিকে শিকারী কুকুরের মত চেয়ে আছে। আমাকে জাগ্‌তে দেখে সে বল্‌লো, "জেগেছিস? চল শীগগির চার নম্বর ঘরে।"

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন স্বপ্নের মত বোধ হতে লাগ্‌ল। বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে দুজনে চার নম্বর ঘরে ছুটে এলাম। সহায় হঠাৎ ধুপ করে দরজার সামনে পড়ে গেল, দরজায় তার মাথা ঠুকে এক দারুণ শব্দ সারা হোষ্টেল কাঁপিয়ে তুল্‌লো। চারিদিক স্তব্ধ, কোথাও কেউ নেই, কেবল দেয়ালগুলি যেন নিরুদ্ধ নিশ্বাসে কার প্রতীক্ষা করছে। সহায় এক লাফে উঠে দরজার হাতল ধরে টান্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে শার্শি-ভাঙ্গার শব্দ। সারা শরীরে ভয়ের একটা শিহরণ জেগে উঠ্‌লো। কিন্তু দরজা খুলে যা দেখ্‌লাম, তা'তে মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না।

দরজা খুলে সহায়রাম তার হাতের টর্চ্চ সত্যর বিছানার উপর ফেলল, ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখ্‌লাম, সত্যর বিছানা লালে লাল হয়ে গিয়েছে। এ কী পৈশাচিক দৃশ্য! দেখে, একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়্‌লাম, ভয়ে সারা শরীর অবশ হয়ে এলো। চীৎকার করতে গেলাম, সহায় আমার মুখ চেপে ধরে বল্‌লো "চুপ!"

দশ

কঙ্কালের টঙ্কার।

ঘুম থেকে উঠে দেখি, সহায়রাম পাশে পড়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সহায়ের ঘরে যে কি করে এলাম, বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। একবার ঘরটার চারিদিকে চাইতে গিয়েই গা-টা কেন জানি হঠাৎ শিউরে উঠ্‌ল; মুহূর্ত্তে রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল।—পাশের লোকটা কি···? একেবারে তাজা রক্ত চোখের সামনে ···!

ইতিহাসে পানিপথের যুদ্ধের কথা পড়েই ত' মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়্তাম, চোখের সামনে যেন রক্ত-নদী দেখ্তে পেতাম! আর — আজ! ভাগ্যিস্ সত্যকে সরানো হয়েছিল। কিন্তু··· কিন্তু কে? কে এসেছিল সত্যকে মারতে? এ কী ভূতের প্রতিহিংসা? কিন্তু সহায়রাম তার বদলে ·····

চিন্তার সূত্র শেষ হলো না। কে যেন দরজায় ঠক ঠক শব্দ কর্তে লাগ্লো। উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম। ঈশান বাবু এক গাল হাসি নিয়ে ঘরে ঢুক্লেন; বল্লেন, "সহায়, এখনো ঘুমুচ্ছে? বেচারী কাল রাত্রে দারুণ খেটেছে।" আমি বল্লাম, "হ্যাঁ, স্যর।"

সহায় কথাবার্ত্তা শুনে ধড়্মড়্ করে উঠে বস্লো। চোখ মুছে বল্ল, "স্যর!"

মাষ্টারমশাই আর একবার হেসে বল্লেন, "হ্যাঁ, তুমি ঘুমোও।"

সহায় এক লাফে উঠে, নমস্কার করে স্যরের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বল্ল, "আপনি নিজে এলেন কেন স্যর? আমায় ডাক্লেই তো স্যর যেতুম।"

"যেতে তা জানি, কিন্তু তুমি জিরোবার সুবিধে পেতে না এটাও অতি সত্য কথা। তাই আমি ভাবলাম তোমায় একবার দেখে যাই।"

ঈশানবাবুর মত লোকই সত্যি সত্যি হাউস মাষ্টার হবার যোগ্য। ঠিক ছেলের মত সবাইকে দেখেন, কার কি অসুখ হলো, কে কোথায় আছাড় খেলো, কোথায় কে পড়াশোনা কর্ছে, কে ফাঁকি দিচ্ছে, সব তিনি জান্তেন, আমাদের তিনি প্রাণভরে ভালোবাস্তেন, তাঁর শাস্তির মধ্যেও যেন তাঁর স্নেহের পরশ দেখ্তে পেতাম। কাজেই আমরা তাঁকে যেমন কর্তাম শ্রদ্ধা, তেমনি তাঁর কথা শুনে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলাম। জান্তাম, তিনি এমন কিছু করতে বল্বেন না যাতে আমাদের অমঙ্গল ঘট্তে পারে। কাজেই তাঁকে আজ সহায়ের ঘরে দেখে খুব বেশী অবাক হইনি। কিন্তু অবাক হলাম যখন স্যর বল্লেন, "শুন্লাম, কাল রাত্রে ঠিক মতই কাজ হয়েছিল। ড্রইংমাষ্টার মশাই ডামিটা* করেছিলেন ভারী চমৎকার কিন্তু।" ডামি? তা হ'লে যে লোকটাকে কাল রাত্রে ভূতে মেরেছে সে আসলে কোন ছেলে নয়? অবাক হয়ে স্যরের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

স্যর বলে চল্লেন, "কিন্তু কথা হ'লো জিনিষটা যে ডামি, তা ভদ্রলোক

* নকল মানুষ—পুতুলের মত জিনিষটা। এখানে রবারের করা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কাঠ দিয়ে করা হয়েছিল তার পাঁজরা।

বুঝ্লেন কি না।" —"না স্যর, তার ত' সময় বড় দেওয়া হয়নি। কারণ তাড়াতাড়ি কর্তে গিয়ে তিনি ছোরাটাই ফেলে গেছেন। আর যাবার সময় তাড়াতাড়িতে জানালার কাঁচও ভেঙ্গে গেছেন একখানা। তাইতেই ত বীরেন জেগে উঠ্ল।"

"আর সত্য?" —"না স্যর, সত্যকে আপনার কথামত ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল, কাজেই সে টের পায়নি।"

"কিন্তু সহায়রাম, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার, কারণ সত্য কিছু জান্তে পেলে কিম্বা দেখে থাকলেই বিপদ ঘট্বে। আর বীরেনকে—"

"হ্যাঁ স্যর, বীরেনকে সব বলে দিয়েছি, ও কিছু বল্বেনা।"

"কাল রাত্রের ব্যাপারটা সব খুলে বল দিকিন।"

সহায় বলতে লাগল—কি রকম ভাবে, আমাদের বিজ্ঞানের শিক্ষক হরিপদ বাবুর কাছ থেকে তিনটা রিসিভার আর তার নিয়ে, সত্যদের কথাবার্ত্তা শোনা হ'ল, কেমন করে সত্যকে বিছানা বদ্লে শোয়ানো হ'ল, কেমন ক'রে সহায়রামের এলার্ম বেল বেজে উঠ্ল, কেমন করে আমরা হুড়্মুড় করে ঘরে ঢুক্লাম—সব। এ পর্য্যন্ত ব'লে সহায় আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে বল্ল, "ঠিক এমন সময়ই শ্রীমান মূর্চ্ছা গেলেন। দেখল যে ডামিটাকে রেখে এলাম, তবুও ঐ নকল রক্ত দেখেই ওর হ'ল মূর্চ্ছা আর বীরেন পড়্লো জেগে! গোড়ায়, কি যে করি বুঝে উঠ্তেই পার্লাম না। সত্যকে একবার দেখে নিয়ে, বীরেনকে সব খুলে বল্লাম;—দেখলাম ও যখন ওই সব কাণ্ডই দেখে ফেল্ল, তখন আর লুকিয়ে লাভ কি। বীরেন কি তা'তে থামে? ব্যাপার দেখে তক্ষুনি পুলিশে ছোটে আর কি? যেমন গোঁয়ার, বুদ্ধিও তেমনি। যতই বোঝাই, যাকে মেরেছে সে সত্য নয়, ততই যেন ওর রোখ চ'ড়ে যায়। শেষ কালে ত' বলেই বস্ল, না হয় সত্যই নয়, তা বলে আমাদের ঘরে লোক আস্বে কেন? শেষে ধরে, বসিয়ে, আপনার নাম করে, সত্যকে ও রমেনকে দেখিয়ে, ডামিটাকে ছুঁইয়ে, সব বুঝিয়ে, তবে ঠাণ্ডা করি। তারপর জল দিয়ে রমেনকে খানিকটা মানুষ ক'রে আমার ঘরে এনে শুইয়ে দিলাম; আর ডামিটা, চাদর টাদর গুলি সব নিয়ে, যেমন কথা ছিল, আপনার বাথরুমে রেখে এলাম; তারপর বীরেনকে ঘুম পাড়িয়ে এসে নিজে শুয়েছি।"

"লোকটাকে তা হ'লে দেখতে পাওনি?"

"না স্যর, কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় ভদ্রলোক নিজেই এসেছিলেন।"

ভদ্রলোক! —ভদ্রলোক! —ভদ্রলোক কে? সহায় এত কথা জানলো কি ক'রে? সেই কঙ্কাল তবে ভূত নয়? হানাবাড়ীর লোক তবে অশরীরী নয়?

স্যর আরম্ভ ক'রলেন, "কিন্তু সহায়, এদিকে সেই যে তুমি ফটো তোলবার কথা বলেছিলে, তা আমি আমাদের হরিপদ বাবুকে বলেছিলাম, তিনি তার একটা ছবি তোলবার ব্যবস্থাও ক'রেছেন। তোমরা বোধ হয় জান যে আজকাল জীবজন্তুর অনেক Flash-light ফটো তোলা হচ্ছে। সেগুলিতে আপনা-আপনিই ফটো ওঠে। জঙ্গলে জীবজন্তুর পথে একটা করে তার পড়ে থাকে। তারের সঙ্গে যেই জন্তুর পা লাগে অমনি সেই তারটি জ্বলে ওঠে, জন্তুও হতভম্ব হয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের এক ক্যামেরায় ছবি উঠে যায়। হরিপদ বাবু সেবার আমার কুকুরটা দিয়ে এ পরীক্ষা করেছিলেন, তাতে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। কাল রাত্রে আমাদের এই ভূতেরও এক ছবি তোলবার ব্যবস্থা করেছেন।"

"কিন্তু, স্যর—"

"সে কিছু সন্দেহ করেছে কিনা, এইত? আমার ত' বাপু মনে হয় না যে সে কিছু সন্দেহ ক'রেছে, কারণ তার কাগজ পত্র যে তুমি সরাতে পারো, এ ধারণা তার মাথায়ই আসতে পারে না। তারপর এর মধ্যে যে আমরা শুদ্ধু থাকতে পারি, এ-সে ভেবেই উঠতে পারে না। সে ঠিক ভেবেছে যে এ সুরেন রাবাজীরই কাজ; কাজেই····· "

ঠিক এমন সময়, দরজায় হঠাৎ শব্দ হলো 'ঠক ঠক ঠক'। হাউস-মাষ্টার বল্‌লেন, "খোলাই আছে, ভেতরে আসুন হরিপদ বাবু।"

আসলে কিন্তু হরিপদ বাবু ঘরে ঢুক্‌লেন না, ঘরে ঢুকলেন তাঁর সহকারী;— সেই বছর পঁচিশ ছাব্বিশ যাঁর বয়স, বেশ সুন্দর চেহারা, একটু লম্বাটে ধরণের, বেশ ফর্সা রং, প্রায় ছ' ফুট লম্বা, মাথায় চমৎকার টেরি, রিষ্ট্‌ওয়াচ একটা সব সময়েই হাতে আছে, পায়ে পাম্প্‌সু, বৈজ্ঞানিকের থেকে কবি বলেই ভুল হয় বেশী, ছাত্র দেখলেই ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে যান। আমরা তাকে 'বাবু' বলে ডাকি।

ঈশানবাবু বল্‌লেন, "কিহে দীনু, তোমার আবার কি হ'ল? মুখ খানা অমন কেন? ব্যাপার কি?"

"আজ্ঞে, হরিপদ বাবু বল্‌ছিলেন যে কালকের পরীক্ষায় নাকি কি একটু গোলমাল হ'য়ে গেছে।"

"কেমন? ছবি ওঠেনি বুঝি?"

"আজ্ঞে না, ছবি উঠেছে···কিন্তু?"

আমরা তিনজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠ্‌লাম। এ আবার কি নতুন রহস্য? চারজনে তক্ষুনি হরিপদ বাবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। চারিদিকে বই, খাতা ছড়ানো, টেবিলের উপর স্তূপাকৃতি বই, চেয়ারের উপর কতগুলি খাতা, ঘরটায় একটা বদ্ধ হাওয়ার গন্ধ। পাশের ঘর হ'লো পরীক্ষার ঘর, অন্ধকার। আমরা ঢুক্‌লে হরিপদ বাবু একটা জানালা খুলে দিলেন।

ঈশানবাবু বল্‌লেন, "আরে হরিপদ বাবু ব্যাপার কি? দীনু যে মূর্চ্ছা যায় আর কি!"

"ব্যাপারটা প্রায় তাই হয়ে পড়েছে। কাল রাত্রে এত বল্‌লাম আমার সঙ্গে থাকতে, থাকতেন যদি ত' আসল ব্যাপার বোঝা যেত। আমি বুড়ো মানুষ, দূর থেকে লোকটাকে ঠিক দেখ্‌তে পেলাম না, আলোটা জ্বলে উঠ্‌বার পরে গেলাম। কিন্তু ···"

"কিন্তু···কিন্তু কি—"

"এই দেখুন··· " বলে হরিপদবাবু একটা ফটোগ্রাফের প্লেট তুলে ধর্‌লেন, আমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখ্‌লাম, সারা প্লেটটার বুকে জেগে রয়েছে একটা কঙ্কাল! গা শিউরে উঠ্‌ল। জানালার পাশে সে মুখ মনে পড়ে গেল। সহায় রাম অবাক হয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠ্‌ল, আমি ঢিপ করে বসে পড়্‌লাম, ঈশানবাবু হাঁ করে চেয়ে রইলেন। সারা ঘরখানা থম্ থম্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

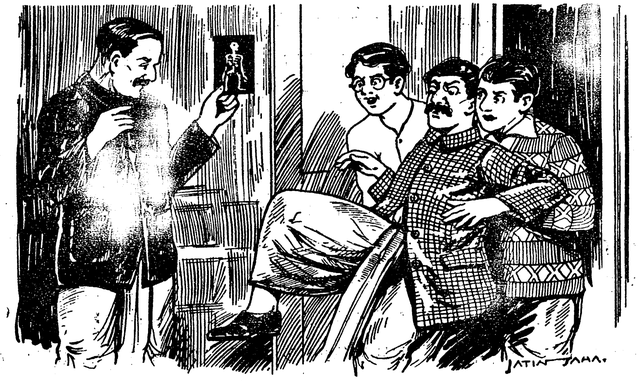

—(ক্রমশঃ)

খেলা

আঙ্গুল-মুখো

হাতের আঙ্গুলগুলিকে নানা রকমে সাজিয়ে, দেওয়ালে তা'র ছায়া ফেলে অনেক রকমের মজার ছবি করা যায় তা' তোমরা জান। "সন্দেশ"এ সেরকম ছবি অনেক বেরিয়েছেও। এবার শুধু আঙ্গুলগুলির সাহায্যে কেমন মজার মুখ বানান যায় তা'র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। এর জন্য সামান্য কয়েকটি সরঞ্জামের দরকার, তা' তোমরা সহজেই জোগাড় ক'রে নিতে পার।

১নং ছবি—হাতটি মুঠো ক'রে, দুটি আঙ্গুলের মাঝে দুই পুতুলের চোখ ঢুকিয়ে দিয়ে, 'মাথা'র কাপড় একটি সাজালেই এই 'বেজারবুড়ী' মুখ তৈরী হ'লো।

২নং ছবি—একটা বোতাম আর খানিকটা পশম বা কালো সুতো হ'লে এই 'লম্বা চুলো' অনায়াসে দেখা দিতে পারে।

৩নং ছবি—এই 'চালিয়াৎ' চুরুট-মুখে লোকটিকে বানান খুবই সোজা। দুটি বোতাম আর খানিকটা কালো পশম হ'লেই হয়। এক টুকরো কাগজকে পাকিয়ে চালিয়াতের মুখে ঢুকিয়ে দিলেই তা'র চালটি সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

৪নং ছবি—দুটি আঙ্গুল, দুটি বোতাম বা মুক্তো (কাঁচের), খানিকটা তুলো বা পশম আর একটি ছোট টুপি বা এক টুকরো কাপড় পেলে অনায়াসে এই 'দাড়িওয়ালা বুড়ো'কে বানান যায়।

৫নং ছবি—এই 'বেচারা'কে বানাতে কোন সাজ-সরঞ্জাম লাগ্‌বে না। একটু ছবি আঁকা জানা থাক্‌লেই হাতের পিছন দিকে এই রকমের অনেক 'বেচারা'কে বানান যায়।

৬নং ছবি—পুতুলের এক জোড়া চশমা আর একটি টুপি পাওয়া গেলে এই 'শীত-কাতুরে'কে বানাতে কোন মুস্কিল নেই। দুটি আঙ্গুলের মাঝে বুড়ো আঙ্গুলটি বেড়িয়ে আছে, তার উপর চশমা বসান হয়েছে। একটা রুমাল পেলেই 'শীত-কাতুরে'র কম্‌ফর্টারটি বানান যায়।

তোমরা যদি এই রকমের মজার মুখ বানিয়ে তা'র ছবি পাঠাও তাহ'লে সেই ছবি আমরা "সন্দেশ"এ ছাপ্‌তে পারি। এগুলো দেখ্‌লে বেশ সহজেই বুঝ্‌বে এ রকমের কত মুখ তোমরা ইচ্ছা কর্‌লে বানাতে পার।


১

আঙ্গুল-মুখো

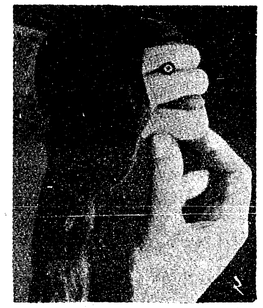
২


৩


৪


৫


৬

ষাঁড়ের গুঁতো

(শ্রীপরিমল রায়)

এই সেরেছে ! পালাই কোথা ! ষাঁড়টা আসে তেড়ে !
আয় না বাপু, প্রাণটা বাঁচা, আছিস্ তোরা কে রে !
কোত্থেকে এ ভীষণ আপদ জুট্‌লো এসে পথে,
একটা গুঁতো মেরেছে কি এক্কেবারে ফতে !
দোহাই তোমার হেই ভগবান, একটা কিছু কর,
নিদেন ওটার পেছন থেকে ল্যাজটা টেনে ধর।
ঘাড় বাঁকিয়ে, শিং বাঁগিয়ে, উচ্চে ধ'রে লাঙুল
আস্‌ছে রুখে,—মাঝখানে আর জোর দু'কুড়ি আঙুল !
পশু কি আর সাধে বলে, ষণ্ডা পশুই বটে,
চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখালুম, একটু যদি হটে !
এগিয়ে তবু ফুঁস্‌ছে দেখ, দেখছি নে তো উপায়,
সাহস করে আঁৎকা লাথি মারবো নাকি দু'পায় ?
কিম্বা দেব গলার তলায় ভীষণ কাতুকুতু ?
কিম্বা যাতে পিছ্‌লে মরে ফেলবো কসে থুতু ?
ভীষণ রেগে শিং দুটোকে ধরব নাকি ঠেসে ?
কিম্বা চোঁচা লম্বা দেব, কিম্বা দেব হেসে ?

ঠিক ধরেছি ! হাস্‌তে হবে মন ভোলানো হাসি,
মিষ্টি হাসি, ভাবটা ওকে কতই ভালবাসি !
মুচকি হাসি, কিন্তু যাতে কুঁচকে না যায় ভুরু,
ভাবটা যেন, বন্ধুতা-টা আজ থেকে নয় সুরু।
হাসির মানে এই হবে যে ভয়টা এতে কিসের ?
বুদ্ধি কি আর রাখি-ই নেকো, মগজটা কি সীসের ?
আসছো ধেয়ে প্রাণের টানে, আসছো কি আর রুখে ?
মুচকি হাসি পাচ্ছে যে তাই হাসছি মনের সুখে !

ফিক্ করে যেই ফেলবো হেসে মনটা যাবে গ'লে,
লক্ষ্মীছাড়া তাইতে যদি গুঁতিয়ে দিতে ভোলে !

পাঁচ বোকার কাহিনী

যুক্ত অক্ষর শূন্য গল্প

(শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

এক চাষার এক বউ ছিল ; তা'র ছিল একটি পাখী। চাষা যখন মাঠে কাজ কর্‌ত তখন তার বউ পাখীটার গায়ে হুঁকো কল্‌কে তামাক বেঁধে দিত ; পাখী উড়ে চাষার কাছে যেত। পাখীটি এসব শিখেছিল চাষার বউএর কাছ থেকেই।

একদিন পাঁচটি বোকা আর হিংসুটে লোক চাষার মাঠের কাছ দিয়ে চলেছিল ; তারা দেখ্‌তে পেল একটা পাখী তামাক হুঁকো কল্‌কে নিয়ে চাষার কাছে উড়ে এসে নাম্‌ল ; চাষা তামাক সেজে মনের সুখে হুঁকোয় টান দিতে লাগল। লোকগুলো ত' দেখে অবাক ! তাদের ভারী লোভ হ'ল পাখীটার ওপর ; কাছে এসে চাষাকে বল্‌লে, "পাখীটা আমাদের দেবে, আমরা টাকা দেব ?" চাষা বুঝেছে লোকগুলো বোকা ; তাই আগে সে কিছুতেই রাজী হয়নি—শেষকালে ৩০০৲ টাকায় পাখীটাকে বেচতে রাজী হ'ল। পাঁচটী বোকার মন খুসীতে ভরে উঠল ; তখনি তা'রা ৩০০৲ চাষাকে দিয়ে দিল। আরও ৩০০৲ টাকা পাখীর পালকে বেঁধে বলল্ "শিবপুর যা।" পাখী উড়ে গেল, পাঁচ বোকা হাসতে হাসতে চল্‌ল শিবপুরের দিকে।

পাখী উড়ে এসে চাষার বাড়ীতে নামল, কারণ চাষার বউ পাখীটাকে শুধু বাড়ী থেকে মাঠ আর মাঠ থেকে এইটুকু পথই শিখিয়েছে, জিনিষ নিয়ে যেতে। পাখী ত আর সারা জগৎটাকে চেনে না ! চাষা বাড়ী ফিরে এসে পাখীর গা থেকে টাকাগুলো খুলে নিল—চাষার ৬০০৲ হ'ল। তা থেকে সে ১০০৲ নিয়ে গোবরের ওপর ছড়িয়ে দিল। পাঁচটি বোকা শিবপুর পৌঁছে পাখীকে দেখতে পায় না—মহাবিপদ ! আবার তারা দৌড়তে দৌড়তে চাষার বাড়ীতে এসে হাজির। চাষা তাদের আস্‌তে দেখে একটা কাঠি দিয়ে গোবর সরাতে লাগল। লোকগুলো এসে ত দেখে অবাক ! এ আবার কী ? গোবরের মধ্যে টাকা ! দেখে তাদের ভারী লোভ হ'লো, হিংসাও হ'লো। তারা পাখীর কথা ভুলেই গেল। চাষাকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "একি ভাই ? গোবরের মধ্যে টাকা ?" চাষা ভাল মানুষের মত

বল্‌লে, "হ্যাঁ ভাই, আমার ঐ গরুটার গোবরে টাকা থাকে।" শুনে বোকাগুলোর বড় লোভ হ'ল, গরুটি কিনতে। শেষকালে অনেক বলে কয়ে চাষার কাছ থেকে ৫০০০৲ দিয়ে গরু কিন্‌ল। বোকাগুলো খুসী মনে গোরু নিয়ে চল্‌ল। চাষা ছুটে এসে বলে গেল, "দেখো ভাই, গরুটাকে যত খাওয়াবে ও-ও তত টাকা দেবে।"

দুদিন ধরে বোকাগুলো গরুটাকে খুব ভাল করে খাওয়ালো, কিন্তু গোবরে টাকা ত দূরের কথা, একটা পাই পয়সাও দেখা গেল না। পাঁচ বোকা আবার চাষার বাড়ী এসে হাজির। চাষা বল্‌ল "বেশ, তোমরা এসেছ, আমি সব শুন্‌ছি; একটু জলখাবার খেয়ে নাও, তারপর দেখা যাবে।" পাঁচ বোকা বসল। চাষা ঘরের ভেতর গিয়ে তা'র মেয়েকে কি বলে এল, মেয়েটি একটা বাটী হাতে বাড়ীর বাইরে চলে গেল। চাষা তখন একটা ছোট লাঠি নিয়ে একটা গোরুকে এক ঘা দিয়ে বলে উঠল, "যা, তুই মেয়ে হয়ে এদের জন্যে খাবার নিয়ে আয়।" গরুটা দৌড়ে চলে যেতে যেতেই চাষার মেয়েও খাবার নিয়ে বাড়ী ঢুকল। বোকাগুলো ত অবাক! তারা তো আর জানে না যে চাষার মেয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিল, চাষার কথা শেষ হতে না হতেই বাটী হাতে এসে হাজির হয়েছে! চাষা বল্‌লে "এ শুধু লাঠির গুণ। একটা গরুকে ভাল ক'রে এক ঘা দিলেই দেখ্‌বে একটি বউ জুটে যাবে।" বোকারা তখন ১৫০৲ দিয়ে লাঠিটা কিনে নিয়ে বাড়ী চল্‌ল। গরুর কথা আর কারো মনেই এল না। বাড়ীর কাছে এসে তাদের মহা ঝগড়া, 'কে আগে লাঠি দিয়ে গরু ঠেঙিয়ে বউ জোটাবে'। শেষকালে একজন জোর করে লাঠিটা নিয়ে গেল তার বাড়ী। গিয়েই তার গরুটাকে ধাঁই করে এমন এক ঘা বসিয়ে দিলো যে গরুটা হাত পা ছুড়তে ছুড়তে এক্কেবারে পটল তুললো।

বোকা হলেও তারা ছিল বোকা-সয়তান। কেউই আগে বল্‌লে না যে লাঠির চোটে তার গরু মরেছে, কিন্তু বউ জোটে নি। শেষটায় যখন সকলে টের পেল ব্যাপারটা কি, তখন তাদের কি ভয়ানক রাগ! সবাই মিলে চাষার বাড়ী গিয়ে, দিল তা'র বাড়ী পুড়িয়ে। চাষা আর কি করে? আগুন থেকে কোন রকমে বেঁচে একটা গরুর গাড়ী করে দুই থ'লে ছাই নিয়ে চল্‌ল গাঁয়ের বাইরে। অনেক দূর গিয়ে দেখে কতগুলো লোক খাজনা নিয়ে টাকায় গাড়ী বোঝাই করে চলেছে; তাদের কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় যাবে?" তারা বল্‌লে, "রংপুরে জমিদার বাড়ী যাব।" সে বললে "আমিও সেইখানেই যাচ্ছি; ব'লে

তাদের সঙ্গে চল্‌তে লাগল। রাতের বেলা পথে তারা খেয়ে শুয়ে রইল, কেবল এক এক জন পালা করে পাহারা দিতে লাগল।" দেখতে দেখতে চাষার পালা এল। সকলে তখন ঘুমিয়েছে, চাষা চুপ ক'রে ব'সে পাহারা দিতে দিতে মনে নানা কথা ভাব্‌ছে। এমন সময় সে দেখ্‌ল সেই পাঁচ বোকা সেখান দিয়ে চলেছে। বোকাদের দেখে সে বিনয় করে বল্‌লে, "তোমাদের কাছে আমি চিরকাল দাস হয়ে থাকব; দেখ, তোমরা আমার ঘর পুড়িয়ে ভালই করেছ, এত টাকা পেলাম ছাই বেচে,—তবু আমার ঘর থেকে কতটুকুই বা ছাই হয়েছে!"

বোকারা বলে উঠল "কি রকম! ছাই লোকে কিন্‌ছে?" চাষা বল্‌লে, "তাও জাননা নাকি বোকারাম সব?" বোকাকে বোকা বল্‌লে তাদের ভয়ানক রাগ হয়। তারা তখুনি বাড়ী গিয়ে নিজেদের বড় বড় ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। পাড়ার লোক তাদের পাগলামী দেখে তাদের খুব ব'কে বেশ দু'ঘা দিয়ে দিল। বোকাদের হল ভীষণ রাগ; তারা গিয়ে চাষাকে ধরল এবং তাকে থলির মধ্যে পুরে নদীতে নিয়ে ফেলে দিল। চাষা যেখানে পড়ল সেখানে জল বেশী ছিল না; আর তখন ভাটার সময়, জল কমছে। চাষা থলির মধ্যে থেকে চিৎকার করতে লাগল।

সেই দিক দিয়ে একজন লোক ঘোড়ায় চেপে চলেছিল। চাষার চীৎকার শুনে সে নদীতে নেমে থলির মুখটা খুলে দিল। চাষা ত তাঁকে কি বল্‌বে ভেবেই পেল না; বল্‌লে, "হুজুর, আপনার ঘোড়ার দাস হ'লাম আমি।" লোকটি বল্‌ল, "আচ্ছা আমি কাছেই ঐ বাড়ীতে থাকি; তুমি ঘোড়া নিয়ে এস;" ব'লে সে এগিয়ে চল্‌ল।

চাষা ঘোড়া নিয়ে চলেছে, হঠাৎ বোকাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। তারা ত অবাক! চাষা বল্‌লে, "ভাই আমাকে ত নদীতে ফেলে দিলে; উঃ, নদীতে কি ভয়ানক ঘোড়া! আমি একা মানুষ, তারপর দড়িও কাছে ছিল না। তাই কোন রকমে একটা ঘোড়াই নিয়ে এলাম।" শুনে বোকারা ত লাফিয়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "চল ভাই, আমরাও জলের ঘোড়া ধর্‌ব—কি কি জিনিষ নিতে হবে?" চাষা বলল, "একটা করে দড়ি আর থলে নিয়ে এসো। এক একজন করে এসো, সকলে এক সঙ্গে গেলে ঘোড়াগুলি ভয়ে পালিয়ে যাবে।" সেই মত এক একজন নদীর ধারে আসতে লাগল, আর চাষা তাকে থলিতে পুরে নদীর মধ্যে ফেলে দিতে লাগ্‌ল। নদীর জলে 'বুক বুক' আওয়াজ হয়, আর চাষা বলে, "এই বার ঘোড়া ধরো।" এমনি করে একে একে সব বোকাগুলিকে নদীর জলে ফেলে দিয়ে চাষা চলে গেল।

ভূমিকম্পে

গত ১লা মাঘ যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেল তার ধাক্কা আমরা বাংলা দেশে খুব বুঝতে পারলেও তাতে বাংলা দেশের তেমন বেশী ক্ষতি হয় নি; কেবল দার্জিলিং ও পূর্ণিয়ায় কিছু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু এই ভূমিকম্পে উত্তর বিহার ও নেপালের, বিশেষত মুঙ্গের, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, মতিহারী, সিতামাড়ি, জামালপুর, কাটমুণ্ড প্রভৃতি সহরের ও তাদের আশে পাশের সব জায়গার একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে। ঐ সব সহরের প্রায় সব বাড়ীগুলিই ভেঙে চুরে একেবারে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। সেই সব বাড়ী চাপা পড়ে কত হাজার হাজার লোক যে প্রাণ হারিয়েছে, আর কত হাজার হাজার লোক যে জখম ও অঙ্গহীন হয়েছে তা এখনও সব ঠিক করা যায় নি। তা ছাড়া গরু বাছুর প্রভৃতি পোষা প্রাণীও মরেছে অনেক। পাটনা, গয়া প্রভৃতি স্থানেও অনেক ক্ষতি হয়েছে।

যারা বেঁচে আছে তারাও এই দারুণ শীতে, জল বৃষ্টির মধ্যে খোলা মাঠে দিন রাত কাটাচ্ছে। ভূমিকম্পের দাপটে শুধু যে ঘর বাড়ী পড়েছে তাই নয়, উঁচু জমি নীচু হয়ে গিয়েছে, নীচু জমি হয়েছে উঁচু, আর অনেক জমিই ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে গিয়েছে। কোন কোন ফাটলের ভিতর থেকে আবার জল ও তার সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি বালি উঠে চাষের জমি প্রভৃতিকে নষ্ট করে ফেলেছে। বালি উঠে কূয়ার তলা জমে যাওয়ায় অনেক জায়গায় খাবার জল পর্য্যন্ত ভাল পাওয়া যায় না। কাজেই যারা মারা যায় নি তারাও আত্মীয় স্বজনের শোকে আর এই সকল অসুবিধার মধ্যে কি দারুণ কষ্টে যে দিন কাটাচ্ছে তা ব'লে শেষ করা যায় না।

এই ভূমিকম্পে দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আর যতদূর জানতে পারা যাচ্ছে তাতে মনে হয় অন্ততঃ কুড়ি হাজার (২০,০০০) লোক প্রাণ হারিয়েছে।

আমরা খুব ব্যথিত মন নিয়েই জানাচ্ছি, আর "সন্দেশের" অন্যান্য পাঠক পাঠিকারাও জেনে খুবই দুঃখিত হবেন যে এই ভূমিকম্পে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন

তাঁদের মধ্যে আমাদের অনেক বন্ধু, গ্রাহক ও পাঠক পাঠিকাও ছিলেন। কি ব'লে যে তাঁদের আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দেব তা আমরা জানি না। তাঁদের এই শোকে আমরা—সন্দেশের পাঠক পাঠিকারা ও আমরা— সকলেই নিতান্ত মর্ম্মাহত হয়েছি। এই দুর্ব্বিপাকে যারা আজ নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে, আশা করি তোমরা সকলেই তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

—০—

(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

কবি অভিরাম

(শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—গ্রাহক নং ১৮৫৪)

(১)

আমরা তাকে নাম দিয়েছি কবি।

ফাইনাল বেল্ পড়ার আর ৬।৭ মিনিট দেরী আছে, এমন সময় একটা নতুন ছেলে ক্লাসে ঢুকল। মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের সব গোলমাল থেমে গেল। ছেলেটা বেমানান লম্বা। গায়ে তার একটা আদ্ধির পাঞ্জাবী। সেটাও তার মালিকের মত একটু অতিরিক্ত লম্বা। নাম তার অভিরাম। মিনিট চারের মধ্যেই সে আমাদের জানিয়ে দিলে যে সে একজন মস্ত কবি। অস্বীকার করতেই সে ব'লে উঠল—

বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি পরিপূর্ণ বলে,
সেই মত হৃদি হ'তে কবিতা নির্ঝর বাহিরায় সদা কুতূহলে।

বাস্! এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হ'তে পারে! কিন্তু বিজয় ফস্ করে বলে উঠল, "ও তো রবি বাবুর নকল"। আর যায় কোথা! অভিরাম একেবারে গর্জ্জে উঠল, "জানিস্—", কিন্তু ঢং ঢং ঢং; ফাইনাল বেল্ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেকেণ্ড মাষ্টার ক্লাসে ঢুকলেন। কাজেই অভিরামের মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। দীর্ঘ এক ঘণ্টার পর আবার ঘণ্টা প'ল; আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এবার দেখি

অভিরাম একটা কবিতা লিখেছে—

সেকেণ্ড মাষ্টার আজ পড়ান গ্রামার
মিছামিছি চ্যাঁচামেচি কেবল ব্যাগার ;
গ্রামারের কিটিমিটি
বোঝা বড় খিটিমিটি
চোখ ভ'রে ঘুম ধ'রে আসিছে আমার ;
পা ছেড়ে ঘুম দে রে, ব'সে থাকা ভার।

বাঃ! সকলে প্রশংসায় শতমুখ। এটাত আর রবি বাবুর নয়। আমরা কবিতাটা ভবতোষ বাবুকে দেখালাম। তিনি আমাদের বাংলার মাষ্টার। কিন্তু শুধু তাই বলিলেই তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। তিনি বাংলার একজন প্রখ্যাতনামা কবি—অন্ততঃ আমাদের কাছে। তাঁর কবিতা মাঝে মাঝে মাসিকে বের হয়। তিনি প'ড়ে গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন—"লিখেছো বেশ। কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে এ রকম ভাবে কোন কবিতা লিখতে চেষ্টা ক'রো না। এতে কবিতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। আগে কোন একটা ভাব ঠিক ক'রে নিয়ে পরে সেইটে ভাষার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়।" তার পর একটু পরে ব'ললেন, "আচ্ছা, কাল তোমরা কোন একটা বিষয়ে কবিতা লিখে এনো।"

আমি বল্‌লাম, "কোন বিষয়ে স্যার ?"

সত্যি বলতে আমার মনে তখন প্রচ্ছন্ন কবিপ্রতিভা হঠাৎ উঁকি মেরে উঠেছিল। আমি যখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ি তখন মাঝে মাঝে কবিতা লিখিতাম। একদিন একটী কবিতা লিখে সাফল্যগর্ব্বে কবিতাটী আর একবার জোরে জোরে পড়ছি এমন সময় কোত্থেকে দুটো শক্ত হাত এসে আমার কান দুটোকে জোরে চেপে ধরল। যদিও সেই হস্তদ্বয়ের মালিককে দেখবার উপায় ছিলনা তথাপি আমার বুঝতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'ল না যে হাত দুখানি কাহার ; কারণ ও হস্তের আশীর্ব্বাদ আমার ভাগ্যে বহুবার ঘটেছিল। যাক্, সেই থেকে আর ও কর্ম্ম করিনি। কিন্তু আজ হঠাৎ কবিত্ব প্রকাশের এমন সুবর্ণসুযোগ পেয়ে আমার সুপ্ত কবিপ্রতিভা অর্থাৎ কবিতাস্পৃহা জেগে উঠল। তাই তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম "কোন্ বিষয়ে স্যার ?"

ভবতোষ বাবু একটু ভেবে বললেন আচ্ছা, গরমের বন্ধে তোমরা বাড়ী গিয়েছিলে। পল্লীগ্রামের দুপুর বেলার নিস্তব্ধ শান্তি আমার বেশ ভাল লাগে।

সেই বিষয়ে একটা কবিতা লিখে এনো, কেমন ?"

রমেশ বলে উঠল "সূর্য্যোদয় সম্বন্ধে—"

"না, ও বোধ হয় হাজার জন লিখেছে। নকল করার সুবিধে হবে, নয় ? আমি শুধু একটা experiment করবো ; কেউ নকল ক'রে এনো না যেন।"

রমেশ বেচারী ক্ষুন্ন হ'ল।

(২)

পরদিন ভবতোষ বাবু কবিতার খাতা নিয়ে বসলেন। প্রথমেই রমেশের খাতা পড়তে লাগলেন।—

"অত্যন্ত শান্ত সুমধুর পল্লীর মধ্যাহ্ন দৃশ্য,
বর্ণনা কর্‌তে তাহা ভাষা খুঁজে পাইনে নিখিল বিশ্ব।"

"দুর্! এ কি কবিতা হ'ল ? 'লিখ্‌তে তাহা পাইনে ভাষা খুঁজে নিখিল বিশ্ব' বল্লে তবু যাহোক মানাত। ভাষার উপর কবিতার অনেকটা নির্ভর করে।"

অজিত লিখেছে—

পল্লীর মধ্যাহ্ন কাল অত্যন্ত শান্ত,
অত্যন্ত নীরব, সহরের মত কোন গোলমাল নেই, জানত !

"Worthless !" ভ্যাবারাম লিখেছে—

পল্লীর মধ্যাহ্ন দৃশ্য
খুঁজে পাবেনা নিখিল বিশ্ব ;
আমার তা ভাল লেগেছে মনে,
দর্শনে অশেষ পুণ্য ভ্যাবারাম ভনে।

ভ্যাবারাম মুকুন্দরামের বংশধর বলে গর্ব্ব করত।

"ভ্যাবারাম ত ভ্যাবারামই", ভবতোষ বাবু বললেন।

পূর্ণেন্দু লিখেছে—

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন এক করি দরশন
আজি যে হইল মোর প্রাণ উচাটন,
কি প্রকার দৃশ্য সে যে কহিতে···

"দুর্! সব এক দলের !"

কালিকেশ লিখেছে—মোটে দু'লাইন,—

একবার গিয়েছিলাম আমি পল্লীতে
গরমের বন্ধে
কিন্তু কখন দেননি বাবা বেরুতে
দুপুরে ও সন্ধ্যে
পল্লীতে মধ্যাহ্ন কভু দেখিনিক ভাই
কবিতা লেখাও মোর হ'ল নাক তাই।

আমরা অতি কষ্টে হাসি চাপলাম। বিজয় ত ছুটী নিয়ে বাইরেই চলে গেল। আহা বেচারা সত্যি কথাই লিখেছে। তার বাবা একটু অতিরিক্ত রকম সাবধানী। বেচারার কষ্টের একশেষ।

তারপর বিজয়ের খাতা। ক্লাসের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে দুষ্টু বকাটে এবং চালাক। কিন্তু এ কি! মাষ্টার মশায় পড়ে চললেন,—

সহসা শুনি একি বারতা—
লিখিতে হ'বে মোরে কবিতা!
হ'ত যদি বজ্রাঘাত করিতাম না দৃকপাত
অদৃষ্টের পরিহাস, শুনি একি কথা—
আমার কি আসে কভু কবিতা টবিতা!

কভু হ'বে না বলা,
শুধু বলিতে বলিতে ভেঙ্গে যাবে গলা।
তবু বলিতে না পারিলে কলম না চালিলে
দুমাদুম কীল চড় আর কান মলা,
তাই লিখিতে লিখিতে নিব ভেঙ্গে ফেলা।
তাই লিখি দু'কলম—
হাট মাঠ পথ ঘাট নিদাঘ তপন,
চাষী মাঠে চাষ করে দর দর ঘাম ঝরে,
চারিদিকে কিন্তু হায় রেজায় গরম
হাঁটিতে হইলে পায়ে দিওগো খড়ম। ...

আরো কত কি! ভবতোষ বাবু আর পারিলেন না; গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "বিজয়!" এ রকম গম্ভীর স্বরের অর্থ আমাদের বেশ ভাল রকমই জানা ছিল। তাই আমরা একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়লাম। কিন্তু কোথায় বিজয়! সমীর বলল, "স্যার, সেত আপনার কাছ থেকে ছুটী নিয়ে একটু আগে বাইরে গেছে।"

"ওঃ!" এই ছোট্ট ও-র মধ্যে অনেক কিছু ছিল। ভবতোষ বাবু তারপর জগদীশের খাতাখানা তুলে নিলেন। সে লিখেছে—

পন্ পন্ দুষ্কর
শন্ শন্ ভাস্কর
বায়ু বয় বন বন, গাছপাতা অস্থির,
হাট মাঠ কাঠ ফাটে
পথ ঘাট মাঠ ঘাটে
সব করে ঠন ঠন; ঘাট মাঠ চৌচির।
ইত্যাদি—

ভবতোষ বাবু বললেন "মন্দ হয়নি"। তারপর ভবতোষ বাবু যে খাতাখানা তুলে নিলেন সেখানা আমার। বুকটা একটু কেঁপে উঠল। তিনি পড়তে লাগলেন,—

নিদাঘের প্রতপ্ত নিঃশ্বাসে
ধরণীর বুক জ্ব'লে যায়,
পলে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
নিষ্ঠুর তপন রক্ত শুষে খায়।
দাব দগ্ধ পবন পরশে
জেগে উঠে শুধু বহ্নিজ্বালা,
বিশুষ্ক .....

"যাক্, লিখেছো এক রকম বেশ" আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। "কিন্তু ভাষাটা একটু সোজা ক'রে—।"

অভিরাম ব'লে উঠল—"কেন স্যার, বিষয়টা যেমন কর্কশ ভাষাও—"

"তার কোন মানে নেই। রবিবাবু আজকাল কত সোজা ভাষায় কবিতা লিখছেন। তোমার কই?"

"লিখে আনতে ভুলে গেছি স্যার।"

আমরা শঙ্কিত হলাম। বিজয়ের উপর রাগটা শেষকালে এর উপরই বা পড়ে! ভবতোষ বাবু মুখখানা বিকৃত করে বললেন "ভুলে গেছি স্যার! কাজের সময় কাজ করবে না বকামোটুকু বেশ আছে। তোমার—"

"আজ্ঞে, যদি বলেন ত এখনি লিখে দিতে পারি স্যার।" তাইত! এ না হ'লে কবি! বাড়ীতে ব'সে, ভেবে চিন্তে, জিজ্ঞেস ক'রে ত সবাই লিখতে পারে। সত্যি বলতে আমার কবিতাটীর জন্যে আমি সেজদার কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী।

ভবতোষবাবু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "হুঁ, আচ্ছা লেখ বোর্ডে"।

খসখস্ চক চলতে লাগল,—

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজে দগ্ধ হয় পল্লী শ্যামলিমা,
প্রকৃতির শ্যাম অলঙ্কার ;
তৃণবক্ষ-রক্তবিন্দু নিঙারি নিঃশেষি করি পান
ঊর্দ্ধে হাসে প্রদীপ্ত ভাস্কর ;
প্রন্তরের বুক চিরে ধরণীর বিক্ষুব্ধ অক্রোশ
ধূমময় হ'য়ে বাহিরায়,
অনল উগারি শ্বাসে জ্বালাময় পবন পরশ
বহ্নিশিখা সম লাগে গায় ;
কোথা বটতলে বসি দুরাগত পথিক জনেক
গাঁর নাম বালকে সুধায়,
বটতরু ছায়ে কোথা গুটী কত রাখাল বালক
গাভী ছাড়ি উন্মত্ত খেলায় ;
গভীর স্তব্ধতা ভাঙ্গি ঘুঘু এক আম্র শাখে বসি
একমনে··· ···

ঢং ঢং—এমন সময় বেল্ পড়ে গেল। ভবতোষ বাবু উঠে বললেন "থাক্, আচ্ছা আজ সন্ধ্যের সময় তুমি তোমার কবিতাগুলি নিয়ে একবার যেয়ো ত। আমার বাড়ী চেনো ত।" উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই তিনি বেড়িয়ে গেলেন।

সেই দিন থেকে আমরা অভিরামকে কবি ব'লেই ডাকতাম।

গল্প-স্বল্প

সংএর স্কুল—সব কাজ শেখাবার যদি স্কুল থাক্‌তে পারে —কুস্তির স্কুল, জিম্‌নাষ্টিকের স্কুল, গানের স্কুল, নাচের স্কুল, আরো কত—তবে সংদের শেখাবার জন্যই স্কুল থাক্‌বে না কেন? জার্ম্মেণীতে ও রকমেরও একটি স্কুল আছে। তা'রই দুটি ছবি দিলাম। প্রথমটিতে নতুন ছাত্রটিকে মাষ্টার (বাঁ দিকে) দেখাচ্ছেন, একটু ভয়-পাওয়া চম্‌কান ভাব কেমন ক'রে দেখাতে হবে।





ছাত্র বেচারা নতুন এসেছে, তাই মাষ্টারের মুখের ভঙ্গি দেখে সে আর হাসি চাপ্‌তে পারে নি। দ্বিতীয় ছবিতে দেখান হয়েছে, মাষ্টার ছাত্রদের দেখাচ্ছেন কেমন ক'রে অবাক ভাব প্রকাশ কর্‌তে হয়। এই ছবিতেও আগের ছবির নতুন ছাত্রটি রয়েছে (বাঁ দিকে ব'সে)। তা'র চোখের ভাবটি এখনও ঠিক হয় নি; তবে এখন আর হাসি পাচ্ছে না তা'র।

রেডিওর বাতিক—বেড়াতে যাবার সময়ও রেডিওর গান শোনা চাই! এক মুহূর্ত্ত রেডিও না হ'লে চলে না। কি করা যায়? তা'রও উপায় বের করা হয়েছে। এই সাহেবটি তাঁর লাঠির মধ্যে ছোট্ট একটি রেডিও-সেট ভ'রে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছেন; কাণে তাঁর রেডিও ফোন লাগান রয়েছে। যখনই তাঁর ইচ্ছা হবে তখনই লাঠিটা মাটিতে বসিয়ে তিনি রেডিও শুন্‌বেন।



প্রথম ঘোড় সোয়ার—পারস্য দেশে কয়েকটি বহু পুরাতন হাড়ের টুকরা পাওয়া গেছে; সেই হাড় নাকি তখনকার দিনে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হ'তো। এই হাড়ের গায়ে ঘোড়-সোয়ারের ছবি আঁকা (বা খোদাই করা) আছে; তার একটি প্রতিকৃতি এই খানে দিলাম। ছবিটি কিছু সুন্দর না হলেও পাঁচ হাজার বছর আগেকার ঘোড়া-পোষার ছবি হিসাবে দেওয়া হ'লো। এর চেয়ে পুরাণ ঘোড়-সোয়ারের ছবি বোধ হয় আর নাই। অবিশ্যি, আমাদের দেশে তখন ছবি আঁকার উন্নতি এর চেয়ে বেশী হয়েছিল; এবং আমাদের দেশের কোন লোক ঐ সময় ঐ ছবি আঁক্‌লে বা খোদাই করলে হয়তো আরো সুন্দর ছবি হ'তো।

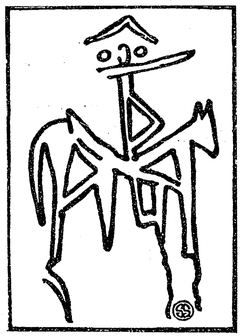

নৌকার লাফ—জোড়া-নৌকা শূন্যে কেমন লাফ দিয়েছে একবার দেখ। দারুন বেগে লাফ দিয়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে নৌকা এপারে নিরাপদে পৌঁছে গিয়েছে।



খুব ওস্তাদ চালাক আর দারুণ বেগ না হ'লে এ কাজটি একেবারেই নিরাপদ হয় না। যদি বেড়ার গায়ে ধাক্কা লাগে তা' হ'লেই দফা শেষ। অবিশ্যি, নৌকাটির গড়নও এই কাজের পক্ষে সম্পূর্ণই উপযোগী।

ধাঁধার উত্তর

লুকান মাছ—

(১) সিঙ্গি, (২) চাঁদা, (৩) কাতলা, (৪) পাব্‌তা (৫) বেলে, (৬) আড়, (৭) বাঁশপাতা, (৮) বাণ, (৯) ফলুই।

নূতন ধাধা

১। চশমা সকলেই আঁকতে পারে কিন্তু এই চশমাটি একবার দেখ। পেন্সিলের এক টানে এটি আঁকতে পার কি? কোন লাইনকে কেটে অন্য লাইন যাবে না, অথবা একবার আঁকা লাইনের উপর দিয়ে দু'বার লাইন বুলা'বে না।

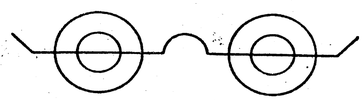

২। ঘড়ির ডায়েলের দুটি ছবি দেওয়া হয়েছে। ডান দিকের ছবিতে দেখ, ডায়েলটিকে তিনটি ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ভাগের রাশিগুলি যোগ করলে যোগফল ২৬ হয়। এবার বাঁ দিকে ছবির ডায়েলটিকে চারভাগে ভাগ কর, যা'তে প্রত্যেক ভাগের রাশির যোগফল সমান হয়। লাইন সোজা না হ'লেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ৪টিই সমান ভাগ হবে;— কম-বেশী নয়।

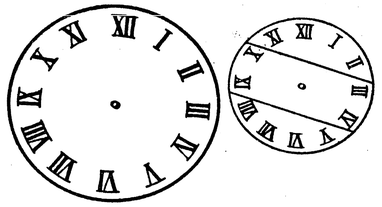



—দেশনায়কগণের অভিমত—

যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য

দেশপূজ্য
৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির
অভিমত

"আমি মিঃ এইচ, বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে ইহাই ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।"

স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জননেতা
লালা লাজপৎ রায়ের
অভিমত

"আমি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি মিঃ এইচ, বসুর "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" বাস্তবিক ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধ অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"

স্বাঃ লালা লাজপৎ রায়

কেশতৈল—কুন্তলীন, কোকোলীন, ম্যাকেসার, চামেলীন প্রভৃতি।

হেয়ার লোসন—দেলখোস, দিলতোষ, হার্টস্ ডিলাইট, প্রভৃতি।

পমেটম—দেলখোস পমেড, গোলাপ ও বকুল পমেটম প্রভৃতি।

এসেন্স—দেলখোস, হোয়াইট রোজ, অপরাজিতা, বকুল, মাস্ক, যুঁই, বেলা, চামেলী, খস, অরিগ্যান প্রভৃতি নানা সিরিজের বিবিধ প্রকার সুগন্ধি।

নানাবিধ অটো, হেয়ারওয়াস, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, লাইম যুস ও গ্লিসারিন ক্রীম এবং স্নো প্রভৃতি।

সাবান—হোয়াইট রোজ, চন্দন, খসখস, মাস্ক, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ ফলের সিরাপ।

এইচ, বসু, পারফিউমার,
৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বিশ্ববরেণ্য
রবীন্দ্রনাথ
বলেন

"কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহারে একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক
৺ মতিলাল নেহেরুর
অভিমত

"ভারতবর্ষের প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এইচ, বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C 700.

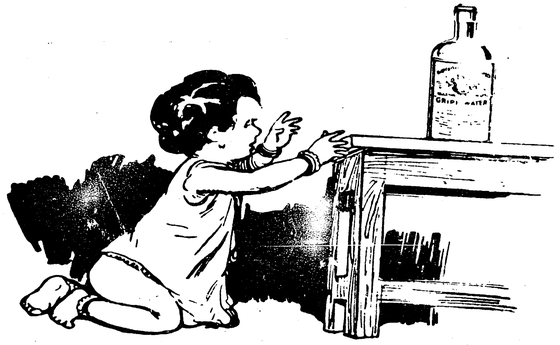



উড্ ওয়ার্ডের
গ্রাইপ ওয়াটার
চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত।
ইহা শিশুদিগকে সুস্থ রাখে।

WOODWARD'S
GRIPE WATER

W. WOODWARD LTD. LONDON, ENGLAND

ডাঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

সন্দেশ



ফাল্গুন, ১৩৪০

সম্পাদক-শ্রীসুবিনয় রায়
শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম্, এস্, সি

বার্ষিক ২৷৷৵০ আনা

প্রতি সংখ্যা ।৹ আনা

COLOURED DOCUMENT.

লমেয়েদের জন্য

কখানি বাছাই বই

ছলেমেয়েদের কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যেমনি
নি চমৎকার চমৎকার এক রঙের ও ৩-রঙের ছবি।
বিশেষ ভাবে প্রশংসিত, এবং ডিরেক্টর-অব-পাবলিক-
জ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

...	॥০	কথাসারৎ সাগর ...	॥/০
বিংশতি	॥০	রবিন্ হুড	॥৵০
াসন	॥০	ওডিসিয়ুস	।৵০
...	॥০	ইলিয়াড	।৵০

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

রণ

।৵০

া ।৶০

ন সংস্করণ
বাহির হইবে।

স্বাস্থ্য

পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত

স্বাস্থ্যের কথা ছেলেমেয়েদের জন্য অতি সরল সরস ভাবে লেখা। ভাল কাগজে, বড় অক্ষরে, পরিষ্কার ছাপা। অনেকগুলি ছোট ছবি, সুন্দর মলাট। মূল্য—ছয় আনা

শ্বাস, এম-এস-সি
ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

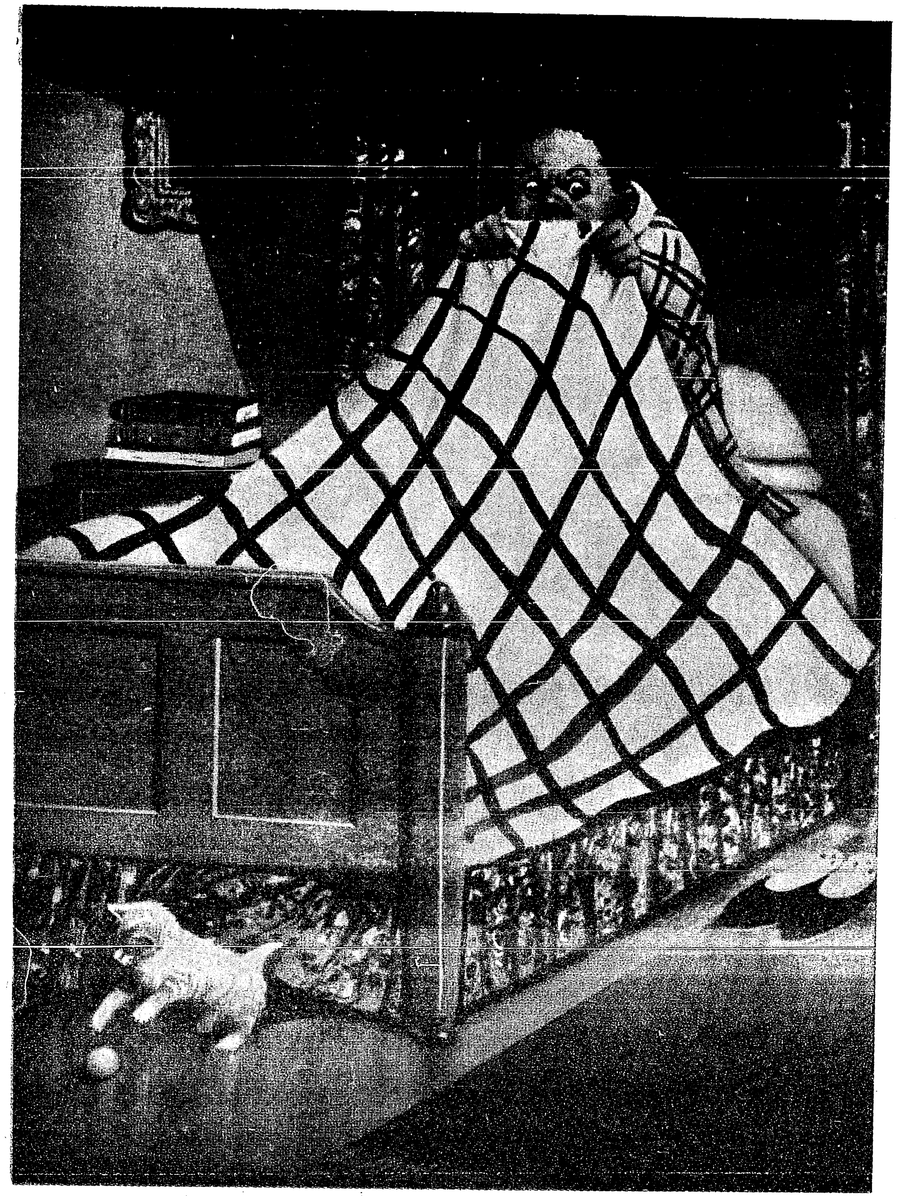

কিসের আওয়াজ—ভূত নাকি!

সন্দেশ

নবপর্য্যায়
৩য় বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩৪০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

ফাগুন বীণা

(শ্রীমনীন্দ্র দত্ত)

কার মধু-পরশে
আকুলিত হরষে
রঞ্জিত বনবীথি নবফুল শোভাতে!
কার সুর-ভঙ্গিমা
অপরূপ মাধুরিমা
মাতাইছে ধরাতল ফাগুনের প্রভাতে!

দখিণ হাওয়া উতল প্রাণে
জগত মাতায় সবুজ গানে।
ফুলের বনে, ঘাসের কোলে,
সবুজ মায়ার স্বপন দোলে।
পলাশবনে রঙের মেলা,
নদীর জলে হোলীর খেলা।

COLOURED DOCUMENT.

কোকিল ডাকে আপনহারা,
বুল্ বুলিরা ডেকেই সারা।
ধরার বুকে ফাগুন প্রাতে
পরশ লাগে জীবন সাথে।
মনের কোণে সুরের বীণা
শুধুই বাজে মরণহীনা।

রূপ-সাগরের কুল হ'তে আজ
ধরার বুকে লাগ্‌লো ঢেউ।
আয়রে ও ভাই, মাত্‌রে গানে—
আজ কি ঘরে থাক্‌বি কেউ?
ঘর ছেড়ে' আজ সবুজ মাঠে
আয়রে সবাই বেরিয়ে আয়,
দেখ্‌রে হেথায় কি সুর বাজে
ফাগুন দিনের ফুল-পাতায়!



স্বপ্নাদ্য ঔষধ

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল)

মাধবপুর টি. এন্. জি. ইন্‌ষ্টিটিউসনে, এবং তৎসংলগ্ন হোষ্টেলে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেছে;—এক সঙ্গে পনেরো দিন ছুটী; এ অসম্ভব কখনোই সম্ভব হইত না, যদি না সেবার বাংলার মন্ত্রীমহাশয়কে পুরস্কার-বিতরণ করিতে রাজী করান যাইত।

পুরস্কার-বিতরণ সভায় মন্ত্রীমহাশয় বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "শিক্ষার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় দিকে আমি আজ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে চাই। আজকাল চারদিক্ থেকেই একটা নালিশের সুর উঠ্‌ছে যে আমরা আমাদের ছেলেপেলেদের কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই শিখিয়ে আস্‌ছি—হাতে-কলমে কাজ শেখ্‌বার সুযোগ তাদের দিচ্ছি না। এ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ যাঁরা তাঁদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ কথাটাকে তাঁরা যেন একটু তলিয়ে ভেবে দেখেন।" এই কথাগুলি হোষ্টেলের য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ প্রতাপ বাবুর মনে বড়ই ধরিয়াছে।

সভা-ভঙ্গের পরই দেখা গেল প্রতাপ বাবু হেডমাষ্টার মশা'য়ের ঘরে বসিয়া তাঁর সঙ্গে কি একটা বিষয় আলোচনা করিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর ডান হাতের মুঠো প্রবল বেগে বাঁ হাতের তেলোকে প্রহার করিতেছিল। যুক্তির সারবত্ত প্রমাণ করিতে হইলেই প্রতাপ বাবু এই রকম করিয়া থাকেন। সেই ঘরে আর একজন ভদ্রলোক চুপ করিয়া বসিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন; তিনি ধ্রুবপদ বাবু, হোষ্টেলের নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্।

ঘণ্টাখানেক বাদে হোষ্টেলের ছেলেরা দেখিতে পাইল নোটিস্‌বোর্ডে একটী নূতন নোটিস্ ঝুলিতেছে—তার মর্ম্মার্থ এই যে, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ায় পর সাড়ে নয়টার সময় 'কমন রুমে' একটী জরুরী বিষয়ের পরামর্শের জন্য মিটিং বসিবে। প্রতাপ বাবু সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক বোর্ডার যেন ওই সময় 'কমন-রুমে' উপস্থিত থাকে।

যথা সময়ে মিটিংএ উপস্থিত হইয়া প্রতাপ বাবু তাঁর বক্তব্য বিষয় ছেলেদের বুঝাইয়া বলিলেন—বাস্তবিক মন্ত্রীমহাশয় আজ তাঁরই মনের কথাটি খুলিয়া

বলিয়াছেন। কেবল বই মুখস্থ করিলেই প্রকৃত শিক্ষা হয় না, হাতে-কলমে কাজ করিতে শেখা চাই। হেড্‌মাষ্টার মশা'য়ের সঙ্গে আজ তাঁর এবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তাঁরা পনেরো দিন ছুটী পাইতেছেন, এ ক'টা দিন ছেলেরা যদি হোষ্টেলেই থাকিয়া যাইতে রাজী হয়, তবে তাদের জন্য চমৎকার একটি জিনিষের বন্দোবস্ত তিনি করিতে পারেন। হোষ্টেলের সংলগ্ন যে বার-চৌদ্দ বিঘা জমি আছে অনায়াসেই সেখানে নানা রকম ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা চলে। এই পনেরো দিন প্রত্যেকে সকালে তিন ঘণ্টা, বিকালে দু'ঘণ্টা, এবং স্কুল খুলিলে প্রত্যহ বিকালে এক ঘণ্টা করিয়া ক্ষেতের কাজ করিলেই ব্যাপারটা খুব সহজ হইয়া যায়। এক দিকে তাদের যেমন হয় স্বাবলম্বন শিক্ষা, অপরদিকে তেমনি আলু, কুমড়া, বেগুন, কপি, মটরশুঁটি প্রভৃতি তরকারী নিজেদেরই ক্ষেতে উৎপন্ন হওয়ায় 'বোর্ডিং চার্জ্জও' অনেক কম পড়ে। এ বিষয়ে ছেলেদের কি মত ?"

প্রতাপ বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া ছেলেরা অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভোট নিয়া তিনি দেখিলেন সকলেরই এ প্রস্তাবে সম্মতি আছে। তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমার প্রস্তাব তবে এ মিটিং গ্রহণ কর্‌ছে—কি বল ?"

সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ স্যর, হ্যাঁ হ্যাঁ।"

সেই রাত্রেই য়্যাসিষ্টেণ্ট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ প্রতাপ বাবু কাজের খস্‌ড়া, শ্রেণী-বিভাগ প্রভৃতি সমাধা করিয়া ফেলিলেন। স্কুলের অন্যান্য মাষ্টার মশায়দের তিনি কথাটা জানাইয়া রাখিয়াছিলেন, পরদিন প্রত্যূষেই দেখা গেল তাঁদের বাড়ী হইতে প্রচুর পরিমাণে কোদাল, শাবল, খোন্তা ঝুড়ি প্রভৃতি আসিয়া হাজির হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম হেড্‌পণ্ডিত মশায় একটি মন্ত্র পাঠ করিলেন; তারপর হারমোনিয়াম্ সহযোগে গান আরম্ভ হইল, আর সেই গানের তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে ছেলের দল কোদাল, শাবল প্রভৃতি হাতে নিয়া মাঠে নামিয়া পড়িল।

মিনিট পনেরো তারা খুবই উৎসাহে কোদাল চালাইয়াছিল, কিন্তু তারপরই সুরু হইল ঘন ঘন ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত—তিন ঘণ্টা হইতে আর কত বাকী আছে।

বিকাল বেলা গান আর তেমন জমিল না, অনেকেরই নাকি ইতিমধ্যে মাথা ধরিয়া গেছে।

দ্বিতীয় দিন দেখা গেল ক্ষেতের কাজে খুব কম ছেলেরই উৎসাহ টিকিয়া আছে, তৃতীয় দিনে এক জনেরও আছে কিনা সন্দেহ। য়্যাসিষ্টেণ্ট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের

দরবারে প্রায় ডজন খানেক দরখাস্ত পেশ হইল—ছেলেদের অনেকেই একবার বাড়ী ঘুরিয়া আসিতে চায়। বর্ষাকালের আকাশের মত মুখ নিয়া প্রতাপ বাবু কোন দরখাস্তের উপর লিখিলেন, No (না), কোন খানার উপর Rejected (না-মঞ্জুর), কোন খানার উপর Impossible (অসম্ভব)।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ভীমসেনের ঘরে কতগুলি ছেলে জটলা পাকাইতেছিল। ঘরের মালিকের আসল নাম ভীমসেন নয়, গোপাল গাঙ্গুলী;



মহাভারতোক্ত ভীমের মত গায়ের জোর এবং চেহারার বহর দেখিয়া হোষ্টেলের ছেলেরা ওই নাম দিয়াছে। ভীমসেনের মানসিক অবস্থা বর্ত্তমানে মোটেই সুবিধাজনক নয়; কি কুক্ষণে বেচারা প্রতাপ বাবুর প্রস্তাবে ঘাড় নাড়িয়াছিল—তার বলীবর্দ্দের মত বপুখানা দিয়া তিনি ক্ষেতের বার আনা মাটী কোপাইয়া লইতেছেন। আজ সকাল হইতেই ভীমের অন্তরাত্মা পালাই-পালাই করিতেছিল, হরিহরকে উদ্দেশ করিয়া সে কহিল, "কাল থেকে তোমরাই বাপু ক্ষেতের কাজ করো,

স্বাবলম্বন-শিক্ষা এবং দৈহিক উন্নতি লাভ হবে। আমি আজকেই সট্‌কাচ্ছি। উঁহুহু, ক্ষেপিনি আমি; প্রতাপ বাবুর কাছে নয়, খোদ্‌ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে আমার আর্জ্জি পড়বে। তারপর প্রতাপ বাবুও একটু চোখের আড়াল হয়েছেন, আর আমিও সুড়ুৎ!" এই শেষের কাজটি কেমন ধাঁ করিয়া সুসম্পন্ন হইবে বোধ করি সেইটিই বুঝাইবার জন্য ভীমসেন ভীমরবে একটি তুড়ি মারিল।

সুরসিক বলিয়া হরিহরের হোষ্টেলে একটু সুনাম আছে; সে কহিল, "সুড়ুৎ বলে তুড়ি মার্‌লেই তো আর 'সুড়ুৎ' করা চলে না। বলি যাবে যে, একখণ্ড 'মেটিরিয়া মেডিকা' জোগাড় হয়েছে? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে গেলেই তো তিনি বল্‌বেন, বাড়ী যাবে যাও, কিন্তু বন্ধের ভেতর 'মেটিরিয়া মেডিকা' খানা মুখস্থ করে এস।"

উপস্থিত সব কয়টি ছেলেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিবার বাস্তবিকই একটা কারণ আছে। নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ ধ্রুবপদ বাবু যেন একটু বাতিকগ্রস্ত —ডাক্তারী করিবার তাঁর উৎকট রকমের সখ এবং ডাক্তারী বিদ্যায় নিজের গভীর ব্যুৎপত্তি আছে বলিয়া তাঁর আন্তরিক ধারণা। চার্জ্জ নিয়া হোষ্টেলে আসিবার দিন তিনি যে কেবল তিন বাক্স ওষুধই সঙ্গে আনিয়াছিলেন তা নয়, বোর্ডারদের স্বাস্থ্য হোষ্টেলের আব-হাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি অনুসন্ধানও করিয়াছিলেন। কলতলার একটা জায়গা শ্যাওলা পড়িয়া অনেক দিন হইতেই বেজায় রকম পিছল হইয়া ছিল, প্রত্যেককে তিনি বার বার সতর্ক করিয়া দিলেন কেউ যেন ভুলক্রমেও ওদিক্‌ না মাড়ায় কেননা আছাড় পড়িয়া হাত পায়ে 'কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার' হইলে সে বড় বিপদের কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিন তাড়াতাড়ি ওই জায়গাটিতেই আঁচাইতে গিয়া রামপদ ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া বসিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে খবর পৌঁছিতে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া, রামপদর পা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আমি বাপু তোমাদের এত করে বারণ করে দিলাম ওখানটাতে যেওনা, তবু কেন ওখানে গেলে?"

রামপদ অপ্রতিভের মত আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "ভুলে গিয়েছিলাম স্যর, কথাটা মনে ছিল না।"

"অঁ" বলিয়া সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ মনে মনে কি একটু ভাবিলেন, তারপর রাম পদর জন্য দুইটি ওষুধের ব্যবস্থা হইল; একটি টিংচার আয়োডিন—পায়ে মালিশ করিবার জন্য, অপরটি ব্রাহ্মীঘৃত—খাইবার জন্য। প্রতাপ বাবু সাশ্চর্য্যে তাঁর

মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন দেখিয়া ধ্রুব বাবু কহিলেন, "আপনি অবাক্‌ হচ্ছেন কেন প্রতাপ বাবু? ওর আসল অসুখ তো আর পায়ের ব্যথা নয়, স্মরণশক্তির অভাব—তাই হয়েছে বলেই তো পেছল জায়গায় গিয়ে পায়ে চোট খেয়েছে। কাজেই দুটো রোগেরই ওষুধ দিতে হবে না? স্মরণশক্তির অভাব হ'লে আমাদের কব্‌রেজী ব্রাহ্মীঘৃতটাতে বেশ কাজ হয়, তাই ওটাই প্রেস্‌ক্রুপসন্‌ করে দিলাম।"

এই অভিনব প্রেস্‌ক্রুপসনে ছেলেরা সকলে এ উহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল; প্রতাপ বাবু মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়াছিলেন। সেই হইতে হোষ্টেলে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের চিকিৎসা একটি হাসির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হরিহরের রসিকতা শুনিয়া ভীমসেন মনে মনে কি একটু চিন্তা করিল, তারপর সোল্লাসে হরিহরের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "ব্র্যাভো ব্রাদার, তোফা কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছিস্‌! ও আর্জ্জি ফার্জ্জি কিছু নয়, সম্পূর্ণ একটা নতুন মৎলব মাথায় এসেছে। দেখিস্‌ ওবেলা থেকে আর আমায় ক্ষেতের কাজে নাম্‌তে হবে না, তোরাই খেটে খেটে মর্‌বি।"

ঠিক সেই সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গলার আওয়াজ শোনা গেল, বোর্ডাররা কে কেমন আছে খোঁজ নিতে তিনি উপরে উঠিয়াছেন। অমনি ভীমসেন তড়াক করিয়া একলাফে বিছানার উপর চিৎ হইয়া পড়িল, সে বড়-বপুর ভারে পুরাতন তক্তপোষ জবাব দেয় আর কি! তারপরেই সুরু হইল তার কাসি—ভীষণ কাসি, কড়িবরগা-ফাটানো কাসি!

"ওকি! ওভাবে কাস্‌ছে কে?" বলিতে বলিতে উদ্বিগ্ন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ ধ্রুব বাবু ভীমের ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ভীমসেনের কাসি তখন চরমে উঠিয়াছে, প্রায় দম বন্ধ হইবার গতিক। সে একটু থামিলে পর ধ্রুব বাবু বলিলেন, "এমন একখানা কাসি বাধিয়ে বসিয়েছ অথচ আমায় একবারও খবর দাওনি!"

বহুকষ্টে কাসির ধমক সাম্‌লাইয়া ভীমসেন বলিল, "কাসিতে আমি ভয় খাইনে স্যর, কিন্তু নিঃশ্বাস নিতে বুকে যে ব্যথাটা উঠ্‌ছে তাইতেই আমায় বড় কাবু করে ফেলেছে।"

"বল কি, সঙ্গে সঙ্গে বুকে বেদনারও সৃষ্টি হয়েছে?" ত্রস্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ তাড়াতাড়ি ভীমের বুকের উপর নিজের ডান কাণটা লাগাইলেন, তারপর বুকে দুইটি টোকা এবং পিঠে দুইটি টোকা মারিয়া কহিলেন, "হুঁ, যা ভেবেছি তাই।"

"আপনি স্যর যতটা গুরুতর ভাব্‌ছেন ততটা বোধ করি নয়। গলা দিয়ে রক্ত তো কই আগের মত তত পড়ে না! কেবল কাল্‌কে ক্ষেতের কাজে মাটী কোপাবার পরই যা আধ কাপ্‌টাক পড়েছিল। আজকে তাও কমে গেছে, বোধ করি সিকি কাপ্‌টাক্ পড়েছে।"

ভয়ে নীল হইয়া ধ্রুব বাবু কহিলেন, "গলা দিয়ে রক্তও পড়ে নাকি আবার? অথচ তুমি বল্‌ছ ভাববার কারণ নেই? ক্ষেতে কাজ-টাজ তোমার করা চলবে না বাপু, ওসব একদম ছেড়ে দিতে হবে। আমার কথা মত দিন কতক ওষুধ খেলেই তোমায় আমি আরাম করে দেব, ভয় নেই। সকাল বিকেল তোমায় দু'বেলা খোলা মাঠে বেড়াতে হবে। ভাল কথা, খাচ্ছ কি আজকাল?"

"ভাত, চচ্চড়ি, ডাল—সবই তো খাই স্যর।"

"আরে ভাত চচ্চড়ির ভেতর কি আর কোন সার বস্তু আছে? তোমার চাই পুষ্টিকর খাবার—এক বেলা মাংস আর একবেলা ডিম না হলেই নয়। রোস, হোষ্টেল থেকেই তোমার জন্য ওসবের আলাদা বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি আমি।"

"ক্ষেতের কাজ কি তবে একটুও কর্‌তে পাবো না স্যর? সামান্য একটুও না?"

"পাগল! আস্ত পাগল! এ অবস্থায় ক্ষেতের কাজ কর্‌তে কোন ডাক্তার তার রোগীকে অনুমতি দিতে পারে?"

ধ্রুব বাবু ঘরের বাহির হইতেই ভীমসেন খবরের কাগজ খুলিয়া দেখিল আজ সিনেমায় তিনটার 'শো'তে কি ফিল্ম্ আছে! তারপর খানিক বাদেই চুল ফিরাইয়া সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে সে "মাঠের খোলা বাতাস খাইতে" বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় হরিহরকে উদ্দেশ করিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিতে ভুলিল না।

পরদিন প্রাতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছিলেন, পাশের বারান্দার দিকে নজর পড়ায় লক্ষ্য করিলেন কে একজন সেখানে বসিয়া হিহি করিয়া কাঁপিতেছে। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওখানে বসে কাঁপছে ও কে?"

"আজ্ঞে আমি হরিহর। কাল রাত্রে বড় জ্বর হয়েছিল, এখনো শরীরটায় কাঁপুনি দিচ্ছে।"

"হুঁ, ম্যালেরিয়া! বেশ বুঝতে পার্‌ছি। এদিকে এসতো নাড়ীটা দেখি।"

হরিহর কহিল, "জ্বর এখন নেই স্যর, শুধু শরীরটা বড় দুর্ব্বল।"

"ওই তো দোষ তোমাদের! জ্বর নেই, আস্‌তে কতক্ষণ?···তাইতো নাড়ীতো

বিশেষ সুবিধের নয়। তোমায় বাপু কিন্তু এখন কিছুদিন একেবারে বিশ্রাম নিতে হবে, আজকের দিনটা শুধু দুধ খেয়েই থাক। দুধে অরুচি? আচ্ছা, কিছু বেদানা আঙুরেরও বন্দোবস্ত করে দেব।"

"বিকেলে বোধ হয় একটু ক্ষেতের কাজ কর্‌তে পারি—কি-ই বা ক্ষেতি তাতে?"

"দেখ বাপু, তুমি রুগী, রুগীর মতই থাক, ডাক্তারীটা আমাকেই কর্‌তে দাও। ক্ষেতের কাজ-টাজ এখন তোমায় বেশ কিছু দিন বন্ধ রাখ্‌তে হবে।"

হরিহর কোন মতে আনন্দের হাসি গোপন করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আপনি যখন নিষেধ কর্‌ছেন তখন তো আর কোন কথাই হতে পারে না।"

বেলা সাড়ে ন'টার সময় রান্নাঘরের দিকে একটা গোলমালের শব্দ শুনিয়া ধ্রুব বাবু সেই দিকে আগাইয়া গেলেন। দেখেন, প্রতাপ বাবু রাগে গজ্‌রাইতেছেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখিয়া তিনি রাগতস্বরে বলিলেন, "শুনেছেন মশাই, হরিহর ছোঁড়ার কাণ্ড? আপনাকে ভাঁওতা দিয়ে এসেছে জ্বর হয়েছে, এদিকে রান্নাঘরে এসে বনমালী ঠাকুরকে দুই দাবড়ান দিয়ে এক থালা ভাত আদায় করে ঐ আড়ালে খেতে বসেছিল। আমায় দেখেই পালিয়েছে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "ছেলেটার অসুখ নিশ্চয়ই তবে খুব বেড়ে গেছে প্রতাপ বাবু। বেশী অসুখের সময়েতেই এ ধরণের দুষ্টু ক্ষিদেটা বাড়ে। ওতো একরত্তি ছেলে, বুড়ো মানুষদের পর্য্যন্ত এভাবে খেতে দেখা গেছে।" প্রতাপ বাবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তারপর একদিনের মধ্যেই হোষ্টেলে সে যেন এক সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হইল। ধ্রুব বাবুর আর কামাই নাই, এঘর হইতে ওঘরে তিনি ডাক্তারী করিয়া ফিরিতেছেন। বিকাল বেলা অসুখ হইয়া পড়ায় পাঁচ সাত জন বোর্ডার ক্ষেতের কাজে উপস্থিত হইতে পারিল না, পর দিন সকালে আরও জনা দশেক।

প্রতাপ বাবু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌কে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন, "দেখুন ধ্রুব বাবু, অসুখবিসুখ সমস্তই ছোঁড়াদের কারসাজি। আমার খুব বিশ্বাস ক্ষেতের কাজ ওদের আর ভাল লাগ্‌ছেনা, তাই সব মিথ্যে অসুখের ভাঁওতা দিচ্ছে। আর তা ছাড়া ওদের খাওয়ার এবং বিশ্রামের আপনি যে রকম রাজসিক ব্যবস্থা কর্‌ছেন তাতে ভবিষ্যতে শীগ্‌গির যে ওদের অসুখ সার্‌বে তাও আমার মনে হচ্ছে না।"

ধ্রুব বাবু বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "বড়ই দুঃখিত হলাম আপনার কথা

শুনে প্রতাপ বাবু! কোন্‌টা আসল অসুখ আর কোন্‌টা তা নয়, এ বোঝবার ক্ষমতাও আমার নেই নাকি! আপনি কি বল্‌তে চান আমি হাতুড়ে ডাক্তার?"

একথার পর আর কথা চলে না, প্রতাপ বাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে রোগীর সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিল, প্রতাপ বাবু প্রমাদ গণিলেন। দুদিন পরে আবার তিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌কে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন ধ্রুব বাবু, আমার ঠাকুর দা মর্‌বার আগে একটা স্বপ্নাদ্য ওষুধের কথা বলে গিয়েছিলেন। যেমন তেমন ক্ষেত্রে সে ওষুধ ব্যবহার কর্‌বার বারণ আছে বলেই এ ক'দিন তার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস এখন সেটা কাজে লাগাবার সময় হয়েছে—দেখ্‌ছেন না হোষ্টেলে প্রায় এপিডেমিকের অবস্থা। অনুমতি করেন তো সেটা একবার পরখ করে দেখি।"

ধ্রুব বাবু চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, "সে কখনো হতে পারে? ছেলেরা রয়েছে আমার চিকিৎসাধীনে, আর আপনি করবেন ওষুধের ব্যবস্থা! চিকিৎসা-বিভ্রাট্ হবে যে—সে বড় ভয়ানক জিনিষ।"

"আহা হা, আপনি ভুলে যাচ্ছেন এটা যে স্বপ্নাদ্য ওষুধ। এতে কাজ দেবেই, দিতে বাধ্য,—বহু 'কেসে' দিয়েছে। আমি জোর করে বল্‌তে পারি এ ওষুধে আমি ছেলেদের আরাম করে তুল্‌তে পারবোই পার্‌ব।" প্রতাপ বাবু বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের মুঠোর আঘাত করিলেন।

অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অবশেষে রাজী হইলেন; প্রতাপ বাবু তখন রান্নাঘরে গিয়া খিল দিলেন স্বপ্নাদ্য ওষুধ তৈরীর উদ্দেশ্যে।

স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকারী নয়, অথচ সব চাইতে তেতো, সব চাইতে বিস্বাদ এবং সব চাইতে দুর্গন্ধ যে কয়টি জিনিষ তাঁর জানা ছিল গাঁধাল পাতার রসে সেগুলিকে গুলিয়া প্রথমে তিনি কয়েকটি জাগ্‌ভর্ত্তি করিলেন। তার পর ডান হাতে তারই একটি জাগ্ এবং বাঁ হাতে মেজারগ্লাস্ নিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে আসিয়া তিনি জানাইলেন ওষুধ প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রথমেই ঢুকিলেন তাঁরা ভীমসেনের ঘরে। রয়াল সিনেমা হাউসের "মুক্ত বায়ু"তে এতক্ষণ 'কিং কং' দেখিয়া আসিয়া এইবার সে একমনে স্পেসাল ডায়েট মাংসের ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ দেখিল মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকার মত জাগ্‌হস্তে প্রতাপ বাবু ঘরে ঢুকিলেন, সঙ্গে ধ্রুববাবু। ধ্রুববাবুই তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য

জানাইলেন, বলিলেন,"বাবা গোপাল, প্রতাপবাবুর ঠাকুর দার দেওয়া একটা স্বপ্নাদ্য ওষুধ আছে সেটা আজ আমরা একবার পরীক্ষা কর্‌ব। এক ডোজ খেলেই নাকি তুমি সদ্য সদ্য উপকার পাবে।"

এই ভয়াবহ প্রস্তাবে সেই কুরুক্ষেত্র-বিধ্বংসী বীরবরের মুখ এক নিমেষে জিওমেট্রির বিন্দুর মত এতটুকু হইয়া গেল। কোন মতে ঢোঁক গিলিয়া সে বলিল, "কেন স্যর, আপনার ওষুধেই তো দিব্যি ফল পাচ্ছি।"

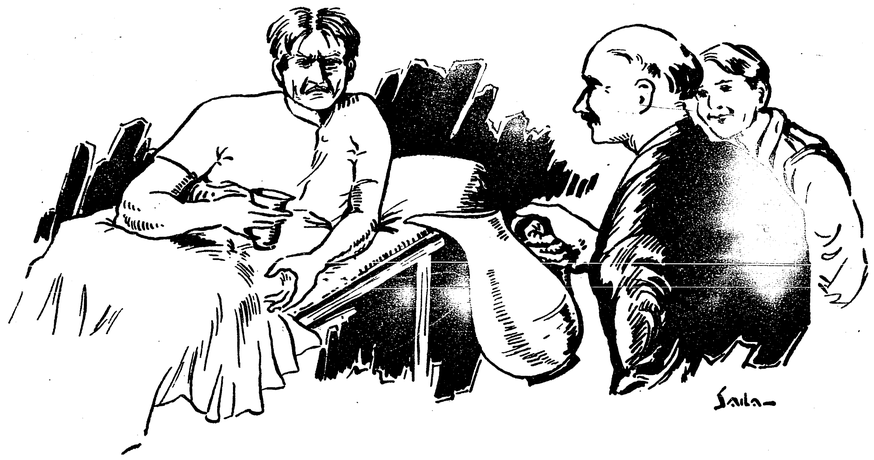

একটু গর্ব্বের সহিত ধ্রুববাবু বলিলেন, "পাচ্ছ নিশ্চয়ই সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে ধীরে ধীরে, এ ওষুধটাতে নাকি কাজ হবে সঙ্গে সঙ্গে।"

প্রতাপ বাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নিজের মুখে গর্ব্ব কর্‌তে চাইনা, ফলেন পরিচীয়তে।" মেজার গ্লাসটি পূর্ণ করিয়া সেটী তিনি ভীমের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

হায়রে, আসল দুর্য্যোধন আসিয়া আমাদের ভীমসেনকে এক ঘা গদার বাড়ি মারিল না কেন? তাতেও সে ততখানি কাহিল হইত না যত খানি হইল সে এক ডোজ ওষুধ সেবন করিয়া। গন্নপ্রাশনের ভাতকেও যে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়!

ধ্রুববাবু সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গোপাল, কেমন ঠেক্‌ছে?"

"অত্যন্ত খারাপ স্যর। এতক্ষণ শুধু বুকের এক পাশটাই ব্যথা কর্‌ছিল ওষুধ খাওয়া মাত্র দুপাশেই ব্যথা সুরু হয়েছে।"

ধ্রুব বাবু একেবারে নিবিয়া গেলেন, বলিলেন, "তাই তো প্রতাপ বাবু, হিতে বিপরীত করে বস্‌লেন নাকি?"

প্রতাপ বাবু বলিলেন, "কোন ভাবনা নেই, নির্ভয়ে থাকুন। প্রথম এগারো ডোজ ওই রকমই মনে হবে বটে, কিন্তু বারো ডোজের পর থেকেই আসল উপকার পষ্ট বোঝা যাবে। দশ মিনিট বাদে বাদে এক এক ডোজ পড়্‌বে।"

ভীমসেন মুখ কালি করিয়া কহিল, "বা—রো ডো—জ! দ—শ—মি—নি—ট্ বা—দে—বা—দে—?"

"হাঁ, সেই রকমই নিয়ম কিনা, ঠাকুর দা বলে গেছেন। তোমার রিষ্ট ওয়াচটা বার কর—সময়টা নোট্ কর্‌তে হবে তো।"

দ্বিতীয় ডোজ ওষুধ খাইবার পরই ভীমসেন একেবারে লাফাইয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য ওষুধ স্যর, এ যে আমি কল্পনাও কর্‌তে পারি নি। বুকের ব্যথা আমার সম্পূর্ণ উবে গেছে। গত এক বচ্ছরে একদিনের তরেও আমি এতখানি সুস্থ বোধ করিনি। আর ওষুধে দরকার হবে না।" নবলব্ধ স্বাস্থ্যের আনন্দে ভীমসেন ভীমবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ধ্রুব বাবু একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন, আনন্দের আবেগে প্রতাপ বাবুর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'এ ওষুধের ফরমুলাটা আমায় লিখে দিতেই হবে প্রতাপ বাবু, না দিলেই চল্‌বেনা।"

"হাঁ, তা দেব বৈকি! আগে চলুন, আপনার অন্যান্য রোগীদের দেখে আসি।"

স্বপ্নাদ্য ওষুধের আশাতীত ফল—একরাত্রের মধ্যেই হোষ্টেল হইতে সমস্ত রকমের অসুখ কর্পূরের মত উবিয়া গেল। পরদিন সকালে ক্ষেতের কাজে আর একটি বোর্ডারও অনুপস্থিত নাই।

ওষুধের ফরমুলা দিতে কিন্তু প্রতাপ বাবু আজ কাল করিয়া বড়ই গড়িমসি লাগাইলেন। শেষটায় ধ্রুব পদ বাবু ভাবিলেন—স্বপ্নাদ্য ওষুধ কিনা কাজেই ভিতরকার রহস্য ভাঙ্গিবার ইচ্ছা প্রতাপ বাবুর আদবেই নাই।*

* একটা ইংরেজী গল্পের ছায়া আছে।

তাল গাছ—তার পাশে চাঁদ

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

তাল গাছ—তার পাশে চাঁদ,
কাল্ রাতে দেখ্‌লাম চেয়ে;
নিঝুম্ ধরণীখানি ভাই
আলোয় আলোয় গেছে ছেয়ে।

মাথা নাড়ে তাল গাছগুলি,
বায়ু বয় ঝির্ ঝির্ ঝির্,
জানালায় বসে আছি আমি,
চারিদিক নিঝুম্ গভীর।

শেষ রাতে ভেঙ্গে গেল ঘুম্,
আর ঘুম আসে না রে ভাই,
জেগে আছে আকাশের চাঁদ,
তার সাথে মিতালী পাতাই।

ঝিম্ ঝিম্ হিম্ ঝ'রে যায়,
ঝিঁঝি ডাকে গাছের পাতায়,
ঝিল্‌মিল্ করে চারিদিক,
আলো ঝলে তালের মাথায়।

চাঁদ জাগে আকাশের গায়,
আমি জাগি ঘরের ভিতর,
রাত-জাগা পাখী ডাকে দূরে,
আর সব নীরব নিথর।

তাল গাছ তেছে পাহারা,
ওরা যেন রাতের প্রহরী,
সারি সারি রয়েছে দাঁড়ায়ে
জেগে আছে সারারাত ধরি।

তাল গাছ—তার পাশে চাঁদ,
এ যেন রে ছবি একখানা,
এই ছবি দেখি চেয়ে চেয়ে—
যে এঁকেছে—তারে নাই জানা।

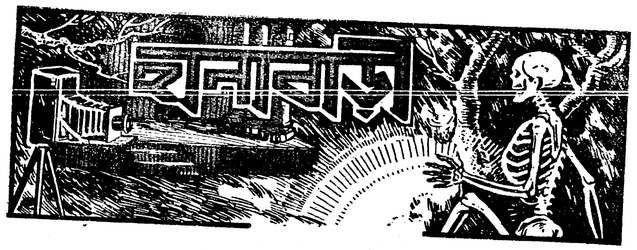

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

এগারো

প্রথম বেগটা কাটবার পর ঈশান বাবু বল্‌লেন, "ব্যাপার কি হরিপদ বাবু ?

হরিপদ বাবু বললেন "আমার মনে হয় প্রথমে খুন করা ভদ্রলোকের ইচ্ছে ছিলনা, ভয় দেখিয়েই কাজ হাসিল করাই বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল, তাই এই ভূত সেজে এসেছিল।"

ভূত সেজে ?—সেকি ? যে ভূত রোজ রাত্রে প্রাণে আতঙ্ক জাগিয়ে তুল্‌ত,—সে মানুষ ! যার কঙ্কালমূর্ত্তি ঐ ছবির বুকে জেগে উঠেছে, যার রোগা আঙ্গুলগুলি রোজ রাত্রে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌তো, সে মানুষ ! চোখ বুঝ্‌লে জানালার কাঁচে আজও সেই কঙ্কাল চোখের সামনে দেখ্‌তে পাই, সে মানুষ ! অসম্ভব !

ঈশান বাবু বল্‌লেন, "কিন্তু এ কেমন হ'ল, এমনটা তো....."

"তা তো বটেই, কিন্তু... .."

"লোকটা চালাক আছে।" —এরা এই বারে বারে লোক লোক করে আমার মাথায় কেমন..., হঠাৎ ঈশান বাবু বলে উঠ্‌লেন, "আচ্ছা আপনার এ খবর আর কেউ জান্‌তো ?"

হরিপদ বাবু বল্‌লেন, "না আমিত কাউকে বলিনি, তবে দীনু ভায়া যদি—"

দীনু বাবু হাঁ করেই ছিলেন, মুখখানা আরও খানিকটা ফাঁক করে বল্‌লেন, "না স্যর, আমি ত কাউকে বলিনি।"

"লোকটার ঠিক মতলবটা বোঝা গেলনা। কিন্তু কথা হলো যে শরীরটা মোটেই উঠ্‌লোনা কেন ?"

"সেটাই হ'লো আসল রহস্য !"

"আমার কাছে কিন্তু সেটাই সবচেয়ে সহজ ঠেকছে,—কঙ্কালের আবার .."

রহস্যের কোন সূত্র পেলাম না। বীরেন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঘরে ঢুকলো, তার অবস্থা দেখে সবাই হাঁ করে চেয়ে রইলাম। সে বল্‌ল, "স্যর ভূ···ভূ ..ভূ"

সহায় তাকে ধরে বল্‌ল, "বীরেন, কি হয়েছে বল, শীগ্‌গির বল কি হয়েছে।"

বীরেন দম নিয়ে, চোক গিলে বল্‌ল, "স্যর, ভূত।"

আমরা সবাই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠ্‌লাম। ভূত ! জলজ্যান্ত ভূত ম'রে প'ড়ে আছে—এর অর্থ কি ? কাল রাত্রে তবে সত্য সত্যই সেই ভূত, সেই অভিশপ্ত প্রেতাত্মা এসেছিলো ? প্লেটের সেই বিকট মূর্ত্তির কথা মনে পড়লো, গা শিউরে উঠলো, কাল রাত্রের সেই রক্তের সঙ্গে ভূতের কথা মনে হয়ে বুক কেঁপে উঠ্‌লো।

সহায় বল্‌ল "কোথায় ?"—"বাগানে চল দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আমরা সহায়ের পেছন পেছন যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দীনুবাবু একটা মৃদু চীৎকার করে উঠ্‌লেন। আমরা বিস্ময়ে ঘুরে তার মুখের দিকে তাকালাম সহায় আর বীরেন আর থামলোনা। ঈশান বাবু বল্‌লেন, "দীনু ব্যাপার কি ?"

দীনুবাবু একটু সামলে নিয়ে বল্‌লেন, "আজ্ঞে কাল রাত্রে আমিও ভূত দেখেছি। ছবি তোলবার সময় যে ফিট হয়ে পড়িনি এই আশ্চর্য্য। হরিপদ বাবুর চোখ খারাপ, আঁধারে উনি কিছুই দেখ্‌তে পান না।"

হরিপদ বাবু দীনুবাবুর দিকে একবার চেয়ে, পাশের প্লেট-র‍্যাক থেকে কঙ্কালের প্লেটখানা আর একবার তুলে নিয়ে খুব ভাল করে দেখলেন ; তারপর বলে উঠ্‌লেন, "কিন্তু দীনু কাল রাত্রে তুমি বল্‌লে না কেন ? জান সেই ভূত কাল রাত্রে আমাদের একটী ছেলেকে ছোরা মেরেছে,—বাঁচে কিনা সন্দেহ।"

"আজ্ঞে···আজ্ঞে... "

"আজ্ঞে আজ্ঞে কি ? তুমি যখন দেখ্‌লে, তখন বল্‌লে না কেন ?"

"আমি···আমি।" —"আবার আমি ! একেবারে একটী অপদার্থ তুমি। চলহে রমেন, ভূত বাবাজীকে একবার দেখে আসি।"

আমরা তিনজনে ছুটলাম। —কিন্তু দীনু বাবুর সঙ্গে ভূতের কি সম্পর্ক ?

ঘন গাছের কোল ঘেঁসে আমরা একটা বেশ বড় গাছের নীচে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের সেই প্রিয় কাঁচা-মিঠা আম গাছ। আম কাঁচা থাক্‌তেই

বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাগতো, আমরা মহানন্দে ছুরী দিয়ে কেটে কেটে খেতাম। সেই গাছের পাশেই একটা কঙ্কাল! সহায় আর বীরেন হাঁ করে সেই কঙ্কালের দিকে চেয়ে আছে।



সহায় বল্‌ল, "একি হ'লো স্যর? ব্যাপার যে কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে। —এ কঙ্কাল···এ কঙ্কাল এলো কোত্থেকে?" হরিপদ বাবু কিছু বল্‌লেন না, ঘুরে পাশের একটা ঝোপে ঢুকে কি যেন খুঁজতে লাগ্‌লেন। আমরা হাঁ করে সেই কঙ্কালের দিকে চেয়ে রইলাম, এ অদ্ভুত রহস্যের মীমাংসা কর্‌বে কে?

এ বিশ্রী স্তব্ধতাটা ভাঙ্গলো হরিপদ বাবুর একটা চিৎকারে। তিনি সহায়ের দিকে এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "সহায় শীগ্‌গির, শীগ্‌গির! আমার ঘরে গিয়ে দোরটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দাও, যাতে দীনু না পালাতে পারে। সে নেহাৎ সহজ মানুষ নয়।"—তবে···তবে!—দীনু বাবুর সঙ্গে ভূতের কি কিছু সম্পর্ক আছে? ভাব্‌তেও গা শিউরে উঠ্‌ল।

সহায় স্যরের হাত থেকে চাবিটা নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে ছুট্‌লো।—হরিপদ বাবু বীরেনকে বল্‌লেন, "বীরেন সত্যর খবর কি? সত্যর···"

বীরেন বল্‌ল, "স্যর সত্যইত গোড়ায় ভূতের কথা বল্‌ল।"

—সত্য বল্‌ল।·· সে ত কাল রাত্রের কোন খবরই জানে না, তবে সে এই ভূতের খবর পেল কোত্থেকে?··· এ কী রহস্য?

ঈশান বাবু খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে থেকে বল্‌লেন, "এঁ্যা···সত্য বল্‌ল! সে কি ·· সত্য বল্‌ল··· !"

"হ্যাঁ স্যর, ভোরবেলা যেই আমি উঠেছি, অমনি ও লাফিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, 'বীরেন দা ভূ···ভূ ··।—ঐ যে···ঐ···যে··· ।' আমি তাকে এক হাতে ধরে বল্‌লাম, 'ভয় কি রে সত্য, চল্ দেখি কোথায় ভূত!' সে ওর মাথার কাছের জানলা দেখিয়ে দিল, সেখান দিয়ে নামলাম। নেমে দাঁড়াতেই এ গাছের দিকে নজর পড়ল;—চেয়ে দেখি, স্যর, একটা কঙ্কাল! আস্তে আস্তে এগিয়ে এলাম। তার পর এই দেখে—, তার গলা আট্‌কে আস্‌তে লাগ্‌লো মুখ চোখ সাদা হয়ে উঠ্‌ল, আমার মনে হ'ল যেন সেই কঙ্কালটা বিশ্রী ভাবে আমাদের দিকে চেয়ে ভেংচি কাট্‌তে লাগ্‌ল।"

হরিপদ বাবু বল্‌লেন, "ভয় কি বীরেন! এতো কতকগুলি হাড় মাত্র, ভূত এতে নেই। যাও তো, তুমি গিয়ে চট্ করে সত্যকে ডেকে নিয়ে এসো তো।"

বীরেন ছুটে চলে গেল। ঈশান বাবু বল্‌লেন, "হরিপদ বাবু, এর যে কিছুই বুঝনি, সবই যে মাথায় খালি তালগোল পাকাচ্ছে। সব জেনে শুনেও যে মনে হচ্ছে এ ভূতের কাজ।··· তারপর হঠাৎ আপনি ঝোপের মধ্যেই বা গেলেন কেন আর কি-ই বা সেখানে পেলেন,— কিছুই যে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে।"

হরিপদ বাবু কাপড়ের নীচে থেকে একটা প্লেট বের কর্‌লেন। বল্‌লেন, "ভাগ্যিস্, ভুল করে কভারটা সুদ্ধু ফেলে গেছে। আমাদের আসল লোক লুকিয়ে আছে এখানে;" ব'লে তিনি একটু রহস্যের হাসি হাস্‌লেন।

এর অর্থ কি? কাল রাত্রে যে ছবি তোলা হ'ল তাতে বেরুল এক কঙ্কাল, তারপর এখানে পড়েও এক কঙ্কাল।··অথচ এ আরেকটা প্লেট,— এ কি ইন্দ্রজাল?

সহায় দূর থেকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলো; বল্‌ল, "স্যর, সর্ব্বনাশ হয়েছে, দীনু বাবু পালিয়েছেন। কোথাও খুঁজে পেলাম না।"

ব্যাপার কি?··· হরিপদ বাবু কি বল্‌তে যাবেন, হঠাৎ দূরে বীরেন চীৎকার করে উঠ্‌ল, শীগগির্ আসুন স্যর, আমাদের ঘরে।"

হরিপদ বাবুর কথা বলা আর হলো না, আমরা ছুটে চল্‌লাম।—রহস্যের

পর রহস্য যে ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

চার নম্বর ঘরে পৌঁছে দেখি ছোট বড় সব ছেলেরা দোর গোড়ায় ভীড় করেছে। ঈশান বাবু এক ধমকে সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন, ঘরে ঢুকে দেখি ঘরে কেউ নেই। এর মানে কি? অবাক হয়ে বীরেনের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বারো

রায়পুরে বার্ত্তাবহ

বীরেন আমাদের দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বল্‌ল, "আমিও স্যর বুঝ্‌তে পারছিনে, ব্যাপারটা কি। কিন্তু এই দেখুন স্যর"—ব'লে যে জায়গাটায় সত্যর ছোট স্যুটকেসটা ছিল সেখানটা সে দেখিয়ে দিল। দেখ্‌লাম স্যুটকেস্ অন্তর্হিত হয়েছে।

সহায় বল্‌ল, "আশ্চর্য্য.....!"

হরিপদ বাবু বল্‌লেন, "কিন্তু সাংঘাতিক। বুঝ্‌ছোনা সহায়, সত্য যে ভূতের ভয়ে আধ-পাগল হয়ে গেছে; আর তাই প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে। যদ্দূর মনে হয় তার খবর সেই হানাবাড়ীতেই পাওয়া যাবে। বুঝেছো সহায়?"

সহায় ছুটে হানাবাড়ীর দিকে বেরিয়ে গেল। হরিপদ বাবু বল্‌লেন, "ঈশান বাবু, সহায় ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কিছুই কর্‌বার নেই। চলুন।" তাঁরা চলে গেলেন। আমি আর বীরেন ঘরটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কিছুই পেলাম না, নতুন কোন চিঠি নয় কিম্বা নতুন কোন জিনিষও নয় যা থেকে আরও কিছু জান্‌তে পারা যায়। সত্যর জন্য মন চিন্তায় ভরে উঠ্‌ল। ছেলেটা পাগল হয়ে জলে ডুবে মরেনি তো, কিম্বা অন্য কোথাও যাইনি তো? না, যাবার সময় বাবু ওকে ভাগিয়ে নিয়ে গেল? যারা ভূত প্রেতকে বশ করতে পারে, তারা না পারে এমন কর্ম্মই নেই।

এমনি ভাবে নানা চিন্তায় অস্থির হয়ে আমরা দু'দিন কাটালাম। সহায়ের ঘরের কাছে সহস্র বার আনাগোনা কর্‌লাম কিন্তু এই দুদিনের মধ্যে সে ঘরের তালা খুল্‌লোনা একদিনও। রোজ রাত্রে ভূতের ভয়ে ঘুম হতোনা,—আমরা লেপের নিচে শিউরে উঠ্‌তাম।

তিন দিন পরের 'রায়পুর বার্ত্তাবহ' পড়ে এ রহস্যের একটা হদিস তবু পেলাম। গোড়ায় চম্‌কে উঠ্‌লাম। গোড়ার হেডিংটা একটু নতুন রকম।

হানাবাড়ীর কথাই দেখ্‌লাম—

'এত দিনে রায়পুরের শ্রী ফিরিল।

'রায়পুর জমিদার বংশের উত্তরাধিকারীর আগমন—আগামী মঙ্গলবার, ১০ই পৌষ তারিখে, রায়পুরের বর্ত্তমান জমিদার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন বসু মহাশয় রায়পুরে পদার্পণ করিবেন।

'রায়পুরবাসীর সকলেরই বোধ হয় মনে আছে, যে রায়পুরের নামকরণই হইয়াছে বিখ্যাত রায়বংশ হইতে। কিন্তু গত প্রায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রায় বংশের জমিদারী ভোগ করিবার মত কেহই ছিল না। এক্ষণে, উক্ত জমিদার বংশের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন বাবু মাতুলের সম্পত্তি দখল করিতে আসিতেছেন। এই প্রসঙ্গে এই বিখ্যাত জমিদার বংশের বংশপরিচয় ও ইতিহাস দিলে বোধ হয় অবান্তর হইবে না।

'প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া এই বিখ্যাত জমিদার বংশ এই রায়পুরে জমিদারী করিতেছেন। তাঁহারা প্রথমে ঢাকা অঞ্চলের বিক্রমপুরের কোন এক জায়গায় ছিলেন, কয়েক পুরুষ পরে, তাঁহাদের বিপুল সম্পত্তি পদ্মার প্রকোপে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইলে, তাঁহারা এই রায়পুরে আসিয়া ঘর বাঁধিলেন। তাঁহারা যখন এখানে আসেন, তখন রায়পুরে কোন লোক ছিলনা বলিলেই হয়। এই পথ ঘাট, স্কুল, কলেজ টেলিফোন, টেলিগ্রাফ সমস্তই এই রায়বংশের জমিদারীর সময়কালে এখানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

'এই বংশেরই শেষ জমিদার ৺তারাপদ রায় বাহাদুরের ছিল তিন ছেলে। তিন ছেলেই উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন; এ সময় হঠাৎ তারাপদ বাবুর যে কি হইল কেহই বলিতে পারে না, তিনি হঠাৎ পুত্রদের বলিলেন যে তিন ছেলের মধ্যে যে উপযুক্ত তাহাকেই সম্পত্তি দিবেন। কাজেই তিনজনেরই কলিকাতা গিয়া ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করিতে হইবে। সকলের চাইতে যিনি বেশী উন্নতি করিতে পারিবেন, তিনিই এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন, তবে যদি কাহারও দৈন্য দশা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি জমিদারী হইতে উপযুক্ত মাসোহারা পাইবেন। তাহাদের পুত্র পৌত্রদের বেলায়ও এই নিয়মই খাটিবে। যদি তাঁহাদের কোন ভাইয়েরই কোন সন্তানাদি না হয়, তাহা হইলে জমিদারী তাহাদের ভাগিনেয়বংশ পাইবেন। যদি তাহাদের মধ্যে এক ভাইয়ের মাত্র ছেলে কিম্বা

মেয়ে হয়, তবে সেই এই সম্পত্তির মালিক হইবে। ইহার পর তিনি তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা ও এক একটী অঙ্ক-লেখা স্বর্ণপদক দেন এবং এই রকম স্বর্ণপদক, ও এই মর্ম্মে একটি উইল, একটা সোনার ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া কোথাও লুকাইয়া রাখেন। শোনা যায়, তাঁহার বাড়ীর কোন গুপ্তকুঠরীতে এক বিগ্রহের কাছে এই উইল আছে, যদি কেহ স্বর্ণপদক লইয়া উপস্থিত হয়, তবে এখানকার স্বর্ণপদকের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে হইবে। সম্পত্তি এখন ট্রাষ্টির হাতে আছে।

'তিন ভাই, পিতার নিকট হইতে পদক ও টাকা লইয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। ঠিক ইহার পরেই কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল।

'দুদিন পর পর বড় ভাই, ও মেজ ভাই কলিকাতার এক হোটেলে মরিলেন। উভয়েই রাত্রে নিজের নিজের ঘরে বসিয়া কি বই পড়িতেছিলেন, ঠিক সে রকম চেয়ারে বসা অবস্থায়ই মারা যান—মুখে ভীষণ ভয়ের ভাব, চোখ বাহির হইয়া পড়িতেছে, হাত দুখানা ভয়ে তুলিয়া রহিয়াছেন, সামনে টেবিলের উপর একখানা বই পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলেই মনে হয় তাঁহারা সামনেই কোন বিভীষিকা দেখিতেছেন।'

আমি লাফিয়ে উঠ্‌লাম। এ কী···তবে কি, ··তবে কি, সেও এই ভূতেরই কর্ম্ম।···এতো প্রায় পঁচিশ বছরের কথা।···সে···সে কি তবে তৃতীয় ভাইকেও···! সত্যর সঙ্গে ভূতের কি সম্পর্ক? উদগ্রীব হয়ে পড়ে চল্‌লাম,—

'স্বভাবতঃই সকলের সন্দেহ পড়িল তৃতীয় ভাইয়ের উপর, কিন্তু খোঁজ করিয়া দেখা গেল, ছোট ভাই সেদিন বাড়ীতেই ছিলেন এবং হঠাৎ ফিট হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। কাজেই কেহই এই অলৌকিক ঘটনার মীমাংসা করিতে পারিল না। ইহার কিছুদিন পরে ছোটবাবুও অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার কোন খবরই আর মিলিল না। বৃদ্ধ এই শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। ট্রাষ্টিদের এই ছোট ভাইয়ের জন্য পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এদিকে, তারাপদ রায়ের হঠাৎ দেহপাত হওয়ায় সেই পদক যে কোথায় আছে তাহা বলিয়া যাইতে পারেন নাই, সকলে আশা করিতেছিলেন যে ছোট বাবু নিজেই আসিয়া সেই পদক বাহির করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের মধ্যে তাঁহার কোন খোঁজই মিলিল না।'

এ নিশ্চয়ই এই ভূতেরই কাণ্ড! তা না হ'লে সেই একই কাণ্ডের আবার অভিনয় এই সুদূর রায়পুরে কি ক'রে হবে? সত্যগোপালই তা হ'লে সেই ছোট ছেলের একমাত্র বংশধর। অভিশপ্ত বংশের একমাত্র বংশপ্রদীপ। তাই বুঝি—

সহায় ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বল্‌ল, "রমেন পড়ছিস্?"

বল্‌লাম, "হ্যাঁ, কিন্তু রায়পুর বার্ত্তাবহ।"

সে হঠাৎ আমায় জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চীৎকার করে উঠ্‌লো। "পেয়েছি, পেয়েছি!" আমি বল্‌লাম, "ব্যাপার কি সহায়, ব্যাপার কি?"

সে একটু থেকে বল্‌ল, "রমেন, সেই চোরা কুঠুরীর চাবিও পেয়েছি, সত্যকেও আবিষ্কার করেছি, আর আর সঙ্গে সঙ্গে বিগ্রহের ঘরও বের ক'রে ফেলেছি।"

আমি চমকে উঠ্‌লাম। বিগ্রহের ঘর! যা বের করবার উপর সত্যর ভবিষ্যৎ



ঠিক কম্পাসের মত নড়্‌ছে। সহায়—সহায় জানলো তার খবর? যার খবর নাকি সেই বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ জান্‌তো না!

অবাক হয়ে বল্‌লাম, "বিগ্রহের ঘর ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বিগ্রহের ঘর, আমি···আমি বের করেছি, হরিপদ বাবু পরীক্ষা ক'রে বলেছেন সব ঠিক আছে। সত্যর পদকেই সব লেখা ছিল, কিন্তু সে অঙ্ক দিয়ে।"

সত্যর পদক! সহায়রাম সে পদক পেলো কোথায়? তবে কি সত্য হোষ্টেলে ফিরেছে?

জিজ্ঞেস করলাম, "সত্য কি হোষ্টেলে ফিরেছে?"

"না, আমি গিয়ে তার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলাম।"

আমি কি জিজ্ঞেস কর্‌তে যাবো ঠিক এমনি সময় বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে সাতটা বেজে উঠল। সহায় বল্‌ল, "চল, আজ আমরা বিগ্রহ খুলে তার সামনে বসে সত্যর গল্প শুন্‌বো।"

আগ্রহে, উৎসাহে সহায়ের সঙ্গে বেড়িয়ে পড়্‌লাম।

ঘৃণা

(শ্রীমতী নিভাননী দেবী)

পুকুরেতে রহিয়াছে কমল ফুটিয়া,
তীরে বটবৃক্ষ এক আছে দাঁড়াইয়া।
নিতান্ত হেলার চোখে কমলে দেখিয়া,
একদিন গর্ব্বভরে কহে ডাক দিয়া—
"পুকুরের গন্ধে মোর নাক জ্বলে যায়
কেমনে উহার মধ্যে রহিয়াছ হায়?"

কমল হাসিয়া বলে, "কি করিব ভাই,
গন্ধ দূর করা ছাড়া কোন কাজ নাই;
যত সব বট পাতা পচে গিয়ে জলে,
ধীরে ধীরে এই জল গন্ধ ক'রে তোলে;
তিষ্ঠাতে একান্ত সবে না পারে যখন
সুবাস বিলাতে ভাই ফুটিগো তখন।

পৃথিবীর কম্পন

(শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম্ এস্-সি)

ভূমিকম্প হয় কেন? আমাদের মা বাবার ঠাকুরমা দিদিমারা মনে করতেন যে পাতালে বাসুকীর মাথা নড়ে ব'লে তার মাথার উপরকার এই পৃথিবীটাও কাঁপে। কেননা, সেকালের সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে পৃথিবীটা বাসুকী নামে খুব বড় একটা সাপের মাথার উপর রয়েছে। সেকালে য়ুরোপ দেশের লোকেরা আবার মনে করত যে পৃথিবীটা আছে য়াট্‌লাস্ নামে খুব জোরালো এক দেবতার ঘাড়ের উপর। কাজেই, য়াট্‌লাস্ যখন কাঁধ বদল করেন বা পৃথিবীকে ঘাড় থেকে মাথায়, কিম্বা মাথা থেকে ঘাড়ে সরান তখনই ভূমিকম্প হয়।



পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ জন্মিবার পূর্ব্বে সূর্য্য যেমন ছিল

আজকাল কিন্তু সকলেই জানে যে পৃথিবীটা সাপের মাথার উপরেও নেই আর য়াট্‌লাসের ঘাড়েও নেই,

আছে আকাশে মহাশূন্যের মধ্যে। ভূমিকম্প তবে হয় কেমন করে?

এই কথার জবাব ভাল করে জানতে হলে পৃথিবীর একেবারে শিশু কালের কথা একটু জানা দরকার। পৃথিবী জন্মেছে সূর্য্য থেকে। বহু কোটি কোটি বৎসর আগে সূর্য্যের অতি বিশাল শরীর থেকে একটু একটু অংশ ছিঁড়ে ও ছিট্‌কে বের হ'য়ে এসে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-গুলির জন্ম হয়েছে। এই ভাবে প্রথম যখন জন্ম হ'ল সেই একেবারে শিশুকালে পৃথিবী ছিল প্রকাণ্ড একটা আগুনের গোলা। তখন সে ছিল নানা রকম তপ্ত গলিত পদার্থ ও গ্যাসে তৈরী তালগোল পাকানো বিরাট দেহ। সে সময়-কার পৃথিবীতে কোন রকম প্রাণীই যে ছিল না তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। প্রাণী তো দূরের কথা তখন পৃথিবীতে গাছ পালা, জল স্থল কিছুই ছিল না। এমন কি পাহাড় পর্ব্বত পর্য্যন্ত ছিল না। পাহাড় পর্ব্বত যে পাথরে তৈরী তাও ছিল তখন গরম ও গলিত অবস্থায়।



প্রথম অবস্থায় পৃথিবী ছিল একটা আগুনের গোলার মত

নানা রকম জ্বলন্ত গ্যাসে ঢাকা ভয়ানক গরম ও তরল দেহ নিয়ে পাক খেতে

খেতে পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘুরতে লাগল। কত কোটি কোটি বৎসর ধ'রে মহাশূন্যের দারুণ শীতের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পৃথিবীর গরম গা একটু একটু ক'রে ঠাণ্ডা হ'তে আরম্ভ করল। প্রথমেই ঠাণ্ডা হ'ল বাইরের দিকের গ্যাস। তার সঙ্গে জলীয় বাষ্পও ঠাণ্ডায় জল হ'য়ে বৃষ্টিরূপে পড়তে লাগল। একাদিক্রমে শত সহস্র বৎসর ধ'রে অবিরত এই রকম বৃষ্টি বাদলের পর পৃথিবীর গা একটু ঠাণ্ডা হওয়ায় তার গলিত গরম ও তরল দেহের উপর পাত্‌লা একটা সর পড়তে আরম্ভ করল। লক্ষ লক্ষ বৎসরের পর এই সর একটু শক্ত হ'লে ক্রমে সেই স্তরটির উপর জলও জমে গেল।

এই সময় থেকেই পৃথিবীর শরীরে ডাঙ্গা, জল ও বাতাস এই তিনটি বিভিন্ন রকমের স্তরের সৃষ্টি হ'ল। একেবারে ভিতরে রইল তরল ও তপ্ত গলিত পদার্থ। তার উপরে রইল গলিত অবস্থা থেকে সদ্য-জমে-যাওয়া পাতলা একটা পাথরের স্তর। তার উপরে জমল জল। আর যে সকল গ্যাস তখন পর্য্যন্ত ঠাণ্ডায় ঘন হ'য়ে বা জলে গ'লে পড়ে নি তারা সকলে একত্র হয়ে, বাতাসরূপে, সব কিছুর উপরে ছড়িয়ে রইল।

কিন্তু এত পাতলা পর্দ্দার নীচে অত গরম ও তরল পদার্থ কি সহজে চাপা থাকে! সামান্য কারণেই সে উপরের পর্দ্দাকে ঠেলে ফাটিয়ে বের হ'য়ে পড়তে চায়, আর বারে বারে বের হ'য়ে পড়েও। এই জন্যে এই সময় থেকেই যত গোলমাল আরম্ভ হ'ল। নীচের তরল পদার্থের ঠেলায় উপরের কঠিন স্তরটির কোন কোন জায়গা ঢিবি হ'য়ে ফুলে উঠল। কাজেই কোন কোন জায়গা আবার চুপ্‌সে বসে গেল। পৃথিবীর উপর তোলপাড় কাঁপন চলতে থাকল। যে জায়গা ঢিপি হ'য়ে উঠল সেখানকার সব জল গড়িয়ে চুপ্‌সে-বসে-যাওয়া জায়গায় গিয়ে জড় হ'ল। এমনি ক'রে পৃথিবীতে ডাঙ্গা ও জলের, পাহাড় পর্ব্বত ও সাগর সমুদ্রের সৃষ্টি হ'ল।

জল ও স্থল আলাদা হ'ল বটে কিন্তু তখনও সব খুব গরম। পরে তাও ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। জলের মধ্যে নানা রকম পোকামাকড় ও ক্রমে মাছ, কাছিম, কুমীর প্রভৃতি জন্মাল। বদ্ধ জায়গায় জলে ও জলের কিনারায় শ্যাওলা ও ছাতা পড়ল। ছোট ছোট গাছপালা থেকে নানা রকম বড় বড় গাছও জন্মাতে লাগল। নানা রকম জীবজন্তুও ডাঙ্গার উপর দেখা দিল। এদের অনেক বৎসর পরে জন্মাল মানুষ।

এই রকম ক'রে পৃথিবীর উপরে পাহাড় পর্ব্বত, সাগর সমুদ্র, কত নদ নদী, কত দেশ মহাদেশ, কত জীবজন্তু, কত জাতি, কত রাজ্য, কত কল কারখানা ইমারত, কত রকম সভ্যতা, আরো কত কি গ'ড়ে উঠল। সবই হ'ল, কিন্তু ভিতরে রয়ে গেল সেই তরল আগুনের মত গরম গলিত পদার্থের রাশি। যে কোন মুহূর্ত্তে সে শতমুখে বের হয়ে আমাদের সব গর্ব্ব সব কিছু ধ্বংস ক'রে ফেলতে পারে। এই সর্ব্বনাশের হাত থেকে আমাদের তফাৎ করে রেখেছে পাথরের সামান্য একটা পাতলা স্তর। আমাদের পায়ের তলায় তাকে যতই মোটা আর যতই শক্ত বলে আমাদের মনে হোক, পৃথিবীর কাছে সে অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষীণ। একটা কমলা লেবুর কাছে তার খোসা যত পাতলা, যত তুচ্ছ, পৃথিবীর কাছে পাথরের এই স্তরটা সেই তুলনায় আরো পাতলা, আরো তুচ্ছ।

সময় সময় এই পাতলা স্তরের কোন একটা কাবু জায়গা তাপ ও চাপের ধাক্কায় একটু ফেটে যায়। উপর থেকে জল সেই পথে ভিতরে গিয়ে ঢোকে আর সেখানকার ভয়ানক গরমে বাষ্প হ'য়ে জোরে বের হয়ে আসতে চায়। তার ধাক্কায় মুখটা যায় বড় হ'য়ে, আর সেই পথে বাষ্প—এবং কখনও কখনও গলিত পদার্থের স্রোত—প্রবল বেগে বের হ'য়ে চারিদিকে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে পড়ে। এমনি ক'রেই আগ্নেয় গিরির উৎপাত হয়, পৃথিবী ওঠে কেঁপে, চারিদিকের দেশ ফেটে চ'টে, উড়ে পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়। ভূমিকম্প হওয়ার এ একটা কারণ।



এই শুকনো ফলটি যেমন কুঁচকে গেছে, পৃথিবীর গা ঠাণ্ডা হবার সময় সেই ভাবে কুঁচকে গিয়ে উঁচুনীচু হয়ে গেছে।

ভূমিকম্প হওয়ার আর একটা কারণ—ঠাণ্ডায় পৃথিবীর গা কুঁচকে ছোট হ'য়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হ'লে দুধের সর যেমন জড়জড় হ'য়ে যায়, পোড়া বেগুন ঠাণ্ডা হ'লে তার উপরকার ছালটা যেমন কুঁচকে যায়, গরম পৃথিবীর গায় প্রথম যে সর বা স্তরটা পড়েছিল ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে তাও তেমনি কুঁচকে গিয়েছে। পৃথিবীর গাটা তাই নিটোল ও সুডৌল নয়। দিনের পর দিন যতই ঠাণ্ডা হচ্ছে, উপরের ও চারিপাশের চাপ যতই কমছে বাড়ছে, ততই পৃথিবীর এই কুঁচকে যাওয়া স্তরটা নিজেকে আরো গুটিয়ে বা

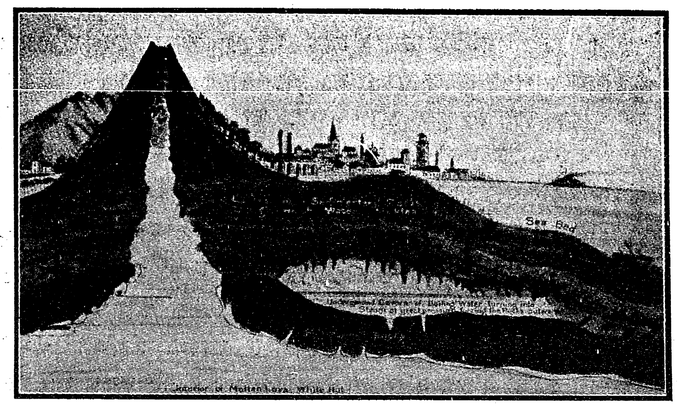

পৃথিবীর স্তরের ফাটল দিয়ে সাগরের জল ভেতরে ঢোকে।

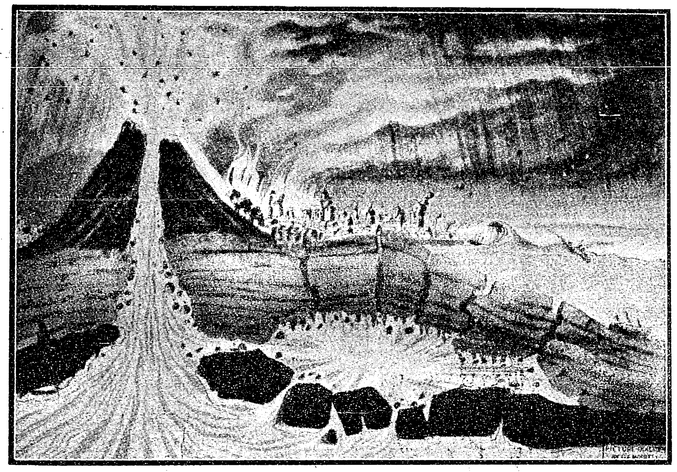

উপরের জল ভিতরে গিয়ে সেখানকার ভয়ানক গরমে বাষ্প হয়ে যায়, এবং পাথরের স্তর ফাটিয়ে দিয়ে গলিত ধাতু ও পাথর প্রভৃতি সমেত বিষম বেগে উপরে ছুটে বের হয়।

গুছিয়ে নিতে চাচ্ছে। সেই জন্যে কুঁচকে যাওয়া স্তরের যে জায়গাগুলো খাড়া ভাবে থাকে তা যায় পড়ে। তাতেই হয় একেবারে সর্ব্বনাশ। তলার স্তরটাই যদি স্থির না থাকে তো উপরের গ্রাম নগর, ঘর বাড়ী স্থির থাকে কি ক'রে? পৃথিবীর কাছে যা একটু নড়া, আমাদের কাছে তাই হয় মহামারী ভূমিকম্প! আজকাল বেশীর ভাগ ভূমিকম্প এই কারণেই ঘটে।

পৃথিবীটা লাটিমটির মত পাক খেতে খেতে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে কিন্তু মাথাটা তার ফেরান আছে ধ্রুবতারার দিকে। মাথাটা সব সময় কিন্তু একেবারে স্থির থাকে না। একটু একটু কাঁপে। কোন কারণে তার মাথাটা যদি বেশ একটু ট'লে যায় তো পৃথিবীর টাইটুম্ব পেটে লাগে ঝাঁকি। সেই ঝাঁকিতে পেটের কাবু জায়গাগুলো ব'সে, ধ'সে বা ফেটে যায়। এই রকম ক'রেও ভূমিকম্প হয় ব'লে কেউ কেউ মনে করেন।

কোন কোন পণ্ডিত আবার বলেন যে পৃথিবীটা কমলা লেবুর মত গোল নয়, নাশপাতি ফলের মত একদিক মোটা, একদিক সরু। আর এই নাশপাতির মত পৃথিবীটা নাকি গা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ঝেড়ে ঝুড়ে একটু একটু ক'রে কমলা লেবুর মত গোল হয়ে আসছে, আর তার জন্যেও ভূমিকম্প হচ্ছে। নাশপাতি যে, সে নাশপাতি থাকলেই পারত। কমলা লেবু হ'তে গিয়ে, আমরা যারা তার গায় বাসা বেঁধে আছি তাদের করছে সর্ব্বনাশ।

যে কারণে যতটা ক'রেই হোক, সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্র (Seismograph) দিয়ে দেখা গিয়েছে পৃথিবীর গা প্রায় সব সময়েই কিছু না কিছু পরিমাণে কাঁপছে। গড়পরতা হিসাবে বছরে অন্ততঃ প্রায় ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) বার এই রকম ভূমিকম্প হয়। এই কাঁপুনি যখন ঝাঁকুনি হয়ে দাঁড়ায়, তখনই হয় উৎপাত।

আরো দেখা গিয়েছে পৃথিবীর স্থান বিশেষে ভূমিকম্প বেশী হয়। এই সব জায়গায় ভূমিকম্পের জোরও বেশী হ'য়ে থাকে। অনেক বৎসর ধ'রে লক্ষ্য ক'রে জানা গিয়েছে যে এই সব জায়গাগুলো মোটামুটি ভাবে দুটো লাইনে পৃথিবীর উপর রয়েছে। একটা লাইন দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিম গা ঘেঁষে, চিলি থেকে আলাস্কা পর্য্যন্ত গিয়ে ঘুরে, এসিয়া মহাদেশের পূব দিকে কামচাট্‌কা ও জাপান দ্বীপপুঞ্জের ভেতর দিয়ে নেমে গিয়েছে। আর একটা লাইন

হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী ধ'রে পশ্চিম দিকে আফগানিস্তান পারস্য এসিয়া মাইনর গ্রীস ইটালী প্রভৃতি হ'য়ে, আটলান্টিক মহাসাগরের আজোর দ্বীপ ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মধ্য আমেরিকার ভিতর দিয়ে ঘুরে, হাওয়াই দ্বীপ মালয় দ্বীপপুঞ্জ

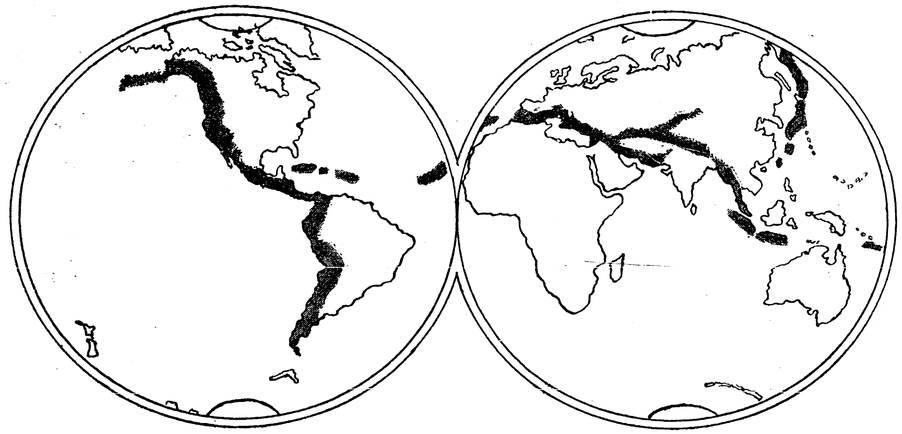

চিহ্নিত স্থানগুলিতে ভূমিকম্প বেশী হয়।

বার্ম্মা ও আসাম হ'য়ে ফিরে এসেছে। কাজেই যত বড় বড় ভূমিকম্প হয় তা ঐ সব জায়গাতেই বেশী হয়।

ভূমিকম্প মূলতঃ যেখানেই আরম্ভ হোক্ তার ধাক্কা পৃথিবীর গা বেয়ে ও পৃথিবীর ভিতর দিয়ে সব দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর ভিতর দিয়ে যে ধাক্কা যায় তা যায় বেশ তাড়াতাড়ি। পৃথিবীর গা বেয়ে ধাক্কা আসে তার পরে। এই জন্যে ভূমিকম্পের সময় পর পর ২।৩ বার জোর ঝাঁকুনি হয়। কেবল ডাঙ্গায় নয়, সমুদ্রের নীচেও ভূমিকম্প হয়; বরং ডাঙ্গার চেয়ে সমুদ্রের নীচেই ভূমিকম্প হয় বেশী।

ভূমিকম্পের উৎপাতে জমি নীচের দিক থেকে উপরের দিকে কাঁপে, পাশা-পাশি দোলে, আবার জিলিপির পাকের মত এলোমেলো পাকও খায়। ভূমিকম্পের ধাক্কায় শুধু যে বাড়ী ঘর পড়ে তা নয়, জমিরও অদল বদল হয় খুব। কোন জায়গা ব'সে যায়, কোন জায়গা উঁচু হ'য়ে ওঠে। কোন জায়গা ফেটে গিয়ে নীচে থেকে

জল বালি ওঠে, কোন জায়গা হয় তো আবার পাশাপাশি ভাবে খানিকটা সরে যায়। এই সব কারণে বড় বড় ভূমিকম্পের পর সময় সময় নদীর মুখ ফিরে যায়, নতুন নতুন পাহাড় হয়, পুরানো পাহাড় ব'সে যায়, পুকুর পাতকুয়ার নীচে থেকে জল সরে যায়, আবার কোন কোন মজা পুকুর পাতকুয়া জলে ভ'রে ওঠে।

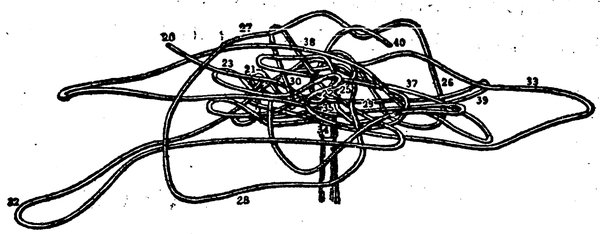

একটি ভূমিকম্পে ২০শ থেকে ৪০শ সেকেণ্ডে পৃথিবীর গা পর পর যে ভাবে কেঁপেছিল তার নক্‌সা।

পৃথিবীর ভিতরটা যতদিন তরল থাকবে, আর তার উপরকার পর্দ্দাটা থাক্‌বে পাতলা, ততদিন ভূমিকম্পের ভয় থাকবেই। পৃথিবী যতই ঠাণ্ডা হচ্ছে পর্দ্দাটাও ততই মোটা হচ্ছে আর আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের অত্যাচার ততই কমছে। ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে পৃথিবী যখন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন আর এদের ভয় থাকবে না। তা না থাকলেও তখন কিন্তু আমাদের একেবারে সর্ব্বনাশ হবে। এখন আমাদের মামাবাড়ী চাঁদের দেশের যে অবস্থা তখন পৃথিবীরও সেই অবস্থা হবে। গাছ পালা পশুপ্রাণী কিছুই তখন বাঁচবে না বা থাকবে না। সমস্ত পৃথিবীটা দারুণ ঠাণ্ডা মরুভূমিতে পরিণত হবে। তবে তার জন্যে আমাদের মাথায় হাত দিয়ে বসবার দরকার নেই। কেননা সে রকম হ'তে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর যে লাগবে তা হিসাব ক'রেও ঠিক বলা যায় না।

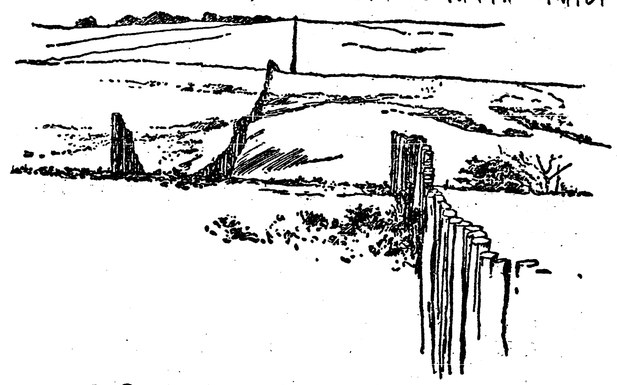

আমেরিকার এক ভূমিকম্পে, একটি বেড়া ভেঙ্গে নিয়ে জমি দুই দিকে সরে গিয়েছে।



এই বারের ভূমিকম্পে পুসার এই মাঠ ফেটে জল ও বালি বের হয়েছে।

("ভারতবর্ষে" তোলা)

দুষ্টু ছেলে

(শ্রীরাধামোহন বটব্যাল, বি-এ)

মানুষ হ'তে হ'লে এবার দুষ্টু হ'তে হবে।
সাতটা চড়ও খেয়ে যারা
কোন মতেই দেয় না সাড়া,
করুক তারা নিন্দে তোমার যতই কলরবে,
তবু মানুষ হ'তে হ'লে দুষ্টু হ'তে হবে।
ভাল মানুষে দেশ যে বোঝাই,
তাদের মোরা আর নাহি চাই
দুষ্টু এবার না হ'লে ভাই নীচেই পড়ে র'বে।
এবার মানুষ হ'তে হ'লে দুষ্টু হ'তে হবে।
উচিত কথা বল্‌তে সদাই
জিহ্বা যেন না কাঁপে ভাই,
বুক ফুলিয়ে ন্যায়ের পথে চল্‌তে তোমায় হবে,
আজ যদি বুক কাঁপে ভয়ে সাহস হবে কবে ?
বিবেক তোমার বল্‌বে যেটা
পুণ্য ব'লে জানবে সেটা,
ভগবানের আদেশ ব'লে মাথা পেতে লবে ;
হয়তো সে কাজ কর্‌তে গেলে দুষ্টু ছেলে হবে !
দল বেঁধে লোক যদি ব'লে
তোমায় অতি মন্দ ছেলে,
তবু বিবেক বল্‌বে যেটা সেইটে মেনে লবে ;
পাপের সঙ্গে আপোষ ক'রে মানুষ কে হয় কবে !

ননী গাঙ্গুলী

(শ্রীযতীন সাহা)

আই-এ পাশ করে হঠাৎ ননী গাঙ্গুলীর সখ হ'ল সে আর জেনারল্ লাইনে পড়্‌বে না। পড়্‌বে সে আর্ট ইস্কুলে। যা বলা কাজেও তাই।

ননী গাঙ্গুলী আর্ট ইস্কুলে এসে ভর্ত্তি হ'ল আমাদের সাথে। আশ্চর্য্য ছেলে এই ননী গাঙ্গুলী। এক দিনে সে যে কি করে আমাদের সাথে ভাব করে ফেল্‌লে তা আজও বুঝ্‌তে পারিনে। ননী গাঙ্গুলী! সে যেন ঠিক স্বপ্নেরই মতন এসে আমাদের চিত্ত জয় করে ফেল্‌লে। তার মুখ চোখ ছাপিয়ে সদাই হাসি। 'জলি' ছেলে যদি বল্‌তে হয় তো ননী গাঙ্গুলীকেই বল্‌তে হবে। ছ' বছর তার সঙ্গে পড়েছি। এ ছ' বছরের ভেতর একদিনও তার মুখে একটু বিষাদের ছায়া দেখি নি। হাসি দিয়েই যেন সে তৈরী। আর শুধু তাই নয়, সবাইকে হাসাতেও সে জানে।

এক দিনে সে দশ বছরের পুরানো বন্ধুদেরও দিলে হার মানিয়ে। তার সাথে যেন কতকালের পরিচয়—কত দিনের ভাব। এম্‌নি ছিল আমাদের ননী গাঙ্গুলী। ভারি মিষ্টি তার হাসি। চোখ দুটি তার এম্‌নি চমৎকার! সে যেন চোখ দিয়েই কথা কয়। তার দাঁত দু'পাটি যেন সারি সারি মুক্তো সাজান। তাতে না আছে একটু ময়লা না আছে অতটুকু পানের রসের দাগ। রং তার উজ্জ্বল গৌর বর্ণ যাকে বলে তাই। সাদা পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছু তাকে কোনো দিন গায়ে দিতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তার সাদাসিদে পোষাকে ফুটে উঠ্‌ত তার সাদা মনের ছায়া। সে বল্‌ত, পৃথিবীতে যারা বোকা তারাই দুঃখ করে—ক'দিনের জন্যেই বা আসা তাও যদি না হাসি প্রাণ খুলে, যদি মুখ ভার করে বসে থাকি তো ঠক্‌বো। সত্যি সে হেসে গেছে ; আর শুধু তাই নয় সবাইকে হাসিয়েও গেছে। সব চাইতে বেশী হাসিয়েছে আমাদের মাষ্টার মশাইকে।

ননী থাক্‌তো চন্দননগরে। রোজ ট্রেণে করে এসে ক্লাস কর্‌ত কোল্‌কাতায় আমাদের সাথে। প্রথম যে দিন সে এল, চেয়ে দেখি তার কপালে চন্দন লেপা। আশ্চর্য্য ! কপালে চন্দন মাখা ইস্কুলের ছেলে ত কোনো দিন দেখিনি!

মাষ্টার মশাই নাকের ডগায় চশমাটা ঝুলিয়ে দিয়ে আড় চোখে ননীর দিকে একবার চেয়ে একটু মুচ্‌কে হেসে বল্‌লেন, "ভর্ত্তি হবার আগে কালীঘাট

গেছ্‌লে বুঝি! মানৎ টানৎ কিছু ছিল?"

ফিরে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেই ননী হেসে ফেল্‌লে। বল্‌লে—"আজ্ঞে ও কথা বল্‌ছেন কেন স্যার! একটা ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার জন্যে আবার মানৎ!"

—"না সে কথা নয়, তোমার কপালে চন্দন দেখ্‌ছি কিনা তাই!"

সবিনয়ে ননী বল্‌লে—"আজ্ঞে স্যার, আমার বাড়ী চন্দননগর কিনা তাই..." ননীর কথা আর শেষ হ'ল না। ওঃ সে কি হাসির ধুম! প্রথম একটি কথাতেই ও যা হাসালে বোধ হয় আমরা সারা জীবনে এত হাসিনি। আমাদের মাষ্টার মশাই প্রিয়তোষ বাবু তো হেসেই অস্থির। হাত দিয়ে ইসারা করে ননীকে তিনি টেবিলের কাছে ডেকে বল্‌লেন—"তোমার ভেতর তো খুব 'হিউমার' আছে হে! এটাও একটা মস্ত বড় আর্ট! তুমি সত্যি এক দিন বড় আর্টিষ্ট হ'তে পারবে।" আসলে কিন্তু ননীর কপালে উঠেছিল একটা ব্রণ, তাই সে চন্দন দিয়েছিল।

প্রিয়তোষ বাবু ছিলেন বড্ড ভীরু কিন্তু খুব 'ডিউটিফুল'। 'নিট এণ্ড ক্লিন্' বলেই তিনি মরতেন। একটু কিছুতে ময়লা দেখ্‌লেই তিনি 'ডারটি', ময়লা, নোংড়া বলে নাক সিট্‌কাতেন। বুড়ো না হলেও তাঁর বয়স হয়েছিল ঢের। তার একটা দোষ ছিল—তিনি কানে একটু কম শুন্‌তেন। রোজকার খবরের কাগজ তিনি সব সময় কাছে রাখ্‌তেন—দরকারী খবর গুলো লাল পেন্সিল দিয়ে 'আণ্ডার লাইন' করে।

প্রথম যে দিন আমরা প্রিয়তোষ বাবুর ক্লাশে উঠলুম তিনি সবাইকে ডেকে একটা ছোট খাটো বক্তৃতা দিলেন। তার সবগুলোই উপদেশ পূর্ণ।

চশমাটা টেনে নাকের ডগায় বসিয়ে, রুমাল দিয়ে হাত দু'টো পরিষ্কার করে পুঁছে, তিনি ড্রয়ার থেকে একটা নক্সা বের কর্‌লেন।

—"দ্যাখো, তোমাদের এবার থেকে শুধু ইস্কুলে বসে ছবি আঁক্‌লে চল্‌বে না। বাইরে গিয়ে ময়দানে সব গরু, ছাগল, মোষ, 'স্কেস্' (sketch) কর্‌তে হবে, বুঝ্‌লে। আর মাঠের এই সীমানা পেরিয়ে কেউ যেতে পারবে না!" ব'লে ম্যাপটা দেখালেন। আমরা বল্‌লুম তাই হবে স্যার। "আর শোনো, রোজ ঠিক সময়ে ক্লাসে আস্‌বে; এক মিনিট পরে এলেই কিন্তু আমি সেদিন 'প্রেজেণ্ট' লিখবো না। আর এক কথা। রোজ একটার সময় তোপ পড়ে; তোপ শুন্‌লেই আমায় বলবে। আমার ঘড়িটা মেলাতে হয় কিনা তাই।"

তারপর থেকে আমরা প্রায়ই মাঠে Sketch কর্‌তে যেতুম। চার ঘণ্টায় চারটি করে ছবি আঁকার নিয়ম ছিল। প্রথম প্রথম যা আঁকতুম তা দেখে নিজেদেরই হাসি পেতো। গরু আঁক্‌তে গিয়ে হয়ে যেতো ঘোড়া। কিন্তু তা হলে কি হবে, চারটি ছবি আঁকা চাইই। নইলে ভয়ানক বকুনী খেতে হ'ত প্রিয়তোষ বাবুর কাছে।

একদিন অনেক করেও ননী গাঙ্গুলী একটা গরুও আঁক্‌তে পার্‌লে না। সবাই ক্লাশে এলুম। পর পর ডাক পড়ল ননী গাঙ্গুলীর। প্রিয়তোষ বাবুর কাছে গিয়েই ননী গাঙ্গুলী খাতাটা টেবিলের ওপর রেখে বল্‌লে—"স্যার অসম্ভব!"

—"অসম্ভব! সে কি হে?"

—"হাঁ স্যার, অসম্ভব নয়তো কি! যেখানে আঁক্‌তে যাই সেখানেই বাধা।"

—"বাধা?"—"হাঁ স্যার বাধা। সি, আই, ডি স্যার! ছবি আঁকা আরম্ভ করেছি কি চেয়ে দেখি পেছনে যমদূতের মত সি, আই, ডি দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে!"

—"সি, আই, ডি তোমার কাছে যাবে কেন?"

—"কি জানি স্যার সে তো আমিই বুঝ্‌ছি না।"

আমরা আর হাসি চেপে রাখ্‌তে পারি না। প্রিয়তোষ বাবু সি, আই, ডি-দের বড্ড ভয় করতেন! তিনি বল্‌লেন—"কাজ নেই তবে তোমার মাঠে গিয়ে। তুমি ক্লাশেই ছবি আঁকবে।"

সেদিন হঠাৎ ননী গাঙ্গুলীর বোর্ডটা দুম্ করে টেবিলের ওপর পড়ে গেল। যেই না পড়া অম্‌নি ননী গাঙ্গুলী চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "তোপ স্যার, তোপ পড়ল।"

চট্ করে পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে প্রিয়তোষ বাবু বল্‌লেন, "তোপ! কে বল্‌লে তোপ! এখনও পনেরো মিনিট বাকী আছে যে একটা বাজ্‌তে।"

আমাদের সবারই মুখ শুকিয়ে গেল। হাস্‌তে হাস্‌তে ননী প্রিয়তোষ বাবুর কাছে গিয়ে বল্‌লে, "হাঁ স্যার তোপ পড়েছে। আপনার ঘড়ি স্লো স্যার।" 'তা হবে' ব'লে প্রিয়তোষ বাবু ঘড়ি মিলিয়ে নিলেন। তারপর যখন সত্যি তোপ পড়ল তখন তিনি চম্‌কে উঠে বল্‌লেন—"কে হে বলেছিলে তখন যে আমার ঘড়ি স্লো?" আমাদের মুখ কালো হয়ে গেল। মনি বল্‌লে—"তাহলে সেটা স্যার কোন লোকের সম্মানের জন্যে দাগা হয়েছিল।" 'তা হবে' ব'লে প্রিয়তোষ বাবু আবার ঘড়ি ঠিক করে নিলেন।

ননীকে বল্‌লুম—"ননী, তুই এমনি মিথ্যে কথা বলিস্।" ননী বল্‌লে—"মুখে

বল্‌লেই মিথ্যে কথা হ'ল! আর তুমি যত রাজ্যের কথা সাজিয়ে গল্প লেখ, সে সব বুঝি খুব সত্য! ও তোমার রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব সবাই বুঝি কেবল সত্য গল্প লিখে বেড়ান। যেটা শুধু একটু আমোদ করার জন্যে করা সেটা মিথ্যে কথা নয় হে।"

পর পর তিন চার দিন ননী গাঙ্গুলী 'লেটে' এসেছে। সে ট্রেনে আসে বলে তাকে দশ মিনিট সময় বেশী দেওয়া ছিল, কিন্তু তবুও তার লেট হয়।

একদিন ননী গাঙ্গুলী ঠিক এক ঘণ্টা বাদে এসে হাজির। দরজার কাছে এসেই সে থম্‌কে দাঁড়ালে। মুখ তুলে প্রিয়তোষ বাবু বল্‌লেন—"কে?" আশ্চর্য্য! ননী গাঙ্গুলী ততক্ষণে একটা ফন্দি এঁটে ফেলেছে। ত্রস্ত পদে টেবিলের কাছে এসে নমস্কার করেই ননী আমাদের দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাস্‌লে, তার পরই গম্ভীর আর ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—"এ্যাক্‌সিডেণ্ট স্যার!"

—"এ্যাক্‌সিডেণ্ট! বল কিহে ননী?"

—"হ্যা স্যার 'এ্যাক্‌সিডেণ্ট'! উঃ, 'ডেনজারাস্'! 'ডেনজারার্স'!"

ব্যস্ত হয়ে প্রিয়তোষ বাবু বল্‌লেন, "অ্যাঁ, বল কি—কোথায়?"

ননী আবার আমাদের দিকে আড় চোখে চেয়ে পর মুহূর্ত্তেই গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—"ঠিক হাওড়া ব্রীজের ওপর স্যার! উঃ মাথাটা বড্ড ঘুর্‌ছে স্যার।"

—"অ্যাঁ, অ্যাঁ তুমি কাঁপছ যে! বোসো বোসো ওখানে, তারপর শুনি।"

টুলটা টেনে বসে ননী বল্‌লে—"কেউ মরেনি স্যার, কিন্তু যা রক্ত-অ-অ-অ!"

ভয় পেয়ে প্রিয়তোষ বাবু বল্‌লেন, "থাক্ থাক্ আর শুন্‌তে চাইনে, কিন্তু তোমার তো কিছু হয় নি?"

—"না স্যার তেমন কিছুই হয়নি তবে লেট্ হয়ে গেলুম স্যার!"

—"না, না লেট কি হে, আমি তোমায় প্রেজেণ্ট করে দিচ্ছি, যাও।"

তারপর ননীর হাসি দেখে কে। বায়স্কোপের পর্দ্দার ছবির মতন মুহূর্ত্তে তার চেহারা বদ্‌লে গেল। অদ্ভুৎ আমাদের ননী গাঙ্গুলীর 'প্রেজেণ্ট' হবার ফন্দি! আমি বললুম, "ননী ভাই এবার থেকে সব ছেড়ে ছুড়ে তুই লেখা সুরু কর।"

ছ' মাস গরু ঘোড়ার ছবি এঁকে যখন আমাদের হাত পাকল তখন প্রিয়তোষ বাবু আমাদের ডেকে বল্‌লেন, "এবার থেকে তোমাদের 'জু-গার্ডেনে' যেতে হবে—হপ্তায় দু'দিন করে 'এনিমল্' 'স্কেস্' কর্‌তে। প্রতি সোমবার আর বুধবারে

আমাদের 'জু'তে যেতে হ'ত।

একদিন সবাই বল্‌লে 'জু'তে একটা 'পিক্-নিক্' কর্‌তে হবে। এক বুধবারে খুব আয়োজন করে খাওয়া হ'ল। সেদিন কিন্তু কারও কাজ হ'ল না।

পর দিন ক্লাসে এলেই প্রিয়তোষ বাবু বল্‌লেন—"তোমাদের কাজ?"

সবাই এর ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌তে লাগলুম। কাল তো মজা করে 'পিক্‌নিক' করেছি কিন্তু আজ হয়ত বা ফাইন দিতে হয়!

হঠাৎ দেখি ননী গাঙ্গুলী দাঁড়িয়ে উঠেই বল্‌লে—"পেপারে পড়েন নি স্যার?"

ধীরে ধীরে মুখ তুলে প্রিয়তোষ বাবু বল্‌লেন, "কিহে কবেকার পেপারে?"

একটু এগিয়ে গিয়ে ননী বল্‌লে—"আজ্‌কের পেপারে স্যার!"

—"কি, কি খবর?"

—"ওঃ, তা হ'লে দেয়নি স্যার সে খবর, কিন্তু কি আশ্চর্য্য—!" ব'লে আমাদের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "দেখ্‌লে জীবু, দেখ্‌লে সতু, এত বড় ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা, উঃ—!"



—"আহা, কি খবর বলই না হে, তারপর দিয়েছে কিনা দেখ্‌বো।"

ননীর কাণ্ড দেখে আমাদের বড্ড হাসি পাচ্ছিল, চোখ টিপে ননী জানালে—খবরদার, হাস্‌লেই সব মরেছি! আমরা গম্ভীর হয়ে বললুম "তাইত!"

—"জু'য়ের খবর স্যার। এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল অথচ কাগজে দেয়নি! আশ্চর্য্য!" প্রিয়তোষ বাবু কাগজটা খুলে দেখে বল্‌লেন, "হ্যাঁ—'জু'তে একটা নূতন রয়াল টাইগার এসেছে কাল। এইত 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে' তার ফটো দিয়েছে।"

ফটোটা দেখেই ননী যেন শিউরে উঠল! "উঃ! বন্ধ করুন স্যার, বন্ধ করুন! ও ছবিটা আর দেখাবেন না। কিন্তু আর কিছু লেখেনি? সব গোপন করেছে স্যার। নূতন বাঘ আস্‌বে সে তো সবাই জানে আগে থেকেই, কিন্তু...।"

—"আবার কিন্তু কি হে?"

—"কি অদ্ভুত শক্তি ওর গায়ে স্যার! 'কেজ্' ভেঙ্গে দু'থাবায় দু' দু'টো লোককে স্যার—! উঃ, ভাগ্যিস্ আমরা সবাই মাথা নিচু করে শুয়ে পরেছিলুম। আমি বললুম ওটা নতুন জানোয়ার, ওটাকে Sketch করে কাজ নেই! তা ওরা সে কথা কেউ শুন্‌লে না। কি সে চীৎকার, আর কি সে রক্ত স্যার!"

—"রক্ত...?"

—"আর বলেন কেন স্যার, দু' দু'টো লোক..."

—"থাক্! থাক্! তোমাদের কারুর তো কিছু হয়নি!" ভয়ে তখন প্রিয়তোষ বাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে। সে দিনের 'জু' Sketch আর কারও দেখাতে হ'ল না। প্রিয়তোষ বাবু বল্‌লেন—"সাবধান, ওসব নতুন জানোয়ার টানোয়ার আর কোন দিন Sketch কর্‌তে যেওনা। যাও কাজ কর গিয়ে!"

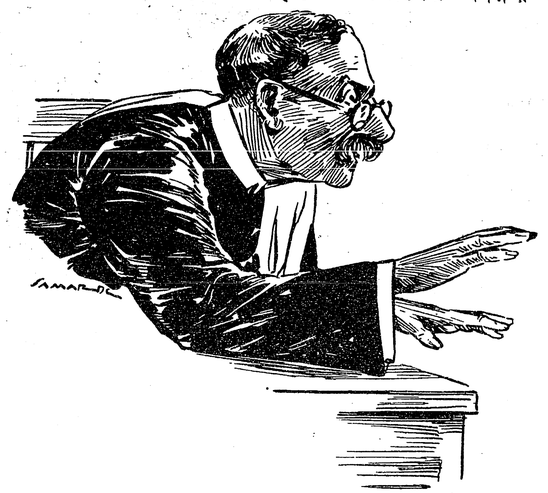

ননী গাঙ্গুলী ফিরে এলো। কিন্তু তখন আর কেউ হাসি চাপ্‌তে পারলুম না। সবাই হো হো করে হেসে উঠ্‌লুম। ব্যাপার বুঝে প্রিয়তোষ বাবু ভয়ঙ্কর রেগে গেলেন। আমি তোমায় ফাইন কর্‌বো ননী! দুষ্টু ছেলে কোথাকার!" কিন্তু তাঁরও এত হাসি পেল যে তিনি আর গম্ভীর হতে পারলেন না—হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন। সাবাস্ ননী, কি অদ্ভুত তোমার উপস্থিত বুদ্ধি, আর কি আশ্চর্য্য তোমার বলবার ঢং!

এম্-সি-সির খেলা

আগের বার তোমাদের এম্-সি-সির খেলার কথা কিছু ব'লেছিলাম। সেবার টেষ্ট-ম্যাচের কথাই বেশী ক'রে বলা হয়েছিল। এম্-সি-সি কলকাতায় এসে আর যে তিনটি খেলা খেলেছিল, তা'র দুটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য —

(১) বাংলাদেশের দেশীয় দলের সঙ্গে খেলা,

(২) An All-India XI এর (অর্থাৎ, একটি বাছাইকরা, দেশীয় এবং সাহেব মিলিয়ে দল) সঙ্গে খেলা। প্রথম খেলাটি আগে হয় এবং সেই খেলাতে বাঙালী খেলোয়াড় কার্ত্তিক বসু (নৃপেন্দ্রমোহন বসু এঁর আসল নাম; ডাক নাম কার্ত্তিক, তাই কাগজেও কার্ত্তিক বসু লেখা হয়) দেশীয় দলের হ'য়ে সব চেয়ে বেশী রাণ্ করেন এবং সকলের

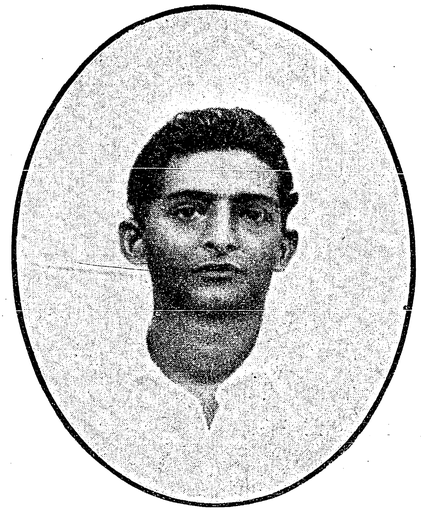

কার্ত্তিক বসু

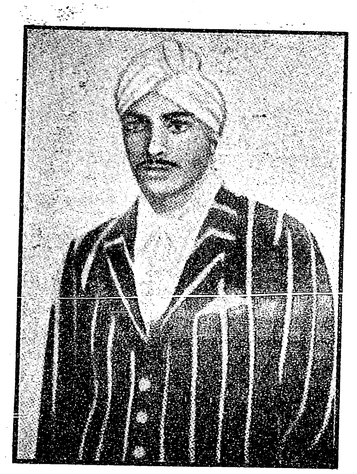

লাল সিং

চেয়ে ভাল খেলেনও (৪২ রাণ্)। বলা বাহুল্য, সে খেলাতে এম্-সি-সির জয় হয়। এর পরে All-India XI এর হয়েও কার্ত্তিক বসু খুব ভাল খেলেন। সে দিন তিনি প্রথম বারে ৩৮ রাণ্ করেছিলেন। এই খেলাতে আর একটি লোকের খেলা আমাদের খুব ভাল লেগেছিল—তিনি হলেন লাল সিং। যেমন বল ধরায় এবং ছুড়ে মারায় পটু, তেম্নি ব্যাট করেন সুন্দর! তিনি

সেদিন দৌড়ে বল ধ'রে কত যে বাউণ্ডারি বাঁচিয়েছিলেন, তা'র হিসাবই নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্ত্তিক বসু বা লাল সিং টেষ্টম্যাচে স্থান পান্ নি। লাল সিং মালয় দেশে থাকেন বলে নাকি তাঁকে ভারতবর্ষের হ'য়ে টেষ্ট ম্যাচ খেল্‌তে দেওয়া হয় নি ; অথচ তিনি ১৯৩২ সালে বিলাতে ভারতবর্ষের হয়ে খেলে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিলেন! আইন অনুসারে নাকি সেবার তাঁকে খেল্‌তে দেওয়াই ভুল হয়েছিল। আমরা অনেকেই আশা ক'রেছিলাম কার্ত্তিক বসুকে দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে নেওয়া হবে, কারণ তা'র আগের দুটি ম্যাচেই তাঁর খেলা খুব সুন্দর হয়েছিল। মারের জোর খুব বেশী না থাক্‌লেও তাঁর বল মারার কায়দা খুব সুন্দর এবং টিকে থাকার ক্ষমতাও (Defence) খুব ভাল।

এম্-সি-সি কলকাতা থেকে বেনারস যান। সেখানে ভিজিয়ানাগ্রামের কুমারের দলের সঙ্গে খেলা হয়। দিন তখন খারাপ ছিল ; অল্প অল্প বৃষ্টিও হচ্ছিল। খেলা হচ্ছিল ম্যাটিংএর উপর (অর্থাৎ, উইকেটের মাঝের জায়গা নারকেল দড়ির ম্যাটিং ঢাকা)। সেদিনকার খেলা বহুকাল স্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে। প্রথমে দেশীয় দল ব্যাটিং ক'রে ১২৪ রাণে আউট হয়ে যান। এম্-সি-সি ব্যাট ক'রে মাত্র ১১১ রাণ করেন। নিসার দারুণ বল দিয়ে ৬ জনকে ৬০ রাণে আউট করেন। এর পর দেশীয় দল আবার ব্যাট ক'রে ১৪০ রাণ করেন ; এম্-সি-সি ১৩৯ রাণ করেন। এবারও নিসার ৩ জনকে ৫৭ রাণে আউট করেন, আর সি, কে, নাইডু ২৪ রাণে ৪ জনকে আউট করেন। দেশীয় দল ১৪ রাণে এই খেলা জেতেন। এম্-সি-সির এই প্রথম হার।



নিসার

এর পর ইন্দোরে মধ্য-ভারতের দলের সঙ্গে খেলা হয় ; সে খেলাও 'ড্র' হয়। এই খেলাতেও সি, কে, নাইডু ৩৪ রাণে ৬ উইকেট নেন। নাইডুকে আমরা ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যান বলেই জান্‌তাম। এখন দেখা গেল, তিনি বোলারও বেশ ভাল।

ইন্দোর থেকে এম্-সি-সি নাগপুরে গিয়ে মধ্য-প্রদেশের সঙ্গে খেলেন। এই

খেলায় দেশীয় দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই অল্প বয়সের ছিলেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতাও কম। খেলায় এম্-সি-সির জয় হয়। সে খেলায় সি, কে, নাইডু খেলেছিলেন এবং ১০৭ রাণ করেছিলেন।

এর পর সিকান্দ্রাবাদে নবাব মৈনুদ্দৌলার দলের সঙ্গে খেলা হয়। এ খেলাও 'ড্র' হয়। মুস্তাক আলী এই খেলার প্রথম বারে (1st Innings) ৩৭ রাণে ৫টা উইকেট নেন। এম্-সি-সি এই বারে মোট ১১২ রাণ করেছিলেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী মান্দ্রাজে শেষ টেষ্টম্যাচ খেলা হয়। আমরা আশা করেছিলাম, ভারতীয় দল এবার খুব ভাল খেল্‌বেন। কিন্তু গোড়া থেকেই যেন বাধা সুরু হয়ে গেল। খেলার দু'দিন আগে নিসার পড়লেন জ্বরে—খেল্‌তে পার্‌লেন না। প্রথম ষ্টেটম্যাচে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোপালন্ আর নিসার বাদ পড়্‌লেন ; তাঁদের জায়গায় খেল্‌লেন পাতিয়ালার যুবরাজ আর নাজির আলি। এম্-সি-সি প্রথমবার ৩৩৫ রাণ কর্‌লেন ; অমর সিং সাতটা উইকেট নিলেন এবার, অমরনাথও দুইটা উইকেট নিলেন। আমাদের আশা হ'লো, এম্-সি-সি কম রাণে আউট হয়েছেন, দেশীয় দলের পক্ষে এটা সুবিধারই কথা। কিন্তু দেশীয় দল মাত্র ১৪৫ রাণ কর্‌লেন (মার্চ্চেণ্ট—২৬ রাণ, পাতিয়ালার যুবরাজ ২৪ রাণ)। ভেরিটি এইবারে দারুন বল দিয়েছিলেন। দেশীয় দলের নাউমল খেল্‌তে খেল্‌তে মাথায় চোট লেগে মাঠ থেকে চ'লে যেতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় বারে এম্-সি-সির ৭ জনে ২৬১ রাণ করার পর জার্ডিন সাহেব 'Declare' কর্‌লেন (অর্থাৎ, তাঁরা খেলা ছেড়ে দিয়ে অন্য পক্ষকে খেলতে বা ব্যাট্



পাতিয়ালার যুবরাজ

করতে দিলেন) ৪৫২ রাণ কর্‌তে পার্‌লে ভারতের জয় হয় ;—অসম্ভব কাজ ! অনেক চেষ্টায় ভারতীয় দল ২৭৯ রাণ কর্‌লেন । ২০২ রাণে এম্‌-সি-সির জয় হ'লো । দ্বিতীয় বারের খেলায় পাতিয়ালার যুবরাজ ৬০, দিলাওয়ার হোসেন ৩৬, আর অমর সিং ৪৮ রাণ করেন । এই ম্যাচে নাইডু একবারও ভাল খেল্‌তে পারেন নি—ব্যাটিং বা বোলিং কিছুই ভাল হয় নি । নাউমল দ্বিতীয় বারেও (2nd innings) মাজার আঘাতের জন্য খেল্‌তে পারেন নি ।

(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

বীরত্ব

(শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী — গ্রাহক নং ১২৮৮)

— অকল্পিত —

কলিকাল—গল্প বল্লেই মনে করে মিথ্যে ; আমি কিন্তু কলিযুগে জ'ন্মেও সত্যিকালের সত্যিটুকুকে হারাইনি ; যে যাই মনে করুক, আমি জানি, এ গল্পে মিথ্যে একটুও স্থান পায় নি ।

১

শ্মশান হ'তে একাই ফির্‌ছি—গ্রামের মেঠো পথ ধ'রে । আলো নেই হাতে, তায় কৃষ্ণ পক্ষের শেষ,—পথ চলাই দায় !

চারিদিকে নানা রকম গাছ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক ভূতের মত । আর হাওয়ায় যখন তা'দের পাতা খস্‌খস্‌ ক'রে উঠ্‌ছে তখন কেবলই মনে হচ্ছিল যে ঐ কালো কালো ভূতগুলো আমায় হাত নেড়ে নেড়ে ডাক্‌ছে,—তাদেরই গলার এই অস্ফুট আওয়াজ ।

মনকে কিছুতেই স্থির রাখ্‌তে পারছিলাম না । যদিও জানি ওটা গাছ, তবুও মনটা চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌ছিল । কেন, কিসের জন্য জানি নে ।

মাথা নীচু করে চল্‌ছিলাম ;—নানা রকম চিন্তা বাধাবিহীন গতিতে মনের দ্বারে এসে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল ।

এখন যদি ক্যাব্‌লার মা,—যা'কে এক্ষুণি পুড়িয়ে এলাম,—এসে সাম্‌নে দাঁড়ায় তো কী হয় ? এত ক'রে বললাম যে আমার সাথে কেউ আয় ;—কেউই এলো না । আবার ঠাট্টা কর্‌তে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করল না । আচ্ছা, একবার দেখে নেবো ওদের ।

খুব ছোট বেলায় গল্প শুনেছি, মানুষ ম'রে ভূত হয়, আর—যা'র ওপর তা'র রাগ থাকে, তা'কে মেরে ফেলে । ভূত কি সত্যিই এই পৃথিবীতে আছে ? আমি তো একদিনও দেখিনি ।

আচ্ছা, ক্যাব্‌লার মা তো ম'রে ভূত হ'লো, সে যদি এখন আমায় তাড়া করে ? সে তবে আমার সঙ্গে দৌড়ে কক্ষনো পারবেনা । সেদিন আমি যখন ওদের বাড়ীর গাছ থেকে পেয়ারা চুরী করে ছুট্‌ দিলাম, তখন তো সে আমার সঙ্গে দৌড়ে পার্‌লেই না । কিছুটা না এসে বক্‌তে বক্‌তে ফিরে' গেল । আমার ওপর কিন্তু তার খু-উ-ব রাগ আছে । আস্‌তেও পারে ।—এই রকম কত কথাই মনে হ'তে লাগ্‌ল, আর মনটাকে চঞ্চল করে তুলল ।

২

মুখ তুলেই দেখি—হাত দশেক দূরে ক্যাব্‌লার মা ঘোম্‌টা দিয়ে দাঁড়িয়ে আমায় ডাক্‌ছে ; আর তার আঁচলটা হাওয়ায় দুলে' দুলে' পত্‌ পত্‌ শব্দ করছে ।

তখন মনের যে কী অবস্থা হ'লো, তা আর কী বল্‌ব !—ভাষায় ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত । ভাব্‌লাম,—এতক্ষণ এই সব কথা ভাব্‌ছিলাম, তাই কি দেখ্‌তে কি দেখ্‌ছি । চোখ দুটো ভাল করে রগ্‌ড়ে' নিয়ে দেখলাম—সত্যিই ক্যাব্‌লার মা দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

মাথার চুল অবধি তখন খাড়া হ'য়ে উঠ্‌ল ভয়ে । হাতে ছিল সাড়ে তিন হাত এক লাঠি । কেমন পাগলের মত হয়ে গেলাম জানিনা ; ছুটে গিয়ে বসিয়ে দিলাম তার উপর এক ঘা লাঠি । মনে হ'ল সে যেন কোমর ভেঙ্গে মাটীতে প'ড়ে গেল । শব্দ হ'লো একটু অদ্ভুত রকমের, মানুষের গায়ে লাগ্‌লে ওরকম শব্দ হয় না । মনে কর্‌লাম,—এ ভূত, মানুষ তো নয় যে মানুষের মত শব্দ হবে !

তারপর যা একটা দৌড় দিলাম—এ-ক দৌড়ে একেবারে বাড়ীর ভেতর, পাঁচ মিনিটের আগেই !

সেবারে Flat Raceএ আমরা এই পথ দিয়েই দৌড়েছিলাম । বাড়ী অবধি

আস্‌তে আমার প-ন-র-টা মিনিট লেগেছিল।

আমি হলফ্‌ ক'রে বল্‌তে পারি যে সেই দৌড় যদি একবার দিতে পারি, তা' হ'লে নিশ্চয়ই World-Record beat কর্‌তে পার্‌ব।

৩

বাড়ী পৌঁছে আর দাঁড়াতে পার্‌লাম না। শরীর তখন অবশ, শুয়ে পড়লাম সেখানেই। বাড়ী শুদ্ধু লোক অবাক্‌!—হঠাৎ এমন ভাবে দৌড়েই বা এলো কেন, আর শুয়েই বা পড়লো কেন?

কথা বলার শক্তি ফিরে' এলে সব কথাই খুলে' বললাম। সকলে তো হেসেই আকুল।

আমি বল্লাম, "সে দৃশ্য দেখ্‌লে তোমাদের হাসি কান্নায় পরিণত হ'ত।" তাঁরা আমায় নিয়ে চল্লেন সেখানে—ব্যাপারটা কি দেখ্‌বার জন্যে।

সেখানে পৌঁছে' আলোটা তুলে' দেখল,—একটা কলাগাছ, মধ্যিখান্‌টা ভাঙ্গা প'ড়ে রয়েছে পথের ওপর; আমার লাঠিটাও সেখানে বিরাজ কর্‌ছে।

তারা তো হেসে রাস্তায় গড়িয়ে পড়লেন। আমি বল্লাম,—ক্যাব্‌লার মা কী এতই বোকা, যে তোমাদের অপেক্ষায় বসে রইবে? আমার ওপর তা'র রাগ ছিল, তাই আমায় ভয় দেখা'তে এসেছিল। আমি কি অতো ভয় পাবার ছেলে? দিয়েছি কোমরে এক ঘা বসিয়ে, অমনি গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে!

একবার মনে হ'ল,—শেষে কি এই কলাগাছটা দেখেই অত ভয় পেলাম!

—*—

গল্প-স্বল্প

বিরাট পাতা—পরের পৃষ্ঠায় ছবিতে দেখ, একটি ছেলে কেমন দিব্য নিশ্চিন্তে একটা পদ্ম পাতার উপর ব'সে আছে। পাতাটি এত বড় যে ২।৩টি ছেলেও অনায়াসে তা'র উপর ব'সে থাক্‌তে পারে।

এই পদ্মের নাম ভিক্টোরিয়া রিজিয়া। এর ফুলেরও একটা ছবি দিলাম।

ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার পাতার তলার দিকে মোটা মোটা শিরা থাকায় পাতাগুলি বেশ মজবুত হয় আর ভার সইতে পারে।

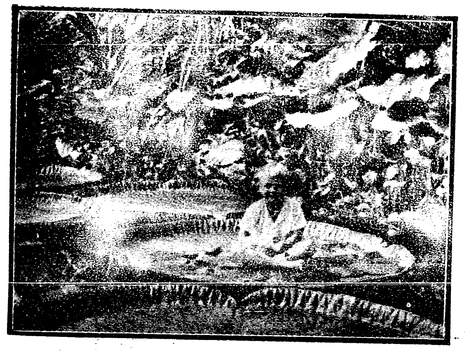

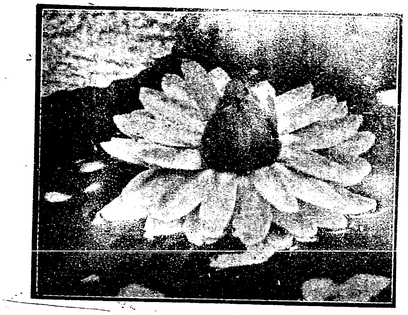

বিরাট ঘড়ি—ছবিতে যে বিরাট ঘড়িটা দেখ্‌ছ, সেটার ডায়াল ছয়-তলা বাড়ীর সমান বড়। জাপানে একটি দোকানের সা ম্নে ঘড়িটি লা গা ন হ য়ে ছে। ডা য়া লে র ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যাগুলি সবই জাপানী ভাষায় লেখা; কেবল ১২ লেখাটি ইংরাজীতে। বোধ হয় বিদেশী লোকেরাও যা'তে ঘড়িটি দেখ্‌তে পারে সেই জন্য ঐ সংখ্যাটি ইংরাজিতে লেখা হয়েছে। এই প্রকাণ্ড ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটি ১৮ হাত লম্বা।

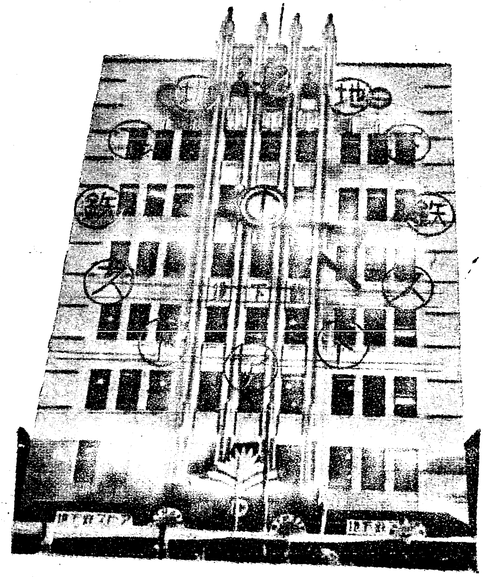

কাগজের ঠোঙায় দুধ—আজকাল আমেরিকা আর জার্ম্মেনীতে কাগজের ঠোঙায় দুধ বিক্রী করা হচ্ছে। এই ঠোঙা এক রকমের কাগজ দিয়ে



তৈরী হয়, যা'র ভিতর দিয়ে দুধ একটুও গ'লে ঝ'রে পড়্তে পারে না। কল থেকে ঠোঙায় দুধ ভরা হয়, ঠোঙাও সেই কলেই তৈরী হয়—মানুষের হাতের সঙ্গে কোন ছোঁয়াছুঁয়ি হয় না। দুধ অন্য পাত্রে ঢেলে নিয়ে ঠোঙাটি ফেলে দিলেই হ'লো।

আরামে সাইকেল চালান—ছবিতে যে সাইকেলটি দেখ্ছ এতে চ'ড়ে কেমন আরামে হেলান দিয়ে চালান যায় দেখ। হাতের কাছে হ্যাণ্ডেল, কাজেই কোন ভাবনা নেই। পা দুটি লম্বা ক'রে বাড়িয়ে দিয়ে পেডাল চালা'তে হয়। বস্‌বার ব্যবস্থাটিও খুব আরামের।



ধাঁধার উত্তর

১। **চশমা**—কেমন ভাবে এক টানে চশমাটি আঁকতে হবে তা পাশের ছবিতে দেখান হ'লো।

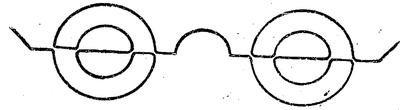

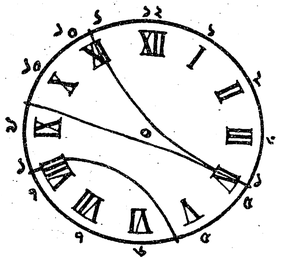

২। **ঘড়ির ডায়েল**—ঘড়ির ডায়েলটি পাশের ছবির মত ৪ অংশে ভাগ করলে সব অংশের রাশিগুলির যোগফলই সমান হবে।

নূতন ধাঁধা

১। তেলের পিপা—এক দোকানদার নিলাম থেকে ৬ পিপা তেল কিনল, তাদের ৫টা পিপায় নারিকেল তেল এবং একটায় তিল তেল ছিল। সে তখনই কতকটা নারিকেল তেল একজনকে বিক্রি করল, এবং পরে আর একজনকে তার দ্বিগুন তেল বেচে দিল। বাকি কেবল তিল তেলটা সে নিজের জন্য রেখে দিল।



প্রতি পিপায় কত সের তেল ছিল তা তাদের গায় লেখা ছিল, কিন্তু কোন্ পিপায় কি তেল তার কোনই উল্লেখ ছিল না। দোকানদারও মুখ বন্ধ অবস্থাতেই পিপাগুলি বেচেছিল, তাদের মধ্যে কি তেল আছে পরখ করার সুবিধা পায় নাই। তোমরা বলত কোন্ পিপায় তিল তেল ছিল।

২। উনপঞ্চাশ তারা—

পাশের ছবিতে ৪৯টি তারা সাজান আছে। একটা কাল তারা থেকে আরম্ভ করে, সোজা লাইন দিয়ে সব তারাগুলি কেটে, অন্য কাল তারায় গিয়ে পৌঁছাতে হবে। পাশের ছবিতে ১৫টি সোজা লাইনে তারাগুলি কেটে দেখান হয়েছে। তোমরা কি কেউ ১২টি সোজা লাইনে সবগুলি কাটতে পার? এক সোজা লাইনে এসে অন্য দিকে বাঁকতে হ'লে একটা তারার উপর থেকে বাঁকতে হবে। ছবির মত তারাগুলি এঁকে নিয়ে পেনসিলের দাগ দিয়ে দেখাতে পার।

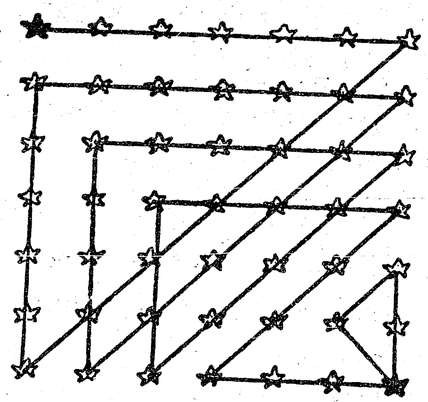

জ্ঞান ও
শিক্ষার নির্ঝর



ছেলেদের
সচিত্র — — মাসিক
মোহন বেণু



পরিচালক
শ্রীদেবীকুমার গোস্বামী, এম. এ.

কার্য্যালয়
আর, জি, কর রোড্
শ্যামবাজার, কলিকাত

১লা বৈশাখ
বাহির হইবে

বার্ষিক মূল্য
৩৲

ছাত্রদের জন্য
সুলভে ২৷৷০

প্রতি সংখ
৷০

কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

COLOURED DOCUMENT.

মোহন বেণু

সাহিত্যের

আসরে

শিশুদের

প্রাণে

জাগাইবে

নূতন

উদ্দীপনা

মোহন বেণু

এক	সুধাদীপ	সাধুসন্তদের বাণী
দুই	প্রাচীন কথা ও কাহিনী	
তিন	বিজ্ঞান-জগৎ	
চার	অ্যাড্‌ভেঞ্চার	দুঃসাহসিকতার গল্প
পাঁচ	কবিতা-কুঞ্জ	
ছয়	মানুষের সাধনা	মনীষীদের জীবন কথা, ভক্ত ও বীর-চরিত
সাত	যাদুঘর	বিচিত্র-বার্ত্তা
আট	সর্ব্ববাদী	খেলাধূলা, আর্ট (শিল্পকলা), হাসি-কৌতুক ইত্যাদি
নয়	উপন্যাস	গল্প ও রূপকথা
দশ	দুনিয়ার খবর (Childrens' World-News)	

—দেশনায়কগণের অভিমত—

যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য

দেশপূজ্য
৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির
অভিমত

"আমি মিঃ এইচ, বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে ইহাই ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।"

স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জননেতা
লালা লাজপৎ রায়ের
অভিমত

"আমি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি মিঃ এইচ, বসুর "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" বাস্তবিক ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধ অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"

স্বাঃ লালা লাজপৎ রায়

কেশতৈল—কুন্তলীন, কোকোলীন, ম্যাকেসার, চামেলীন প্রভৃতি।

হেয়ার লোসন—দেলখোস, দিলতোষ, হার্টস্ ডিলাইট, প্রভৃতি।

পমেটম—দেলখোস পমেড, গোলাপ ও বকুল পমেটম প্রভৃতি।

এসেন্স—দেলখোস, হোয়াইট রোজ, অপরাজিতা, বকুল, মাস্ক, যুঁই, বেলা, চামেলী, খস, অরিগ্যান প্রভৃতি নানা সিরিজের বিবিধ প্রকার সুগন্ধি।

নানাবিধ অটো, হেয়ারওয়াস, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, লাইম যুস ও গ্লিসারিন ক্রীম এবং স্নো প্রভৃতি।

সাবান—হোয়াইট রোজ, চন্দন, খসখস, মাস্ক, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ ফলের সিরাপ।

এইচ, বসু, পারফিউমার,
৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বিশ্ববরেণ্য
রবীন্দ্রনাথ
বলেন

"কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহারে একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক
৺ মতিলাল নেহেরুর
অভিমত

"ভারতবর্ষের প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এইচ, বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

COLOURED DOCUMENT.

Regd. No. C 700.

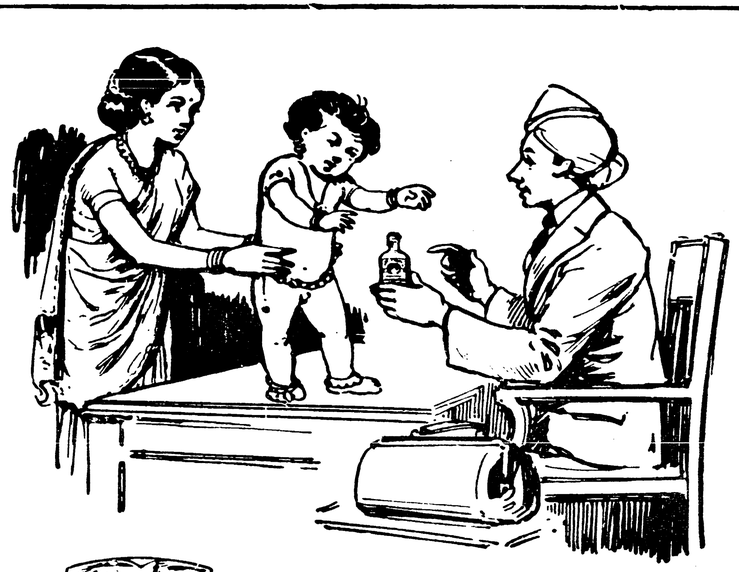



উড্ ওয়ার্ডের

গ্রাইপ ওয়াটার

চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

ইহা শিশুদিগকে সুস্থ রাখে।

WOODWARD'S
GRIPE WATER

WW 13 111

W. WOODWARD LTD., LONDON, ENGLAND

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

সন্দেশ

চৈত্র, ১৩৪০

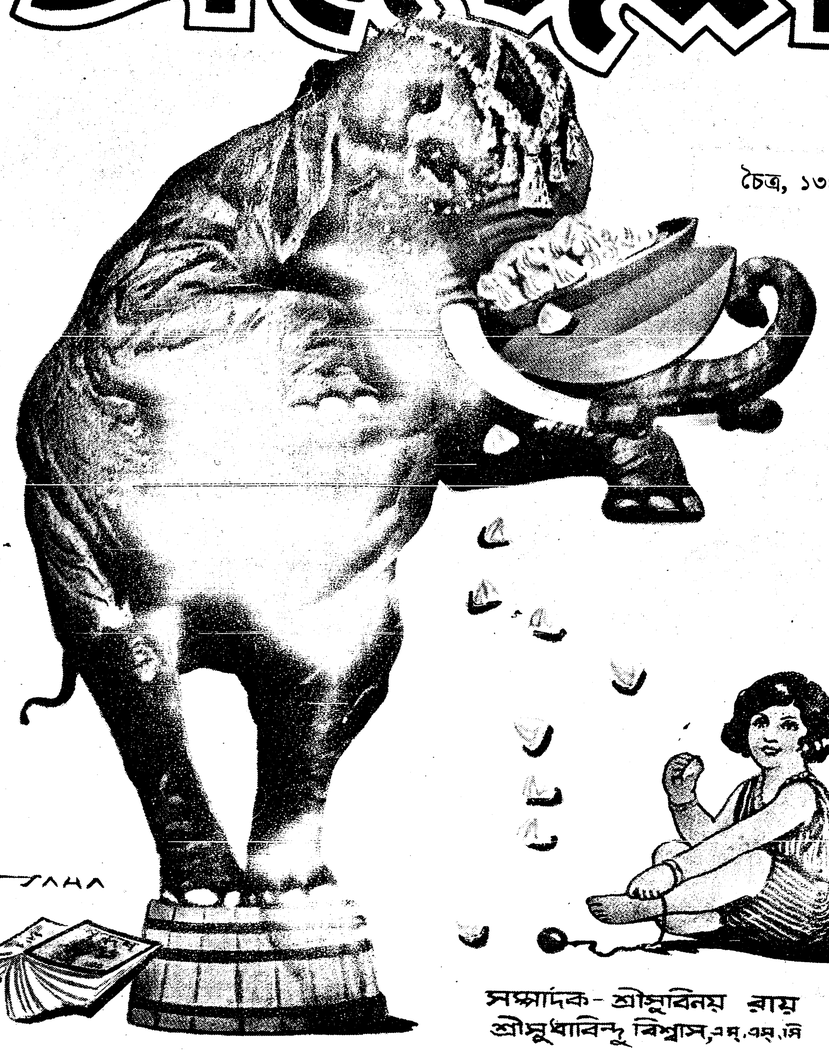

সম্পাদক - শ্রীসুবিনয় রায়
শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম্, এস্, সি

বার্ষিক ২৷৷৵০ আনা

প্রতি সংখ্যা ।৹ আনা

COLOURED DOCUMENT.

—দেশনায়কগণের অভিমত—

যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য

দেশপূজ্য
৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির
অভিমত

"আমি মিঃ এইচ, বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে ইহাই ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।"

স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জননেতা
লালা লাজপৎ রায়ের
অভিমত

"আমি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি মিঃ এইচ, বসুর "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" বাস্তবিক ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধ অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"

স্বাঃ লালা লাজপৎ রায়

কেশতৈল—কুন্তলীন, কোকোলীন, ম্যাকেসার, চামেলীন প্রভৃতি।

হেয়ার লোসন—দেলখোস, দিলতোষ, হার্টস্ ডিলাইট, প্রভৃতি।

পমেটম—দেলখোস পমেড, গোলাপ ও বকুল পমেটম প্রভৃতি।

এসেন্স—দেলখোস, হোয়াইট রোজ, অপরাজিতা, বকুল, মাস্ক, যুঁই, বেলা, চামেলী, খস, অরিগ্যান প্রভৃতি নানা সিরিজের বিবিধ প্রকার সুগন্ধি।

নানাবিধ অটো, হেয়ারওয়াস, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, লাইম যুস ও গ্লিসারিন ক্রীম এবং স্নো প্রভৃতি।

সাবান—হোয়াইট রোজ, চন্দন, খসখস, মাস্ক, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ ফলের সিরাপ।

এইচ, বসু, পারফিউমার,
৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বিশ্ববরেণ্য
রবীন্দ্রনাথ
বলেন

"কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহারে একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক
৺ মতিলাল নেহেরুর
অভিমত

"ভারতবর্ষের প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এইচ, বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ছেলেমেয়েদের সুন্দর উপহারের বই

এই বইগুলি ছেলেমেয়েদের যে কত প্রিয় তা এদের এতগুলি সংস্করণ থেকেই বোঝা যায়। সরল সুন্দর লেখায়, চমৎকার চমৎকার ছবিতে, ঝরঝরে ছাপায়, বইগুলি ছেলে মেয়েদের বিশেষ উপযোগী।

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

ছেলেদের রামায়ণ

এরূপ সুন্দর ভাবে সরল ভাষায় বইখানি লেখা যে ইহার মত ছেলেমেয়েদের রামায়ণ আর নাই। ৮ খানি হাফটোন ছবি, ১ খানি রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

২০শ সংস্করণ। দাম ॥৵০

ছেলেদের মহাভারত

এখানিও ছেলেমেয়েদের একখানি অতুলনীয় বই। মহাভারতের মূল গল্প উপেন্দ্র বাবুর সুন্দর সরস ভাষায় লেখা। ৮ খানি হাফটোন ছবি, কয়েকখানি অন্যান্য ছবি, ১ খানি রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

১৮শ সংস্করণ, দাম ১॥০ টাকা

টুনটুনির বই

ছেলেমেয়েদের অতি সুন্দর গল্পের বই। ২৭টি চমৎকার গল্প, ৩০ খানি মজাদার ছোট ছবি, ও রঙ্গিন মলাট।

১১শ সংস্করণ, দাম ॥০ আনা

৺সুকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

আবোল তাবোল

পাতায় পাতায় হাসি, পাতায় পাতায় মজার ছবি! মোটা কাগজে সুন্দর ছাপা, চমৎকার রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট। ছেলে-মেয়েদের উপহারের এমন বই আর নাই।

৪র্থ সংস্করণ। দাম ৸৵০

হ-য-ব-র-ল

নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এমন মজার বই খুব কম। পড়িতে পড়িতে হাসির চোটে পেটে খিল ধরিবে। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বই। রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট, সুন্দর ঝকঝকে ছাপা।

দাম ।৵০ আনা।

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

গল্পের বই

২০টি মজার গল্প, ১৬ খানি সুন্দর হাফটোন ছবি। ১ খানি রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট।

৯ম সংস্করণ। দাম ॥৵০

আরো গল্প

১৫টি সুন্দর গল্প, ১৬ খানি চমৎকার হাফ-টোন ছবি। ১ রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

৮ম সংস্করণ। দাম ॥৵০

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

COLOURED DOCUMENT.

"সন্দেশ"এর নিয়মাবলী

আশ্বিন হইতে "সন্দেশ"-এর বৎসর আরম্ভ হয়।

"সন্দেশ"-এর বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৷৶০ ; প্রতি সংখ্যা ।০ আনা। চার আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

ভিঃ পিঃ খরচ আলাদা। টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়াই ভাল।

সন্দেশ মাসের ১লা বাহির হয়। কোন গ্রাহক সময়মত সন্দেশ না পাইলে, ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। তাহার পরে প্রতিখানার আলাদা দাম লাগে।

চিঠিপত্র, টাকা পয়সা, লেখা প্রভৃতি সবই নীচের নামে পাঠাইবেন। অন্য নামে পাঠাইলে অসুবিধা হয়।

ম্যানেজার, "সন্দেশ"

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রত্নেশা

যখন

প্রথম বের হয়

তখন

সন্দেশের গ্রাহকেরা

কিনেছিল সকলেই।

প্রথম সংস্করণ কয়েক খণ্ড

এখনও আছে।

নতুন গ্রাহকেরা সত্বর হও।

দাম একটাকা

ইউ রায় এণ্ড সন্স,

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুভা (সচিত্র)

শ্রীসুখলতা রাও প্রণীত

ছেলেমেয়েদের একখানি নূতন ধরণের নাটক।

খেলাচ্ছলে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, নানা নীতিকথা এমন চমৎকার সুললিত ভাষায় লেখা যে পড়তে বস্‌লে শেষ না ক'রে উঠা যায় না।

দাম ।৶০ ছয় আনা।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চৈতী-সাঁঝে	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	২৭৭
মুঘল সম্রাট বাবর ও গুরু নানক	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	২৭৯
দোল-পার্ব্বণী	শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী ...	২৮১
খেলা	শ্রীসুবিনয় রায় ...	২৮৮
কেরানী	শ্রীহিমাংশুভূষণ সেন গুপ্ত ...	২৯৩
হানাবাড়ী	শ্রীননীগোপাল মজুমদার ...	২৯৪
ব্যাধ বালক	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩০২
কালা	... ...	৩০৭
বিনিপয়সার ভোজ	শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩০৮
বোধ হয় বিদ্যালয়	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ ...	৩১০
মূখ সাথী	কুমারী হামিদা হোসেন ...	৩১৩
গল্প-স্বল্প	... ...	৩১৭
ধাঁধার উত্তর	... ...	৩২০
নূতন ধাঁধা	... ...	৩২১

বাঁধানো "সন্দেশ"

পূর্ব্বের কোন কোন বৎসরের বাঁধানো সন্দেশ এখনো আছে—

১৩২৭, ১৩২৮, ১৩২৯ ও ১৩৩০ সাল —প্রতিখণ্ড, ১৷৷০

নব পর্য্যায়, ১ম বর্ষের (১৩৩৮-১৩৩৯) বাঁধানো সন্দেশ—৫৮০ পৃষ্ঠার প্রকাণ্ড বই—১৭ খানি রঙিণ ছবি, এবং ৩০০ খানির বেশী ১-রঙা ছবি—দাম ২৲ টাকা

সন্দেশ কার্য্যালয়—১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

COLOURED DOCUMENT.



প্রত্যেকদিন তোমাদের রুমালে ব্যবহার করবার জন্যে

'ইরা'র মত এমন সুন্দর অথচ দামে কম

— সুগন্ধি বাজারে আর নাই —

চমৎকার বাক্সে, সুমনোহর কাচের শিশিতে থাকে

* *
*

বেঙ্গল কেমিক্যাল, কলিকাতা

U. RAY & SONS

for

THE BEST QUALITY PROCESS BLOCKS —

HALFTONE, LINE,
DUO-TONE AND
3-COLOUR BLOCKS
OF ALL VARIETIES.

and

THE HIGHEST CLASS OF ART, COLOUR, AND GENERAL PRINTING

in

ENGLISH, BENGALI,
ASSAMESE, HINDI,
AND ORYIA, ETC.

***Office:*—117-1, Bowbazar Street, Calcutta.**

PHONE : B.B. 2211 TELE : "RAYTONE". CALCUTTA.

COLOURED DOCUMENT.

ডোঙ্গরের বালামৃত

বালকবালিকার পক্ষে যথার্থই অমৃততুল্য।

ইহা শিশুদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরে বলসঞ্চার করে। ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক। ইহা পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাশি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট; অনেকের ধারণা ইহা 'ফুড' বিশেষ। বস্তুতঃ ইহা অতি উপাদেয় সুমিষ্ট ঔষধ। বর্দ্ধনশীল শিশুদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা চলে।

মূল্য প্রতি বোতল এক টাকা মাত্র।
সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটর—

কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং
BOMBAY, Girgaon.

DONGRE'S
BALAMRIT



IDEAL TONIC FOR CHILDREN.

"গন্ধরাজ" এমন সুন্দর যে দেখলেই কিনতে ইচ্ছা করে।

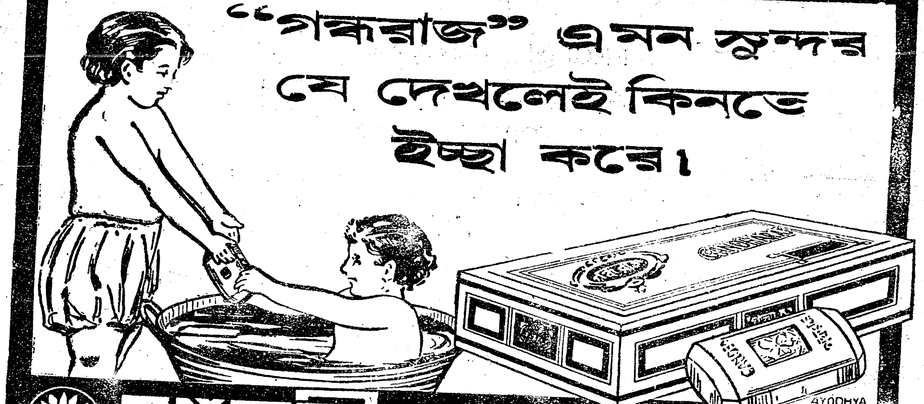

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্

ধূলো বালি ঘাঁটা ছেলেদের স্বভাব।



ধূলাবালি থেকে নানা রকম সংক্রামক চর্ম্মরোগের সৃষ্টি হয়। ছেলেপিলেদের গা হাত পরিষ্কার করতে ও স্নান করাতে

মার্গো সোপই

সব চেয়ে ভাল। এতে বীজাণু নষ্ট হয়, অথচ অন্য ওষুধযুক্ত সাবানের মত গা জ্বালা করে না।

ছোটদের নরম শরীরের জন্য স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর ফেনাযুক্ত মার্গোসোপই উপযোগী; মার্গো-সোপ সুন্দর গন্ধযুক্ত ও ব্যবহারে আরামদায়ক।

ক্যালকেমিকো'র

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট—সর্দ্দিজ্বরের জন্য।
মাগুয়েণ্টাম—ঘা পাঁচড়ার জন্য।
টাইকোসোডা ট্যাবলেট—অম্বল ও পেটফাঁপা প্রভৃতিতে।

ছেলেমেয়েদের ঘরে সব সময় রাখা দরকার—বিশেষ করে শীতের দিনে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড।

COLOURED DOCUMENT.



COLOURED DOCUMENT.



সত্যবানের মৃত্যুর পর সাবিত্রী যমের অনুগমন করিতেছেন

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক অঙ্কিত)



নবপর্য্যায়
৩য় বর্ষ

চৈত্র, ১৩৪০

৭ম সংখ্যা

চৈতী-সাঁঝে

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

বাব্‌লা বনে চাঁদ উঠেছে
চৈতী-সাঁঝে রে,
পাতায় পাতায় রিমি ঝিমি
সেতার বাজে রে ;—
চাঁদ উঠেছে চাঁদ,—
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে আলোর আশীর্ব্বাদ।

বাব্‌লা বনের একটি কোণে
আগুন লেগেছে,—
চকোর ছিল অঘোর ঘুমে,
হঠাৎ জেগেছে ;
চাঁপার ডালে শোন্,—
কাঁপা-গলায় কোকিল ডাকে, আকুল হোল মন।

COLOURED DOCUMENT.

আকাশ বেয়ে আস্‌লো নেমে
জ্যোৎস্না এবারে,—
রোশ্‌নায়ে রাত উজল্ হোল,
বোস্ না এ ধারে ;
আমার দাওয়ায় আয়,—
হাওয়ায় হাওয়ায় দেখ্‌বি কেমন প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

ঝোপের তলে জোনাক্ মেয়ের
প্রদীপ জ্বলেছে,—
বাঁশের ঝাড়ে ঝিঁঝির ঝাঁঝর
বেজেই চলেছে ;
বাতাস বয়ে যায়,—
ধানের ক্ষেতে গান জেগেছে,—শুন্‌বি যদি আয়।

আল্‌পনা কে আঁক্‌লো আজি
বাব্‌লা তলেতে,
শাপ্‌লা বনে কাঁপ্‌ছে আলো
দীঘির জলেতে ;—
চৈতী-সাঁঝে ভাই,
আলোর ঝোরায় ভর্‌লো ভুবন, দেখ্‌ছি বসে তাই।



মুঘল সম্রাট বাবর ও গুরু নানক

(শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত)

গুজ্‌রনওয়ালা জেলায় এমিনাবাদ। এই এমিনাবাদে—সে অনেক দিন আগে গুরু নানক ভাই লালু নামে একজন সূত্রধরের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। ভাই লালু গরীব হইলেও ছিল সাধু এবং সজ্জন। এজন্যই নানক এখানে আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। এসময়ে মুঘল সম্রাট্ বাবর আসিয়াছিলেন ভারত বিজয়ে। বাবর এমিনাবাদ আক্রমণ করিলে পর, এখানকার লোকেরা খুব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। বাবর এজন্য এমিনাবাদের লোকদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।

বাবরের সৈন্যেরা অতি নির্দ্দয়ভাবে নগরবাসীদের হত্যা করিল, তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল, বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিল—এইরূপ অত্যাচারে এমিনাবাদের লোকেরা একান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

এই ভীষণ যুদ্ধে অল্প সংখ্যক লোকেরই প্রাণ রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গুরু নানক ও তাঁহার অনুচর মর্দ্দানা বাঁচিয়াছিলেন। নানক ও মর্দ্দানা এ নগরের অধিবাসী নন্ বলিয়াই বাবরের সৈনিকেরা তাহাদিগকে হত্যা করে নাই। তাহাদের দুইজনকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। বন্দী অবস্থায় দু'জনের উপর দু'রকমের কাজের ভার পড়িল। গুরু মাথায় বোঝা বহন করিতেন আর মর্দ্দানার একটা ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করিতে হইত।

নানক কিন্তু বন্দী অবস্থায়ও এতটুকু দুঃখিত হইলেন না। তিনি কয়েদ-খানায় বন্দী থাকিয়া মনের আনন্দে ভজন গাহিতেন আর মর্দ্দানা বাজাইত তাহার রবাব যন্ত্র।

কারাগারের প্রহরীরা দেখিত—মর্দ্দানার ঘোড়া আপনা আপনি তাহার পিছুপিছু ছুটিয়া আসে, আর নানকের মাথার বোঝা আপনা আপনি তাঁহার মাথার উপর দিয়া যেন শূন্য পথে চলে—মনে হয়, নানক যেখানে যান, বোঝাটিও সেখানে যায়।

প্রহরীরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কয়েদখানার কোতোয়ালকে এই

আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখাইল, কোতোয়াল এই কথা সম্রাটের গোচর করিলেন। বাবর এমিনাবাদ সহরাদি ধ্বংস হওয়ায় দুঃখিত ছিলেন—যে সহরে গুরু নানকের মত সাধু মহাপুরুষ আসিয়া বাস করিতেছিলেন সেই সহর ধ্বংস করা ত ঠিক হয় নাই। একদিন তিনি গুরু নানককে দেখিবার জন্য কারাগারে আসিলেন।

সম্রাট্ দেখিলেন—কয়েদীরা হাসিমুখে নানা কাজ করিতেছে। কেহ যাঁতা ঘুরাইতেছে, কেহ শস্য মড়াইজাত করিতেছে, আর গুরু নানক নয়ন মুদিত করিয়া পড়িয়া আছেন। একটি যাঁতার উপর তিনি হাত রাখিয়াছেন, আর যাঁতা যেন আপনা হইতেই ঘুরিতেছে।

বাবর নানককে জাগাইতে চাহিলেন কিন্তু পারিলেন না। গুরু স্ত্রীলোকদের ক্লেশ দেখিতে পারিতেছিলেন না। বন্দিনী স্ত্রীলোকদের কারাক্লেশ তাঁহার অন্তরে ব্যথা দিতেছিল। আরা যুদ্ধে যাহারা প্রাণ হারাইয়াছে তাহাদের দুঃখে তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গাহিতে লাগিলেন,—"হে দয়াল প্রভু! তুমি চিরদিন মানুষের কল্যাণ করিয়া আসিতেছ, তুমি তাহাদিগকে দুঃখ ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতেছ। দয়াল, তুমি এই বন্দী নর-নারীদিগকে মুক্ত কর!—মুক্ত কর!" এইরূপ প্রার্থনা করিবার সময় তাঁহার চক্ষু দিয়া অজস্রধারে জল পড়িতেছিল।

বাবর নানকের এই প্রার্থনা শুনিয়া বিচলিত হইলেন। মানুষ এমন করিয়া পরের জন্য কাঁদিতে পারে? যে পারে সে ত মানুষ নয়, দেবতা! বাবর কহিলেন—"মহাপুরুষ, আমি আপনার নিকট মার্জ্জনা চাই। বলুন, আমি আপনার তৃপ্তির জন্য কি করিতে পারি। আমি ইচ্ছা করি আপনি আমার কিছু দান গ্রহণ করেন।"

গুরু বলিলেন,—"বাদশাহ! আমার ত কিছুই প্রার্থনীয় নাই।" বাবর বলিলেন—"আপনি যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা না করেন তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

তখন নানক বলিলেন—"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই নিরীহ পুরুষ ও নারী বন্দীদিগকে মুক্তি দিন।" বাদশাহ তাহাই করিলেন।

বন্দী ও বন্দিনীরা সকলে হাসিমুখে গুরুজীর জয় ও বাদশাহের জয় রবে চারিদিক ধ্বনিত করিয়া চলিয়া গেল।

এইবার বাবর বলিলেন—"আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন্।"

গুরু বলিলেন—"বাদশাহ, তুমি ভারতবর্ষে যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলে তাহা বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। তুমি সর্ব্বদা ন্যায়পথে চলিবে, সাধু ও সজ্জনের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে কখনও ভুলিও না।"

বাবর নতমস্তকে নানককে অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন—"আপনি মুক্ত, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন।" নানক ভজন গাহিতে গাহিতে রাজপথ দিয়া চলিলেন আর মর্দ্দানা রবাব বাজাইতে বাজাইতে তাঁহার অনুসরণ করিল।

—*—

দোল-পার্ব্বণী

(শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী)

প্রথম দৃশ্য

[সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ছোট একটি ঘরের মধ্যে কয়েকটি ছেলে বসে বসে পরামর্শ করছে]

বেণু। পরশু যে দোল, সেটা খেয়াল আছে তোদের?

মানু। বা রে, একথা কে না জানে? বয়সে বড় বলেই বেণুদা মনে করে···

কালু। থাম্। মানুটা ভারী ভেঁপো হয়েছে। এখন কাজের কথা হোক। দোল তো এসে গেল, কিন্তু পিচকিরী, রং এসব কিছুই এবার আসে নি।

টুনু। কেন, গতবছরের পিচকিরীই তো রয়েছে।

বেণু। পিচকিরী নয় রইল, রং খেলবে কি দিয়ে?—নর্দ্দমার জল দিয়ে?

মানু। কেন, ঠাকুর্দ্দা রংএর পয়সা দেবেন।

টুনু। দিলে তো! বাবা—একহাজার পাকা চুল তুললে তবে একটা পয়সা পাওয়া যায়!

কালু। একহাজার চুল কি ঠাকুরর্দ্দার মাথায় আছে? আছে তো মস্ত বড় তেলালো টাক, ঠিক বেলের মতন।

বেণু—থাক না থাক, আমাদের পয়সা আদায় করতেই হবে। চল সকলে মিলে ঠাকুর্দ্দার কাছে যাই। মেজ কাকুও এবার নেই যে পয়সা দেবে।

টুনু—সব চুপ্! ঠাকুর্দ্দা আস্‌ছে—ঐ খড়মের ঠক, ঠক, শব্দ।

[একটা লণ্ঠন হাতে, খড়ম পায়ে ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ —ঠাকুর্দ্দা আসতেই সকলে এক সঙ্গে, ঢিপ্ ঢিপ করে মাটিতে মাথা ঠুকতে সুরু করে দিল।]

ঠাকুর্দ্দা—সর্‌রে সর। হঠাৎ এত ভক্তি কেন?

সকলে—কেন, অমনি বুঝি ঠাকুর্দ্দাকে প্রণাম করতে নেই?

ঠাকুর্দ্দা—বেশ, বেশ! আসল মতলবটা বল্ দিকি, একটা গল্প চাই, না?

বেণু—পরশু দোল···!

ঠাকুর্দ্দা—তা হয়েছে কি?

সকলে—রং কিনে দিতে হবে আমাদের।

ঠাকুর্দ্দা—ভ্যালা আপদ, রংএ কি হবে?

কালু—তোমার গায়ে দেব।

ঠাকুর্দ্দা—বটে! আমার পয়সার রং আমার গায়ে দেওয়া? কখনও দেবনা।

টুনু—পাকা চুল তুলে দেব।

বেণু—পা টিপে দেব।

কালু—তামাক সেজে দেব।

ঠাকুর্দ্দা—ভারী স্যায়না ছেলেমেয়ের দল দেখছি! যত অকাজের কাজ। সন্ধ্যে বেলায় আড্ডা দেওয়া হচ্ছে, পড়াশোনা কি মাথায় উঠেছে! রাতদিন খালি হৈ হৈ! এই টুনি যা, বই নিয়ে পড়।

টুনি (বই বার করে পড়তে লাগল)—টিয়া পাখীর ঠোঁটটি লাল,
ঠাকুরদাদার শুকনো গাল।···

ঠাকুর্দ্দা—আমার গাল শুকনো, না? আর তোদের গাল ভারী ভরাট, না?

টুনু—তা, আমি কি কোরব, বইতে রয়েছে যে।

ঠাকুর্দ্দা—ফেলে দে ও বই।

টুনু (আনন্দে বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে)—ভালই হ'ল পড়তে হবে না। (প্রস্থান)

ঠাকুর্দ্দা—আচ্ছা বেণু মুখস্ত বলতো, Twinkle, Twinkle, little, ···

বেণু — Twinkle, Twinkle, little Cat
How I wonder, you grow so fat.

Up above the shelf so high,
Eat ঠাকুর্দ্দার দুধটুকু ভাই।

ঠাকুর্দ্দা —এ্যাঁ, বেড়ালে আমার দুধ খেয়ে গেল, যাই দেখি! (প্রস্থান)

কালু—বেণুদা, এই বেলা ঠাকুর্দ্দা আসবার আগে পালিয়ে যাই চল।

বেণু—সেই ভাল, চল্। —(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—ঠাকুর্দ্দার শোবার ঘর]

কালু—এই মানু, তাড়াতাড়ি কর, ঠাকুর্দ্দা এসে পড়বে এক্ষুনি।

মানু—তক্তপোষের নীচে আমার মাথা আটকে গেছে, বেরোতে পারছি না।

বেণু—আচ্ছা, আস্তে আস্তে বেরিয়ে আয়, তোর কর্ম্ম নয়—যা হেঁড়ে মাথা। এই টুনু, তুই ছোট আছিস, ঢোক তক্তাপোষের নীচে; ঐ বাঁদিকের কোণে ঠাকুর্দ্দার নতুন কালীর বোতল আছে নিয়ে আয়।

কালু—পেয়েছিস? টুনু (খাটের নীচ থেকে)—হুঁ।

মানু—এই বেণুদা, একটু ধরনা ভাই, বেরুতে পারছিনা।

কালু—এই টুনু বোতল নিয়ে বেরিয়ে আয় তাড়াতাড়ি, ঠাকুর্দ্দা আসছে।

[ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ ও টুনু কালুর প্রস্থান]

ঠাকুর্দ্দা—কিসের শব্দ? বেড়ালটা নিশ্চয়। দাঁড়াও আস্তে আস্তে উঁকি মেরে তক্তাপোষের নীচে দেখি। ওমা, তোরা কি করছিস এখানে?

বেণু—এই তোমার হুঁকোটা খুঁজছিলাম ঠাকুর্দ্দা, জল ভরে দিতে হবে।

ঠাকুর্দ্দা—তা বেশ! মানু তুই কি করছিস?

মানু—আমার সেলেটটা বেণুদা লুকিয়ে রেখেছে তাই খুঁজছি।

ঠাকুর্দ্দা—বেরিয়ে আয়। মুখে মুখে অঙ্ক কষ, স্লেট লাগবে না। আচ্ছা বলতো, পয়সায় দশটা কলা হলে, দুকুড়ি কলার দাম কত হবে?

মানু—কি কলা? ঠাকুর্দ্দা—মনে কর মর্ত্তমান কলা।

মানু—হুঁ, আমায় ঠকাবে? আমি যেন জানিনা! পয়সায় দশটা মর্ত্তমান কলা পাওয়া যায় না; ও অঙ্ক ভুল।

[স্লেট হাতে টুনুর প্রবেশ]

নেপথ্যে "হরিহর বাবু বাড়ী আছেন ?"

ঠাকুর্দ্দা—আর পারা যায় না, দেখি আবার কে এল। —(প্রস্থান)

[কালীর বোতল হাতে কালুর প্রবেশ]

কালু—ঠাকুর্দ্দা পয়সা যদি না দেয় বয়ে গেল। এই কালির বোতলের কালি আর ঠাকুর্দ্দার তামাক খাবার টিকে গুঁড়িয়ে, জলে মিশিয়ে রং কোরব।

[বড়দাদার প্রবেশ]

বড়দাদা—তোরা এখানে কি করছিস ? হাতে ওটা কি ?

কালু—ব্লু ব্ল্যাক কালী, এই দিয়ে দোল খেলা হবে।

বড়দা—কালীটা কেন নষ্ট করবি ? তার চেয়ে আমায় দে। এর বদলে আমি কলেজ থেকে ফিনলফ্‌থেলিন এনে তোদের ভানুমতীর রং তৈরী করে দেব।

(আনন্দে) মানু—সে আবার কি বড়দা ?

বড়দা—একরকম মজার রং, গায়ে দিলে লাল টকটকে দেখাব, আবার দুমিনিট বাদেই উঠে যায়।

বেণু— ভারী মজা তো !

বড়দা—পরিষ্কার চুনের জলের সঙ্গে খানিকটা ফিনলফ্‌থেলিন মিশিয়ে দিলে চমৎকার লাল রং হবে। রং লাগাবার কিছুক্ষণ বাদেই রং উড়ে যাবে। এরকম ভাবে লোককে খুব আশ্চর্য্য করা যায়। প্রথমে রং দিলেই লোকে ক্ষেপে যায়, তার পর রং উড়ে গেলে তার আশ্চর্য্যের আর সীমা থাকেনা। যা দুঃখ করিস না রং নেই বলে। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পর গে, কাল আমি বন্দোবস্ত করে দেব সব।

সকলে—সেই বেশ ভাই, চল আজ খেয়ে শুতে যাই। কাল বাজার থেকে চুন এনে ভিজিয়ে দিতে হবে।

কালু—কিন্তু তা বলে ঠাকুর্দ্দাকেও বাদ দেওয়া হবে না। ঠাকুর্দ্দার কাছ থেকে দোলের পার্ব্বণী আদায় করতেই হবে।

—(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[বড়দা কলেজ থেকে ফেরার পর সকলে তাঁকে ঘিরে ধরেছে]

বেণু—দাদা, এনেছ ?

বড়দাদা—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। অত তাড়া কিসের ? দোল তো কালকে !

কালু—রংটা কি রকম হয় দেখব। বেশী না, এখন ছোট একশিশি রং করে দাও, ঠাকুর্দ্দাকে একটু রাগিয়ে আসি।

বড়দাদা—তোদের যত সব দুর্ব্বুদ্ধি। আচ্ছা, কেউ একটু চুনের জল নিয়ে এসতো একটা শিশিতে করে।

(টুনু একটা শিশিতে চুণের জল নিয়ে এলো, এবং বড়দাদা পকেট থেকে ফিণলফ্‌থেলিন বের তার খানিকটা চুণের জলে মিশিয়ে দিলেন)।

বেণু (হাত তালি দিয়ে)—কি সুন্দর, কেয়া মজা !

কালু—চল ঠাকুর্দ্দার কাছে যাই। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।

(গলা জড়িয়ে ফিসফিস করতে করতে ছেলেমেয়েদের প্রস্থান)

বড়দাদা—এ গুলোর দস্যিপনার জ্বালায় অস্থির হবার জোগার, বুড়ো ঠাকুর্দ্দা বেচারাকে জব্দ করবার কোন ফন্দী আঁটছে। ঠাকুরদাও প্রত্যেকবার শেষ পর্য্যন্ত পয়সা দেনই, শুধু এদের নিয়ে একটু মজা করেন। তাতো দুষ্টুগুলো বুঝবে না !

(ঠাকুর্দ্দা বসে বসে তামাক খাচ্ছিলেন, এমন সময়ে সকলের প্রবেশ)

ঠাকুর্দ্দা—এই যে চামচিকের দল, আবার জ্বালাতে এসেছে ?

ঠাকুর্দ্দার গান

চামচিকেটি,
চিমটি কাটি
নাতি নাতনীর দল,
ঠাকুর দাদা হওয়া তোদের
অনেক জন্মের ফল
সব প্যাঁকাটি
আমের আঁটি—
বচনটুকুই সার,
শয়তানিতে তোদের জুড়ি
খুঁজে মেলাই ভার।

মানু—বটে আমাদের এত অপমান! আয় ভাই, আমরাও গান গাইতে জানি।

(সকলে গান)—ঠাকুরদাদা, হুঁকো হাতে,
একটা চুলও নেইকো মাথে
বেজায় কৃপণ লোক,
যতই নস্যি নিকনা নাকে
টেক্কা মোরাও দেব তাকে
সে যতই চালাক হোক।

টুনু—ঠাকুরদা, আমরা তোমায় বড্ড ভালবাসি, না ঠাকুরদা?

ঠাকুরর্দ্দা—তোমাদের ভালবাসার ঠেলায় যে দেউলে হ'তে বসেছি।

বেণু—আমাদের একটি মোটে ঠাকুরর্দ্দা, কত ভালবাসি।

ঠাকুর্দ্দা—তাই নাকিরে। দুর্গা, দুর্গা। মতলবটা বলে ফেল্।

সকলে—আমাদের দোলের পার্ব্বণী!

ঠাকুর্দ্দা—তবে রে ছোঁচার দল, টোকো আমের ছিড়ে, এসো ভাল করে পার্ব্বণী দিচ্ছি! (লাঠি নিয়ে তাড়া)

[হঠাৎ কালু থম্‌কে দাঁড়িয়ে ঠাকুর্দ্দার গায়ে ভানুমতীর রং ঢেলে দিয়ে পালাল]

ঠাকুর্দ্দা—দেখলে, দেখলে, নতুন কাপড়টা নষ্ট করে দিল।

বেণু—(ফিরে এসে) আমি যদি রং উঠিয়ে দিতে পারি, কি দেবে?

ঠাকুর্দ্দা—এক পয়সার লেবু লজেন্স।

বেণু—উঁহু, আট আনা যদি দাও তো এখুনি রং তুলে দেব।

ঠাকুর্দ্দা—(মনে মনে হিসাব) একজোড়া নতুন কাপড়ের দাম হচ্ছে তিন টাকা, একখানার দাম দেড় টাকা। আট আনা দিয়ে যদি দেড় টাকা দামের কাপড় বাঁচে তো মন্দ কি?—ওরে, চার আনা পাবি।

বেণু—না, ভদ্রলোকের এক কথা।

ঠাকুর্দ্দা—আচ্ছা, নে বাপু নে (পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক খুলে একটা আধুলি বের করে দিলেন)

বেণু—(মাটিতে ফেলে বাজিয়ে) বদলে দিতে হবে, এ অচল আধুলি।

ঠাকুর্দ্দা—এঁ্যা বলিস কি? বেটা দোকানদার ঠকিয়েছে। দে বাপু বদলে দিচ্ছি। রং তোল্। বেণু—আগে দাও।

ঠাকুর্দ্দা—এই নে বাপু, নে। (একটি ভাল আধুলি প্রদান)

বেণু—(আধুলিটি পকেটে রেখে) আচ্ছা দেখ, রং উঠে গেছে।

ঠাকুর্দ্দা—আরে তাইতো, এ যে ভারী আশ্চর্য্য!

বেণু—ওরে কালু, টুনু, মানু, সবাই আয়—আট আনা পয়সা আদায় করা গেছে; এক একজনের ভাগে দু'আনা করে পড়বে। (সকলের প্রস্থান)

ঠাকুর্দ্দা—আচ্ছা ঠকান ঠকিয়েছে তো!

এসব দস্যি নাতির দল
দিন দুপুরে রোদে পুড়ে'
মাঠে খেলে বল্
যত লক্ষ্মীছাড়ার দল

সকলে— মোরা খাম খেয়ালীর দল
কোনই মানা নাইকো জানা
সর্ব্বদা চঞ্চল,
হাড় জ্বালানির দল।

ঠাকুর্দ্দা— এরা ফচ্‌কে ছোঁড়ার দল
পাড়ায় পাড়ায় ফেঁদে বেড়ায়
ডান পিটেমির কল।
অকাট এদের প্রাণ
ভীষণ এদের জান,
জলে স্থলে আছাড় খেলে
নাইকো চোখে জল,
যত ছিঁচকে চোরের দল।

সকলে— ওরে দস্যি ছেলের দল
বুক উঁচিয়ে চল!
দস্যি ছেলে যে না হলে,
জন্ম তার বিফল।

খেলা

(মনের পরীক্ষা)

শ্রীসুবিনয় রায়

শরীরের শক্তি পরীক্ষা করার কত রকমের উপায় আছে ;—যেমন, হাতের জোর পরীক্ষা, গায়ের জোর পরীক্ষা, ফুস্‌ফুসের জোর পরীক্ষা, চোখের নজর পরীক্ষা, শ্রবণশক্তির পরীক্ষা, দমের জোর পরীক্ষা, আঙ্গুলের জোর পরীক্ষা, দাঁতের জোর পরীক্ষা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মনের জোর পরীক্ষা করারই বা উপায় কেন থাক্‌বে না? হাঁ, আছে বৈকি! এর আগে একবার দু' চারটা পরীক্ষা দিয়েছিলাম, যা' দিয়ে একাগ্রতা, হাত স্থির রাখার ক্ষমতা প্রভৃতি বোঝা যায়। সেগুলিকেও মনের পরীক্ষা বলা যেতে পারে।

এবার আরও কয়েকটি পরীক্ষা বা খেলা দিচ্ছি যা' দিয়ে মনের একাগ্রতা, তাড়াতাড়ি চিন্তা করার শক্তি, মনের সঙ্গে হাতের মাংসপেশীর যোগের পরিমাণ প্রভৃতির বেশ ভাল পরীক্ষা হয়। ১নং খেলা দিয়ে হাতের মাংসপেশীকে মন কি ভাবে চালায় তা'র বেশ পরীক্ষা হয়। ২ আর ৩ নং খেলা দিয়ে অঙ্ক কষার এবং তাড়াতাড়ি চিন্তা করার শক্তির সুন্দর পরীক্ষা হয়। ৪ নং খেলা দিয়ে তাড়াতাড়ি চিন্তা করার এবং তুলনা করার সুন্দর পরীক্ষা হয়। ৫ নং খেলা দিয়ে স্মরণশক্তির পরীক্ষা ভাল হয়। এবার খেলাগুলিকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

১ নং খেলা—একটি কার্ডবোর্ডের বাক্স নিয়ে তার ভিতরের লম্বা দিকে

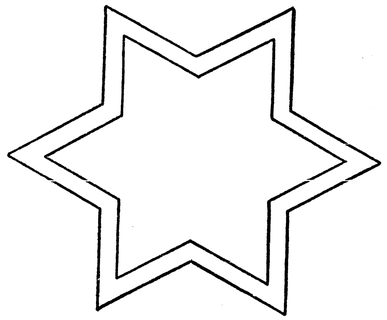

এই ডবল-লাইন-ওয়ালা তারার ছবিটিকে কেটে (বা এঁকে) বসাও। তা'র পর বাক্সের তলাটা কেটে ফেল। বাক্সটিকে একটা আয়নার সাম্নে টেবিলের উপর রেখে (বাক্সের খোলা দিক আয়নার দিকে ফিরিয়ে) আয়নার দিকে দেখ। আয়নাতে তারাটির ছায়া দেখা যাবে। এবার একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে, আয়নায় ছায়াটি দেখে, ঐ তারার ছবির দুটি লাইনের মাঝ

দিয়ে লাইন টেনে যেতে থাক—যা'তে ঠিক তারার মতন আকারের একটি ছবি (অবিশ্যি ডবল লাইনের নয়) আঁকা হয়। সাবধান! যেন পেন্সিলের লাইন, বাইরের বা ভিতরের তারার কোন লাইনকে না ছোঁয়। বেশ তাড়াতাড়ি আঁক্‌তে চেষ্টা কর। যত সোজা মনে কর্‌ছ তত সোজা নয়।

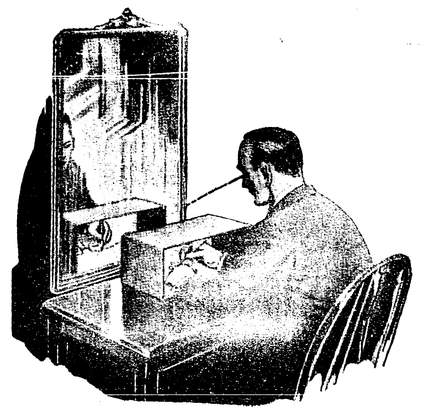

২ নং খেলা—পর পর কয়েকটি যোগ এবং বিয়োগের অঙ্ক দেওয়া আছে; তা'র মধ্যে কয়েকটির ফল ভুল, কয়েকটির ফল ঠিক। উপর থেকে আরম্ভ ক'রে, না থেমে, চট্‌পট অঙ্কগুলির কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল, একটা পেন্সিল দিয়ে টিক্ দিয়ে যাও, তা'রপর দেখ তোমার হিসাব কতটা ঠিক হয়েছে। তাড়াতাড়ি করার মধ্যেই এই খেলার মজা।

৩ + ১২ = ১৫
১৩ + ৩ = ১০
১৬ − ৯ = ৭
১২ − ৬ = ৬
১৫ − ২ = ১৩
১৫ + ৫ = ১০
৫ + ১৭ = ২২
৪ + ১৮ = ২২
১৬ − ৫ = ১১
১৭ + ৭ = ২৩
১৪ − ৮ = ৬
১৮ − ৪ = ১২
১৪ + ৬ = ২০
১৫ − ৮ = ৭
১৬ + ৮ = ২৩
১৯ + ৯ = ২৮
১৫ + ৯ = ২৫
১৯ + ৫ = ২৪
১৪ − ৯ = ৫
৭ + ১৮ = ২৫
৬ + ১৫ = ২২
১২ − ৭ = ৫

৩নং খেলা—এটিতে, উপরে ৮টি রাশি (বা সংখ্যা) দেওয়া আছে ; তা'র নীচে আরও কয়েকটি লাইনে ৬টি ক'রে রাশি বা সংখ্যা দেওয়া আছে আর দুটি রাশি বা সংখ্যার জায়গা রাখা হয়েছে। প্রথমটিতে দেখান হয়েছে, সংখ্যাগুলি দুই দুই ক'রে বেড়ে গেছে। এই ভাবে, প্রত্যেক লাইনেই কোন রকমের একটা ক্রম বা হিসাব ঠিক করা আছে। সেই হিসাব অনুসারে শেষের দুটি খালি জায়গার সংখ্যা বা রাশিগুলি বসা'তে হবে। কোন লাইনে সংখ্যাগুলি ক্রমশঃ ক'মে এসেছে, কোনটাতে মাঝে মাঝে অন্য একটি সংখ্যা বসিয়ে অন্য সংখ্যাগুলি এক এক ক'রে ক'মে এসেছে, কোনটাতে সংখ্যাগুলি পাঁচ যোগে বেড়ে গেছে—এই রকম। প্রত্যেকটি লাইনেরই একটা বিশেষ হিসাব আছে। খেলা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি, না থেমে, চট্‌পট্‌ ফাঁকা জায়গাগুলি পূর্ণ করে ফেলা। কর্‌তে গিয়ে দেখ্‌বে কত মজা হয়, কতবার মাথাও গুলিয়ে যায়।

২	৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬
২	৩	৪	৫	৬	৭	...	...
১০	৯	৮	৭	৬	৫	...	...
৫	১০	১৫	২০	২৫	৩০	...	...
৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	...	...
৮	৮	৬	৬	৪	৪	...	...
৩	৭	১১	১৫	১৯	২৩	...	...
৯	১	৭	১	৫	১	...	...
৪	৫	৮	৯	১২	১৩	...	...
২৫	২৫	২১	২১	১৭	১৭	...	.
১	২	৪	৮	১৬	৩২	...	
২১	১৮	১৬	১৩	১১	৮	...	..
১২	১৪	১৩	১৫	১৪	১৬	...	...
১৬	১২	১৫	১১	১৪	১০	...	..
২৫	২৪	২২	২১	১৯	১৮	...	...
৩	৪	৬	৯	১৩	১৮	..	...
১	৪	৯	১৬	২৫	৩৬	...	...
১৫	১৬	১৪	১৭	১৩	১৮	...	...
৪	৮	১০	২০	২২	৪৪	...	...

৪নং খেলা—এই খেলাটিতে, দুই দিকে ১০টি ক'রে দুই দেশী প্রবাদ বাক্য দেওয়া আছে। এগুলি প'ড়ে ঠিক কর, কোন্ প্রবাদটি অন্য দেশী কোন্ প্রবাদের সঙ্গে মেলে—অর্থাৎ ইংরেজী কোন্ প্রবাদ আফ্রিকার কোন্ প্রবাদের সঙ্গে এক অর্থে ব্যবহার করা হয়। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝ্‌বে ;—ইংরাজী প্রবাদ "The bad workman quarrels with his tools" ('আনাড়ি মিস্ত্রি তা'র যন্ত্রপাতির সঙ্গে ঝগড়া করে), আর বাংলা প্রবাদ "নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠান বাঁকা", এ দু'টিই একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। ১০টি ইংরাজী প্রবাদের ১০টি এক-মানে-ওয়ালা আফ্রিকার প্রবাদ ফর্দ্দে দেওয়া আছে ; তোমরা এবার খুঁজে বা'র কর।

ইংরাজী প্রবাদ

(ক) বোকাকে তা'র বোকামী অনুসারে জবাব দেও।

(খ) দুধ শিশুরই খাদ্য।

(গ) কড়া থেকে আগুনে।

(ঘ) রামের কাছ থেকে ধার নিয়ে শ্যামকে শোধ করা।

(ঙ) এক জাতের সব পাখী এক জায়গায় জড় হয়।

(চ) আগে শিকার ধরেই তো নাও—

(ছ) পরের কষ্ট সকলেই সইতে পারে।

(জ) মারার উপর আবার অপমান।

(ঝ) অন্যকে গাল দিলে নিজের ঘাড়েই পড়ে।

(ঞ) দূরের জিনিষই ভাল লাগে।

আফ্রিকার প্রবাদ

১। পাখীটাকে প্রায় মেরেছিলাম। 'প্রায়-মারা' দিয়ে তো ঝোল রাঁধা চলে না!

২। ছেলে পেট ভ'রে খেয়ে ক্ষুধার্ত্ত ছেলেকে বলে 'সরে থাক ভাই'।

৩। দূরে যে লাকড়ি পাওয়া যায় সেটাই রান্নার জন্য বেশী ভাল।

৪। ছাই ছুঁড়্‌লে নিজের মুখেই উড়ে এসে পড়্‌বে।

৫। ছেলেটা যদি বলে দড়ি দিয়ে জল বাঁধ্‌বে, তাকে জিজ্ঞাসা কর, পুকুরের জল না ঘড়ার জল ?

৬। হজমের জোর না থাক্‌লে আরশুলা খেও না।

৭। তলোয়ারের কাছ থেকে পালিয়ে খাপের মধ্যে লুকান।

৮। এ পাড়ার হাঁদা ও পাড়ার বোকার সঙ্গে ভাব কর্‌তে যায়।

৯। শিকারের পাখী বলে, যে আমায় মেরে ফেলেছে তার উপর ততটা চটিনি, যতটা চটেছি মারার পর যে আমায় মাটিতে আছড়েছে তা'র উপর।

১০। ঝরণা থেকে জল নিয়ে নদীতে ঢেলে কোন লাভ নাই।

৫নং খেলা—ছবির উপরের লাইনে পাঁচটি চিহ্নের মধ্যে পাঁচটি সংখ্যা বসান আছে। বেশ ক'রে দেখে নাও কোন্ চিহ্নের ভিতরে কোন্ সংখ্যা। তারপর নীচের কয়টি লাইনে যে চিহ্নগুলি বসান আছে তা'র মধ্যে সংখ্যাগুলি যথাস্থানে বসিয়ে যাও—কিন্তু উপরের লাইনের দিকে একবারও চাইতে পার্‌বে না।

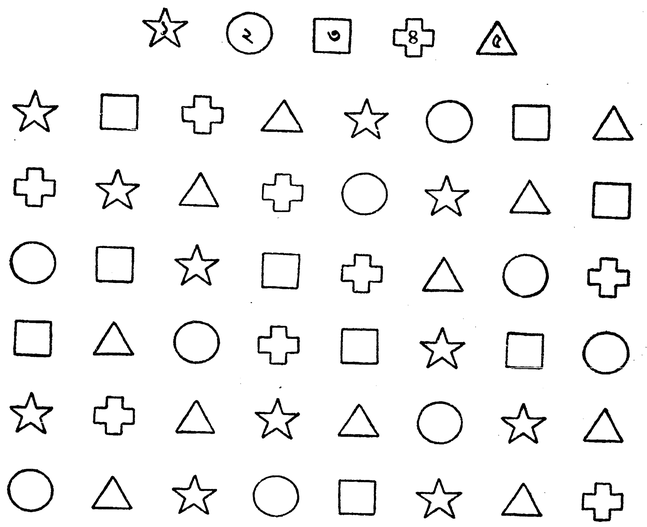

এই সব খেলা খেল্‌বার আগে যদি ঠিক ক'রে নাও—এত মিনিটের মধ্যে খেলাটা শেষ কর্‌তে হবে, মোট নম্বর এত, এক একটি ভুলের জন্য এত নম্বর কাটা যাবে, তা' হ'লে বেশ পরীক্ষা হবে।



কেরানী

(শ্রীহিমাংশুভূষণ সেন গুপ্ত)

মারচেণ্ট্ ব্যাঙ্কের কেরানী যে গদাধর ;
কুড়ি টাকা মাহিনায় চলে নাকো তার ঘর ॥
লেখা পড়া করে নিকো বুদ্ধিটা ছিল মোটা।
তাই তার ছিল ভার কোন কিছু কাজ জোটা ॥
একগুণ ছিল তার—খোসামোদে ওস্তাদ ;
তাহাতেই হ'ল বড়, ক'রে নিল বাজীমাৎ ॥
সাহেবের জুতো ঝাড়ে, বলে তারে 'মাই গড্'।
ড্যাম্, ফুল্ বলে যদি, হেসে কয় 'লড্ লড্' ॥
লাথি খেলে ধুলা ঝেড়ে বলে তারে 'থ্যাঙ্ক্ ইউ'।
কাপড়টা ছিঁড়ে গেল—যাক্, এটা হ'বে 'নিউ' ॥
ভোরে যায় অফিসেতে, আসে রাত দশটায়।
সাহেবেরে কর জোড়ে, পদানত থাকে ঠায় ॥
সাহেব ত ভারি খুসি, কত দেয় বোক্‌সিস্।
হ'লে তার 'কম্‌প্লেন' করে দেয় 'ডিস্‌মিস্' ॥
মাসে মাসে মাহিনাটা ক্রমে তার বেড়ে যায়।
তবু ক্ষোভ মেটে নাক, সদা করে হায় হায় ॥
একদিন সাহেবকে বলে তুমি পিতা মোর।
তোমা হ'তে আমাদের দেখি ভারি 'লাক্' জোর ॥
তাই শুনে সাহেব ত করে তারে কেসিয়ার।
এইবারে গদাধরে কার সাধ্য পায় আর ॥
রাতারাতি ক্যাস্ ভেঙে গদাধর চম্পট্।
তাই দেখে সাহেবের পিলে ফাটে ফট্‌ফট্।

—*—

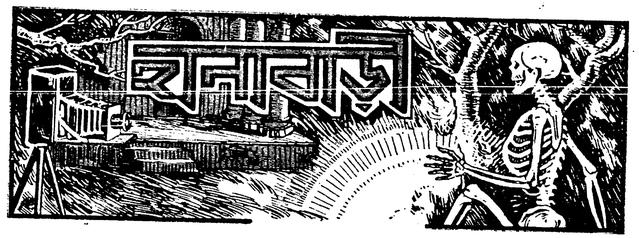

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

— তেরো —

সুরেনের কথা

হানাবাড়ীতে পৌঁছে দেখি, দোরে দাঁড়িয়ে হরিপদ বাবু, হাউস্ মাষ্টার, আরও কয়েকজন ভদ্রলোক। হরিপদ বাবু বল্‌লেন, "এই যে সহায়, তোমাদের জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলাম।"

সহায় বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো, আমরা পেছনে। আর একদিনের কথা মনে পড়্‌লো, আমরা সে দিন মাত্র হলঘরের সামনের বারান্দাটা আর তার পাশের ঘরটাই দেখে গিয়েছিলাম, আর কিছুই দেখ্‌তে পাই নাই। আজ দেখ্‌লাম, হ্যাঁ বাড়ীখানা একখানা বাড়ীর মত বাড়ী বটে। ঘরের পর ঘর, সুন্দর সুন্দর আসবাব-পত্র, কিন্তু সব ধূলোয় ধূলোময়। ঘরগুলি বেশ সুন্দর, মধ্যে মধ্যে বেশ দামী জিনিষ দিয়ে সাজানো। কিন্তু সে সবই আজ পঁচিশ বছরের মধ্যে কেউ ধরে না বলে কত ভাল ভাল জিনিষ যে উইয়ে নষ্ট কর্‌ছে!

ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে হলঘরে এসেই উঠ্‌লাম, হরিপদ বাবু পকেট থেকে একটা একশো গজি ফিতার চাক্তি বের করে কি সব মাপলেন, তারপর ডান দিকের দেয়ালে একটা দাগ দিলেন। সেই দাগের তিন হাত বাঁয়ে আর একটা দাগ দিয়ে সখানে একটা ছুরী দিয়ে ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বল্‌লেন "ঠিক পেয়েছি সহায়রাম, সত্যকে ডেকে আন।"

সহায় বেরিয়ে গেল। হরিপদ বাবু ঈশান বাবুর হাত থেকে তার মোটা

লাঠিটা নিয়ে, দেয়ালের সে জায়গাটায় মারতে লাগ্‌লেন। চুন আগেই পড়ে গিয়েছিল। এবার বালি ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌ল। শীঘ্রই দেখ্‌তে পেলাম, একটা মস্ত বড় কাঠের খানিক অংশ। সাগ্রহে হরিপদ বাবু সেই বালি খসাতে লাগ্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেখানে একটা ছোট্ট দরজা বেরুল, প্রায় চার ফুট উঁচু। আমরা অবাক হয়ে সে দিকে চেয়ে রইলাম।

হরিপদ বাবু বল্‌লেন, "না, সহায়রাম ঠিকই ধরেছিল।" ব'লে তিনি দরজাটার ঠিক মাঝখানে হাত লাগালেন, একটা শব্দ করে দরজাটা নীচে নেমে



গেল। আমরা বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে দেখ্‌লাম, সেখানে কষ্টি পাথরে খোদাই করা চমৎকার এক বিষ্ণু-মূর্ত্তি।

সত্য ও সহায় সে সময় খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো, সামনে বিষ্ণু-মূর্ত্তি দেখে তারাও অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

সামনে বিষ্ণু-মূর্ত্তি, তারই সামনে এক সোনার ঝাঁপি। হরিপদ বাবু এক লাফে ঝাঁপিটা তুলে আন্‌লেন।

হঠাৎ কে যেন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে তাঁর হাত থেকে ঝাঁপিটা ছিনিয়ে নিয়ে, খুলে ফেলে, একটা সোনার পদক বের করে আনন্দে চীৎকার করে উঠ্‌লো, "পেয়েছি, পেয়েছি।"

বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম—ভদ্রলোক বৃদ্ধ, মাথার চুল সব সাদা হয়ে গিয়েছে, গায়ে একটা ছোট ফতুয়া, পরণে একটা আধময়লা কাপড়, চুল উস্কু খুস্কু, চেহারা কতকটা পাগলের মত, চোখ ব'সে গেছে, হাত পা সরু সরু হয়ে গেছে। সত্য বল্‌ল, "আমার সুরেন দা।"

বৃদ্ধ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌ল, "আপনারা কে জানিনা, বোধ হয় দেবদূত হবেন। আজ আপনারা না থাক্‌লে বাছার আমার কী যে হতো, তা ভগবানই জানেন। আহা, বাছা আমার···" ব'লে সত্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগ্‌লেন।

* * *

ভদ্রলোকদের একজন বল্‌লেন, "সুরেন, তোমার আর ভয় নেই ভাই, তুমি যে সাধনা করছিলে, আজ তা' পূর্ণ হ'য়েছে, আমরা হ'লাম এখন এই সম্পত্তির মালিক। এখন এই উইল যদি সেকালের বলে প্রমাণ হতে পারে তা হ'লেই সম্পত্তি সত্যর, আর তা'তেও বোধ হয় অসুবিধা হবে না কিছুই। এখন চল ভাই আমার বাড়ী, সত্যর গল্পটা শুন্‌বার জন্য আমরা বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি।" সুরেন বল্‌ল, "চলুন।"

ভদ্রলোকের ঘরের মেঝেতে এক ফরাস পাতা, সবাই তার উপর গোল হ'য়ে বস্‌লাম।

সুরেন বলে চল্‌ল, "আজ্ঞে, গল্প আমার বড় বেশী কিছু নেই। ছোট বাবুর সেই ছোট বেলা থেকেই আমি ছিলাম ডান হাত, কাজেই বাবুর যখন ক'লকাতা যেতে হ'ল তখন আমিও তার সঙ্গে সঙ্গেই রইলাম। তার ভায়ের মরার পর

কেমন যেন তিনি ভয় পেলেন। জিজ্ঞেস কর্‌তেন ভূত আছে কি না, দেখতে কেমন, এই সব। তারপর একদিন আমাকে ডেকে নিয়ে, তিনি পালিয়ে ঢাকা চলে গেলেন। সেখানে নাম বদ্‌লে একটা চাকুরী নিলেন, বছর কয়েক কাটালেন। সেখানে বিয়ে কর্‌লেন, তার প্রায় বছর পাঁচেক পরে তাঁদের ছেলে হ'লো—এই সত্য। কিন্তু বরাতে তাঁর সুখ ছিল না. এক বছর পরে সেই ভূতের ভয়েই মারা গেলেন সত্যর মা। বাবু পাগল হয়ে উঠ্‌লেন, ভূতের উপর চটে গেলেন। যে ভূত তাঁর দুভাইকে মেরেছে, যে ভূত তাকে মার্‌তে চেয়েছে, সে তার স্ত্রীকে অবধি মেরেছে, তাকে তিনি রেহাই দেবেন না ঠিক কর্‌লেন। আমি সত্যকে নিয়ে, আর এই সোনার চাক্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম; নানা বেশে, নানা দেশে ঘুর্‌লাম। শেষকালে, নিজের বাড়ীতে সত্যকে নিয়ে গেলাম, তাকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিলাম। এদিকে ছোটবাবুর কোনই খোঁজ নেই। তার পরে সত্যকে পড়ালাম। আমার অসুবিধে কিছু হতো না, কারণ বাবু যাবার আগে প্রায় হাজার দুই টাকা আমায় দিয়েছিলন, আর বাড়ী আসবার পর থেকে প্রত্যেক মাসেই একশো করে টাকা পেতাম। শেষে, কয়েক দিন আগে একটা চিঠি পেলাম বাবুর লেখা; তাতে লেখা আছে, যে সত্য যেন রায়পুর স্কুলে আসে। আমি নিজে যেন বাসা নেই হানাবাড়ীতে, আর আমার আর সত্যর মধ্যে কথাবার্ত্তা চালাবার জন্য থাকবে একটা টেলিফোন।—সে চিঠি পেয়েই এখানে চলে এলাম। কিন্তু যে ভূত এতদিন চুপ করে ছিল, যার হাত এড়িয়েছি ভেবে মনে ফূর্ত্তি হয়েছিল ভারী, সে ভূত কিন্তু এখানেও বাছাকে আমার তাড়া করেছে!" বৃদ্ধের চোখ বেয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো।

সবাই এক মিনিট চুপ করে বসে রইলাম। এই ছোট্ট কাহিনীটির বুকে যে বিষাদের ছায়া আঁকা, তা' সবারই প্রাণেই একটা শোকের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তুললো,—সবারই চোখ টলটল করে উঠলো।

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "ভয় নেই সুরেন, কালই দেখ্‌বে ভূত ধরা পড়ে যাবে; তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, কালই সেই ভূতকে হাজতে পূর্‌বো, তবে ছাড়্‌বো।"

এ আবার কী নূতন রহস্য?

— চৌদ্দ —

কিস্তিমাৎ

সারাদিন কাট্‌লো দারুণ দুশ্চিন্তায়। ট্রাষ্টি বোর্ডের ভদ্রলোক সেই যে বল্‌লেন, তিনি আজ চোর ধর্‌বেন, সে কথাগুলি যেন আমার মগজকে তোলপাড় করে তুল্‌লো। সেই গোড়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ব্যাপারটিকে যতই ভাল ক'রে দেখ্‌ছি ততই মনে হচ্ছে যেন এর মধ্যে বেশ বড় রকম একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। জমিদার বাবু হঠাৎ এমন একটা আজব উইলই বা কর্‌লেন কেন, আর তার দুই ছেলেকেই বা অমন অদ্ভুত ভাবে ভূতের হাতে মর্‌তে হ'লো কেন? তারপর সেই নাটকের আবার পুনরাবৃত্তি এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে এই সুদূর রায়পুরেই বা কে কর্‌লো? এদিকে সত্য যে সত্যি সত্যি রায়পুরের এই বিশাল জমিদারীর মালিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই তো আর নেই, তবে জ্ঞানাঞ্জন বাবুকেই বা সব জানানো হয় নি কেন? তবে কি তিনি কাল এসে এখানে পৌঁছুলে পর তাঁকে সব কথা খুলে বলা হবে? কিন্তু তা হ'লে বাইরেই বা সমস্ত ব্যাপারটাকে 'ঢাক' 'ঢাক' করে রাখা হচ্ছে কেন? যার জমিদারী সেই যখন এসে পৌঁছেছে, তখন আর সকলের কাছে বল্‌বার আপত্তিই বা কি থাক্‌তে পারে? আবার সুরেনদা বল্‌ল, তার বাবুর চিঠি সে পেয়েছে। তা হ'লে সত্যর বাবা, কালীপদ রায়, এখনও বেঁচে আছেন? আর তাহলে এই টেলিফোনের তার, চোর কুঠুরী, সত্যর ভর্ত্তি এই সবই তা হ'লে তাঁর কাজ। সকলের চোখের অন্তরালে থেকে তাঁর এ করারই বা অর্থ কি? আর এখনও তিনি কেনই বা গা ঢাকা দিয়ে আছেন? আত্মপ্রকাশ কর্‌ছেন না কেন? সব চেয়ে আজব আর অসহ্য হ'লো সহায়ের ব্যবহার। সে জানে ভূত কে! ভূত, স্বচক্ষে দেখেছি ভূত, তার ছায়ামূর্ত্তি; দেখেছি তার কার্য্য-কলাপ, মনে প্রাণে অনুভব করেছি তার হিম, কঠোর ছোঁয়াচ, পরিষ্কার বুঝ্‌তে পার্‌ছি বাবু রোজ আমাদের ঘরে ভূত চালান দিত। অদ্ভুত এই 'বাবু'! কে বুঝ্‌বে ঐ সুন্দর সুকোমল চেহারার নীচে লুকিয়ে আছে, ভীষণদর্শন এক কাপালিক! কিন্তু কী তার স্বার্থ এই সত্যর উপর ভূত চালিয়ে? তার কী ছিল অভিসন্ধি? কিছুই তো বোঝা গেল না। সহায় মান্‌তে চায় না ভূতের কথা, হরিপদ বাবু জানেন 'বাবুর' আসল পরিচয়। কিন্তু একটি কথাও কি শুন্‌তে পেলাম

তার কাছ থেকে। আশ্চর্য্য রকম বুদ্ধি এই হরিপদ বাবুর, বাবুকে ধর্‌লেন ছোট্ট দুইটা প্লেট থেকে! কিন্তু কি ধর্‌লেন? বাবুর পাপের কতটুকুর কথা তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন? আর যাও বুঝ্‌তে পারলেন, তার এক বর্ণও বেরুল না তার মুখ দিয়ে। অদ্ভুত এরা, অদ্ভুত এই সহায়রাম,—হ্যাঁ, আমার বন্ধু সহায়রাম, যার সঙ্গে সঙ্গেই আমার এই দুই বছরের জীবন দশ বছরের সমান এগিয়ে গেল! অদ্ভুত এই বাবু, অদ্ভুত এই হরিপদ বাবু।

আজ জ্ঞানাঞ্জন বাবু আস্‌বেন। সহায় বলেছে, আজই পড়্‌বে এই নাটকের যবনিকা। খুব ভোরে উঠে চুপ করে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, ব্যাপারখানা কি হতে পারে। যে বিরাট পর্দ্দা সমস্ত ব্যাপারটিকে ঘিরে আছে, আর অন্তরালের খবর এতটুকুও জান্‌তে পার্‌লাম না।

সহায় ঘরে ঢুকে বল্‌ল, 'রমেন কেমন বুঝ্‌ছিস?'

বল্‌লাম, 'বুঝ্‌বো আর কি? সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন। নিজের মনে মনে জেরা করে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি।'

সে মুচ্‌কি হেসে বল্‌ল, 'আর কয়েক মিনিট চুপ করে থাক্, তারপরেই দেখ্‌তে পাবি, আসল ব্যাপারখানা কি। তা যাক্, ভূত ধর্‌তে যাবি নাকি?'

ভূত ধর্‌তে? ভূত, সত্যর ভূত? লাফিয়ে উঠ্‌লাম; বল্‌লাম, 'নিশ্চয়ই, চল, চল।'

চল্ বলে সে চল্‌তে লাগ্‌লো ষ্টেশনের দিকে। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলাম; সহায় আবার মুচ্‌কি হাস্‌ল, বল্‌ল, অবাক হচ্ছিস? কিন্তু জ্ঞানাঞ্জন-বাবুর কাছেই হলো এ রহস্যের আসল চাবি। তাঁর, একমাত্র তাঁর সাহায্য পেলে পরই আমরা এ রহস্যের পরিসমাপ্তি কর্‌তে পার্‌বো।'

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলাম। এ আবার কি নতুন রহস্য! জ্ঞানাঞ্জনবাবুর সঙ্গে ভূতের কী সম্পর্ক? বাবুর কী সম্পর্ক? সত্যি সত্যি Book of Knowledge-এর বিজ্ঞানের পাতাটার মত আমার মগজে মাত্র স্থান হ'লো একটি বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্নের।

ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলাম, ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। এই গত পঁচিশ বছর পরে রায়পুর জমিদারীর উত্তরাধিকারী রায়পুরের হর্ত্তাকর্ত্তা আস্‌বে শুনে, রায়পুরের ছোট বড়, ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ সবাই এসেছে তাঁকে আদর অভ্যর্থনা করতে।

কিন্তু দৃশ্যপটের অন্তরালে সে ছোট্ট ঘটনাটি ঘটে গেছে, তার খবর তো এরা কেউ জানে না। জানে না যে যাঁকে তারা আদর করতে এসেছে, কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তার মুখ কালী হয়ে উঠবে। সকলের আনন্দ অবশ্য এতে বাড়্‌বে বই কম্‌বে না। কিন্তু···কিন্তু একখানা মলিন মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো; তার হাত ধরে ও কে? একটা কঙ্কাল? চোখের সাম্‌নে যেন বিভীষিকা দেখ্‌তে পেলাম।

ট্রাষ্টিদের সকলেই এসেছেন দেখ্‌লাম। সত্যকে আর সুরেনদাকে খুঁজলাম, কিন্তু ছোট্ট ষ্টেশনের কোথাও তাদের চিহ্নমাত্রও দেখ্‌তে পেলাম না।

সহায়কে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। সে বল্‌ল, 'তাদের ইচ্ছে করেই আসতে দেওয়া হয়নি রমেন। ওরা এলে বিপদ বাড়তো বই কমতো না। এখানে এলে তাদের বিপদের সম্ভাবনা ছিল পদে পদেই।'

বুঝ্‌লাম সেই ভূতের দল হয়তো বা ওদের দেখে সট্‌কে পড়্‌বে এই হ'লো সহায়ের ভাব্‌না, কিন্তু ভূত ··সেও ধরা পড়বে? এ কী বল্‌ছে?

হুস্ হুস্ শব্দ করে ট্রেণখানা এসে ষ্টেশনে ঢুকলো। সবাই এগিয়ে গিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরার কাছে দাঁড়াবার জন্য ঝুঁকে পড়্‌লাম। চারিদিকে ছড়ানো ছোট ছোট পিনের কাছে মস্ত বড় চুম্বক একটা ধরলে যেমন সব পিন একসঙ্গে সেদিকে ভীড় করে ছোটে, ঠিক তেমনি ভাবে ষ্টেশনের সব লোক ছুট্‌লো কামরার দিকে। কে কার নীচে পড়্‌লো, কাকে কে দ'লে গেল, কারও গেল জামা ছিঁড়ে, কারও বা কাপড় গেল খুলে, কারও বা সখের টেরীর একটি চুলও রইলো না ঠিক। ছেলেদের কেউ কেউ পড়লো পায়ের তলে, কেউ কেউ দু'দল বড়র মধ্যে পড়ে ট্রামগাড়ী চাপা-পড়া ব্যাঙের মত চেপ্টে যেতে যেতে আর্ত্তনাদ করতে লাগল। আমি আর সহায় কনুই দিয়ে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে এগিয়ে চল্‌লাম। সেদিনের গালাগালের কেই বা ধার ধারে!

গাড়ী থেকে নামলেন আধবুড়ো এক ভদ্রলোক,—আধপাকা চুল, মাঝখান দিয়ে সিঁতে করে দুভাগ করা, তার নীচে বিরাট কপাল, সুন্দর বিরাট বিরাট দুই চোখ; কিন্তু কী হিংস্র তার দৃষ্টি! সারা মুখে একটা অসম্ভব গাম্ভীর্য্যের ভাব, প্রখর বুদ্ধির গভীর ছাপ মুখে, কিন্তু হাসির স্থান তাতে নেই, কৌটিল্য তার সারা মুখে মাখানো; চমৎকার একখানা চুড়িদার পাঞ্জাবী গায়, একখানা শান্তিপেড়ে ধুতি পরণে, চমৎকার কোঁচানো একটা চাদর গলায়, চোখে চশমা। হাঁ, চেহারাটা

দেখে 'বাবু' বলেই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভয়েও মন ভরে উঠে, চেহারা দেখে ভক্তি হয় না মোটেই। সহায় ফিস ফিস্ করে বল্‌ল, "জ্ঞানাঞ্জন বাবু"।

ট্রাষ্টিদের সেই ভদ্রলোক নমস্কার করে কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কোত্থেকে একজন লোক এসে জ্ঞানাঞ্জনের গলা টিপে ধরলো, আর চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌ল, 'পেয়েছি, পেয়েছি'। তার বিরাট দেহ কাঁপছে, মস্ত বড় মুখটার



ভেতর থেকে রক্তবর্ণ চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌ছে। ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল নেড়ে বল্‌ল, 'চিন্‌তে পারছো না জ্ঞানাঞ্জন? আমি,...আমি কালিপদ রায়। তোমার শয়তানী বের করবার জন্যই আমি নির্ব্বাসন দণ্ড নিয়েছিলাম আমার ঘাড়ে।'

এই, এই কি কালিপদ রায়! এ কী মূর্ত্তি তাঁর!

জ্ঞানাঞ্জন অবাক হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

ব্যাধ বালক

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

শরৎকাল। নদীর দু'কূল ছাপিয়ে উঠেছে জল। তীরে সবুজ কাশের বনে সাদা ফুলের সে কি নাচ! একটু বাতাসেই দুলে দুলে কূলে উঠ্‌ছে। জলে স্থলে হাসির বান ডেকেছে যেন। দূরে তালবনের সারি মাথায় মাথায় এক হয়ে দাঁড়িয়ে। তারি কোল ঘেঁসে কাঁচা ধানের ক্ষেতের বুক চিরে সরু এক পথ এসেছে নদীর ঘাটে। অপর প্রান্ত তার রাঙা পাথুরে জমি ভেঙ্গে সোজা গিয়েছে এক গ্রামে। ছায়ায় ঘেরা ছোট্ট গ্রামটি। তারি এক ছোট্ট কুঁড়েতে থাকে একঘর ব্যাধ।

একমাত্র ছেলে তাদের, বড় দুরন্ত। বড় বড় ঘন কালো চুল কাঁধ বেয়ে পড়েছে। চোখে-মুখে হাসির ঝলক মাখানো। কাল রঙেও তাকে ভাল দেখায় ভারি। হাতের ধনুকতীরে তার প্রাণকে আরো প্রাণবন্ত করেছে। সারাদিনে তার মাঠে মাঠে নদীর তীরে ঘোরার আর অন্ত নেই। বসন্তের প্রথম পলাশ কোন্ গাছে ফুট্‌ল, শরতের শেষ শিউলি কোন ডাল থেকে ঝর্‌ল, সব খবরের খুঁটি-নাটি সে জানে।

এবার শরতে বকের পাল নদীর কোন্ তীরে বাসা বাঁধ্‌ল সেই খোঁজ নিতে সে চলেছে। সঙ্গী-সাথীর ধার ধারে না মোটেই। বিকেলের পড়ন্ত রোদে, হাতে ধনুক নিয়ে, মাথায় একরাশ চুল নাচিয়ে, আঁচল গায়ে সে একাই চলেছে। মনের মধ্যে এলোমেলো অনেক কথাই সে ভাবে। ওপারে ধবধবে সাদা এক দল বক উড়ে এল; দুধের ফেনায় কে ধোয়ালে ওদের গা! একটা, দুটো, তিনটে—উঃ, গোনা যায় না কতগুলি যে এক সঙ্গে ওড়ে। সারির প্রথম বকটিকে ধরে আনা যায় না? উড়ে যাবে? কেন, হাতে তীর নেই? লক্ষ্য করে ছুঁড়তে কতক্ষণ! তীরের বেগের সঙ্গে ওদের ডানা পারবে পাল্লা দিয়ে? কিন্তু যদি বুকে গিয়ে লাগে? উঃ, বেচারীর কত কষ্টই না হবে। হয়ত তক্ষুনি মরে যাবে। আচ্ছা, ওর ডানা টিপ ক'রে আল্‌গা একটা তীর মারা যায় না? উড়তে পারবে না, পড়ে

যাবে তখন ধ'রে এনে একটু ঠাণ্ডা জল দিয়ে ব্যথা সারিয়ে দিলেই ত হ'ল।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। হাতের ধনুকে তীর লাগিয়ে সারির প্রথম বকের পাখা টিপ করলে কিছুক্ষণ। এদিক্ থেকে সুবিধা হ'ল না। ডান দিকে খানিকটা সরে গিয়ে এক ঝোপের আড়াল খুঁজে সেখান থেকে আল-গোছে তীরটি ছাড়ল। একসঙ্গে সব বকগুলো ডাক্‌তে ডাক্‌তে পাখা ঝট্‌পটিয়ে মাটি ছেড়ে উঠ্‌ল। কি আশ্চর্য্য! ডানায় বেঁধা তীর নিয়ে প্রথম বকটাই উঠ্‌ল সবার আগে। ব্যাধের বাচ্চা সে, মোটেই দমবার পাত্র নয়। ঘাটের কাছে নদীর ওপর হেলে পড়া তাল গাছটা বেয়ে, সেই ছোট্ট পাহাড়ে নদীর ওপারে এসে সে হাজির। ছুটে চল্‌ল তীর বেঁধা বকের উদ্দেশে। বকের পাল চলেছে সার বেঁধে ধানের ক্ষেত পার হয়ে, সবুজ মাঠ পার হয়ে, মহুয়াবনের ধার দিয়ে, রুক্ষ রাঙা পাথুরে জমির ওপর দিয়ে। সেও চলেছে ওপরে চেয়ে, ধানক্ষেতের আল ডিঙিয়ে, কাঁটাবনের পাশ কাটিয়ে, উচুনীচু ঢিবির ওপর দিয়ে। কখনো খাচ্ছে হোঁচট, পায়ে কখনো ফুটছে কাঁটা, কখনো ফুটছে ছোট ছোট পাথরের কুচি, সে দিকে দৃষ্টি নাই। বকের পাল কোথায় গিয়ে যে থামবে মোটেও তা জানা নেই। জানবার দরকারও যেন নেই। তার দৃষ্টি রয়েছে তীর বেঁধা বকের দিকে। ডানার ব্যাথায় না হোক, ক্লান্ত হয়ে ও কি এক সময় ওড়া বন্ধ করবে না। ডানা এলিয়ে পড়ে যাবে না।



ব্যাধ বালক

এদিকে দূরদিগন্তে নীলবনের মাথার ওপরে সূর্য্য পড়ল ঢ'লে। আকাশের কোলে মেঘের গায়ে, বনের ফাঁকে, গ্রামের কুটিরের চালে, বেলা শেষের রঙের ছোপ

লাগ্‌ল। মাঠের বুকের রাঙা পথ ক্রমে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে চায় যেন। ব্যাধের ছেলের ছোটার আর শেষই নেই। কখনো সন্ধ্যার আব্‌ছায়ায় আকাশের কোলে বকের সারি প্রায় মিলিয়ে আসে, আবার কখনো ছায়ার মত একটুখানি দেখা দেয়। এ যেন এক অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা তার কাছে। ক্লান্ত পায়ে ভর রাখতে আর পারে না, তবু যেন কিসের এক নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে। বাড়ী ফেরার কথা গেল ভুলে, সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন্ পথে সে চলেছে কোন্ পথে সে আবার ফিরবে কিছুই ঠিকানা নেই। জিদ তার উদ্দাম, কিশোর প্রাণের উৎসাহ তার অফুরন্ত। যে বকের ডানায় সে তীর বিঁধেছিল, আজ তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে তার পাওয়া চাইই।

একি! পাখীগুলো এ কোন্ বনের মধ্যে ঢোকে? জোনাক্‌পোকার চুমকিতে সমস্ত বনটা যেন ঝলমল করছে। আকাশের তারার রাশ আর গাছের পাতার জোনাকীর রাশে মিলে' এ কী আকাশ পৃথিবী জোড়া আগুনের ফুল্‌কির ফুলঝুরি! শিউলিবনের তলা দিয়ে, ফুলছড়ানো সাদা পথ বয়ে, সে যেন স্বপ্নে চলেছে! ফুলের হাল্কা গন্ধে প্রাণ তার ভরপুর। বনময় এক জ্যোৎস্না গলানো আভা ঝরছে। পাতার আড়ালে চাঁদকে দেখা যায় না। এদিকে তার আলোয় সমস্ত বন গেছে ভেসে। আর সব বকগুলো গেল কোথায়? তীর-বেঁধা বক ক্লান্ত পাখা মেলে এখন তার হাতের খুব কাছ দিয়েই উড়ে চলেছে। ধরা দিয়েও যেন ধরা দিতে চায় না। ক্রমে তার কানে এসে পৌঁছল ভারি মিষ্টি অথচ ভারি হাল্কা এক সুর। আরো এগিয়ে সে বুঝ্‌ল, অনেকগুলো মিষ্টি সুরের পাখী একসঙ্গে সুর মিলিয়ে কাছেই কোথাও গান গাইছে।

হাতের কাছেই বকটা ডানার এক ঝট্‌কানি দিয়ে চট্ করে বাঁদিকে ঘুরে গেল। ব্যাধের ছেলেও পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তেই বাঁদিকে ঘুরে সাম্‌নেই দেখে রক্তমাখা পাখা এলিয়ে ধব্‌ধবে সাদা বকটা পড়ে রয়েছে। হেঁট হয়ে যেমনি তাকে ধর্‌তে যাবে অমনি যেন কোন্ এক মন্ত্রে নিমেষের মধ্যে সব সুর একসঙ্গে থেমে গেল। সারা দেহ তার কেমন যেন অবশ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। নিজের পায়ে নিজের ক্লান্ত দেহের ভার সে না রাখ্‌তে পেরে কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়লো তা সে নিজেই জান্‌তে পারলো না।

চোখ মেলে যখন চাইল, দেখ্‌তে পেল তাকে ঘিরে ছোট্ট ছোট্ট গুটিকয়েক

ছেলেমেয়ে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একরাশ নানান্ রঙের নানান্ চেহারার পাখী তার চারপাশে ভীড় করেছে। কেউ টুঁশব্দটি পর্য্যন্ত করছে না; সবাই যেন তার জাগার আশায় সময় গুন্‌ছে। তাকে চোখ খুল্‌তে দেখে ছোট ফুট্‌ফুটে একটি মেয়ে এগিয়ে এল। পরণে তার কচি সবুজ রঙের শাড়ি। চুলে জড়ানো শিউলি-ফুলের মালা। কানের কাছে মুখ নামিয়ে ধীরে সে বল্‌ল, "বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, না? জল তেষ্টা পেয়েছে কি?" ঘাড় নেড়ে ব্যাধের ছেলে তাকে জল আন্‌তে বল্‌ল।

মেয়েটি ইসারা করতেই আর একটি মেয়ে জল এগিয়ে দিল। জল খেয়ে ব্যাধের ছেলের জ্ঞান ফিরে আস্‌তে লাগ্‌ল। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের সাম্‌নে ছেলেমানুষের মত সে শুয়ে আছে বুঝ্‌তে পেরে ভারি লজ্জা পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌ল। পাখীরা ব্যস্ত হয়ে পাখার বাতাস করতে সুরু করল। মেয়েটি তাকে উঠে দাঁড়াতে বারণ ক'রে বলল, "কি চাই আমাকে বল"। ব্যাধের ছেলের মাথায় ঘুর্‌ছে সেই বকের কথা। সে একটু ঝাঁঝালো গলায় বল্‌ল, "এখান থেকে তীর-বেঁধা বকটাকে কে নিয়ে গেল?"

মেয়েটি বল্‌ল, "ও বড় ব্যথা পেয়েছে, নিজের বাসায় গিয়ে একটু শুয়েছে। কি দরকার তাকে?"

ব্যাধের ছেলে—"আমি ওকে পুষ্‌ব। ও আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে। ওকে আমার ভারি ভালো লেগেছে।"

মেয়ে—"আমারও ত ওকে খুব ভালো লাগে। কৈ, আমি ত ওকে বেঁধে রাখি না। ভালো লাগ্‌লে কি বনের পাখীকে ঘরের খাঁচায় না ভরে চলে না? এই বনে আরো কত পাখী রয়েছে, আমাদের সঙ্গেই তারা থাকে। তারাও আমাদের ভালোবাসে। কত ফুল এই বনের গাছের ডালে ফোটে। রূপে গন্ধে সারাটা বন ভরপুর করে রাখে। এ বনে একটি ফুলও কেউ গাছ থেকে নিজের জন্য ছিঁড়ে আনে না, তাদের কষ্ট দেয় না। তাই এরা রোজ নিজেদের খুসিতেই হাজারে হাজারে ফোটে, গন্ধ দেয়, আবার ঝ'রে পড়ে মাটিতে। দেখ্‌বে ঘুরে বনটা একবার?"

কথাগুলো ব্যাধের ছেলের প্রাণের ভেতরে গিয়ে পৌঁছল। ভাব্‌ল, সত্যিই

ত! কি হবে বকের পালকে খাঁচায় পুরে? প্রত্যেক শরৎকালেই ত তারা আমাদের গাঁয়ের ধানের ক্ষেতে গিয়ে বাসা বাঁধে, দল বেঁধে উড়ে' বেড়ায়। প্রত্যেক বছরই ত তাদের দেখ্‌তে পাই, সবুজ ধানের ক্ষেতের গলায় যেন শ্বেতকমলের মালা। সেইত ভালো। আবার খাঁচায় পুরতে যাবার দরকার? কি হবে ওদের কষ্ট দিয়ে, যদি শেষে ওরা আমাদের গাঁয়ে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দেয়!

মেয়েটির হাত ধ'রে সে উঠে দাঁড়াল বন দেখতে যাবার জন্য। ক্লান্তি তার তখন অনেকটা দূর হয়েছে। মেয়েটি তাকে সারাটা বন ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগল। ফুল আর পাখীর অন্ত নেই। সমস্ত ঋতুর সব রকমের ফুল ফুটেছে বনে একই সময়ে! তবে শিউলি ফুলেরাই দলে ভারী বলে মনে হয়। ব্যাধের ছেলে ভাব্‌ল, বাইরে এখন শরৎকাল কিনা তাই এত শিউলি ফুলের ছড়াছড়ি। কোথাও একদল কোকিল দোয়েল ঘন সবুজ গাছের পাতার আড়ালে বসে গান গাইছে শীস্ দিচ্ছে, কোথাও আবার মাঠে ময়ুর চরে বেড়াচ্ছে দলে দলে। বনের মাঝখানে মস্ত এক পদ্মদীঘি। শ্বেতপদ্মে আর লালকমলে জল প্রায় ঢেকে ফেলেছে। কত হাঁস বক সারসের পাল তার পারে বাসা বেঁধেছে। কখনো তারা জলে নাম্‌ছে খেলা করতে, কখনো বা রোদ পোয়াচ্ছে ডানা পেতে। কারোর মনে এতটুকু ভয় নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে তাদের কত ভাব। আপনার লোক যেন তারা সবাই।

মেয়েটি ব্যাধের ছেলের অবাক্ চোখের দিকে চাইল; বল্‌ল, "দেখ ত আমরা কেমন সুখে আছি সবাই মিলে এক সঙ্গে। তোমরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যারা দূরে আছ, তোমাদের আনন্দের জন্য মাসে মাসে কত নতুন ফুল, কত নতুন পাখীর গান, কত রঙীন প্রজাপতি আমরা এখান থেকে পাঠিয়ে দিই। তোমরা খুসী হবে ব'লে কত বিপদের মধ্যেই না আমরা আমাদের আদরের সঙ্গীদের তোমাদের সঙ্গে খেলা করতে পাঠাই। তারা তোমাদের বাড়ীর দোরে গিয়ে রাতারাতি কেমন খেলাঘর পাতে।

ব্যাধের ছেলে ভাব্‌ল, তারও কতদিন এসব বিষয় মনে এসেছে। এই যে ঋতুতে ঋতুতে নানা রঙের নানা গন্ধের ফুল ফোটা, এই যে নানান্ পাখীর আসা যাওয়া, এ সব কেমন ক'রে হয় কত দিন সে ব'সে ব'সে সব ভেবেছে;

কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে এতদিন তা আন্দাজ করতে পারে নি। চাঁপাভাই পারুলদিদির গল্প শুনেছে সে ঢের, কিন্তু এই সব ছেলেমেয়েদের কথা সে কখনো স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারে নি। এদের ছেড়ে যেতে তার মন আর কিছুতেই চাইছে না। এই সব ফুলপাতা গাছপালার সঙ্গে ভাব ক'রে সে ত বেশ থাক্‌বে। বনের পাখীরা আর তাকে দেখে' উড়ে' পালাবে না। তাকেও আর তীর হাতে তাদের পেছনে ছুট্‌তে হবে না। মেয়েটির হাত ধ'রে সে বল্‌তে চাইল—"আমাকে তোমাদের সঙ্গে থাক্‌তে দেবে"? কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। কি হ'ল তার? আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। কিন্তু এ কি? সে যে তার বাড়ীতেই বিছানায় শুয়ে। কেউ তাকে সন্ধ্যে বেলা বাইরে থেকে তুলে এনেছে বোধ হয়। সমস্ত গায়ে যেন কিসের ব্যথা। বুঝ্‌ল, কাল সন্ধ্যেবেলায় বকের পিছনে অত ছুটোছুটি করার ফল।

মাথার কাছের জান্‌লাটা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখল, দূরে কচি সবুজ ধানের ক্ষেত ভোরের বাতাসে দুল্‌ছে। সে মনে ভাবল, মেয়েটির পরণে ঠিক এই রঙের শাড়ীই ত ছিল। জান্‌লার পাশ দিয়ে এক সারি সাদা বক উড়ে গেল কাশবনের দিকে। কৈ, তারা ত ওকে দেখে চিন্‌তে পারল না!

কালা

বিনয়। এই বুড়ি, আমার টাকা শোধ দিবি নে?
কৃপণ বুড়ি। কি বলছ বাবা? কিছুই শুনতে পাচ্ছিনা, আমি যে কালা।
বিনয়। আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে চল্,—ডাকতে এসেছি।
কৃপণ বুড়ি। নেমন্তন্ন খেতে যাব?—চল—চল—চল—।

—কুমারী বেলারাণী দেবী।



শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়োপাধ্যায়

মিহিদানা সরপুরিয়া ভাল ভাল মণ্ডামিঠাই
জিভেগজা রসমুণ্ডি নাওনা কিনে কার কত চাই,—
খোট্টা ভজু মোড়ের বাঁকে ফিরল যখন এইনা ব'লে,
দেখল চেয়ে পাড়ার যত ছেলেরা সব হট্টরোলে
কেউবা জোরে মারছে গুলি কেউবা তেরে লাটিম ঘোরায়,
কেউবা আবার লাটাই নিয়ে ফর্‌ফরিয়ে ঘুড়িই ওড়ায় ;
দলের সেরা নন্দা নেতাই ভজুর দেখা যেইনা পেল,
ফন্দী এঁটে ধীরে ধীরে তার কাছেতে এগিয়ে গেল ;
বল্ল ডেকে—এই ভজুয়া দাও ত দুটি বড়া বড়া
আচ্ছা দেখে টাট্‌কাবালা রসগোল্লা রসে ভরা।

ভজু তবে মনের সুখে খাবার দিয়ে তাদের হাতে
আরও কিছু বেচ্‌বে বলে রইল চেয়ে সেই আশাতে ;
রসগোল্লা যেইনা পেল নন্দ নেতাই দুই সেয়ানা,
রসটুকু সব সাপ্‌টে নিল দেখলনা কেউ ব্যাপারখানা ;

তারপরেতে বল্‌ল ফিরে—রসগোল্লার কেত্‌না দর ?
জলদি বল বেশী চাইলে ঠক্‌ব কেন খাওয়ার পর !
আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে মাথা ঘুরিয়ে চোখ নাড়িয়ে হাত,
জিভটি কেটে বলল ভজু—এ বাবুয়া ই কেয়া বাৎ !
চার পয়সামে রসগোল্লা এইত আছে বাজার দর,
বেশী কর্‌কে ক্যায়ছে বোলে সব ত জানা দুনিয়া ভর্‌ !
জবাব শুনেই অবাক মানি' বলল নন্দ সেদিক চেয়ে—
তাজ্জব কা বাৎ বলছ কেন ছোট্ট ছেলে মোদের পেয়ে !



সবখানেতে রসগোল্লা দু' দু' পয়সা মিল্‌তা হ্যায়,
নিতাই খাতা হাম্‌ভি খাতা দু' পয়সামে সবাই খায়।
এইনা বোলে মিঠাইগুলো ফিরিয়ে দিয়ে থালের 'পরে
রাঙা চোখে উঠ্‌ল তেড়ে নেহাৎ যেন রাগের ভরে ;—
বহুৎ তুমি চোট্টা আছ ছোট্ট ছেলে যেথায় পাও,
এম্‌নি ধারা ঘুরে ঘুরে তাদের থেকে ঠকিয়ে খাও।

ব্যাপার দেখে ভজু তখন উঠিয়ে বোঝা মাথার 'পরে
সোজাসুজি ফিরতি পথেই হন্‌হনিয়ে পড়ল স'রে।
রসগোল্লার রসে ভিজে নন্দ নিতাইর হাত দু'খানা
মিষ্টি হ'ল কেমনতর সে কথা ত আছেই জানা ;
এবার তবে সুযোগ পেয়ে পিছন ফিরে ঘুরিয়ে মুখ
হাতটি চেটে বুঝে নিল বিনিপয়সার রসের সুখ।

'বোধ হয়' বিদ্যালয়

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ)

মাট্রিক পরীক্ষা ত কোনরূপে শেষ করা গেল। হাপ্ ছেড়ে বাঁচলুম্ আর কি! এইবার নিমন্ত্রণ খাবার পালা।

মাসীমারা অনেক আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন—"আমাদের বাড়ীতেই কিন্তু ছুটির তিনটি মাস কাটিয়ে দিবি, শিশির।" বড় মাসীমা থাকেন পূর্ব্ববাংলার কোন্ এঁদো দীঘির পারে—যেখানে দিনের বেলায় শেয়াল ডাকে, আর ঝিঁঝিঁ পোকায় গান শোনায়। সেই জায়গায় আবার মানুষ যায়! ছোট মাসীমা থাকেন সুন্দরবনের দিকে কোন্ এক বাংলোতে। সেখানে ত বাঘ ভাল্লুকেরই বাসা। শুনেছি মাসীমার ছোট ছেলে ঝণ্টু একদিন সন্ধ্যেবেলায় বাইরের এক কুঠুরীতে জানালার দিকে পা ঝুলিয়ে পড়ছিল; এমন সময় হয়েছে কি, এক বাঘ চুপি চুপি এসে ঝণ্টুর পা ধরে দিয়েছে টান। ঝণ্টু মনে করছে হয়ত বা তার মিনি বেড়ালটাই তামাসা কচ্ছে। বাঘ যতই টানে বাইর থেকে ঝণ্টুও ততই টানছে ভেতর থেকে, আর বল্‌ছে—"হেঁইও, হেঁইও, ছেড়েদে লক্ষ্মীটি।" এভাবে টানাটানি বেশীক্ষণ চল্‌তে না চল্‌তেই ঝণ্টুর চোখে জল এসে পড়্‌ল। মেসোমশাই শব্দ শুনে এসে দেখেই ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারলেন। বন্দুকটা কাছেই ছিল। কাজেই ঝণ্টু সে যাত্রা রক্ষে পেয়ে গেল। ঝণ্টু সে দিন যখন এই গল্প ক'রে গেল তখন হ'তেই মনে করেছি ছোট মাসীমার বাড়ীকে চিরদিনের মত নমস্কার।

কাজেই পরদিন ভবানীপুর সেজো মাসীমার বাড়ীতেই রওনা হওয়া গেল।

যাবার সময় বাবা বলে দিলেন, "গাড়ীটা শিগ্‌গীর পাঠিয়ে দিস্, দরকার আছে।"

যেয়ে দেখি মাসীমার মেজো ছেলে সমর ও তার দিদি লাবী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই তারা "লজুদা, লজুদা" বলে আমাকে অস্থির করে তুল্‌লে। ছোট বেলা হ'তেই আমি লজেন্স্ ভালবাসি ব'লে ওরা আমার নাম দিয়েছিল লজেন্স্‌দা। আমি কত দিন রাগ করেছি কিন্তু ওরা কখনও শোনেনি। সমর পড়ে ফোর্থ ক্লাশে আর লাবী এবার উঠেছে সেকেণ্ড ক্লাশে।

সমর বল্লে—"একটা লজেন্স্ দাও না দাদা। তোমার পকেটে বোধ হয় নিশ্চয়ই আছে।" না বল্‌তে সাহস হ'ল না, কারণ আস্‌বার সময় এক পকেট ভ'রে নিয়ে এসেছিলুম।

মাসীমা হেসে বল্লেন—"এখনো তোর লজেন্সের নেশা ফুরাল না। তোকে একটা লজেন্সের ফ্যাক্টরীতে ম্যানেজার করে দোব। তা' হ'লে বেশ মজা হবে। তোর পেটে যাবে অর্দ্ধেকটা, আর বাকীটা বিক্রী হ'বে।"

সমরের ছোট ভাই সরোজ বল্লে—"বা রে, লজুদা'র পেটে অত লজেন্স্ ধরবে কি করে? সে দিন বাবার সাথে গিয়ে যে দেখলুম্, কত লজেন্স রয়েছে! একবারে আমাদের ঘরটা ভরে যাবে।" আমি শুধু হাস্‌লুম। না হেসে আর কি কর্ব্ব? জব্দ হ'বার ত বেশী বাকী নেই।

কিছু খাবার খেয়ে যখন সমরের কুকুরটা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি কচ্ছি তখন হঠাৎ মনে হ'ল—বাবা ত গাড়ীটা শিগ্‌গীর পাঠাতে বলেছিলেন। সমরকে জিজ্ঞেস কর্‌লুম, "আমাদের শফারটা চলে গেছে তো?" সমর বল্লে "গেছে বোধ হয়।"

সে দিন মাঠে জোর একটা খেলা ছিল। দুপুর বেলা খেতে বসে মাসীমাকে বল্লুম, "চলুন না আজ আমরা সবাই খেলা দেখতে যাই।"

লাবী বল্লে, "আমি যেতে পার্ব্বো না গো। আজ যে আমাদের স্কুলের স্পোর্টস্; আমার সেখানে যেতেই হবে।" সরোজ বলে উঠ্‌লো, "আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাবো লজুদা, আর কেউ না যাক্।"

সমরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"তুই যাবি নে রে?"

"যাবো বোধ হয়"—সে উত্তর দিলে।

আমি বল্লুম—"বোধ হয় কেন?" সমর বল্লে, "যাবোই যে সে ত একবারে ঠিক নেই; ধরনা যদি আমার অসুখই হয়ে পড়ে তবে ত আর যাওয়া হবে না।"

মাসীমা ধম্‌কিয়ে বল্লেন,—"রেখে দে তোর তর্ক ! একবার খেয়ে ওঠ্ দিকিনি। তারপর যখন যেতে হয় যাওয়া যাবে।"

খেয়ে দেয়ে আমরা যখন ক্যারম্ বোর্ডে মেতে উঠেছি তখন হঠাৎ বাবা এসে উপস্থিত। আমাকে দেখেই বল্লেন—"তোকে না গাড়ী পাঠাতে বলে দিয়েছিলুম !"

আমি বল্লুম—"সে ত পাঠিয়ে দিয়েছি।"

মাসীমা এসে বল্লেন—"না, সে গাড়ী ত শিশিরের মেশোমশাই নিয়ে গেছেন। আমাদের গাড়ীটা বিগড়ে গেছে। কোল্‌কাতার বাইরে জরুরী 'কল' পেয়ে শিশিরের গাড়ীটাই নিয়ে গেলেন। আমাদের গাড়ীটা ভাল হ'লে পাঠাবার কথা ছিল কিন্তু সেটি এখনো ভাল ক'রে উঠ্‌তে পারে নি।"

বাবা বল্লেন—"তিনি ফিরবেন কটায় ?"

"সন্ধ্যার আগে নয়"—মাসীমা উত্তর দিলেন।

বাবা একটু হেসে বল্লেন—"তা' হ'লে বেশ মজা হ'ল। সেই গাড়ীতে খুব জরুরী মোকদ্দমার কাগজ ছিল। আজ যদি তারিখ বদ্‌লাতে না পারি তবে মোকদ্দমাই ফেঁসে যাবে দেখ্‌ছি।"

সমরের উপর আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। আমি বল্লুম, "সে কি ? আমি ত মেশোমশাই বেরিয়ে যাবার আগেই সমরকে জিজ্ঞেস কল্লুম আমাদের গাড়ীটা চলে গেছে কি না। সে ত বল্লে—গেছে।" সমর উত্তর দিলে—"বাঃ রে, সে আমি কখন বল্লুম ? আমি ত শুধু বলেছি 'গেছে বোধ হয়'।"

আমি বল্লুম—"সে ত একই কথা।"

সমর বল্লে—"সে কি ক'রে হ'ল ? আমি শুধু বলেছিলুম যে সে যেতেও পারে, না যেতেও পারে। অর্থাৎ গেছে কি না আমি জানতুম্ না।"

মাসীমা রেগে বল্লেন, "রেখে দে তোর বোধ হয়, হতভাগা"। বাবার দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন, "ব্যাপার হয়েছে কি জানেন রামবাবু ? সমরের কীর্ত্তি কাহিনী শুনুন। মাস দুই হ'ল এই পাড়ায় এক ভদ্র মহিলা প্রতি রবিবারে একটি স্কুলের মত বসিয়েছেন। সেখানে সমর সরোজেরা যেত। তিনি নাকি বলেছেন যে মিথ্যা কথা কখনো বল্‌বে না। যাতে ভুলেও কখনো মিথ্যা বলা না হয় সে জন্যে প্রত্যেক কথার পিছনে 'বোধ হয়' যোগ করে দেবে। সেই থেকে সমরের সব কথাতেই 'বোধ-হয়' আছে। খাবে কিনা জিজ্ঞাসা কল্লে সে বলবে 'খাবো বোধ হয়' ? স্কুলে

যাবে কিনা জিজ্ঞেস কল্লে সে বল্‌বে 'যাবো বোধ হয়'। শিশির ত আর এ ব্যাপারটি জানেনা, কাজেই সে ওর কথাই বিশ্বাস করেছে।"

আমরা সবাই হেসে উঠলুম্। সমর লজ্জায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার পর সে আর আমাকে লজু দা বলে ক্ষেপাতে সাহস পায়নি।

(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

মূক সাথী

(কুমারী হামিদা হোসেন—গ্রাহক নং ৮৭৯)

লোহার বড় ফটক। তাহার পাশেই এক কোণে সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি একটি মুচি নীরবে নতমস্তকে আপন কাজ করিয়া যাইত। মজনু কোনও দিন ইহার ব্যতিক্রম হইতে দেখে নাই।

সেদিন রবিবার। মজনু পিতার সহিত মোটরে করিয়া সকালে বেড়াইতে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় ফটকের কাছে কি যেন নূতনত্ব অনুভব করিল। নূতন কিছু লোকের মনকে সহজেই টান দেয়। মজনুও তাই মোটর থামিবামাত্র ফটকের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে ধনপৎ সিং দারোয়ান একটি অদ্ভুত লোকের সহিত গল্প করিতেছিল। লোকটিকে দেখিয়া মজনুর কেমন সন্দেহ জন্মিল। মনের সংশয় ঘুচাইবার জন্য মজনু তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ মনের দ্বিধা দূর হইয়া গেল। মজনু আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, ঐ অদ্ভুত লোকটি তাহাদেরই ফটকের সেই একান্ত পরিচিত মুচি।

মজনু অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। মুচির একমাথা ঝাঁকড়া চুল, এবং স্বস্থান ছাড়িয়া অনেক দূর অবধি ঝুলিয়া পরা মোটা উদ্ধত গোঁফ জোড়াটি কি করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইতে পারে, তাহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

হঠাৎ মজনুর উপর ধনপৎ সিংএর নজর পরিতেই সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কেতা দুরস্ত সেলাম ঠুকিয়া সসম্ভ্রমে তাহাকে টানিয়া লইল। তাহার কোলে ঢলিয়া পড়িয়া পরম নিশ্চিন্তে মজনু শুধাইল, "ইয়ে আদমিকা এসা সুরৎ কিঁউকর হুয়া ?"

মুচির সহিত দারোয়ানজীর এতক্ষণ সেই বিষয়ই আলোচনা হইতেছিল। সে বলিল, "ইয়ে আদমি বহুৎ তক্‌লিফ্‌ পায়া।" সে ক্রমে সব খুলিয়া বলিল। এই সংসারে দাদা, মা ও একমাত্র ছেলেই মুচির সম্বল। দাদার কাছে মা ও ছেলে রাখিয়া মুচি উপার্জ্জনের আশায় এই সুদূর বিদেশে আসিয়াছিল। এই আসন্ন উন্নতির সময় সহসা দেশ হইতে তাহার দূর সম্পর্কীয় কোনও জ্ঞাতি তাহার মায়ের মৃত্যুসংবাদ ও সেই সঙ্গে তার অবোধ ছেলেটিকে লইয়া আসিয়াছে। মজনুর কিছুই বোধগম্য হইল না। সে বলিয়া উঠিল, "তোমার চুল গোঁফ আর এখন আগের মত নেই কেন মুচি ?"

ধনপৎ সিং মজনুর পিঠ চাপরাইয়া বলিল—"উন্‌লোগঁকে জাতিমে কোই মর্‌ যানেছে এসা শির মুন্‌ঢানেকা রেওয়াজ হায়।" মজনু 'ও' বলিয়া বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িল।

মুচি ধনপৎ সিংকে দুঃখের কাহিনী বলিয়া মন হাল্কা করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু কথায় কথায় তাহার বেদনা বাড়িবার উপক্রম হওয়ায় সে মলিন বস্ত্রে আপনার সজল চক্ষু দুইটি মুছিতে লাগিল। মজনুর শিশু হৃদয়ে সান্ত্বনার কোন বাণীই জোগাইল না। সে ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার ছেলে এখন কোথায় মুচি ? তাকে এনো, আমি দেখব।" কান্নায় মুচির কণ্ঠ রোধ হইয়া গিয়াছিল; সে শুধু অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দূরের একটি সুপুষ্ট বালককে দেখাইয়া দিল।

মজনুর ইচ্ছা হইল উহার সাথে আলাপ করে, উহাকে আদর করে। ছেলেটি মার্ব্বেল লইয়া আপন মনে খেলিতেছিল, মজনু গিয়া ডাক দিল, "তোমার নাম কি খোকা ?" ছেলেটি মজনুর পানে করুণ দৃষ্টি তুলিয়া মুখ ঈষৎ বিকৃত করিল মাত্র। মজনু তাহার কোনই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না।

দূর হইতে মুচি বলিয়া উঠিল—"ওর নাম লালু, ও তো কথা কইতে পারে না খোকা বাবু, ও যে জন্মাবধি বোবা!"

মজনু বড়ই অপ্রস্তুত হইল এবং সমবেদনায় তাহার নয়ন সজল হইয়া

উঠিল। লালুর সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতে সে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহাকে বোবা দেখিয়া খুবই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

* * *

বসন্ত কাল। মজনুদের বাগানে রঙ বেরঙের ফুলের সার এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তখন গোধূলি লগন। মজনু অতি সন্তর্পণে লঘু পদ-বিক্ষেপে এক রবারের 'গুলাল' হস্তে বাগানে প্রবেশ করিল। তখন আর সেখানে কেহ ছিল না, মালির জলসিঞ্চন কাজ আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে। মজনু দেখিল সামনে গাছের উপর একটি দোয়েল পাখী। সে পকেট হইতে মার্ব্বেল বাহির করিয়া গুলালে বসাইয়া স্থিরভাবে দোয়েলকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়িয়া দিল।

অব্যর্থ লক্ষ্য! শীষ থামিয়া পাখী উড়িবার চেষ্টায় কিছু দূর গিয়াই পড়িয়া গেল। মজনু দেখিল না, আপন খেয়ালে অন্য পাখীর সন্ধানে ব্যস্ত হইল।

বাগানের অনতিদূরেই ফটক। লালু অধীর ভাবে এতক্ষণ মজনুর কাজ দেখিতেছিল। দোয়েলকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ততক্ষণে মজনু অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে। সংজ্ঞা-হারা পাখীর অবস্থা দেখিয়া লালু কাঁদিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই সে নিজেকে সংবরণ করিয়া, সযতনে পাখীটিকে তুলিয়া লইয়া, পিছনে চাহিতে চাহিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। কি জানি মজনুর নিকট ধরা পড়িয়া পাছে তাহাকে পাখী ফিরাইয়া দিতে হয়।

* * *

লালুর সাথে মজনুর ভাব খুবই জমিয়া উঠিয়াছে। লালুকে না পাইলে মজনুর কোন খেলাই সম্পূর্ণ হয় না। আজকাল সব কিছুই তাহার বেশী বেশী চাই, নইলে লালুকে যে ভাগ দেওয়া যায় না। এই হাবা সাথীটির কথা আকারে ইঙ্গিতে মজনু এখন বেশ বুঝিতে পারে।

প্রতিদিনকার অভ্যাস মত সেদিনও মুচি ফটকের পাশে সেই যায়গাটিতে তাহার থলি নামাইয়া কাজে বসিল। সঙ্গে লালুও আসিয়াছে। তাহার হাতেও একটি থলি। মজনু লালুর জন্যই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; তাহাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার হাতে ওটা কি লালু ?" লালুর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সভয়ে মিনতিমাখা চোখে জানাইল যে উহা মজনুর দেখিবার

মত কিছু নয়। দুঃখিত কণ্ঠে মজনু বলিল, "আমায় সত্যি দেখাবে না লালু?"

লালুর মহা ভয়, পাছে পাখীটিকে দেখিলেই মজনু মারিয়া ফেলে। তাহার ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া মজনুর ক্ষুদ্র বুকে ঝড় বহিয়া গেল। সে তাহার মনের ভাব চাপিয়া উদাসকণ্ঠে বলিল "আমাকে দেখাতে যদি তোমার কিছু আপত্তি থাকে তো আমি দেখতে চাই না।"

মজনুর কথায় লালুর মনে খুবই কষ্ট হইল। সে থলিটি মজনুর হাতে দিয়া ইসারায় মিনতি করিয়া জানাইল, "দোহাই মজনু, তুমি নিরীহ পাখীটিকে বধ করিও না।" মজনু থলি খুলিয়াই অবাক! এ যে তাহার হাতে আহত সেই দোয়েল পাখীটি! সে একদৃষ্টে লালুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। বুঝিল যে লালুর মহত্বেই আজ পাখীটি জীবিত আছে। সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন একে তুমি কি করতে নিয়ে এলে লালু?"

সশঙ্কিত ভাবে লালু জানাইল যে চিড়িয়াটি একেবারে ভাল হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে তাহাকে থলির মধ্যে লুকাইয়া লইয়া আসিয়াছে; মজনুর অজ্ঞাতে তাহাদের বাগানে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে।

ব্যগ্র কণ্ঠে মজনু বলিল, "কেন, কেন, আমার অজ্ঞাতে কেন?"

সসঙ্কোচে লালু বোঝাই, "যদি তুমি মেরে ফেল—!" মনের গ্লানীতে মজনুর চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল। সে লালুর নরম হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল—"ধন্য ভাই লালু! স্কুলে প'ড়ে আমার যে জ্ঞান হয় নি, তুমি অনায়াসে আজ আমায় সেই অমূল্য শিক্ষা দিলে। মূক পাখীর জন্য তোমার প্রাণে যে ব্যথা বেজেছিল তারই কল্যাণে এবং ভগবানের দয়ায় সে এ যাত্রা রক্ষা পেল।" তবে এসো ভাই এক্ষুনি, তোমার পাখীকে বাগানে ছেড়ে দেবে এস।"

লালুর আনন্দ দেখে কে? তাহার প্রাণভরা আনন্দের ভাগ পাইয়া মজনুরও মুখ চোখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এক অনির্ব্বচনীয় সুখে। তারা বাগানে গিয়া দোয়েলটিকে থলি হইতে বাহির করিল। সুগভীর স্নেহে দু'জনে দোয়েলের মাথায় ছোট্ট দুটি চুমো দিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল একটি ফুটন্ত ফুলের গাছে।

অরুণ রাঙা পথে ফাগ ছড়াইয়া সূর্য্যদেব বাগানে উঁকি দিয়া বালক দুইটির কাজ দেখিলেন, এবং মুগ্ধচিত্তে তাহাদের উপর স্নেহাশীষ বর্ষণ করিলেন। মুক্ত পাখী মনের আনন্দে শীষ দিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

গল্প-স্বল্প

এক চাকার গাড়ী—পৌষের সন্দেশে এক চাকার গাড়ীর ছবি দিয়েছিলাম।

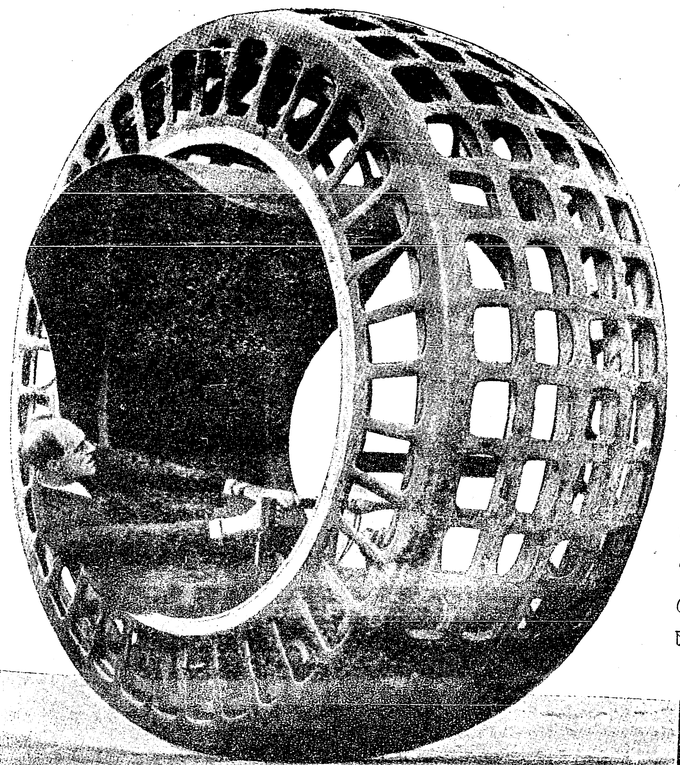

এবারও এক চাকার গাড়ীর ছবি দিচ্ছি, কিন্তু এ ই গা ড়ী র চাকাই সব,—গা ড়ী ত্ব আ র কি ছু না ই। চাকার মধ্যে লোক ব'সে একে চালায়, চাকাটি গড়িয়ে চলে; ভিতরের মানুষ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গড়ায় না; সে সর্ব্বদা চাকার নীচের দিকেই থাকে। ছবিতে দে খ, চা ল ক চাকাটিকে মোড় ঘো রা চ্ছে ন। চাকাটির বেগও মন্দ নয়;—ভাল রাস্তায় ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলও চলে।

মুখোস-মেলা—জাপানে যেমন মুখোস নাচের চল্ আছে, অন্যান্য কোন কোন দেশেও সে রকম মুখোস-নাচ আর মুখোস-মেলার চল্ আছে। কোন কোন দেশে বিশেষ দিনে অদ্ভুত মুখোস প'রে লোকে তামাসা দেখায়। সুইজার‍্যাণ্ডে এই রকমের মেলা হয়; তা'তে মস্ত বড় আর অদ্ভুত মুখোস প'রে লোকে রাস্তায়-ঘাটে তামাসা দেখায়। ছবিতে দেখ, 'পুলিশ-মুখো' রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ীর ভিড় সাম্‌লাচ্ছে। শ্যাম-দেশে মুখোস-মেলা এবং মুখোস-নাচ বছরে কয়েকবার হয়; আফ্রিকার নানা দেশেও মুখোস-নাচের চল্ আছে;—তবে আফ্রিকার মুখোস-নাচওয়ালারা অনেক সময়েই ভূত তাড়াবার উদ্দেশ্যে নেচে থাকে।

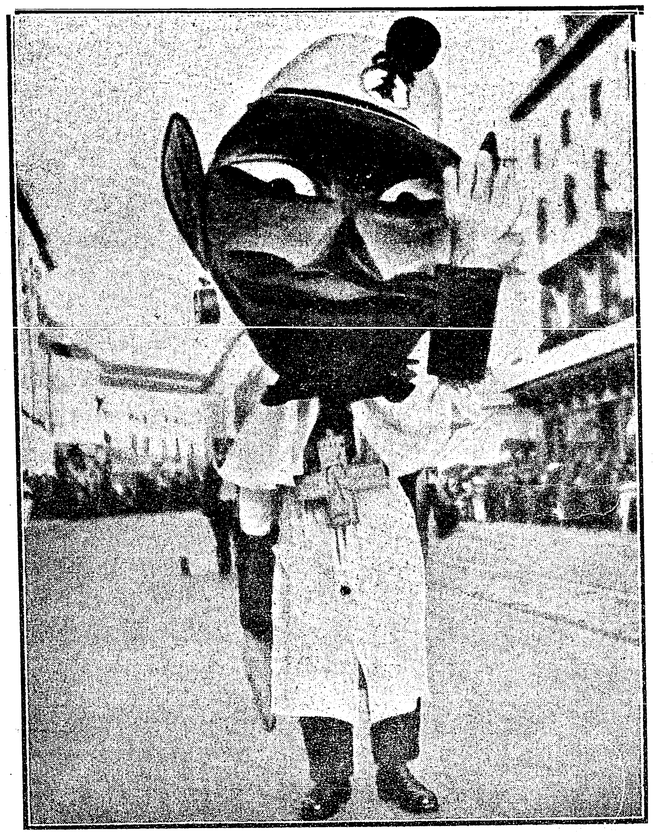

চোরেরা গেল কোথায়?—স্পষ্ট দেখা গেল, একজন দাগী চোর মোটরে চ'ড়ে রওয়ানা হয়েছে। তার পিছন পিছন পুলিশ মোটর নিয়ে রওয়ানা হ'লো; খানিক দূরে গিয়ে চোরের মোটরটাকে ধ'রেও ফেল্‌ল। কিন্তু কৈ? চোর তো নাই সে মোটরে! গেল কোথায়? পুলিশ তো একেবারে অপ্রস্তুত। দু'চার বার এরকম ঘটনা ঘট্‌বার পর থেকে পুলিশও সতর্ক হ'য়ে গেল। এবার মোটর ধর্‌লে তারা আর ভিতরে দেখেই সন্তুষ্ট হয় না; ইঞ্জিনের ঢাক্‌নি খুলেও দেখে। তা'র ফলে একটি চোর সেদিন ধরাও পড়েছে। বেচারা দিব্য আরামে শুয়ে শীতের দিনে এঞ্জিনের গরমে আগুন পোহাচ্ছিল; পুলিশ এসে তা'কে টেনে বের কর্‌ল। আরেকবার, একটি দুই সীটার (2 Seater) গাড়ীতে ৪ জন চোর লুকিয়ে পালাচ্ছিল, —দু'জন ব'সে ছিল ঠিক চালকের বস্‌বার

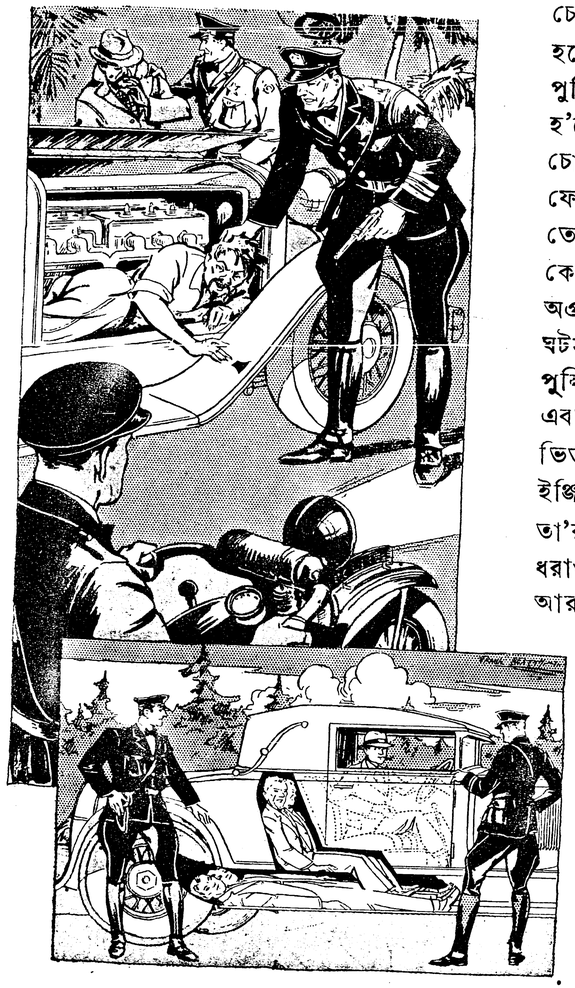

জায়গার নীচেই, আর দু'জন তা'র নীচে শুয়েছিল। পুলিশ কিন্তু হার্‌বার পাত্র নয়;—তা'রা চারটি লোককেই খুঁজে বের করেছিল। ছবিতে দেখান হয়েছে, কি ভাবে চোরেরা মোটরে লুকিয়ে পালায়। অবিশ্যি এ সব ঘটনা আমাদের দেশে ঘটে নি, এগুলো ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে হয়েছিল।



চুম্বকের কাজ—ছবিতে যে মস্ত চোঙার মত জিনিষটি দেখ্‌ছ, ওটি হচ্ছে একটা চুম্বক। এই চুম্বকটির বিশেষ কাজ হচ্ছে, চোখের ভিতর থেকে লোহার কুচি টেনে বের করা। এর জোর এত বেশী যে প্রকাণ্ড ইস্তিরিকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

ধাঁধার উত্তর

১। তেলের পিপা—২০ সের চিহ্নিত পিপাটায় তিল তেল ছিল। বাকীগুলির মধ্যে সে ১৫ ও ১৮ সের চিহ্নিত পিপা দু'টি প্রথম লোককে বেচেছিল, এবং ৩১, ১৯ ও ১৬ সের চিহ্নিত পিপা তিনটি দ্বিতীয় লোককে বিক্রি করেছিল।

২। উনপঞ্চাশ তারা—১২টি সোজা লাইনে তারাগুলি কি করে কাট্‌তে হবে পাশের ছবিতে দেখান হয়েছে।

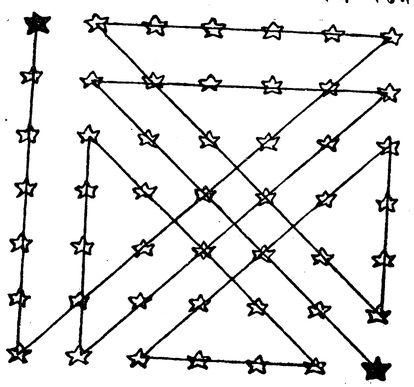

—*—

নূতন ধাঁধা

চোর ধরা—এক পাহারাওয়ালা রাত্রে রাস্তার চৌমাথায় পাহারা দিচ্ছিল, একটি লোক তার পাশ দিয়ে চ'লে গেল। লোকটি যখন পাহারাওয়ালার কাছ থেকে ২৭ পা এগিয়ে গেছে, তখন তাকে চোর ব'লে সন্দেহ ক'রে পাহারাওয়ালা তাকে তাড়া করল।

চোরও পালাচ্ছে, পাহারাওয়ালাও পিছনে চলেছে। পাহারাওয়ালা যতক্ষণে ৫ পা চলে, চোর যায় ৮ পা। তবে পাহারাওয়ালার পাগুলি বড় বড়, সে দু'পা চ'লে যতটা পথ যায় চোরের সেটুকু যেতে লাগে ৫ পা।

তোমরা বল দেখি পাহারাওয়ালা কয় পা গেলে চোরকে ধরতে পারবে?

দশ বেড়াল—এই বৃত্তের মধ্যে ১০টি বেড়াল আছে। বৃত্তটির মধ্যে আর ৩টা ছোট বৃত্ত এঁকে বেড়ালগুলিকে এমন ভাবে আলাদা করে ফেলতে হবে, যাতে প্রতি ঘরে মাত্র একটি ক'রে বেড়াল থাকবে, এবং কোন বেড়াল লাইন পার না হয়ে অন্য বেড়ালের কাছে যেতে পারবে না।

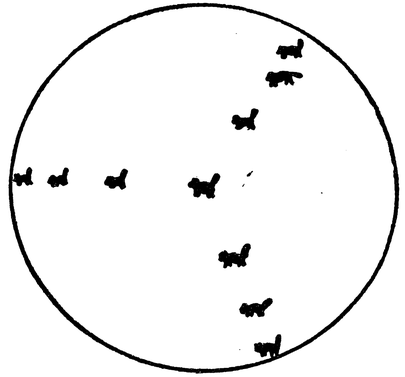

দি সান্ অপ্‌টিকাল কোম্পানি

নিখুঁত চোখ পরীক্ষা
এবং চশমা ফিটিংএর
— জন্য অদ্বিতীয় —

২৪।১ কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—বড়বাজার ২১৬৫

নূতন সংস্করণ! নূতন সংস্করণ!

সচিত্র

মহাভারতের গল্প

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত
৩য় সংস্করণ। দাম—১।০

মহাভারতের ৬৬টি বাছাই সুন্দর সুন্দর গল্প, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অতুলনীয় সরস ভাষায় লেখা। তাঁহার নিজের আঁকা একখানি ৩-রঙের ছবি ও অনেক গুলি এক-রঙের ছবিতে বইখানি আরো মনোরম হয়েছে। ছেলেমেয়েদের অতি সুন্দর বই। ঝকঝকে পরিষ্কার ছাপা; চমৎকার বোর্ড বাঁধাই।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,
১১৭।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"জোড়া-কথা-ছাড়া বই" সিরিজের প্রথম পুস্তক

ভেক রাজকুমার

শ্রীবিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ, বি-এ প্রণীত

বাংলা দেশের শিশুসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব জিনিষ

এই বইখানির পরিকল্পনা এবং রচনা করিয়া বিনয়বাবু বাংলা দেশের শিশুসম্প্রদায়ের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এমন কৌশলে এ বইখানি রচিত হইয়াছে যাহাতে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকবালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাদের মাত্র অক্ষর পরিচয় হইয়াছে তাহারাও এ বইখানির দ্বারা জ্ঞান এবং আনন্দ লাভ করিবে। সমস্ত পুস্তকটিতে এমন একটি কথাও ব্যবহার করা হয় নাই যাহাতে যুক্তাক্ষর আছে। যুক্তাক্ষর-যুক্ত কথাকে হসন্তের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া অযুক্ত করিয়া লইলে শিশুদের মনে বানান সম্বন্ধে পরে গোলযোগ ঘটিতে পারে। এ পুস্তকে সে প্রথা অবলম্বন করা হয় নাই, কারণ এ পুস্তকে ব্যবহৃত সকল কথাই যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত। কিন্তু তাহাতে ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও বাধা পায় নাই।

এই বইখানি শিশুদের হস্তে পড়িলে এক সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি এবং কল্পনাবৃত্তি উন্মেষিত হইবে। বইখানিতে যে রেখাচিত্রগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রঙ্ লাগাইবার প্রণালীও নির্দ্দেশ করা আছে। ছবিগুলিতে রঙ ফলাইবার সুযোগে শিশুদের শিল্প-বোধ বিস্তার লাভ করিবে। মূল্য তিন আনা।

প্রকাশক—বিচিত্রা নিকেতন, ২৭।১ ফরিয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

যতীন বাবুর
লেখা আরো ৪ খানা ভাল বই

যাদুকর
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
আট আনা

চিচিং ফাঁক
আট আনা

আঁধার রাতের
মুসাফির
আট আনা

সোনার-ঘড়া
চৌদ্দ আনা

— মনে আঁচর রেখে যাওয়া গল্প—
—চোখে ছাপ রেখে যাওয়া ছবি—

যতীন সাহার লেখা
সমর দের আঁকা

"ঝিকিমিকি"

এনে দেবে তোমাদের মনে সত্যিকারের ছাপ

শিগ্‌গীরই বেরুবে!
দাম আট আনা

সমস্ত বড় বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ উপহারের বই

রত্নদ্বীপ (সচিত্র)

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত

প্রাইজের জন্য ডিরেক্টর কর্ত্তৃক অনুমোদিত

২য় সংস্করণ—মূল্য ॥৵০ আনা

গৃহে, জঙ্গলে, সাগরে, দস্যু তস্করের মধ্যে বালকের অসীম সাহসিকতা ও কর্ম্মতৎপরতার কাহিনী পড়িয়া ছেলেদের মন সাহসে ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিবে। R. L. Stevenson এর Treasure Island-এর গল্প—অতি চিত্তাকর্ষক। ভাল কাগজে ঝকঝকে ছাপায় ও সুন্দর সুন্দর ছবিতে বইখানি সুশোভিত।

সচিত্র

সাঁওতালী উপকথা

শ্রীমতী নির্ম্মলা রায় প্রণীত

কত যে সুন্দর তাহা না পড়িলে বোঝান যায় না। সরল সিধা সাঁওতালদের উপকথাগুলি অতি মনোরম। তাহার উপর গল্পের ভাষা ও পদ্ধতি এমন চমৎকার যে, পড়িলে মন আনন্দে ও শান্তভাবে ভরিয়া উঠে। বহু সুন্দর সুন্দর ছবিতে, উৎকৃষ্ট কাগজে ও ঝকঝকে ছাপায় বইখানি ছেলেমেয়েদের উপহারের পক্ষে অতুলনীয়। মূল্য ॥০ আট আনা।

সচিত্র

২য় সংস্করণ **ছেলেদের কাদম্বরী** মূল্য ।৵০

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত

বাণভট্টের সুবিখ্যাত পুস্তক হইতে ছেলেদের অনুপযোগী স্থানগুলি বাদ দিয়া, অতি সুন্দর সরল ভাষায়, ছেলেদের মত করিয়া লেখা। সমস্ত গল্পটি একখানি ছবির মতই সুন্দর। পরিষ্কার ছাপা ও চমৎকার চমৎকার ছবিতে বইখানি অতি মনোরম।

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম্-এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের জন্য
কয়েকখানি বাছাই বই

এগুলির পরিচয় ছেলেমেয়েদের কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যেমনি সরস সুন্দর ভাষা, তেমনি চমৎকার চমৎকার এক রঙের ও ৩-রঙের ছবি। মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত, এবং ডিরেক্টর-অব-পাবলিক-ইনস্ট্রাকসন কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র ...	॥০	কথাসরিৎ সাগর ...	॥৵০
,, বেতাল পঞ্চবিংশতি	॥০	রবিন্ হুড্	॥৵০
,, বত্রিশ সিংহাসন	॥০	ওডিসিয়ুস	।৵০
পুরাণের গল্প ...	॥০	ইলিয়াড	।৵০

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

নূতন সংস্করণ

স্বাস্থ্য

পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত

১। পড়া শুনা ।৵০
২। খেলার পড়া ।৶০

স্বাস্থ্যের কথা ছেলেমেয়েদের জন্য অতি সরল সরস ভাবে লেখা। ভাল কাগজে, বড় অক্ষরে, পরিষ্কার ছাপা। অনেকগুলি ছোট ছবি, সুন্দর মলাট। মূল্য—ছয় আনা

বই দুইখানির নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম-এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Regd. No. C 700.



উড্ ওয়ার্ডের

গ্রাইপ ওয়াটার

চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

ইহা শিশুদিগকে সুস্থ রাখে।

WOODWARD'S
GRIPE WATER

I-WW 0-111A W. WOODWARD LTD., LONDON, ENGLAND



COLOURED DOCUMENT.

—দেশনায়কগণের অভিমত—

যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য

দেশপূজ্য
৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির
অভিমত

"আমি মিঃ এইচ, বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে ইহাই ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।"

স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জননেতা
লালা লাজপৎ রায়ের
অভিমত

"আমি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি মিঃ এইচ, বসুর "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" বাস্তবিক ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধ অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"

স্বাঃ লালা লাজপৎ রায়

কেশতৈল—কুন্তলীন, কোকোলীন, ম্যাকেসার, চামেলীন প্রভৃতি।

হেয়ার লোসন—দেলখোস, দিলতোষ, হার্টস্ ডিলাইট, প্রভৃতি।

পমেটম—দেলখোস পমেড, গোলাপ ও বকুল পমেটম প্রভৃতি।

এসেন্স—দেলখোস, হোয়াইট রোজ, অপরাজিতা, বকুল, মাস্ক, যুঁই, বেলা, চামেলী, খস, অরিগ্যান প্রভৃতি নানা সিরিজের বিবিধ প্রকার সুগন্ধি।

নানাবিধ অটো, হেয়ারওয়াস, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, লাইম যুস ও গ্লিসারিন ক্রীম এবং স্নো প্রভৃতি।

সাবান—হোয়াইট রোজ, চন্দন, খসখস, মাস্ক, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ ফলের সিরাপ।

বিশ্ববরেণ্য
রবীন্দ্রনাথ
বলেন

'কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহারে একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক
৺ মতিলাল নেহেরুর
অভিমত

"ভারতবর্ষের প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এইচ, বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

এইচ, বসু. পারফিউমার,
৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ইউ রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ছেলেমেয়েদের সুন্দর উপহারের বই

এই বইগুলি ছেলেমেয়েদের যে কত প্রিয় তা এদের এতগুলি সংস্করণ থেকেই বোঝা যায়। সরল সুন্দর লেখায়, চমৎকার চমৎকার ছবিতে, ঝরঝরে ছাপায়, বইগুলি ছেলে মেয়েদের বিশেষ উপযোগী।

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

ছেলেদের রামায়ণ

এরূপ সুন্দর ভাবে সরল ভাষায় বইখানি লেখা যে ইহার মত ছেলেমেয়েদের রামায়ণ আর নাই। ৮ খানি হাফটোন ছবি, ১ খানি রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

২০শ সংস্করণ। দাম ॥৵০

ছেলেদের মহাভারত

এখানিও ছেলেমেয়েদের একখানি অতুলনীয় বই। মহাভারতের মূল গল্প উপেন্দ্র বাবুর সুন্দর সরস ভাষায় লেখা। ৮ খানি হাফটোন ছবি, কয়েকখানি অন্যান্য ছবি, ১ খানি রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

১৮শ সংস্করণ, দাম ১॥০ টাকা

টুনটুনির বই

ছেলেমেয়েদের অতি সুন্দর গল্পের বই। ২৭টি চমৎকার গল্প, ৩০ খানি মজাদার ছোট ছবি, ও রঙ্গিন মলাট।

১১শ সংস্করণ, দাম ॥০ আনা

৺সুকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

আবোল তাবোল

পাতায় পাতায় হাসি, পাতায় পাতায় মজার ছবি! মোটা কাগজে সুন্দর ছাপা, চমৎকার রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট। ছেলে-মেয়েদের উপহারের এমন বই আর নাই।

৪র্থ সংস্করণ। দাম ৸৵০

হ-য-ব-র-ল

নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এমন মজার বই খুব কম। পড়িতে পড়িতে হাসির চোটে পেটে খিল ধরিবে। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বই। রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট, সুন্দর ঝকঝকে ছাপা।

দাম ।৵০ আনা।

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

গল্পের বই

২০টি মজার গল্প, ১৬ খানি সুন্দর হাফটোন ছবি। ১ খানি রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট।

৯ম সংস্করণ। দাম ॥৵০

আরো গল্প

১৫টি সুন্দর গল্প, ১৬ খানি চমৎকার হাফ-টোন ছবি। ১ রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

৮ম সংস্করণ। দাম ॥৵০

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

COLOURED DOCUMENT.

"সন্দেশ"এর নিয়মাবলী

আশ্বিন হইতে "সন্দেশ"-এর বৎসর আরম্ভ হয়।

"সন্দেশ"-এর বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৷৵০ ; প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।
চার আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

ভিঃ পিঃ খরচ আলাদা। টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়াই ভাল।

সন্দেশ মাসের ১লা বাহির হয়। কোন গ্রাহক সময়মত সন্দেশ না পাইলে, ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। তাহার পরে প্রতিখানার আলাদা দাম লাগে।

চিঠিপত্র, টাকা পয়সা, লেখা প্রভৃতি সবই নীচের নামে পাঠাইবেন। অন্য নামে পাঠাইলে অসুবিধা হয়।

ম্যানেজার, "সন্দেশ"

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রত্নমেশা

যখন
প্রথম বের হয়
তখন
সন্দেশের গ্রাহকেরা
কিনেছিল সকলেই।
প্রথম সংস্করণ কয়েক খণ্ড
এখনও আছে।
নতুন গ্রাহকেরা সত্বর হও।
দাম একটাকা

ইউ রায় এণ্ড সন্স,
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুভা (সচিত্র)

শ্রীসুখলতা রাও প্রণীত

ছেলেমেয়েদের একখানি নূতন ধরণের নাটক।

খেলাচ্ছলে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, নানা নীতিকথা এমন চমৎকার সুললিত ভাষায় লেখা যে পড়তে বস্‌লে শেষ না ক'রে উঠা যায় না।

দাম ।৵০ ছয় আনা।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
ওস্তাদী মার-প্যাঁচ	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...		৩২৩
হানাবাড়ী	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	...		৩২৫
তরুণের অভিযান	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	...		৩৩১
খিচুড়ী	শ্রীসত্যগোপাল সরকার	...		৩৩২
বিজলী বাতি	শ্রীসুবিনয় রায়	...		৩৪০
দাড়ির দাম	শ্রীহিমাংশুভূষণ সেন গুপ্ত	...		৩৪৩
অজানা কুটুম	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...		৩৪৫
ডিক্ ও ভুতুড়ে বাড়ী	শ্রীদেবব্রত রায় চৌধুরী, এম্-বি			৩৫২
নবীনের গান	শ্রীশিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	...		৩৫৯
জগুর দান	কুমারী সাধনা সরকার	...		৩৬১
গল্প-স্বল্প	...	...	...	৩৬৪
বন্ধু হারা	...	...	...	৩৬৮
ধাঁধার উত্তর	...	...	...	৩৬৯
নূতন ধাঁধা	...	...	...	৩৬৯

বাঁধানো "সন্দেশ"

পূর্ব্বের কোন কোন বৎসরের বাঁধানো সন্দেশ এখনো আছে—
১৩২৭, ১৩২৮, ১৩২৯ ও ১৩৩০ সাল —প্রতিখণ্ড, ১৷৷০
নব পর্য্যায়, ১ম বর্ষের (১৩৩৮-১৩৩৯) বাঁধানো সন্দেশ—৫৮০ পৃষ্ঠার প্রকাণ্ড বই—
১৭ খানি রঙিণ ছবি, এবং ৩০০ খানির বেশী ১-রঙা ছবি—দাম ২৲ টাকা
সন্দেশ কার্য্যালয়—১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

COLOURED DOCUMENT.

"জোড়া-কথা-ছাড়া বই" সিরিজের প্রথম পুস্তক

ভেক রাজকুমার

শ্রীবিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ, বি-এ প্রণীত

বাংলা দেশের শিশুসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব জিনিষ

এই বইখানির পরিকল্পনা এবং রচনা করিয়া বিনয়বাবু বাংলা দেশের শিশুসম্প্রদায়ের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এমন কৌশলে এ বইখানি রচিত হইয়াছে যাহাতে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকবালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাদের মাত্র অক্ষর পরিচয় হইয়াছে তাহারাও এ বইখানির দ্বারা জ্ঞান এবং আনন্দ লাভ করিবে। সমস্ত পুস্তকটিতে এমন একটি কথাও ব্যবহার করা হয় নাই যাহাতে যুক্তাক্ষর আছে। যুক্তাক্ষর-যুক্ত কথাকে হসন্তের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া অযুক্ত করিয়া লইলে শিশুদের মনে বানান সম্বন্ধে পরে গোলযোগ ঘটিতে পারে। এ পুস্তকে সে প্রথা অবলম্বন করা হয় নাই, কারণ এ পুস্তকে ব্যবহৃত সকল কথাই যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত। কিন্তু তাহাতে ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও বাধা পায় নাই।

এই বইখানি শিশুদের হস্তে পড়িলে এক সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি এবং কল্পনাবৃত্তি উন্মেষিত হইবে। বইখানিতে যে রেখাচিত্রগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রঙ্ লাগাইবার প্রণালীও নির্দ্দেশ করা আছে। ছবিগুলিতে রঙ ফলাইবার সুযোগে শিশুদের শিল্প-বোধ বিস্তার লাভ করিবে। মূল্য তিন আনা।

প্রকাশক—বিচিত্রা নিকেতন, ২৭।১ ফরিয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

যতীন বাবুর
লেখা আরো ৪ খানা ভাল বই

যাদুকর
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
আট আনা

চিচিং ফাঁক
আট আনা

আঁধার রাতের
মুসাফির
আট আনা

সোনার-ঘড়া
চৌদ্দ আনা

— মনে আঁচর রেখে যাওয়া গল্প—
—চোখে ছাপ রেখে যাওয়া ছবি—

যতীন সাহার লেখা
সমর দের আঁকা

"ঝিকিমিকি"

এনে দেবে তোমাদের মনে সত্যিকারের ছাপ

শিগ্‌গীরই বেরুবে।
দাম আট আনা

সমস্ত বড় বড় বইয়ের দোকানে
পাওয়া যায়।

U. RAY & SONS

for

THE BEST QUALITY PROCESS BLOCKS—

HALFTONE, LINE,
DUO-TONE AND
3-COLOUR BLOCKS
OF ALL VARIETIES.

and

THE HIGHEST CLASS OF ART, COLOUR,
AND GENERAL PRINTING

in

ENGLISH, BENGALI,
ASSAMESE, HINDI,
AND ORYIA, ETC.

Office:—117-1, Bowbazar Street, Calcutta.

PHONE: B.B. 2211 TELE: "RAYTONE", CALCUTTA.

ডোঙ্গরের বালামৃত

বালকবালিকার পক্ষে যথার্থই অমৃততুল্য।

ইহা শিশুদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরে বলসঞ্চার করে। ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক। ইহা পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাশি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট; অনেকের ধারণা ইহা 'ফুড' বিশেষ। বস্তুতঃ ইহা অতি উপাদেয় সুমিষ্ট ঔষধ। বর্দ্ধনশীল শিশুদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা চলে।

মূল্য প্রতি বোতল এক টাকা মাত্র।
সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটর—

কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং
BOMBAY, Girgaon.

DONGRE'S
BALAMRIT



IDEAL TONIC FOR CHILDREN.



বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্

ধূলো বালি ঘাটা ছেলেদের স্বভাব।



ধূলাবালি থেকে নানা রকম সংক্রামক চর্ম্মরোগের সৃষ্টি হয়। ছেলেপিলেদের গা হাত পরিষ্কার করতে ও স্নান করাতে

মার্গো সোপই

সব চেয়ে ভাল। এতে বীজাণু নষ্ট হয়, অথচ অন্য ওষুধযুক্ত সাবানের মত গা জ্বালা করে না।

ছোটদের নরম শরীরের জন্য স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর ফেনাযুক্ত মার্গোসোপই উপযোগী; মার্গো-সোপ সুন্দর:গন্ধযুক্ত ও ব্যবহারে আরামদায়ক।

ক্যালকেমিকো'র

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট—সর্দ্দিজ্বরের জন্য।
মাগুর্য়েণ্টাম—ঘা পাঁচড়ার জন্য।
টাইকোসোডা ট্যাবলেট—অম্বল ও পেটফাঁপা প্রভৃতিতে।
ছেলেমেয়েদের ঘরে সব সময় রাখা দরকার—বিশেষ করে শীতের দিনে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড।

COLOURED DOCUMENT.



COLOURED DOCUMENT.



ওস্তাদী মার-প্যাঁচ

—শিল্পী শ্রীসমর দের সৌজন্যে



নব পর্য্যায়
৩য় বর্ষ

বৈশাখ, ১৩৪১

৮ম সংখ্যা

ওস্তাদী মার-প্যাঁচ্

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

শিখে গেছি ওস্তাদী মার্-প্যাঁচ্ যত,
ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ ছড়্ টানি দস্তুর মত।
হুম্ বাবা, শুনে যাও কালোয়াতী খাঁটি,
বেহালার কসরত্ দ্যাখো পরিপাটি!

ভৈরবী, মালকোষ, মূলতান, পিলু,
শোনো যদি, মগজের নড়ে যাবে ঘিলু;—
এই শোনো আলাইয়া, এই শোনো টোরী,
হাম্বির, খাম্বাজ, কাফি, আশাবরী।

COLOURED DOCUMENT.

ছত্রিশ রাগিণীর তানালাপ শুনে,
বত্রিশ পাটি দাঁত বের হবে গুণে।
তালকাণা যত সব আনাড়িরা এসে—
গিট্‌কিরি শুনে দেবে টিট্‌কিরি শেষে।

দুঃখ যে, মূর্খেরা কিছু নাহি বোঝে,
সস্তার ছেঁদো গান শুধু তারা খোঁজে।
ওস্তাদ মিয়াজান্ দিল্লীতে আছে—
কিছুদিন সাগ্‌রেদী করি তার কাছে।

দু'দিনেই ক্ষমতার পাইয়া আভাষ,
হেঁকে কয় ওস্তাদ—"সাবাস্, সাবাস্!..."
লিক্‌পিকে ল্যাবারাম লোক নয় সোজা,
ওস্তাদী শোনো যদি তবে যাবে বোঝা।

আন্দাজে বলি নাক,—মান্দ্রাজে গিয়ে
ভেতো বাঙ্গালীর নাম এসেছি ঘুচিয়ে;
মোর বাজনার ঢং—সকলের সেরা,
শুনে থতমত খায় যত বাদকেরা।

হ্যাংলারা চিন্‌লো না বাংলার মাঝে,—
গেঁয়ো যুগী নিজ গাঁয়ে ভিখ্ পায় না যে;
ল্যাবারাম মাইতির সাঁইথিয়া বাড়ী,
সারাদেশ মশ্‌গুল্ বাজনায় তারি।

—*—



(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

— পনেরো —

সহায় রামের বিবৃতি

পাক্কা দু'দিন পরে সহায়রামের দেখা মিল্‌লো।

সহায় বল্‌লো, 'সেদিন বেঁচে গেছি বড় জোর। বাপ্‌স্! সব্বার সামনে নিজের বাহাদুরী দেখাতে গেলেই হয়েছিল আর কি!"

আমি বল্‌লাম, "তা বল্‌লেই পার্‌তে। কষ্ট যখন করেছো, তখন প্রশংসাটাও তা তোমারি পাওনা।"

সহায় বল্‌লো, "না, সব যদি শোনাতে হয় তো কেবল তোকেই শোনাব, আর কাকেও নয়।"

লাফিয়ে উঠ্‌লাম। তা হলেই তো হ'লো, অন্যরা শুনুক বা না শুনুক আমার ভারী ব'য়ে গেল। বল্‌লাম, "সত্যি? কিন্তু চাণক্যের ভাষায় বল্‌ছি সহায়রাম, মনে রেখো গোখ্‌রো সাপ নিয়ে খেল্‌ছো, অর্থাৎ, এতো গোলমাল ব-য-ব-র-ল করে দিয়েছো জিনিষটাকে আমার মাথায়, যে আমার আর.....", ব'লে মাথা নাড়্‌লাম।

"হয়েছে, হয়েছে, থাম!" ব'লে মুচ্‌কী হেসে সহায়রাম আরম্ভ কর্‌লো,—

"বছরের মাঝখানে সত্যর আসাটাই আমার ঠেক্‌লো যেন কেমন কেমন। টার্মের মাঝখানে কেউ না ঠেক্‌লে স্কুল বদ্‌লায় না। অথচ ওর এমন কোন দরকার ছিল না, যাতে ওর স্কুল বদল না কর্‌লেই নয়। সত্য ছেলেটি না বেশী দুরন্ত, না হ'য়েছিল ওর বাবা সরকারের চাকুরীতে বদ্‌লি। কাজেই অন্য কোন কারণ না থাক্‌লে ও আস্‌তো না।

"কী সে কারণ? ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, কিন্তু কোন হদিসই কি আর হয়। ওর উপর খুব কড়া নজর আমার রইলো। ওর কোন চিঠি পত্র আসে কিনা লক্ষ্য করি, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা? কেউ ওর কাছে চিঠিও লেখে না, টাকাও পাঠায় না। অথচ, ওকে টাকা ধার কর্‌তেও দেখি না। বুঝ্‌লাম নিশ্চয়ই কাছাকাছি ওর কেউ থাকে। কিন্তু মনে আছে তো, ও এসেছিল একলা, ওর সঙ্গে আর কেউ ছিল না। যদি ওর গার্জিয়ানই কেউ থেকে থাকেন, তবে তিনি না গেলেন ইষ্টিশানে ওকে আন্‌তে, না নিয়ে এলেন ওকে সঙ্গে ক'রে। এর কি কারণ হ'তে পারে? ভেবে দেখ্‌লাম এর একটি মাত্র কারণ থাক্‌তে পারে, সেটি হ'লো সত্যর আসল পরিচয় গোপন রাখা।"

আমি বল্‌লাম, "কিন্তু স্কুলের রেক্টরের কাছে জিজ্ঞেস করলেই তো সব জান্‌তে পার্‌তে সহায়রাম।"

সহায় বল্‌লো, "উহুঁ, তার জো ছিল না। কালীপদ বাবু রেক্টরের সঙ্গে দেখা ক'রে ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন। কারও কাছে বলা বারণ, কারণ এ সাবধানতাটুকুর উপরে সত্যর জীবন আর রায়দের ভাগ্য নির্ভর কর্‌ছিল। জিজ্ঞেস ক'রে শুধু এই বুঝ্‌লাম যে রেক্টর চান আমি যেন ওর উপর খুব কড়া নজর রাখি। যা হোক আমার এখন একমাত্র উদ্দেশ্য হ'লো ও কি রকম ক'রে ওর এই গার্জিয়ানের কাছে খবর পাঠায় তা জান্‌তে হবে। কারণ তা হ'লেই ওর গার্জিয়ানকে ধরা সহজ হবে, আর সত্যর আসল পরিচয়ও আমার কাছে অজানা থাক্‌বে না। তাই রাত্রে আমার ঘুম হ'তো না, সারা রাত জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাক্‌তাম, নতুন কিছু ঘটে কি না। আর সে দিন জুটেও গেল।

"তোমরা যখন তোমাদের ঘর থেকে হানাবাড়ীর ভূতকে দেখ্‌ছিলে তখন আমিও আমার ঘর থেকে তাকে দেখ্‌ছিলাম। হঠাৎ যেন আমার মনে হ'লো সত্যর সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধই কি নেই? যদি কোন সম্বন্ধই না থাক্‌বে তবে সত্যর সঙ্গে সঙ্গে হানাবাড়ীতে ভূত দেখা দিল কেন? তাই এ সুযোগ ছাড়া গেল না, উঠে পড়লাম, বিছানাটা ঠিক ক'রে সাজিয়ে টর্চ্চ আর স্কাউট্ ছুরি নিয়ে বেড়িয়ে পড়্‌লাম। একটা গাছের ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে কোন দিক দিয়ে এগোব ভাবছি, হঠাৎ দেখি আমার পায়ের কাছে জানলায় একজন লোক। ভাবো একবার আমার অবস্থা! নিস্তব্ধ রাত, ছোট্ট একটা গাছের তলায় যে একটুখানি আঁধার তারই কোলে

আমি লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় দৈত্যের মত একটা লোক—কী বিরাট তার শরীর, আর কী হিংস্র তার মুখখানা! রইলো তোমাদের ভূত হানাবাড়ীতে, আমি চল্‌লাম সেই ডাকাতের পেছন পেছন। কি চায় সে আমার ঘরে? আমার কাছে কি চায় সে? কিন্তু বুঝ্‌তে দেরী হ'লো না। সে একবার মাত্র ভেতরে চেয়ে দেখ্‌লো, তারপর এগিয়ে চল্‌লো। প্রত্যেকটি জানালায় দাঁড়িয়ে ভেতরের ছেলেদের দেখ্‌তে লাগ্‌লো। মধ্যে মধ্যে কোটের পকেট থেকে কি বের করে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। মনে হ'লো হয়তো ছবি। রাতটা জোছ্‌না রাত, কাজেই গায়ের চাদরের উপরে মুখগুলি বাইরে থেকে বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু ডাকাত থামলো না—চার নম্বর ঘরের কাছে আসবার আগে। অনেকক্ষণ ধরে দেখ্‌লো, ছবি মেলালো,



বীভৎস মুখটা হাসিতে ভরে উঠ্‌লো। ছবিটা পকেটে ফেলে আস্তে আস্তে হানাবাড়ীর দিকে একটু গিয়েই লোকটা থমকে দাঁড়ালো। হানাবাড়ীতে সেই ভূত তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকটা একটু চেয়েই হানা-বাড়ীর দিকে বোঁ বোঁ করে ছুট্‌লো। আমি ঘুরে তোমাদের জানালার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, সত্য ভয়ে কাঁপছে। আর দাঁড়ালাম না। বুঝলাম, সত্য ডাকাত আর ভূত একই ব্যপারের এক একটি অংশ অভিনয় কর্‌ছে। সে রাত্রে তার পেছন পেছন গাছের ঝোপে ঝোপে আমি ঘুরেছি, হানাবাড়ীতে আমি গিয়েছি। কিন্তু বিশেষ লাভ হ'লো না; কেবল এইটুকু বুঝ্‌লাম, যে সত্যকে ঘিরে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র গড়ে উঠ্‌ছে। আর তার কেন্দ্র

হ'লো এই হানাবাড়ী। আরও একটা কথা আমি বুঝ্‌লাম যে এই হানাবাড়ীতে সত্যর শত্রু কিম্বা মিত্র একজন লুকিয়ে আছে। কারণ ডাকাতও বাড়ীটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছে আর আমিও হানাবাড়ীতে ভূত দেখেছি। সংশয় ভঞ্জন হ'লো পরের দিনের টেলিফোন আবিষ্কারে। কোনই সন্দেহ আর রইলো না যে হানাবাড়ীতে সত্যর কোন বন্ধু নিশ্চয়ই থাকেন। কিন্তু কে সেই বন্ধু, আর এই দুশমন চেহারার লোকটাই বা কে? আমার কেমন যেন একটু ভয় হ'লো, আমি ঈশানবাবুকে সব বল্‌লাম। ঈশানবাবু আমাকে সারা সহরটা খুঁজে দেখ্‌তে বল্‌লেন, সেই দুশমন লোকটা থাকে কোথায়। খুঁজলাম একদিন, দু'দিন, তিন দিন। খুঁজতে খুঁজতে এক দিন তাকে পেলাম কোথায় জানো?—রায়পুর হোটেলে। খোঁজ নিয়ে জানলাম ভদ্রলোকের নাম জ্ঞানাঞ্জন বসু, ক'লকাতা থেকে এসেছেন। ঈশানবাবুকে সব বল্‌লাম। উনি জ্ঞানাঞ্জনের উপর নজর রাখ্‌তে বল্‌লেন, আর নিজে একদিন হোটেলে খেতে গিয়ে আলাপও ক'রে এলেন। তারপরে ঈশানবাবুর সঙ্গে জ্ঞানাঞ্জনের খুব আলাপ হয়ে গেল। আমি তক্কে তক্কে রইলাম। এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। প্রাণ দিয়েও সত্যকে আমাদের বাঁচাতে হবে, আর যে সত্যিকারের কি বিপদ তা আমাদের জান্‌তে হবে।

"সত্যকে এর মধ্যে আমি পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলাম, সে নিজে আসল ব্যাপারের কিছুই জানে না। কাজেই তার উপর নজর আমার রাখ্‌তে হ'লো, কেবল তাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য। আমি তার কাছে আসা কার্ডগুলি পরীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম।"

আমি বল্‌লাম, "কোন্ কার্ড?"

"ওঃ, সে কথা বলিনি বুঝি? পিকনিকের দিন আমাকে ডেকে অজয় দিয়েছিল একখানা নীল কার্ড, তারই কথা সত্যগোপাল ওর সুরেনদাকে বলেছিল। তারপর রোজই প্রায় একটা ক'রে ঠিক একই রকম কার্ড আস্‌তো, কেবল রংটা বদ্‌লে যেতো। কার্ডগুলি আমি রেখে দিতাম। কিন্তু কী হ'তে পারে এর মানে? রংটা বদ্‌লানোর কোন বিশেষ ধারা আছে কি না ভাবতে গিয়ে দেখি সত্যই তো তাই। কার্ডের রং ঘোর নীল থেকে ক্রমে লালের দিকে চলেছে। ঈশান বাবু বল্‌লেন, ব্যাপার বড় সুবিধের নয়। তাই রেক্টরকে জানানো হ'লো, তিনি কালীপদ বাবুকে জানালেন! এদিকে আমরা ঠিক কর্‌লাম যেমন ক'রেই হোক, জ্ঞানাঞ্জনকে

আটকাতে হবে কিম্বা তাকে তাড়াতে হবে। যদি তাকে পুলিশের হাতে দিতে হয়, তা'হলে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে, কিন্তু তার তো কোনই উপায় নেই। তাই তার সর্ব্বস্ব চুরি করা হবে ঠিক হ'লো। স্যার একদিন জ্ঞানাঞ্জনকে আমাদের স্কুলে নিমন্ত্রণ করলেন; সে সুযোগে রহমৎ,—ও কি চম্‌কে উঠ্‌ছো যে,—আমাদের সেই পাজী, বদমায়েস, চোরের সর্দ্দার রহমৎ, তার কাগজপত্র, টাকাকড়ি সব চুরি করে নিয়ে এলো। আমরা কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লাম তাতে হানাবাড়ীর একটা প্ল্যান রয়েছে। ঈশানবাবুকে সেটা দিলাম।

"এদিকে জ্ঞানাঞ্জন বাড়ী ফিরে অবাক হয়ে গেল; সে বুঝ্‌লো তার চালাকী ধরা পড়ে গেছে, কেউ না কেউ তাকে সন্দেহ ক'রেছে। কিন্তু সে জান্‌তো তা'কে ধরা খুব সহজ নয়। তা ছাড়া, সে যা তা কর্‌তে পারে। অগাধ তার টাকা। পুলিশ তার হাতে, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে খুব জোরালো কোন প্রমাণ পাই ততক্ষণ আমরা তার কিছুই কর্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু একটু কাজ হ'লো, জ্ঞানাঞ্জন রায়পুর থেকে চলে গেল। যাবার সময় টাকা দিয়ে 'বাবু'কে হাত ক'রে গেল। স্কুলের মাষ্টার মশায়দের সে সন্দেহ করেছিল, কাজেই সেখানে তার একজন লোক দরকার।

"ঠিক এ রকম সময় আমরা সত্যর বাবার একখানা চিঠি পেলাম। তিনি একজন লোক দিয়ে এক বোতল রক্তের মত জিনিষ পাঠিয়ে দিয়ে লিখ্‌লেন, 'একটা ডামি তৈরী ক'রে যেন সত্যর বিছানায় রাখা হয়। জ্ঞানাঞ্জন এতদিন যেমন ভাবে হত্যা করেছে তার আর উপায় নেই। কাজেই সাধারণ অস্ত্রের সাহায্যই সে নেবে।' সত্যর বাবা জ্ঞানাঞ্জনকে এবার হাতে হাতে ধর্‌বেন।

"এদিকে Flash light-এ তার ছবি তোলা হবে ঠিক হ'লো।

"হ্যাঁ, ঐ রক্তের মত জিনিষটার গুণ হ'লো যে ও একবার কাপড়ে লাগ্‌লে আর ওঠেনা। কাজেই চেনা যায় খুব সহজেই। উনি এ সব ব্যবস্থা এদ্দিন ধরে কর্‌ছিলেন, আর সে জন্যই তাঁর একমাত্র ছেলেকে মৃত্যুর মুখে পাঠাতে ভয় পান নি। কাজেই আমাদের একটুও ভুল করবার জো ছিল না; আমরা প্রাণপণে খাট্‌তে লাগ্‌লাম, উৎকণ্ঠায় আমাদের দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো।

"কিন্তু শেষকালে মুস্কিল বাঁধালেন সত্যর বাবা। উনি ট্রেন মিস্ ক'রে এক ঘণ্টা দেরী ক'রে ফেল্‌লেন। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন জ্ঞানাঞ্জন পালিয়েছে, আর 'বাবু' প্লেট বদ্‌লাচ্ছে। ওঁর তাড়া খেয়ে সে আসল

প্লেটখানা ফেলেই দৌড়ল। সত্যর বাবাও দেরী কর্‌লেন না, কলকাতা ফিরে জ্ঞানাঞ্জনের সেই রংমাখা কাপড় জোগাড় ক'রে ফেল্‌লেন।

"এদিকে আমাদের ক্লোরোফর্ম্ম দেওয়া হয়েছিল ভুল। এরকম ভাবে দিলে খুব বেশী কার্য্যকরী হয় না, কাজেই সত্যর আর বীভৎস ব্যাপারটা না দেখে উপায় ছিল না। অম্‌নি সে ভীতু ছেলে। ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে গেল।"

আমি বল্‌লাম, "কিন্তু 'বাবু'র কারসাজি হরিপদ বাবু ধর্‌লেন কি করে?"

সহায় হেসে বল্‌লো, "সে ভারী মজা হয়েছে। যে কঙ্কালের ছবি উঠেছে তা হ'লো আমাদের স্কুলের স্বাস্থ্যরক্ষা ক্লাশের। তার পায়ের একটাআঙ্গুলের হাড় কম আছে, তাই প্রথমেই হরিপদ বাবুর সন্দেহ হয় যে আমাদের মধ্যেই কারও এই কাণ্ড। তারপর 'বাবু'র কথা শুনে একটু ভালো ক'রে দেখ্‌তে গিয়ে আরও একটা মজার জিনিষ বেরিয়ে পড়্‌লো। হরিপদ বাবু কি ভেবে আমাদের চোরের ছবির back ground করেছিলেন দালান, কিন্তু কঙ্কালের ছবির back ground দেখা গেল গাছ। কাজেই হরিপদ বাবু আসল প্লেট খুঁজতে ছুটলেন।

"সুরেনদা বেচারা আগের দিন রাত্রের টেলিফোনের খবর পেয়ে সকাল হ'তে না হ'তেই হোষ্টেলের আশে পাশে ঘুর্‌তে লাগ্‌লেন, যদি কিছু খবর তিনি পান। হ'লোও তাই। সত্য তল্পিতল্পা নিয়ে তার সঙ্গে পালালো।

"এ কয়দিন বসে আমি নক্সা দেখে দেখে সুরেনদার ঘর খুজে বের করেছিলাম, এবারে গিয়ে তাঁকে সব কথা খুলে বল্‌লাম।

"সুরেনদা কেঁদে ফেল্‌লেন। তাঁর যত্নে রাখা পদকটা আমায় দিলেন। নক্সায় ঘরের খবর ছিল, এবার এই পদকটা থেকে জায়গাটাও বের করে ফেল্‌লাম।

"এর মধ্যে সত্যর বাবা এসে ট্রাষ্টিদের সঙ্গে দেখা ক'রে চুপ থাক্‌তে বল্‌লেন। তারপর তো সব জানই।"

একটু চুপ ক'রে সে এক তাড়া কাগজ আমায় হাতে দিয়ে বল্‌লো, "এই হ'লো কালীপদ বাবুর ইতিহাস। পরে সময় মত প'ড়ো।"

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)



নবীন মোরা, এই পৃথিবীর তরুণ সেনানী,
ভয় ভাব্‌না বিঘ্ন বিপদ কিছুই না মানি।
জীবনটাকে নিয়ে বেড়াই হাতের মুঠাতে—
চল্‌ছি ছুটে এগিয়ে মোরা চলার নেশাতে।
রুদ্র যখন বহ্নি ছড়ান বিশ্ব জুড়িয়া—
আমরা তরুণ ঘুরে বেড়াই তামাম দুনিয়া।
ঝঞ্ঝা মাঝে জাহাজ ভাসাই উতল দরিয়া—
মৃত্যুরেও ভয় করি নাকো, আমরা মোরিয়া।
যাত্রা মোদের তুষার মরুর ঊষর বুকেতে,
আমরা থাকি অটল চির দুঃখ সুখেতে।
জীবন দিয়ে কর্ম্মে মোরা লাভ করি সিদ্ধি,
মোদের তরে হবে সকল জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি।
চলার পথে বিঘ্ন বিপদ কিছুই না মানি,
নবীন মোরা, এই পৃথিবীর তরুণ সেনানী।



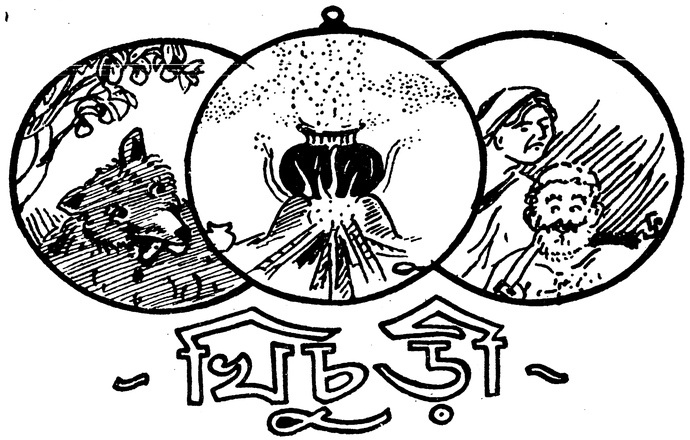

(শ্রীসত্যগোপাল সরকার)

এক বনের ধারে দু'জন কাঠুরে পাশাপাশি দুই বাড়ীতে বাস করত। তাদের একজন ছিল খুব গরীব। সে বুড়ো হ'য়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে থাকৃত শুধু সে আর তার বৌ; ছেলেপুলে কেউ ছিল না। বুড়ো কাঠুরে বনে কাঠ কেটে যা সামান্য আয় করতো, তাতেই দু'জনের কোন রকমে চ'লে যেত। অন্য কাঠুরেটির অবস্থা বেশ ভাল ছিল।

ধনী কাঠুরের বাড়ীতে একটি চমৎকার পেয়ারা গাছ ছিল, তার একটি ডাল গরীব বুড়ো কাঠুরেটির উঠানে এসে পড়েছিল। গাছটার পেয়ারাগুলো পাকলে খেতে ভারি মিষ্টি লাগ্‌ত। কিন্তু বুড়োবুড়ির কপালে তা জুটত খুব কমই। ধনী কাঠুরে ঠিক ক'রে দিয়েছিল যে, গাছে থাক্‌লে সেই ডালের ফল তার নিজের. কিন্তু পেকে মাটিতে যা প'ড়ে যাবে তা হবে বুড়ো কাঠুরের। তা হ'লেই বুঝতে পার্‌ছো, বুড়োবুড়ী কেমন ভাবে পেয়ারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাক্‌তো। তারা হাঁ ক'রে থাকতো কখন পেয়ারা দুই একটা পড়ে; আর প্রার্থনা করত—বাতাস একটু জোরে চলুক, টপ্‌ টপ্‌ ক'রে দু'চারটে পেয়ারা পড়ুক, একদল বাদুর এসে এক গাদা পেয়ারা ফেলে দিয়ে যাক্‌!'—

বুড়ীটা ছিল ভারি খিট্‌ খিটে স্বভাবের। হঠাৎ তার মনে হ'ল যে এই বেলা

কিছু জমাতে না পারলে শেষ বয়সে তাদের ভিক্ষে করতে হবে। সে বুড়োর খাবার কমিয়ে দিয়ে তাকে শুধু শুকনো রুটি খেতে দিতে সুরু করল, আর তাকে বেশী বেশী ক'রে কাঠ কাট্‌তে বলতে লাগ্‌লো। বেচারী বুড়ো অতিরিক্ত খেটে এবং খেতে না পেয়ে ক্রমে খুব রোগা হ'য়ে গেল। শেষে একদিন সে খুব রেগে গিয়ে বলল, "আমাকে আজ খিচুড়ী না খাওয়ালে আমি আর কাঠ কাট্‌তে যাবো না। রোজ রোজ শুক্‌নো রুটি খেয়ে আমার শরীরটা কি যাচ্ছে তাই হ'য়ে গেল! আজ খিচুড়ী না হ'লে আমি এই বস্‌লুম—আর নড়ছি নে!" এই ব'লে সে সত্যি সত্যি কুঁড়ের দাওয়ায় গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে প'ড়লো।

বুড়ো যখন এমনি গোলমাল সুরু ক'রে দিল, তখন বুড়ী আর কি করে? সে চাল ডাল ঘি মশলা টশলা নিয়ে খিচুড়ী রাঁধতে বস্‌লো। খানিক পরে ফুটন্ত খিচুড়ীর চমৎকার গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ায় ভেসে বুড়োর নাকে আসতে লাগ্‌লো। বুড়ো খুসী হ'য়ে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে বস্‌লো। কারণ, সেখানে বস্‌লে খিচুড়ীর গন্ধটা অবিরাম নাকে পাওয়া যায়। আঃ, কি চমৎকার! বুড়ো অনেকদিন খিচুড়ী খায় নি। তার জিভে জল এলো; সে উস্‌ খুস্‌ করতে লাগ্‌ল—কখন খিচুড়ীটা শেষ হয়, কখন খিচুড়ীটা শেষ হয়! কিন্তু বুড়ী ব্যাপার বুঝতে পেরে খেঁকিয়ে উঠ্‌লো, "উঁহু, উঁহু, ওসব চলবে না। আমি আগুন তাতে ব'সে কষ্ট ক'রে খিচুড়ী রাঁধব, আর তুমি আরাম ক'রে ব'সে থাক্‌বে? সে হবে না। খুব বড় এক বোঝা কাঠ না এনে দিলে আমি খিচুড়ী খেতেই দেবো না। খিচুড়ী যদি খেতে চাও, যাও কাঠ কেটে নিয়ে এসো। কিন্তু মনে থাকে যেন বোঝাটা বড় হওয়া চাই।"



বুড়ো বেচারী আর করে কি? সে বুড়ীর মেজাজ জানতো। একবার যখন বলেছে তখন এক বোঝা কাঠ না এনে দিলে সে সত্যি সত্যি খিচুড়ী খেতে দেবে না। নিঃশ্বাস ফেলে সে কুড়ুলটি কাঁধে নিয়ে বনের দিকে চলল।

খুব তাড়াতাড়ি সে এক বোঝা কাঠ কেটে ফেলল। খিচুড়ী খাবে ব'লে তার স্ফূর্ত্তি তখন খুব। কাঠ কাট্‌তে কাট্‌তেও সে যেন বুড়ীর খিচুড়ীর চমৎকার

গন্ধটা পাচ্ছিল। বুড়ো গুণ গুণ ক'রে একটা কি গান জুড়ে দিয়ে কাঠগুলোকে একটা মোটা লতা দিয়ে বাঁধতে লাগ্‌ল।

বোঝা বেঁধে সে সেটাকে কাঁধে তুল্‌বার উদ্যোগ করছে, এমন সময় একটা কালো ভালুক হেল্‌তে দুল্‌তে, আকাশের দিকে নাকটা তুলে, ছোট ছোট কুত্‌কুতে চোখে চাইতে চাইতে, তার সামনে এসে হাজির। তবে ভালুকটা খুব ভাল লোক ছিল বলতে হবে। কেন না, সে কাঠুরেকে মারবার চেষ্টা ক'রল না, এমন কি ভয়ও দেখাল না। বরং মোলায়েম সুরে ব'লল, "কি ভায়া, ভাল আছ তো? রোজ তোমাকে আমি আড়াল থেকে দেখি, তবে আলাপ করবার অবসর পাই নি। আজ আলাপ করবার জন্যেই এলুম। তা, অত বড় এক বোঝা কাঠ নিয়ে তুমি করবে কি?"

কাঠুরেও ভালুকের রকম সকম দেখে সাহস পেয়ে আলাপ জুড়ে দিল। সে বলল, "ওটা নিয়ে যাচ্ছি আমার বৌএর জন্যে।" তারপর সে আর চেপে রাখতে পারলো না—কি জন্যে তার বৌ অত বড় এক বোঝা কাঠের ফরমাস করেছে। খিচুড়ীর কথা মনে হ'তেই তার মুখে জল এল। ভালুক কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সে মুখের জলটা গিলে ঠোঁট দুটো দিয়ে একটা শব্দ ক'রে বলল, "মানে,—ব্যাপারটা হচ্ছে এই, যে সে আজ খিচুড়ী রেঁধেছে। আর বলেছে, যদি তাকে বেশ বড় এক বোঝা কাঠ নিয়ে গিয়ে দেই—তবেই সে আমাকে বেশ খানিকটা খিচুড়ী খাওয়াবে। আঃ, খিচুড়ী খেতে কি আরাম! কি চমৎকার গন্ধ খিচুড়ীর! তুমি তো কখনো খাওনি, তুমি জানবে কি ক'রে! আচ্ছা, আজ আমি যাই তাড়াতাড়ি। খিচুড়ী অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে।"

শুনে ভালুকটারও জিভে জল এল। সে কাঠুরেকে বল্‌ল, "আচ্ছা, এ-এ··· আমি যদি খুব বড় এক বোঝা কাঠ নিয়ে গিয়ে তোমার বৌকে দিই—তাহ'লে সে আমাকে খিচুড়ী খেতে দেবে?"

কাঠুরে ভালুকের কাছ থেকে বেশ প্রকাণ্ড এক বোঝা কাঠ খানিকটা খিচুড়ী খাইয়ে আদায় করবার ইচ্ছেয় বলল, "তা দিতেও পারে বোধ হয়—অবশ্য যদি কাঠের বোঝাটা খুব বড় হয়।"

ভালুক বলল, "আচ্ছা, চার মণ কাঠ দিলে হবে?"

কাঠুরে মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, তা কি হয় কখনো? তুমি জানো না

খিচুড়ী রাঁধতে হ'লে অনেক ভালো ভালো জিনিষ লাগে। তার খরচও অনেক। ধর না—চাল চাই, ডাল চাই, নূন চাই, তারপর ঘি চাই, তারপর কি বলে গিয়ে···!"

ভালুক বলল, "আট মণ কাঠ দিলে হবে?"



কাঠুরে বলল, "বোধ হয় না। বারো মণ কাঠ দিলে ঠিক দর হয়।"

ভালুক নিশ্বেস ফেলে বলল, "ও বাবা! সে যে অনেক!"

কাঠুরে বলল, "তেমনি যে খিচুড়ীতে কত রকম চমৎকার চমৎকার গন্ধওয়ালা মশলা লাগে! তারও তো খরচ আছে।"

ভালুকের মুখে আবার জল সরল। তার কুতকুতে চোখগুলো লোভে ও আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ঠোঁট চেটে বলল, "আচ্ছা, এই দরই রইল। বাড়ী গিয়ে তোমার বৌকে বল গিয়ে। দেখো খিচুড়ীটা যেন গরম গরম থাকে। আমি আর একটু পরেই সমস্ত কাঠের বোঝা নিয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও শীগ্‌গীর।"

কাঠুরে মহানন্দে তার বাড়ীর দিকে চলল। সে মনে মনে ভাবতে লাগ্‌ল, তার বৌ তার কত প্রশংসা কর্‌বে, যখন সে শুন্‌বে বোকা ভালুকটা খানিকটা খিচুড়ী খাবার জন্য বারো মন কাঠ তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

কিন্তু আগেই বলেছি বুড়ীটা ছিল ভীষণ খিট্‌খিটে। সে বুড়োর কোন কাজে কিছুতেই সন্তুষ্ট হ'ত না। এখন যদিও বুড়ো বাস্তবিকই একটা বড় রকম দাঁও মেরে এসেছিল, তবু সে নিজের মেজাজ অনুযায়ী বুড়োকে বকতে সুরু ক'রে দিল,—"কেন তুমি চুক্তি ক'রে নিলে না, ভালুক কতটা খিচুরী খাবে?"

বুড়ো বলল, "তার কি দরকার আছে? আমার যতটা ক'রে খাবো, তাকেও ততটাই দেবো। যতটা রেঁধেছ, সেটা তিন ভাগ করলেই তো হবে। হবে না কি?"

বুড়ী বলল, "ভাগ তো হ'তে পারে; কিন্তু ভালুক বুঝি ঐটুকু খেয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌বে? আমরা একমুঠো খেতে না খেতে সে ঐ এক হাঁড়ি খিচুড়ী সাবাড় ক'রে দেবে!"

বুড়ো ভেবে দেখল কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। সে মুখ্‌টি চূণ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল "তা হ'লে এক কাজ করা যাক্। চল্ আমরা এখন থেকেই খেতে সুরু করে দিই। তারপর তার মধ্যে যদি ভালুক এসে পড়ে তা হ'লে তাকে তার ভাগ দেওয়া যাবে। আর যদি না এসে পড়ে তা হ'লে তার জন্যে খানিকটা রেখে দিলেই চলবে।"

তখন দু'জনে খিচুড়ীর হাঁড়িটা মাঝখানে রেখে দু'ধারে দুটো থালা নিয়ে খেতে বস্‌লো। অনেকদিন তারা খিচুড়ী খায় নি। তার ওপর ভয়, ভালুক এসে পড়লে আর সাধ মিটিয়ে খাওয়া হবে না! তাই তারা খুব তাড়াতাড়ি গ্রাসের পর গ্রাস মুখে পূরতে লাগ্‌ল।

বুড়ো দেখল, হাঁড়ির খিচুড়ী খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে; যেই থালার খিচুড়ী ফুরিয়ে যাচ্ছে—অমনি দু'জনে আবার হাঁড়ি থেকে বের ক'রে নিচ্ছে। বুড়ো এক প্রকাণ্ড গ্রাস মুখে ফেলে কোন রকমে গলার আওয়াজ বের ক'রে বলল, "বুড়ী, ভালুকের কথা মনে রাখিস্।"

বুড়ী হাঁড়ী থেকে আবার দু'হাতা খিচুড়ী বের ক'রে একগ্রাস মুখে পুরতে পুরতে বলল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

তারপর বুড়ো আবার হাঁড়ি থেকে দু'হাতা খিচুড়ী ঢেলে নিল। বুড়ী ব'লে উঠলো, "ভালুকটার কথা মনে রোখো।"

বুড়োর মুখ তখন খিচুড়ীতে ভর্ত্তি। তবুও তারই ফাঁক দিয়ে কোন রকম ক'রে বলল, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।"

এই রকম ব্যাপার চলল। শেষে দেখা গেল, খিচুড়ীর হাড়িতে একটুও খিচুড়ী নেই। বুড়োর থালা খালি হ'য়ে যাওয়ায় সে আরও একটু খিচুড়ী নেবে ব'লে হাতটা হাড়িতে ডুবালো। কিন্তু বেরুল না কিছুই। বুড়ো হাড়ির ভেতর উঁকি মেরে দেখে সব শেষ! মুখ খিঁচিয়ে বুড়ীর দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল "এখন করবি কি? এক গাদা যে গিল্‌লি, ভালুক এলে কি উপায় হবে?

বুড়ীও খেঁকিয়ে উঠে বলল, "গিললাম কি শুধু আমি—তুই আমার দু'গুণ গিল্‌লি যে!"

বুড়ো হেঁকে বলল, "মিছে কথা বলিস্‌নি ব'লে দিচ্ছি! আমি এই রোগা পেটে তোর দু'গুণ খেলাম, না তুই আমার দু'গুণ খেলি!"

বুড়ী চোখ পাকিয়ে বলল, "খেয়েছিস্‌ই তো! পুরুষ মানুষরা মেয়েদের থেকে বেশী খায়।"

বুড়ো বলল "কখ্‌-খনো না।"

বুড়ী এঁঠো হাতটা দিয়ে বাঁ হাতের ওপর চাপড় মেরে বলল, "নিশ্চয়ই খায়—আলবৎ খায়!"

বুড়ো দেখল তার দম ফুরিয়েছে। আর ঘাঁটাঘাঁটি করলে বুড়ী এবার হয়ত ঐ এঁঠো হাতেই দাড়ি ধ'রে টান মারবে, না হয় চড় কসিয়ে দেবে। সে নরম হ'য়ে হাত চাট্‌তে চাট্‌তে বলল, "থাক্, থাক্, এখন ঝগ্‌ড়া টগ্‌ড়া থাক। খিচুড়ী তো শেষ হ'য়ে গেছে; এখন ভালুক এসে যে মারমূর্ত্তি ধরবে, তখন কি করা যাবে সেই উপায় ঠাওরাও।"

বুড়ী বলল, "আরে তার উপায় আমি ক'রে দিচ্ছি। এখন তার কাঠগুলো পাওয়া যায় তো লাভ। ঘরের সমস্ত জিনিষ ঐ চোর কুঠুরীতে ভ'রে রেখে, দরজার পাশে হাঁড়িটা ফেলে দিয়ে আমরা লুকিয়ে থাকিগে চল। ভালুক এসে ভাববে আমরা তার খাবার রেখে বাইরে চ'লে গেছি। তখন সে কাঠের বোঝা নামিয়ে রান্নাঘরের ভেতরে যাবে। অবশ্য, যখন সে দেখ্‌বে হাঁড়িটা খালি, তখন সে খানিকক্ষণ ধ'রে খুব দাপাদাপি কর্‌বে বটে, কিন্তু কিছু অনিষ্ট করতে পারবে না। তার আমার মনে হয়, সে আবার কষ্ট ক'রে কাঠের বোঝাটা ঘাড়ে ক'রে ফিরে যাবে না।"

বুড়ো বলল, "হুঁ, এ একটা উপায় বটে। তা চল্, তাড়াতাড়ি করা যাক্।"

তাড়াতাড়ি তারা সমস্ত খাবার জিনিষ চোর কুঠুরীতে রেখে ঘরের পাশেই একটা ঘন ঝোপে লুকিয়ে রইল।

এদিকে ভালুক বনে ঘুরে ঘুরে কাঠ জোগাড় ক'র্‌তে ক'র্‌তে বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। বারো মণ কাঠ জোগাড় করা তো বড় সহজ নয়! যাই হোক, কোন রকমে সমস্ত কাঠ জোগাড় ক'রে প্রকাণ্ড একটা বোঝা বেঁধে অতি কষ্টে বোঝাটা

ব'য়ে নিয়ে কাঠুরের দরজায় হাজির হ'ল। সেখান থেকে সে খিচুড়ীর হাঁড়ীটা দেখ্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি কাঠের বোঝাটা নামিয়ে দৌড়ে হাঁড়িটার কাছে এল। কিন্তু আহা বেচারা! অত উৎসাহে হাঁড়িটা তুলে নিল, কিন্তু দেখে যে একেবারে খালি,—তার ভিতর একটি ভাতের কণাও নেই, একটি ডালের দানাও নেই! হাঁড়ির ভিতরের খিচুড়ীর চমৎকার গন্ধটা তাকে আরও ক্ষেপিয়ে তুলল। ভালুক ভীষণ রেগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগ্‌ল। তখন তার ক্ষিদেও পেয়েছে বিষম। গোটা রান্নাঘরটা তোলপাড় ক'রেও সে কোন খাবারই পেল না। তখন সে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে বলল, "আচ্ছা, কাঠুরে ব্যাটার মজা বের করছি আমি! বিনি পয়সায় আমার আনা কাঠগুলি যে গাপ্‌ ক'রে নেবে, তা হ'তে দিচ্ছিনে। সমস্ত কাঠ আমি আবার বনে নিয়ে যাব। কষ্ট হয় হোক্‌, তবুও নিয়ে যাব।" এই ব'লে সে কাঠের বোঝাটা ঘাড়ে তুলে চলল। দু'পা গিয়েই হঠাৎ থেমে ব'লল, "কিন্তু আমি এরকম অপদস্থ হ'য়ে ব্যাটার বাড়ী থেকে খালি হাতে যাচ্ছি নে।" এই ব'লে সে খিচুড়ীর হাঁড়িটা হাতে তুলে নিল। হাড়িটা ছিল পিতলের। আড়াল থেকে বুড়ী এই ব্যাপার দেখে আফ্‌শোষ করতে লাগ্‌ল, "আহা, অমন চমৎকার পিতলের হাঁড়ীটা ভালুকটা নিয়ে যাবে! হায় হায়! এর চেয়ে খানিকটা খিচুড়ী খাওয়ানোই তো ভাল ছিল।

ভালুক খিচুড়ীর হাঁড়িটা হাতে নিয়ে বলল, "স্বাদটা না পাই, গন্ধটা তো পাব! গন্ধটা কিন্তু ভা-রি চমৎকার!"

হঠাৎ তার চোখ প'ড়ে গেল পেয়ারা গাছটার দিকে। গাছে তখন অনেক পেয়ারা পেকে ছিল। দেখে লোভে ভালুকের জিভে জল এলো। তাছাড়া তখন খিদেয় তার পেটের নাড়ী জ্বল্‌ছে। সে তাড়াতাড়ি পাঁচীল দিয়ে গাছের উপর চড়ল। কতকগুলো বড় বড় পাকা পাকা পেয়ারা তুলে সে মুখে পূরতে যাবে, হঠাৎ তার মনে একটা মতলব এলো। তখনও তার মনের ভিতর সেই খিচুড়ীর কথা বার বার আসা-যাওয়া করছে। সে মনে মনে বলল, "উঁহু, এগুলো এখন খাওয়া হচ্ছে না। এগুলো আমি বনে নিয়ে গিয়ে চড়া দামে অন্য ভালুকদের কাছে বিক্রী করব। সেই টাকা দিয়ে আমি খিচুড়ী কিনে খেতে পারবো। বাঃ, চমৎকার মতলব ঠাউরেছি। হাঃ হাঃ হাঃ—সে বেশ মজা হবে!"

তখন সে বড় বড় পাকা পাকা পেয়ারা যত তুল্‌তে লাগ্‌ল সব সেই খিচুড়ীর

হাঁড়িতে ভরতে লাগ্‌ল! কাঁচা পেয়ারা সাম্‌নে প'ড়ে গেলে সে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, "তোমাকে বাপু কেউ কিন্‌বে না; কিন্তু তাই বলে তোমাকে তো ছেড়ে দেওয়া চলে না, তোমাকে এইখানেই শেষ ক'রে দি!"—ব'লে সেটিকে মুখে পূরে চিবিয়ে খেতে লাগল।

বুড়োবুড়ী এতক্ষণ ভয়ে কেঁচোর মত কুঁচ্‌কে লুকিয়েছিল। পাছে ভালুক তাদের দেখে ফেলে, এই ভয়ে কেউ কোন শব্দ করে নি। ভালুক সেই খিচুড়ীর হাঁড়ি পাকা পেয়ারায় ভর্ত্তি ক'রে ফেলেছে, অম্‌নি হঠাৎ তার নাকের ভেতর সোঁ ক'রে একটা মশা ঢুকে গেল। তার ভীষণ হাঁচি এল। নাকমুখ চেপে অনেক করেও সে কিছুতেই আট্‌কাতে পারল না। ভয়ানক জোরে, হেঁচে ফেলল —"হ্যাঁ-চ্চো-ও—!"

ভালুকের হঠাৎ মনে হ'ল, কেউ বুঝি তাকে দেখতে পেয়ে তীর কিম্বা পট্‌কা ছুঁড়ে মারল। চম্‌কে সে পা হ'ড়কে প'ড়ে গেল—গাছ থেকে পাঁচীলের ওপর, পাঁচীল থেকে একেবারে বুড়ো কাঠুরের উঠোনের উপর। ভয়ে এবং আছাড় খেয়ে সে তখন একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেছে। কোন দিকে না চেয়ে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বনের দিকে চোঁ চোঁ দৌড় দিল। কাঠগুলো, খিচুড়ীর হাঁড়ি আর পাকা পেয়ারাগুলো সবই সেখানে প'ড়েই রইল।

বুড়োবুড়ী তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! মনের সুখে পেয়ারাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পূরতে লাগল। কি মজা! এতকাল ক'রে অপেক্ষা ক'রে একটা পেয়ারা কপালে জোটে নি, আজ একটা নয়, দুটো নয়, তিনটেও নয়, চারটেও নয়, এক্কেবারে এক হাঁড়ি বড় বড় পাকা পাকা পেয়ারা! কপাল জোড় কি কম! ভাগ্যিস্‌ আজ খিচুড়ী রান্না হয়েছিল!

ভালুক ব্যাটা কাঠের বোঝাটা আর হাঁড়িটা নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাও পারে নি। অদৃষ্ট আজ বড়ই সুপ্রসন্ন।

ওদিকে ভালুক বেচারীর আর দুঃখের শেষ নেই! কত কষ্ট ক'রে, কতক্ষণ ধ'রে বারো মণ কাঠ যোগাড় ক'রে খিচুড়ী খাবার জন্যে কাঠুরের বাড়ী গিয়েছিল; খিচুড়ি তো পেলই না, তার উপর গাছ থেকে আছাড় খেয়ে গায়ের ব্যথায় এখন অস্থির! হায় রে খিচুড়ী! *

* উত্তর ভারতের একটি উপকথা।

বিজলী বাতি

(শ্রীসুবিনয় রায়)

বিজলী-বাতি এক আশ্চর্য্য জিনিষ। পাত্‌লা কাঁচের গোলার মধ্যে একটা অতি সূক্ষ্ম তার—চোখে দেখাই ভার। এই তারের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ (Electric current) গেলেই তারটি জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে জ্বলে ওঠে; তখন মনে হয় তারটি কত মোটা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, তারটি ইচ্ছামত জ্বালিয়ে তা' থেকে উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়,—পুড়ে ছাইও হয় না, আলোও নিভে যায় না। বহুদিন পর যখন বাতি খারাপ হয়ে যায়, সেটিকে খুলে ফেলে, সামান্য কয়েক আনা পয়সা দিয়ে আরেকটি বাতি কিনে সেই জায়গায় লাগিয়ে দিলেই হ'লো।

ঐ যে কাঁচের গোলা, ওর ভিতরে বাতাস থাকে না ব'লেই অত সূক্ষ্ম তার অতদিন ধ'রে আলো দিতে পারে। ঐ তারটি টাংষ্টেন (Tungsten) ধাতুর তৈরী। বিদ্যুৎ ওকে গরম করে, তাই ধাতুর তার তাপের চোটে প্রায় সাদা হয়ে জ্বল্‌তে থাকে। কাঁচের গোলার মধ্যে বাতাস থাক্‌লে মুহূর্ত্তে তার জ্বলে ছাই হয়ে যেত।

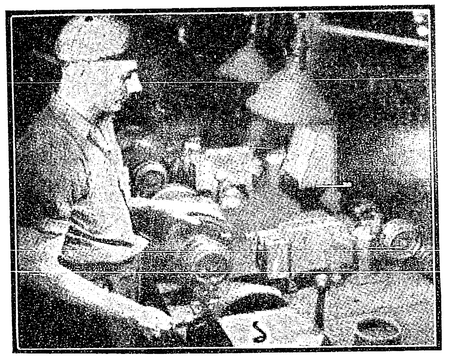

(১) টাংষ্টেন ধাতুর অতি সূক্ষ্ম তার তৈরী।

প্রথম যখন বৈদ্যুতিক আলোর আবিষ্কার হয় তখন কয়লা জাতীয় জিনিষের তার ব্যবহার করা হ'তো। সে আলো তেমন উজ্জ্বল হ'তো না, খরচও তা'তে বেশী পড়্‌ত। ধাতুর তার জ্বলে খুব উজ্জ্বল ভাবে, খরচও কম পড়ে তা'তে।

আগেকার দিনে কাঁচের গোলা থেকে বাতাস বের ক'রে নিয়ে বাতি তৈরী করা হ'তো। এখনও তাই হয়, কিন্তু এখন এক রকমের বাতি তৈরী হয়

যা'র মধ্যের হাওয়াটা বের ক'রে নিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস্ ভ'রে দেওয়া হয়—একে বলে Gas-filled lamp। নাইট্রোজেন গ্যাসেও তার পোড়ে না।

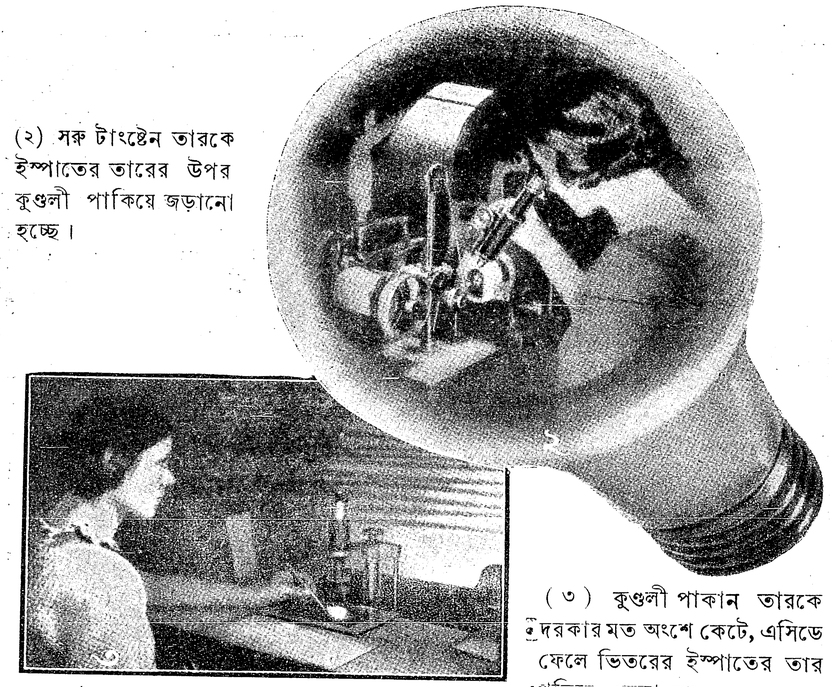

(২) সরু টাংষ্টেন তারকে ইস্পাতের তারের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়ানো হচ্ছে।

(৩) কুণ্ডলী পাকান তারকে দরকার মত অংশে কেটে, এসিডে ফেলে ভিতরের ইস্পাতের তার গলিয়ে ফেলা হয়।

বিজলী-বাতি (Electric bulb lamp) কেমন ক'রে তৈরী করা হয় তা'র কয়েকটি ছবি দিচ্ছি।

প্রথম ছবিতে দেখ, একটা কলের সাহায্যে টাংষ্টেন ধাতুর অতি-সূক্ষ্ম তার তৈরী হচ্ছে। এ তার এত সূক্ষ্ম যে চোখে ভাল ক'রে দেখাই যায় না — মাথার চুলের চেয়ে অনেক বেশী সরু।

দ্বিতীয় ছবিতে দেখান হয়েছে, ঐ তারকে একটি কলের সাহায্যে, সরু ইস্পাতের তারের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়ান হচ্ছে। জড়াবার সময় একটি অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা হচ্ছে ঠিক ভাবে কাজটি চল্‌ছে কিনা।

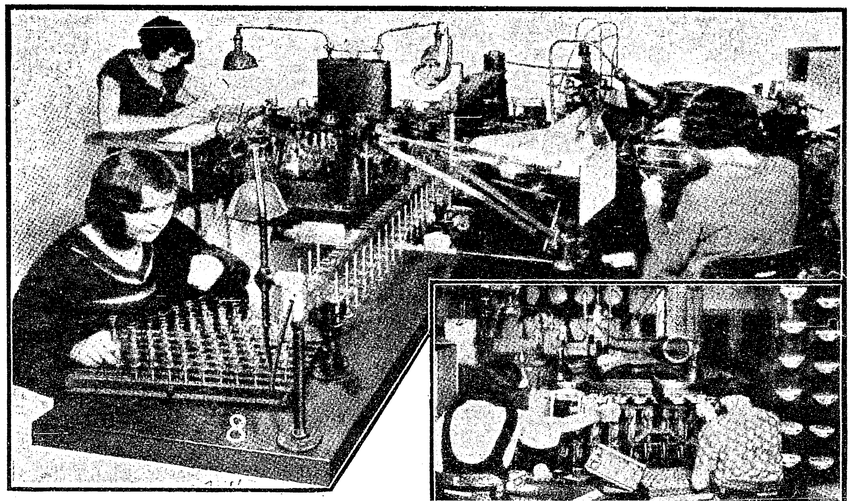

(৪) সীসার তার লাগান কাচের দণ্ড এবং টাংষ্টেন তারের কুণ্ডলী কাচের বাল্‌বের মধ্যে বসান হচ্ছে।

(৫) বাল্‌বের ভেতর থেকে বাতাস বের করে বাতির মুখ বন্ধ করা হচ্ছে।

কুণ্ডলীপাকান তারের মাঝ থেকে ইস্পাতের তারটি বের ক'রে নেওয়া দরকার; কিন্তু তারটি ধ'রে টান দিলেই পট্‌ ক'রে ছিঁড়ে যাবে। কেমন ক'রে কার্য্যসিদ্ধি হবে? উপায়টি সহজই। সব শুদ্ধ এসিডে ফেলে দিলে ইস্পাতের তারটি গ'লে বেরিয়ে যাবে, টাংষ্টেন তারের কুণ্ডলী অবশিষ্ট থাক্‌বে (তৃতীয় ছবি দেখ)। এই কাজটি হবার পর কুণ্ডলীর বড় ছায়া দেয়ালে ফেলে দেখে নেওয়া হয় সব ঠিক আছে কিনা।

এবারই আসল কাজ। ৪ নং ছবিতে দেখ, একটা জবড়-জং কলের সাহায্যে

বাতির কাজ শেষ করা হচ্ছে। প্রথমে কাঁচের গোলার মধ্যে কুণ্ডলী লাগাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। কুণ্ডলীর ভিতরে একটি 'হুক' জাতীয় জিনিষ পরিয়ে, কুণ্ডলীর মাথা দুটি কাঁচের গোলার গোড়ায় লাগান একটি পিতলের গোল জিনিষের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। পিতলের ঐ জিনিষটাই বাল্‌বের (Bulb) মাথা। 'হুক'টি তারকে যথাস্থানে রাখে এবং জ্বলবার সময় তা'কে ঠিক রাখে।

বাতিটি তৈরী হয়ে গেল; এবার কাঁচের গোলার ভিতর থেকে আরেকটি কলের সাহায্যে বাতাস বের ক'রে ফেল্‌লেই বাতি ব্যাবহারের উপযুক্ত হ'লো।

আমাদের দেশেও বৈদ্যুতিক বাতি তৈরীর কয়েকটি কারখানা হয়েছে এবং ২।১টি কারখানার বাতি বাজারে বিক্রীও হচ্ছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ বাতি এক একটি সহরেই জ্বলে; তা' হ'লে সারা পৃথিবীতে কত বিজলী-বাতি রোজ জ্বলে একবার ভেবে দেখ।

দাড়ির দাম

(শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত)

মোদের গাঁয়ের বিন্দে খুড়ো
নেড়া মাথায় লম্বা দাড়ি;
তাহার বৌএর বসনখানি
কস্তাপেড়ে ছোট্ট শাড়ী।
দিবস যতই হচ্ছে গত
দাড়ি ততই যাচ্ছে বেড়ে;
কুকুর মহিষ ছাগল গরু
দেখ্‌লে আসে জোর্‌সে তেড়ে।
রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে
জড়িয়ে দাড়ি হোঁচট্‌ খায়;
কপালে হাত দিয়ে ভাবে
হ'ল একি বিষম দায়।

একদিন সে সখের ঝোঁকে
সাইকেলেতে বেড়ায় চ'ড়ে ;
হঠাৎ গিয়ে বাধ্‌লো দাড়ি
চাকার তারে আচ্ছা ক'রে।
চাকার পাকে টেনে দাড়ি
কর্‌লো মাথা এতই হেঁট ;
ধপাস্ ক'রে পড়্‌ল শেষে
উল্টে তারই মস্ত পেট।
এসব দেখে উপায় ভেবে
গিন্নি তারে বল্লে ডেকে,—
"দাড়ি তোমার কামিয়ে ফেল,
ফল কি বল ওসব রেখে!"
বিন্দে কয়, "তাও কি হয়!—
মা কালীর যে হচ্ছে মানা ;
এ দাড়িটির মূল্য কত
তোমার তাতো নাইক জানা!
এক্ষুনি এই দাড়ি আমি
হাটে গিয়ে বেচি যদি,
নগদ পাব দেড়শ' টাকা
হবে গাড়ি, ঘোড়া, গদি।
একথা যেই শুনতে পেল
আড়াল থেকে একটা চোর,
লাফিয়ে উঠে ভাব্‌ল তবে—
আজকে ভারি বরাৎ জোর!
সেদিন রাতে চোরটা এসে
দাড়ি কেটে পড়লো স'রে,
ভোরের বেলা উঠে বিন্দে
দাড়ির শোকে কেঁদে মরে।



(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

সকাল থেকেই বেশ মেঘ করেছে।

বেলা তখন আট্‌টা হবে,—আমি ঘরে বসে একমনে খবরের কাগজটা উল্‌টে পাল্‌টে দেখছি এমন সময় বন্ধুবর মোহনলাল এসে হাজির।

বোর্ডিংএর চাকর জগন্নাথকে ডেকে বল্লাম, "ওরে, চট্ ক'রে দু' কাপ চা আর কিছু গরম জিলিপি নিয়ে আয় শীগ্‌গির!"

মোহনলাল বল্ল, "ওহে, আমি এই মাত্র চা খেয়ে আস্‌ছি, শুধু তোমার জন্যেই আন্‌তে দাও।"

"আরে, সে কি হ'তে পারে নাকি! আর এক কাপ চা খেলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, দিন্‌টা আজ বেশ ঠাণ্ডা আছে।"

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মোহনলাল বল্ল, "দিন্‌টা আজ ঠাণ্ডা আছে বলেই তো একটা মত্‌লব নিয়ে তোমার কাছে এলাম। আজ রবিবার আছে, চল কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যাক্।"

মত্‌লবটা আমার কাছে নেহাৎ মন্দ লাগ্‌ল না। মোহনলালের সঙ্গে অনেক দিনই এরকম আমি ঘুরে বেড়িয়েছি! গত রবিবারেও আমরা ব্যারাকপুরের এক বাগানে মাছ ধরতে গেছিলাম।

আমি বল্লাম, "কোথায় যাবে মনে করেছ? এমন জায়গায় চল যেখানে গাঁটের পয়সাও বেশী খরচ হয় না অথচ কল্‌কাতার বাহিরেও ঘুরে আসা যায়।"

মোহনলাল বল্ল, "ডায়মণ্ড হারবার লাইনে 'গড়িয়া' বলে একটা জায়গা আছে, জায়গাটা শুনেছি খুব সুন্দর। সেখানকার হাটও নাকি একটা দেখ্‌বার জিনিষ। কল্‌কাতার খুব কাছে, খরচেরও বেশী ভয় নেই।"

আমি বল্লাম, "কখন ফিরবে?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মোহনলাল বল্ল, "এখন সোওয়া আট্‌টা; বারোটার মধ্যে আমরা ফিরব নিশ্চয়ই। আজ রবিবার, তোমাদের বোর্ডিংএর খাওয়া দাওয়া হ'তে আজ অনেক দেরী হবে; কাজেই অসুবিধার কোনই কারণ নাই।"

ততক্ষণে চা আর জিলিপি এসে গেছে। দু'মিনিটের মধ্যে সেগুলির সুব্যবস্থা ক'রে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

ভাগ্য ভালো। শিয়ালদায় এসে দেখ্‌লাম ডায়মণ্ড হারবারের গাড়ী গার্ড সাহেবের সঙ্কেতের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমরা গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম, গাড়ীও ছেড়ে দিল।

বালীগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, ট্রেণ হুশ্‌ হুশ্‌ ক'রে ঝড়ের মত ছুটে চলেছে। যাদবপুর ছাড়িয়ে যেতেই আমাদের চোখে পড়লো দু'ধারের দিগন্তবিস্তৃত নীচু জমি। ধূধূ করছে ফাঁকা মাঠ। শোনা যায় বর্ষাকালে এই সব জমিতে রীতিমত বান ডাকে, তখনকার রূপ দেখ্‌লে কেউ ধারণা করতে পারে না এখানে কোনো-কালে মাঠ ছিল। মনে হয় ট্রেন যেন কোন সীমাহীন নদীর সেতুর উপর দিয়ে চলেছে।

পরের ষ্টেশনই 'গড়িয়া'। গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। ছোট্ট ষ্টেশন। ভদ্রলোকের মধ্যে আমি আর মোহনলালই নাম্‌লাম; আর যারা নাম্‌লো তাদের মধ্যে ছিল কয়েকজন জেলে, কয়েকটি উড়ে, একজন ডাকহরকরা, আর কয়েকটি লুঙ্গিপরা মুশলমান্‌ কারিকর।

গাড়ী থেকে নাম্‌তেই হাঁপাতে হাঁপাতে একটি রোগামত ভদ্রলোক এসে আমাদের বল্লেন, "আপনারা তো কল্‌কাতা থেকে আস্‌ছেন?" মোহনলাল আর আমি একসঙ্গে বল্লাম, 'হাঁ'।"

ভদ্রলোকটির গায়ে কাপড়ের খুঁট জড়ানো। এতক্ষণ বোধ হয় খালি গায়েই ছিলেন, হঠাৎ অপরিচিত দুটি ভদ্রলোকের ছেলেকে দেখেই বোধ হয় ভদ্রতার খাতিরে ঐ কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়েছেন।

তিনি বল্লেন, "মহেন্দ্র বাবু এলেন না?" মনে মনে বুঝ্‌লাম ভদ্রলোক ভুল করেছেন। বেশ কৌতুক অনুভব করলাম। চোখের ইসারায় মোহনলালকে কোন কথার উত্তর দিতে মানা ক'রে আমি বল্লাম, "না, বিশেষ কাজে আট্‌কে পড়ায় তিনি আস্‌তে পারলেন না।"

ভদ্রলোক তখন আমাদের আপ্যায়িত করে ডেকে নিয়ে পথ দেখিয়ে তাঁর বাড়ীতে চল্লেন। ভদ্রলোক একটু এগিয়ে যেতেই আমি মোহনলালকে খুব আস্তে আস্তে বল্লাম, "দেখা যাক্‌ কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, বিপদ বুঝ্‌লে সটকে পড়া যাবে।"

মোহনলালও মুচ্‌কী হেসে আমার কথায় সায় দিল।

মাঠের রাস্তা ধ'রে আমরা চলেছি। মাঝে মাঝে পথের দুই ধারে ঝোপ্‌ড় কাশের ঝাড় আর তার আশে পাশে এঁদো পুকুর। জনশূন্য গ্রাম। দু'এক জায়গায় শুধু দেখ্‌লাম কয়েকটি ছেলে পুকুরের জলে নেমে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে।

অনেকখানি পথ হেঁটে আমরা একটা টিনের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম। বাইরের ঘরে আমাদের বসিয়ে ভদ্রলোকটি ছুটে ভিতরে গেলেন। টের পেলাম ভিতরে বেশ সাড়া পড়ে গেল। দুই একটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এসে কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের দেখ্‌তে লাগ্‌ল। বোধ হোল যেন আশে পাশের জান্‌লা দিয়ে বাড়ীর মেয়েরাও উঁকি ঝুঁকি মারছে।

ব্যাপারটা মন্দ নয়। আমি আর মোহনলাল মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগ্‌লাম। এখন পর্য্যন্ত কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না! দেখা যাক্‌ শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়!

ছোট্ট একখানা বৈঠকখানা ঘর। বেশ ফিট্‌ ফাট করে সাজানো। তক্তপোষের উপর একটা পরিষ্কার সাদা চাদর বিছানো। এক পাশে একটা টেবিল, তার উপরে অনেকদিনের পুরানো একখানা আয়না, একধারে একটা ছোট টাইম পিস ঘড়ি টিক্‌ টিক্‌ করছে। টিনের দেয়ালে কতগুলি রং চংএ ক্যালেণ্ডার টাঙানো, ঘরের এক কোণে একটা কাপড় জড়ানো লম্বা মতন কি জানি ঝুলছে; মনে হলো বোধ হয় এস্রাজ।

আমরা জুতো খুলে তক্তপোষের উপর উঠে বস্‌লাম।

ডুরে সাড়ী পরা নোলক নাকে একটি ছোট্ট মেয়ে হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। মোহনলাল বল্ল, "খুকি, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার?"

আঁচল ঘুরিয়ে খুকী এক ছুটে ভিতরে চলে গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ভদ্রলোকটি দু'টো নেয়াপাতি ডাব কেটে এনে আমাদের সাম্‌নে ধরে বল্লেন, "এখন এই ডাবের জলটুকু খান্, চা হচ্ছে। চা খেয়ে তারপর মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করা যাবে।"

আমাদের দম্ ফেটে হাসি বেরিয়ে আস্‌ছিল, মোহনলাল হাসি চাপ্‌তে না পেরে খুক্ খুক্ ক'রে কাশতে আরম্ভ ক'রে দিল।

কিছুক্ষণ পরেই চা এলো, তার সঙ্গে ফুল্‌কো ফুল্‌কো লুচি আর আলুর দম। বিনা বাক্যব্যয়ে খাবারগুলো সাবাড় ক'রে ফেল্লাম।

তারপর মেয়ে দেখার পালা। লালরঙের সাড়ী পরা একটি খুকীর হাত ধ'রে ভদ্রলোক আমাদের ঘরে ঢুক্‌লেন। বল্লেন, "নাও মা, প্রণাম কর।"

খুকী আমাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। হাসি চেপে চেপে মোহনলালের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আমারও মারাত্মক রকমের হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হেসে ফেল্লেই সব মাটি।

যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এর নামটি কি?"

ভদ্রলোক খুকীর দিকে চেয়ে বল্লেন, "বল মা, নাম বল।"

মুখ নীচু করে অতি অস্পষ্ট ভাষায় খুকী বল্ল, "নিস্তারিণী দাসী"।

মোহনলাল বল্ল, "বাঃ, বেশ নাম।"

আমি ভদ্রলোকটিকে বল্লাম, "আচ্ছা, এখন ওকে ভিতরে নিয়ে যান্।"

ভিতরে আর নিয়ে যেতে হ'ল না, চৌকাঠ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে গিয়ে এক লাফে খুকী অন্দরে চলে গেল।

আমরা বল্লাম, "এখন তবে উঠি।"

ভদ্রলোকটি হাতজোড় করে বল্লেন, "তা কি হ'তে পারে! এই ভর দুপুর বেলা, ভাত না খেয়ে যেতে পারবেন না। আমি কিছুতেই ছাড়ব না। চান্

ক'রে খেয়ে দেয়ে খানিক বিশ্রাম ক'রে বিকেল বেলার দিকে যাবেন।"

মনে মনে ভাব্‌লাম—বোর্ডিংএ গিয়ে তো সেই কলাইয়ের ডাল আর পুঁই শাকের ছ্যাঁচ্‌ড়া খেতে হবে, এমন খাসা ভোজটা ছাড়তে যাই কেন? মোহনলালের মনেরও সেই তূরীয় অবস্থা।

কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোকটি একশিশি জবাকুসুম তেল আর শাদা ধব্‌ধবে দু'খানা তোয়ালে এনে বল্লেন, "আমাদের বাড়ীর পুকুরের জল খুব চমৎকার, চান্ করে বেশ আরাম পাবেন।"

আচ্ছা ক'রে তেল মেখে স্নান করা গেল। বেশ পুকুর, কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে উঠে পড়লাম।

স্নান সেরে আবার বাইরের ঘরে বসে আছি। ভদ্রলোকটি ভিতরে খাবার ব্যবস্থা করতে গেছেন, এমন সময় ডাকপিয়ন একখানা 'পোষ্টকার্ড' দিয়ে চলে গেল।

পরের চিঠি পড়া অন্যায়, কিন্তু পোষ্টকার্ডের দু'একটা কথা হঠাৎ চোখে পড়ে যেতেই বাকি সবটুকু পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। দেখ্‌লাম চিঠিতে লেখা আছে—

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

মহাশয়, রবিবার আপনার কন্যাকে দেখিতে যাইব—এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ঘটনাচক্রে সেদিন আর যাইতে পারিব না, সোমবার সকালের গাড়ীতে অবশ্যই যাইব। শ্রীমান্ হরিমোহন ও কালীচরণ আমার সাথে যাইবে।

আমার বিনীত নমস্কার জানিবেন।

বশম্বদ

শ্রীমহেন্দ্রলাল মজুমদার।

চিঠি খানি প'ড়ে জলের মত সমস্ত জিনিষটা বুঝ্‌তে পারলাম। ভাগ্যিস্ চিঠিটা ভদ্রলোকের হাতে পড়ে নাই, তা হলেই হয়েছিল আর কি!

চিঠিখানা গোপনে পকেটে পুরে ফেল্লাম। মোহনলালকে বল্লাম, "ছ্যাখ, যতক্ষণ এখানে আছি, তুই হরিমোহন আর আমি কালিচরণ—বুঝ্‌লি!"

বেলা অনেক হয়েছে। ক্ষিধের চোটে নাড়ী টন্ টন্ করছে। ভদ্রলোকটি বারে বারে এসে হাত জোর ক'রে বলে যাচ্ছেন, "আর একটু অপেক্ষা করুণ, মাংসটা প্রায় হয়ে এলো।"

যথা সময়ে খাওয়ার ডাক্ পড়লো। ভাত কই! এ যে পোলাও, সারি সারি বাটীতে ডাল, কই মাছের কালিয়া, গল্‌দা চিংড়ির ঝোল, মাংসের কোরমা, ভাজা ভুজি, অম্বল, তারপর এলো দই আর সন্দেশ—।

ভদ্রলোকটি বল্লেন, "পায়েসটা আর হয়ে উঠ্‌ল না কিছুতেই।"

আমি বল্লাম, "না না এই যথেষ্ট, এত আয়োজনেরও কোন দরকার ছিল না।"

ছাগল গেলার পর অজগর সাপের যে দশা হয় আমাদের দশাও তাই হোল, একেবারে 'নট্ নড়ন্ চড়ন্'।

সমস্ত দুপুরটা পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমালাম। বিকেল পাঁচটা তেইশ্ মিনিটে কল্‌কাতার গাড়ী। এই গাড়ীতেই আমরা ফিরব।

বিকেলেও ভদ্রলোক জলখাবার খেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু কাঁহাতক আর খাওয়া যায়! দুই কাপ চা খেয়ে আমরা ষ্টেশনের দিকে হাঁটা দিলাম। ভদ্রলোকটিও সঙ্গে চল্লেন আমাদের গাড়ীতে তুলে দিতে।

যথাসময়ে গাড়ী এলো, চড়ে পড়লাম। ভদ্রলোকটি হাত জোড় করে আবার বিনয় জানিয়ে বল্লেন, "অনেক কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না; মহেন্দ্র বাবু এলে খুবই সুখী হইতাম।"

গাড়ী ছেড়ে দিল, আমি জানালা দিয়ে মুখ বের করে বল্লাম, "ওঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আপনার একখানা চিঠি ছিল, দিতে ভুল হয়ে গেছে।" এই ব'লে হাত বাড়িয়ে সেই পোষ্ট কার্ড খানি হাতে গুঁজে দিলাম।

হুশ্ হুশ্ করতে করতে গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেল।





পুসি আমার

ডিক্ ও ভুতুড়ে বাড়ী

(শ্রীদেবব্রত রায় চৌধুরী, এম্-বি)

ডিক্ আর শয়তান ম্যাক্ নিয়ে যে ঘটনা হয় তার কথা তো অন্য বারে বলা হয়েছে। ডিক্ স্থির করেছিল যে এবার শীতের কন্‌কনানি আর একটু কম্‌লেই পাহাড় পার হ'য়ে অন্য ধারে যাবে। কিন্তু যাবার কয়েক দিন আগেই আর একটা অদ্ভুত ঘটনা হয়ে গেল; সেই গল্পটী আজ তোমাদের বলব।

আগেই বলেছি যে জঙ্গলের ধারে একটী ছোটো গোছের গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে একটা ছোটো দোকান আর সরাইখানা ছিল। দোকানে খাবার দাবার জিনিষ, পোষাক আসাক, শিকারের সাজ সরঞ্জাম, বন্দুক, পিস্তল, ও তাদের গুলী বারুদ ইত্যাদি সমস্তই পাওয়া যেত। সরাইখানায় অল্প ক'জন লোকের থাকবার বন্দোবস্ত ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় যারা জঙ্গল থেকে কাজ কর্ম্ম সেরে ছুটী পেত, তারা সবাই সরাইখানায় এসে জুটতো। নানা রকম গল্প গুজব আমোদ আহ্লাদে সন্ধ্যাগুলি কাটিয়ে দিত। ডিকের আস্তানা একটু দূরে ছিল ব'লে ডিক্ বেশী আসতে পারত না, তবে যে দিনকার কথা বলছি সে দিন সন্ধ্যায় ডিক্‌ও সেখানে এসেছিল।

সেই দিন সরাইখানায় অনেক লোক জমা হয়েছিল। তাদের মধ্যে অপরিচিত আধবুড়ো একটী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সরাইখানার মালিক জনের "ভূতুড়ে বাড়ী"র কথা হচ্ছিল, আর সবাই তাঁদের ঘিরে সেই গল্প শুন্‌ছিল। ঐ বাড়ীটার গল্প সেখানে অনেকবারই হয়েছে, এবং সব্বাই তার ইতিহাস ভাল করেই জানে; তবুও যখনই ও বাড়ীটার কথা উঠে, তখনই সকলে অন্য কথা-বার্ত্তা বন্ধ করে এক মনে ঐ গল্পই শুনতে থাকে। ১০।১৫ বছর আগে, ঐ বাড়ীটায় যে সব ভীষণ কাণ্ড হয়েছিল, আজ পর্য্যন্ত কেউ তার কারণ বের করতে পারে নি।

সরাইখানা থেকে মাইল দুই দূরেই জঙ্গলের গা ঘেঁসে অনেকখানি জমি নিয়ে একটা পুরাণ, পোড়ো, একতলা বাড়ী দেখতে পাওয়া যেত। জমিটার চারি দিক ৪।৫ হাত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেই পাঁচিল অবিশ্যি তখন অনেক জায়গায় ভেঙ্গে ধসে গিয়েছিল। বাড়ীটারও খুব জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার অবস্থা।

চারপাশের জমিটা জঙ্গলে ভরে গিয়েছিল। বাড়ীর সামনে ছাড়া বাকী তিন দিকে, পাঁচিলের গা ঘেঁসে লম্বা লম্বা নীচু নীচু ঘরের ভাঙ্গা টুক্‌রা দেখতে পাওয়া যেত। একটু ভাল করে দেখলে বোঝা যেত যে এক সময় ঐ ঘরগুলি মস্ত বড় বড় গোয়াল ঘর বা খোঁয়াড় ঘর ছিল। সব দিন অবিশ্যি ঐ বাড়ী, জমি, বা গোয়ালঘরের এমন খারাপ অবস্থা ছিল না। অনেক দিন আগে এখানে একজন বুড়ো ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি পশমের ব্যবসা করতেন। তাঁর ২।৩ হাজার খুব ভাল জাতের ভেড়া ছিল। ঐ বাড়ীটায় তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। আশপাশের লোকরা বুড়োকে খুব মান্য করত এবং তাঁকে বুড়োকর্ত্তা বলে ডাকত। এতগুলি ভেড়াকে চরাবার জন্য উপযুক্ত রাখাল ছিল, আর তাদের পশম ছাঁটবার জন্য কারিগর ছিল। তাছাড়া ৩০।৪০টা ভাল ভাল কুকুরও ছিল। রাত্রে ভেড়াদের ঐ লম্বা লম্বা গোয়ালে রাখা হ'ত।

বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল। পশমের ব্যবসা করে বুড়োকর্ত্তা বেশ লাভও করছিলেন। হঠাৎ ভেড়ারা দলে দলে মরতে সুরু করে দিলে। দিনের বেলা তারা বেশ থাকে, রাত কাবার হলেই দেখা যেতে লাগল যে গোয়ালের ভেতর তাদের মধ্যে ৮টা ১০টা এখানে সেখানে অদ্ভুত ধরণে ম'রে প'ড়ে রয়েছে। তাদের শরীর অসম্ভব ফুলে ঢোল হয়ে যেত আর তাদের চামড়া আল্‌কাতরার মত কাল রংএর হয়ে যেত। সারাদিন ভেড়ারা বেশ থাকত, অথচ রাতারাতি এমন কি হ'ত যে তারা দলে দলে ঠিক একই ভাবে ম'রে প'ড়ে থাকত? বুড়োকর্ত্তা সহর থেকে ভাল ভাল পশুর ডাক্তার আনালেন, কিন্তু কি কারণে ভেড়ারা মরত, তা তাঁরা ঠাহর করতে পারলেন না। তাঁরা শেষে এই মত দিলেন যে রাত্রেই যখন ভেড়ারা মারা যাচ্ছে, তখন রাতারাতি তাদের হয় তো কোনও অজানা মারাত্মক রোগ হচ্ছে। রাত্রের হাওয়া ভেড়াদের পক্ষে ভাল হবে না মনে করে, তাঁরা গোয়াল ঘরে দরজা দেবার ব্যবস্থা করলেন। এতদিন গোয়াল ঘরগুলায় দরজা ছিল না, খোঁয়াড়ে যেমন বাঁশ দিয়ে আগড় করা হয় তেমনি ব্যবস্থা ছিল। বুড়োকর্ত্তা তাড়াতাড়ি দরজা তৈরী করালেন, রাত্রে ভেড়ারা সেই সব গোয়াল ঘরগুলায় বন্ধ থাকতে লাগল। ভেড়াদের বন্ধ করে রাখবার পর দেখা গেল যে বাস্তবিক ভেড়ারা আর অমন করে মরছে না। বুড়োকর্ত্তাও এতে খানিক নিশ্চিন্ত হলেন।

ভেড়া মরা তো বন্ধ হ'ল, কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতে কুকুরগুলাও মরতে সুরু করে দিল। মরার ধরণ সেই ভেড়াদেরই মত। দিনমানে তাদের কোনও কষ্ট নেই, রাত শেষ হলেই সকালে দেখা যেত যে ঠিক ভেড়াদের মতই তাদের শরীর খুব ফুলে গেছে, আর রং ঘোর কাল রংএর হয়ে গেছে। এতদিন কুকুরগুলা রাত্রে খোলা অবস্থায় এখানে সেখানে থাকত। ওরাও মরতে সুরু করায় বুড়োকর্ত্তা তাড়াতাড়ি কুকুরদের জন্যও ঘর তৈরী করিয়ে রাত্রে তাদেরও বন্ধ করে রাখতে লাগলেন। এই উপায় করাতে কুকুর মরাও বন্ধ হ'ল। বুড়োকর্ত্তা নিজে ও তাঁর ছেলে সন্ধ্যা হলেই ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে থাকতেন। কিছুতে রাত্রে বের হতেন না, কিম্বা দরজা কি জানালা খুলতেন না। এই রকম করে সর্ব্বদা আড়ষ্ট হয়ে প্রাণের ভয় নিয়ে থাকা বড় মুস্কিলের কথা, কিন্তু পশমের কারবারে বেশ লাভ হচ্ছে দেখে, আর দিনের বেলায় কিছু হয় না এই সান্ত্বনায়, বুড়োকর্ত্তা সে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারলেন না।

২।১ বছর এক রকম বিনা বিপদে কেটে গেল। শুধু মধ্যে মধ্যে দেখা যেত বাড়ীর জমিটায় বুনো বেড়াল, কি খরগোস, কি পাখী টাখী, ঐ রকম ফুলে আর কালো হয়ে মরে রয়েছে। শেষে সেই জমিটার কোনও গাছে কোনও পাখী বাসা করত না, কিম্বা সেইখানে কোন জন্তুরাও থাকত না। জঙ্গলের মধ্যেও কখন কখন ঐ রকম জন্তু এমন কি হরিণ টরিণও মরে আছে দেখা যেত।

একবার খুব অসহ্য গরম পড়ল। সেই সময় এক দিন রাত্রে বুড়োকর্ত্তা তাঁর ঘরের ভেতর শুয়ে ছট্ ফট্ করছিলেন। একে তো ভীষণ গরম, তার উপর আবার দরজা জানালা সব আষ্টে পৃষ্টে বন্ধ, বুড়ো কিছুতে ঘুমাতে পারছিলেন না, গরমে যেন সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন। আর সহ্য হয় না দেখে, তিনি একটা জানালা খুলে ফেল্লেন। তিনি ভাবলেন, "অনেক দিন তো হয়ে গেছে, এখন হয় তো সেই কারণটা আর নেই। তা ছাড়া মানুষতো কখনও মরে নি, শুধু জন্তু জানোয়ার ও পাখীরাই মরেছে। মিছামিছি কেন তবে কষ্ট পাই।" বুড়ো সেই ঘরে একলাই শুতেন। ঘরে আলোটালো থাকত না। সে দিন উনি খালি একটা ঢল্‌ঢলে পায়জামা মাত্র পরে ছিলেন। জানালা খুলে বুড়ো খানিকক্ষণ বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর ঘর থেকে ২৫।৩০ হাত দূরে একটা মস্ত বড় য়্যাশ্ গাছ ছিল। য়্যাশ্ গাছ থেকে সুন্দর ছড়ি, টেনিস্, হকি,

ক্রীকেট ইত্যাদির খেলবার ব্যাট্ তৈরী হয়। অনেক লোক ভাল দাম দিয়ে ঐ য়্যাশ্ গাছটা কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু গাছটী দেখতে বেশ সুন্দর বলে বুড়োকর্ত্তা সেটাকে বিক্রী করেন নাই। গাছটার গুঁড়ী ১০।১২ হাত সোজা উঠে তিনটে বড় বড় ডালে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এই গাছের চারিদিকে ফুলের বাগিচা লাগান



হয়েছিল—আর গাছটার গুঁড়ি ঘিরে বসবার জন্য কাঠের বেঞ্চ বসান হয়েছিল। জানালা খুলে দেওয়ায় ফুলের সুগন্ধ নিয়ে ঝির ঝিরে বাতাস ঘরে আসতে লাগল। বুড়োকর্ত্তা কিছুক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আরাম পেয়ে, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন আর অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালে ছেলে উঠে দেখল যে তার বাবার ঘর তখনও বন্ধ রয়েছে। কাল তারও ঘুম ভাল করে হয়নি; তাই সে ভাবল হয় তো বুড়োকর্ত্তার প্রথম রাত্রে গরমের জন্য ভাল ঘুম হয় নি, কাজেই বোধ হয় শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে আর গোলমাল না করে নিজে মুখ হাত ধুয়ে চা টা খেয়ে নিল। তখনও রাখালরা আসে নি, তারা এলে তবে ভেড়া আর কুকুরদের ঘর খোলা হ'ত। ছেলেটী নিজের মনে বাগানে বেড়াতে লাগল। বেড়াতে বেড়াতে য়্যাশ্ গাছটার নীচে এসে তার বাবার ঘরের দিকে চোখ পড়াতেই দেখতে পেল যে ঘরের

জানালাটা খোলা রয়েছে। তখনই তার মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এত দিন তো কখনও তার বাবা জানালা খুলে শোন নাই, গত রাত্রিতেই শুয়েছিলেন বলে বোধ হচ্ছে। অথচ আজই তার বাবার তখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। তার বাবাতো রোজ খুব ভোরেই উঠেন। তবে কি……? ভাবতে গিয়ে তার মাথা ঘুরতে লাগল। একটু সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে যে বুড়োকর্ত্তা বিছানার উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। শরীরটা ফুলে প্রায় চার গুণ বড় হয়ে গেছে, আর রংটা ঘোর কাল রংএর হয়েছে। তখনই বুঝতে পারল যে, যে কারণে পশুপাখীরা সব মারা যায়, সেই কারণেই আজ তার বাবার প্রাণটাও গিয়েছে। ততক্ষণে রাখালরাও সব এসে পড়ল। সব্বাইএর খুব দুঃখ হ'ল, কেননা, বুড়োকর্ত্তা খুব ভাল লোক ছিলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল যে বিছানাটা ধাম্‌সান রয়েছে—মনে হয় বুড়োকর্ত্তা শুয়ে শুয়েই কারোর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছিলেন। চোখ খোলা, মুখের ভাব দেখলে মনে হয় মারা যাবার সময় কোনও কিছু ভীষণ জিনিষ দেখে তাঁর খুব আতঙ্ক হয়েছিল।

কবর দেওয়া হয়ে গেলে ছেলে স্থির করল যে সে আর সেখানে থাকবে না। ভেড়া ও অন্য সব মাল বিক্রী করে দিয়ে, বাড়িটার ভার সরাইখানার মালিক জন্‌কে দিয়ে সে চলে গেল। যাবার সময় জন্‌কে তার ঠিকানা দিয়ে গেল, আর বলে গেল যদি কেউ বাড়ী কিনতে চায়, তা হলে যা দাম উঠে, তাই নিয়েই যেন বাড়ীটা ছেড়ে দেয়। টাকা পেলে, কিছু কমিশন বাদ দিয়ে, তাকে পাঠিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু তারপর ১০।১৫ বছর হয়ে গেছে, বাড়ীটার চমৎকার সুনামের জন্য কেউই কিনতে চায় নি।

সে রাত্রের সেই ভয়ানক ঘটনার কারণ কেউই বুঝতে পারে নাই। সবাই সেটা মনে করত ভূতুরে কাণ্ড। যদি কেউ সে রাত্রে লুকিয়ে থেকে সে ঘরের সব ঘটনা দেখতে পেতো, তা হ'লে সে খানিকটা বুঝতে পারতো যে এই অদ্ভুত কাণ্ডের আসল কারণটা কি? সেই রাতটা ছিল খুব আঁধারে রাত, আর বুড়োকর্ত্তার ঘরে আলো জ্বালা ছিল না। তবুও অস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যেত যে, বুড়োকর্ত্তা ঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়বার খানিক পরেই, জানালার উপর নারকেলের মত বড় আর গোল মত কি একটা জিনিষ এসে, খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। কিছুক্ষণ এই ভাবে চুপ্‌চাপ্ বসে থেকে সেটা টুপ্ করে জানালা থেকে ঘরের মেজেতে

লাফিয়ে পড়ল। পড়বার সময় বিশেষ কিছু শব্দ হ'ল না, মাত্র একটু থপ্ করে আওয়াজ হ'ল কি না হ'ল বোঝাই গেল না। ওটা লাফিয়ে পড়বার পরই আরও দু'টা ওরকম জিনিষ ঘরে লাফিয়ে পড়ল, তারপর আরও, তারপর আরও। দেখতে দেখতে ঘরটা যেন ঐ সব অদ্ভুত জীবগুলা দিয়ে ছেয়ে গেল। ইতিমধ্যে যারা আগে এসেছিল তারা খুব তাড়াতাড়ি অথচ কোনও শব্দ মাত্র না করে খাটের পায়া বেয়ে উঠে বুড়োকর্ত্তার গায়ে চ'ড়ে বসল। বুড়োকর্ত্তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, তিনি দেখলেন তাঁর গায়ে গোল গোল কি সব উঠেছে। তাড়াতাড়ি ধড়ফড় করে উঠতে যাবেন, কিন্তু তার আর সময় পেলেন না। কেননা, নিমেষ মধ্যে ৪।৫টে ঐ গুলা তাঁর গলা, মুখ, নাকের উপর জোঁকের মত আঁটকে থাকল। তা ছাড়া ঐ গুলা বেশ ভারী বলে বোধ হ'ল, কেননা বুড়োকর্ত্তা ভাল করে হাত পা ঝাড়া দিতেও পারছিলেন না। তিনি ২।৪ বার ক্ষীণভাবে হাত পা নেড়ে, সামান্য একটু ঘড় ঘড় শব্দ মাত্র করে নির্জীব হয়ে পড়ে রইলেন। ঐ সাংঘাতিক জিনিষগুলা ততক্ষণ তাঁর সমস্ত গা ছেয়ে ফেলে জোঁকের মতই আঁটকে থাকল। বোধ হয় তাঁর রক্ত চুষে খাচ্ছিল। বাকী যারা খাটে উঠতে পারে নি, তারা নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি মারামারি করতে লাগল। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই ভাবে ঘরের ভেতর হুলস্থুল কাণ্ড চলতে থাকল। অথচ বেশী শব্দটব্দ হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পরে, যারা বুড়োর গায়ে লেগেছিল তারা এক এক করে নেমে আসতে লাগল। তার কিছুক্ষণ পরেই সব কটা যেমন জানালা দিয়ে এসেছিল, তেমনি জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এদিকে বুড়োকর্ত্তার শরীর অসম্ভব ফুলে গেল আর কাল রংএর হয়ে গেল। প্রাণ তো অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। এই হ'ল ভূতুড়ে বাড়ীটার আসল ইতিহাস।

যে দিনকার গল্প আজ বলছি, সে দিন সরাইখানায় আবার ঐ বাড়ীটার কথা উঠবার কারণ এই যে সেই নতুন আধবুড়ো ভদ্রলোকটী ঐ বাড়ী কেনবার মতলবে এসেছিলেন। তাঁকেই জন্ বাড়ীটার কথা সব ভাল করে বলছিল। নতুন লোকটী বল্লেন, "আমি ভূত প্রেত মানি না, তবে বাড়ীটায় যখন ঐ সব বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে, তখন নিশ্চয় ওর ভেতর আসল কোনও কারণ আছে। সেইটা কেউ যদি বের করে দিতে পারে খুব উপকার হয়। আমি তাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেই।" এই কথা যখন হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ডিক্ সেখানে এলো।

জন্ বল্লে, "এত সাহস কারো নেই যে ও বাড়ীর আসল কথাটা খুঁজে বের করতে যাবে।" এমন সময় ডিকের দিকে তার নজর পড়ায় সে বল্লে, "যদি কেউ এ কাজে রাজী হয় তো ডিক্‌ই হ'তে পারে। পুরস্কারের লোভে নয়, নিজের সৎসাহসের গুণে। তবে ওকে আমি এ কাজে হাত দিতে কখনও বলতে পারি না। ওকে দুষ্টু ডাকাতের সামনে যেতে বলতে পারি, খ্যাপা হাতীকে থামাতে বলতে পারি। যে সব জায়গায় সমানে সমানে লড়াই হয়। কিন্তু ভূতুড়ে বাড়ির বিপদ চোরের মত চুপি চুপি কখন কোন দিক দিয়ে আসে তা ত কেউ বলতে পারে না! সামান্য ভুল চুকে যদি ডিকের মত জীবন এই বাজে কাজে নষ্ট হয়ে যায় তো তাতে আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না।" ডিকের কিন্তু সে দিন কি খেয়াল হ'ল, সে ধরে বসল যে ঐ বাড়ীটায় রাত্রি বাস করে আসল ব্যাপারটা কি তা জানবার চেষ্টা করবে। অনেকে অনেক বোঝাল, কিন্তু ডিক্ কিছুতে শুনল না। শেষে ঠিক্ হ'ল যে পরের দিন থেকে যতদিন না কোনও কিনারা হয় ততদিন ডিক্ ঐ বাড়ীটায় একলা থাকবে।

নতুন লোকটীর বড় ইচ্ছা হ'ল যে সেই রাত্রেই একবার বাড়িটা দেখেন। বেশ চাঁদনী রাত ছিল; তাই ডিক, জন্, আর তিনি তিনটে ঘোড়ায় চ'ড়ে, বাড়িটা দেখতে বের হলেন। দেখে শুনে ফিরছেন এমন সময় নতুন লোকটী বলে উঠলেন, "আচ্ছা! য়্যাশ্ গাছটার গুঁড়ী বেয়ে ওগুলা কি উঠা নামা করছে?" ডিক্ আর জন্ চাঁদের আলোয় দূর থেকে ভাল করে দেখতে পেলে না। তবে বুঝতে পারলে যে গোল গোল কি সব গাছের গুঁড়ী বেয়ে খুব তাড়াতাড়ী উঠা নামা করছে। জন্ তাচ্ছিল্য ভাবে বল্লে, "ও সব কিছু না। কাঠ বেড়ালীরা উঠা নামা করছে। চলুন, যাওয়া যাক্, অনেক রাত হয়ে গেছে।" ফিরতে ফিরতে ডিক্ ভাবতে লাগল, "কাঠবেড়ালী কি? প্রথমতঃ, কাঠবেড়ালীরা সহজে রাত্রে চলা ফিরা করে না। দ্বিতীয়তঃ, যারা উঠা নামা করছিল তাদের কিন্তু চারটের বেশী করে পা ছিল। কাঠবেড়ালী তো কখন নয়, কিন্তু তাহ'লে কি হ'তে পারে ওরা?"

পরদিন সকালে ডিক্ আবার ভূতুড়ে বাড়ীটায় গিয়ে বুড়োকর্ত্তার ঘরটা পরিষ্কার করালো। দরজা জানালা মেরামৎ করালো আর একটা খাটিয়া, একটা টেবিল, আর একটা আরাম চেয়ার আনিয়ে রাখালো। বাড়িটার প্রত্যেক ঘরেই, মোটা শেকল দিয়ে ছাদ থেকে ঝোলান, ৪টে করে লোহার দোলনা মত ছিল।

ডিক্ শুনল যে তৈরী পশম, বিক্রীর আগে, ঐ দোলনাগুলায় টাঙ্গিয়ে রাখা হ'ত। বুড়োকর্ত্তার ঘরের ছাদ থেকেও ঐ রকম ৪টে দোলনা ছিল। সব দেখে শুনে, ঠিক ঠাক করে, ডিক্ তখনকার মত ফিরে গেল। সন্ধ্যা হ'তেই, ডিক্ আবার ও বাড়ীতে গেল। এবার ওকে পৌঁছাতে জন্, নতুন লোকটী, আর কয়েক জন লোক এসেছিল। ডিক্ খুব মোটা কাপড়ের পোষাক পরে ছিল, প্রায় জানু অবধি উঁচু বুট জুতা পরে ছিল আর হাতে চামড়ার মোটা দস্তানা পরে ছিল। সঙ্গে ওর সব অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। তা ছাড়া একটা লণ্ঠন আর একটা লম্বা লাঠির ডগায় তেল আর চব্বি মাখান নেকড়া জড়িয়ে মশাল তৈরী করিয়ে নিয়ে এসেছিল। ঠিক হয়েছিল যে সেই রাত্রে ডিক্ আলোটালো নিবিয়ে, দরজা জানালা বন্ধ করে, ঘরের মধ্যে চুপ্‌চাপ্ বসে থাকবে। কিছু শুনতে পায় কি না, বা অন্য কোনও দিক্ দিয়ে কিছু বুঝতে পারা যায় কি না, এই শুধু সেই রাতটা দেখবে। পরের রাত থেকে যেমন অবস্থা হয় তেমন ব্যবস্থা করবে। ডিক্ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকল। তার ঘোড়া অন্যরা ফিরিয়ে নিয়ে গেল, আর বলে গেল যে পরদিন সকাল ৮টা আন্দাজ আবার সবাই আসবে।

—(ক্রমশঃ)

(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

নবীনের গান

(শ্রীশিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—গ্রাহক নং ৬৪১)

পুরাতনে ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার,
সুদূর পথের ডাক এসেছে
নাইক দেরী আর।

শিশু মনের গণ্ডী দিয়ে
ঘিরে ছিলাম যেটুক্ নিয়ে,
আজ দেখি যে সব পেরিয়ে
মন হয়েছে বার।
পুরাতনে ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার।

দূর আকাশের রঙীণ আলো
দেখিয়ে দেবে পথ,
বাধবে না ক চলতে কোথাও
মোদের জয় রথ।
বনের হাজার হাজার পাখী
সমস্বরে উঠ্‌বে ডাকি',
কণ্ঠে তাদের উঠ্‌বে বাজি'
অচিন্ সুরের গৎ ;
তাদের গানে রথের নিশান
উড়বে পত্ পত্।

কর্‌ব মোরা মনকে স্বাধীন
এই করেছি পণ,
বিপদ্ ভয়ের ভয় তাড়িয়ে
বাঁধ্‌ব মোদের মন।
এই জগতের ভাবনা যত
ঝড়ের মুখে কুটোর মত
দূর করে তায় ঈশ্বরে মন
করব সমর্পণ
নতুন নেশায় নতুনেরই
গাইব আবাহন।

জগুর দান

(কুমারী সাধনা সরকার—গ্রাহক নং ১৯৮০)

রেল লাইনের ধারেই জগু সিং-এর গুন্টি ঘর। জগু রেলওয়ে চৌকিদার। ট্রেন আসার সময় লাইনের উপর গরু, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি যাতে না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখাই তার প্রধান কাজ।

ছোট্ট জগুর সংসারটী। সংসারে থাকার মধ্যে মাত্র তিনটী প্রাণী,—জগু নিজে, একটা সাদা গাই আর একটা ছোট্ট আপাদমস্তক লোমে ঢাকা লেজকাটা ভুটিয়া কুকুর। কুকুরটীকে নাকি জগুর কোন্ এক পাহাড়িয়া বন্ধু উপহার স্বরূপ দিয়েছিল। সংসারটী ছোট্ট হলেও এর উপর জগুর মায়া যথেষ্ট।

গুন্টি ঘরের নিচেই একখণ্ড ঢালু জমি, পাশে একটা একচালা খোড়ো ঘর। গাইটা তার ঝড় বাদলে সেখানেই আশ্রয় পায়। অন্য সময় কাছের আম গাছের গুঁড়িতেই বাঁধা থাকে।

গুন্টি ঘরের ওদিকেই 'ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যাল'টা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রাত্রির বেলা অন্ধকারে তার লাল চোখ দু'টো যখন জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে তখন দূর থেকে তাকে একটী উপকথার দৈত্যের মতই দেখায়। সে যেন চোখ লাল করে ট্রেনগুলিকে শাসিয়ে দেয়, "খবরদার, এদিকে এসো না"। তারই তলা দিয়ে আঁকা বাঁকা রেল পথটা প্রকাণ্ড অজগরের মত ঘুরে ফিরে ওদিকের পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চলে গেছে,—হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন ঐ পাহাড়েই তার শেষ।

সমস্ত দিনে মাত্র দু'খানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন—একখানা 'আপ্' আর একখানা 'ডাউন'। কোন কোন দিন দুই একখানা মাল গাড়ীও আসে। ডাউন ট্রেন খানা সকাল ১০টায় চলে যায়। তার পর তার আর কোন কাজ থাকে না। হয় বাগানের মধ্যে শাকসব্জীর গাছ লাগায়, জঙ্গল পরিষ্কার করে, না হয় ফুলের বীজ ও চাড়ার সন্ধানে বের হয়। ফুল জগু বড়ই ভালবাসে। লাইনের দুই ধারে সে কত রকম সুন্দর সুন্দর দেশী ফুলের গাছ সে লাগিয়াছে তার ঠিক নাই।

যে দিন নেহাত তার কোন কাজই না থাকে, সে দিন বাঁশের মাচাটার উপর বসে বসে তার দেশওয়ালী সুরে গান গাইতে থাকে। অদূরে মাঠে অনেক রাখাল ছেলেও তার সুরের অনুকরণ করে গাইতে সুরু করে। সে শোনে আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে।

রাত যখন ক্রমে বেশী হয়, জগু খাওয়া দাওয়া সেরে মাচাটার উপর বসে বসে গুণ্‌ গুণ্‌ স্বরে গান গায়, অথবা চুপ করে বসে ঝিমায়। পৌনে বারটার সময় ১৩২ নং 'আপ্‌' ট্রেনখানা যায়। ষ্টেশনে ঘণ্টা বাজার শব্দ কিংম্বা সিগন্যালের তারের ঝুন ঝুন শব্দ কাণে গেলেই জগু উঠে আসে ; তারপর হাত বাতিটা জ্বালায়, উপরের কলটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে লাল কাচখানাকে নীল করিয়ে দেয়, তারপর দু'দিকের ফটক দু'টা বন্ধ করে দিয়ে, বাতিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়ীখানা চলে গেলেই তার সেদিনের মত ছুটী।

রেল লাইনের ঠিক পাশেই একটা ছোট বস্তি। বস্তির অধিবাসী অধিকাংশই কৈবর্ত্ত। দুই চার ঘর তেলীও বাস করে। গ্রাম থেকে একটা রাস্তা গুল্টি ঘরটার কাছে এসে রেল লাইনটার বুক চিড়ে ওদিকে নেমে গেছে ; এ রাস্তাটাই হচ্ছে গ্রামের রাজপথ। এই পথ দিয়েই লোকের চলাচল বেশী।

গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সবাই জগুর পরিচিত। সে নাকি আজ ১৫।১৬ বৎসর এখানে কাজ করছে। গ্রামের অধিকাংশই ও পথ দিয়ে যাবার সময় জগুর খানিকটা তামাকু ধ্বংস অথবা তার সঙ্গে দু'টো খোস গল্প না করে যায় না।

সব চেয়ে দীনু মাঝির সঙ্গেই জগুর ঘনিষ্টতা খুব বেশী। সংসারে দীনুর স্ত্রী ও ৭।৮ বছরের একটী ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। তার বাড়ীখানি গ্রামের শেষ প্রান্তে,—দুটী খোলার ঘর ও আর একটী গোয়াল ঘর। নদী, বিল থেকে মাছ ধরে নিয়ে সহরে গিয়ে বিক্রি করে যা পায়, তাই দিয়ে তার এক রকমে সংসার চলে যায়। কিন্তু দীনুর স্ত্রী প্রতিবাসিনীদের নিকট বলে যে ঐ জগু আফিংখোরের সঙ্গে মিশেই নাকি দীনু দিন দিন তার কাজে অবহেলা করছে ; বাড়ীতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টাও নাকি সে থাকে না ; প্রতিদিন জগুর বাসায় গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দু'জনে বসে বক বক করে।

জগু আফিং খায় বটে, কিন্তু নেশা করা বলতে যা বোঝায় তা করে না। সে বলে, "ও হামারা ছোটাসে অভ্যাস্‌ হো গেয়া, হাম্‌ ছোড়নে নেহি শক্‌তা ; লেকিন্‌ হাম্‌ আউর কুছ্‌ নেশা ভাঙ্গ্‌ নেহি কর্‌তা।" অনেক সন্ধ্যাতেই জগুর ঘরে মস্ত মজলিস বসে। গ্রামের ছেলে বুড়ো অনেকেই সেখানে জড়ো হয়। বহু তামাকু ধ্বংস ও খোস গল্পের পর একে একে সবাই ক্রমে উঠে যায়। শেষ পর্য্যন্ত থাকে শুধু দীনু। তারপর চলে তাদের সুখ দুঃখের কথা। দীনু নীরব হয়ে শোনে জগুর অতীত জীবনের ইতিহাস। জগু তার আধা বাংলা আধা হিন্দিতে বলে যায়—"হামারা দাদা ঠাকুর দোস্‌রা এক রেল কোম্পানীমে পয়েণ্টম্যানকা কাম্‌ কর্‌তা। উস্‌কো দু লেড়কা—এক হামারা বাবা, আউর দুস্‌রা হামারা খুড়া। দাদাঠাকুর কোম্পানীমে যো কুছ্‌ কামাই কিয়া থা বিলকুল নেশা ভাঙ্গ্‌ কর্‌কে উড়া দিয়া। পিছে হামারা বাবা বিদেশমে আয়া করকে ইয়ে রেল কোম্পানীমে চৌকীদারী কাম্‌ লিয়া থা। ওহি কাম্‌ পিছে হামারা মিলা। ঘর্‌মে হামারা একঠো লেড়কা থা, উ বেমার্‌সে মর্‌ গেয়া। পিছে উস্‌কো মাইভি মর্‌ গেয়া। তব্‌সে হাম্‌ বিদেশমে রহা হ্যায়, ঘর্‌মে আউর নেহি গেয়া।" বল্‌তে বল্‌তে দু এক ফোঁটা জল তার চোখের কোণে ছল ছল করে ওঠে।

এমনি ভাবে জগুর বছরের পর বছরগুলি কেটে যায়, ঐ ছোট্ট গণ্ডীটির ভিতরেই। মাঝে মাঝে পাড়া প্রতিবাসীদের খবর নিয়ে আসে, কে কেমন আছে। সবার শেষে দীনুর বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "দীনু, বাড়ী আছো ?" দীনুর ছেলে বীণু লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে আসে ; বলে, "ও, জগু সিং ! তারপর একখানা মাদুর এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিয়ে, প্রশ্নের পর প্রশ্নে জগুকে অস্থির করে তোলে,—"এতদিন আস নি কেন ? তোমার সাদা গাইটী কেমন আছে ? লেজকাটা ভুটিয়া কুকুরটা কি করছে ?" জগু সংক্ষেপে সব উত্তর দিয়ে যায়।

অনেকদিন জগু দীনুর কোন খবর পায় নাই। নিজেও বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিল, খবর নিতে পারে নাই। হঠাৎ একদিন রাত্রি প্রায় ১০টার সময় দীনু হাঁপাতে হাঁপাতে জগুর কাছে এসে উপস্থিত। বলল, "জগু, বীণুর আজ ১০।১২ দিন যাবৎ ব্যামো। কব্‌রেজ মশাই বল্লেন ব্যামো খুব কঠিন, ভাল চিকিৎসা না হলে ছেলে বাঁচানো শক্ত হবে। হাতে একটী পয়সা নেই যে সহর থেকে ভাল ডাক্তার এনে দেখাব। পাড়ার অনেকের নিকট ৫টী টাকার জন্য ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়েছি, কিন্তু একটী টাকাও কারও কাছ থেকে উধার পেলাম না।" এই বলে দীনু অঝোরে কেঁদে ফেলল।

জগু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "তুমি যাও, হামি থোরা পিছে আতা।" দীনু চলে গেল। ঘণ্টা খানিক বাদে জগু দীনুর বাড়ীতে এসে দেখল, তার স্ত্রী ছেলের বিছানার পাশে বসে চোখের জল মুছ্‌ছে। জগু ট্যাঁক্ থেকে দশখানি দশ টাকার নোট বের ক'রে দীনুর হাতে দিল। দীনু হতভম্বের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তাকে এরূপ ভাবে চেয়ে থাক্‌তে দেখে জগু বলল—"লে ভাইয়া, ইয়ে হামারা দান্ নেহি, ইয়ে ভগবান্ কি দান।"

* * *

অনেক বছর চলে গিয়েছে। জগু এখন আর নাই, অবসর পেয়ে দেশে চলে গেছে। তার স্থানে নূতন লোক কাজে লেগেছে। কিন্তু দীনু বলে, সে নাকি এখনও ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে শুনতে পায় যে জগু বলছে—"লে ভাইয়া, ইয়ে হামারা দান নেহি, ইয়ে ভগ্‌বানকি দান!"

গল্প-স্বল্প

কুমীরের সঙ্গে কুস্তি—একটা জল ভরা কাঁচের মস্ত চৌবাচ্চার মধ্যে কুমীরভায়াকে ছেড়ে দিয়ে জর্জ্জ লিঙ্ক্ সাহেবকে কুমীরের সঙ্গে কুস্তি কর্‌বার জন্য জলে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবিতে দেখ, দুজনে কেমন ধস্তাধস্তি চলেছে। কুস্তিতে নাকি সাহেবেরই জয় হয়েছিল। কিন্তু আসল কথাটাই বলা হয় নি;—কুমীরের দাঁতের উপর ভাল করে কাপড় জড়িয়ে দেওয়া

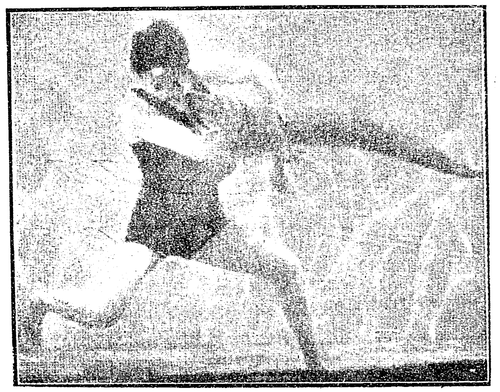

হয়েছিল, যা'তে সে তার ধারালো দাঁত দিয়ে কোন অনিষ্ট কর্‌তে না পারে। আসলে, শুধু গায়ের জোরের আর কুস্তির কায়দার পরীক্ষাই হয়েছিল।

ভূগোল শিখ্‌বার সুবিধা—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের একটি স্কুলে



ভূগোল শিখ্‌বার সুবিধার জন্য একটা বেশ ব্যবস্থা করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের একটি বিরাট মানচিত্রকে ছোট ছোট প্রদেশে ভাগ ক'রে, সেগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে কেটে, ছেলেমেয়েদের সাজাতে দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা সকলে মিলে সেই পৃথক পৃথক প্রদেশের টুকরোগুলো উপরে নীচে ও পাশাপাশিভাবে সাজিয়ে যুক্তরাজ্যের মানচিত্র তৈরী করে। তাতে ছেলেমেয়েরা বেশ সহজেই যুক্তরাজ্যের ও তার বিভিন্ন প্রদেশের ভূগোল শিখ্‌বার সুবিধা পায়। নীচের ছোট ছবিটিতে দেখো, ছেলেমেয়েরা এক একটি প্রদেশের টুকরো নিয়ে সাজাচ্ছে।

আশ্চর্য্য কারিকুরি— এই যে পাঁচটি এঞ্জিন দেখ্‌ছ, এগুলি কি জান? এগুলি বিভিন্ন সময়কার পাঁচটি এঞ্জিনের নিখুঁত প্রতিকৃতি। একজন ওস্তাদ কারিকর কেবলমাত্র একখানি ছুরির সাহায্যে কাঠ ও হাড় কেটে এগুলি তৈরী করেছেন। বড় এঞ্জিনগুলি দেখে, তা'র প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এই ছোট এঞ্জিনগুলিতে নিখুঁত-ভাবে লাগান হয়েছে। ছুরি ছাড়া আর কোন যন্ত্র এর জন্য তিনি ব্যবহার করেন নাই। গোল চাকা, বাঁকা কাঠ বা হাড়, অথবা ফাঁপা নল প্রভৃতি যেখানে দরকার হয়েছে, সেখানে হাড় বা কাঠকে বাঁকাবার তিনি কোন চেষ্টা করেন নাই। সেরূপ বাঁকা কাঠ বা নল প্রভৃতি সব তিনি বড় কাঠ বা হাড় থেকে কেটে বা খুদে তৈরী করেছেন। এই লোকটির মত ওস্তাদ কারিকর যে খুব কমই আছে তা তাঁর এই নিখুঁত কাজগুলি দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো।

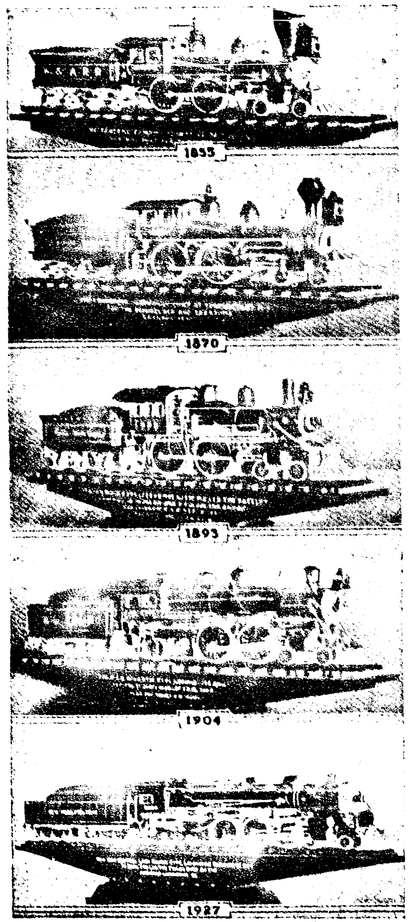

মেয়েদের ফায়ার ব্রিগেড—এই যে ছবি দেখ্‌ছ, এতে জাপানী মেয়েদের একটী ফায়ার ব্রিগেড দেখান হয়েছে। জাপানের পাহাড়ী অঞ্চলে এই ফায়ার ব্রিগেড রীতিমত কাজ ক'রে থাকে। সেখানে পাহাড়ে জায়গায় রাস্তা ঘাটের সুবিধা নাই ব'লে মানুষ-টানা ফায়ার এঞ্জিনের ব্যবস্থা আছে। এই



ফায়ার ব্রিগেডের সব কাজই মেয়েরা নিজেই ক'রে থাকেন এবং খুব ভাল করেই নাকি এ কাজ করতে পারেন তাঁরা।

অন্ধকারে টেনিস্ খেলা—ভোরের বেলা কিম্বা সন্ধ্যায় টেনিস্ খেলার সখ অনেকের হয়। তখন অন্ধকারে বল্ যাতে স্পষ্ট দেখা যায় সেজন্য আজকাল টেনিস্ বলের গায়ে এক রকম রং মাখান হচ্ছে। তাতে বল্ অন্ধকারে ঝক্‌ঝক্ ক'রে জ্বল্‌তে থাকে। এই রংএর দরুণ বলের কোন ক্ষতি হয় না এবং র‍্যাকেটও কিছু খারাপ হয় না।



হারানো বন্ধু

এই ছোট্ট ছেলেটি কি করছে তোমরা বুঝতে পারছো কি? এর বাড়ী জঙ্গলের ধারে, তাই সে বনের পশুর সঙ্গে খুব ভাব পাতিয়েছে। তা'র একটি বন্ধুকে অনেকদিন আগে সে হারিয়েছিল; আজ তাকে হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে। তা'কেই সে হাতে ধ'রে নিয়ে আস্‌ছে।

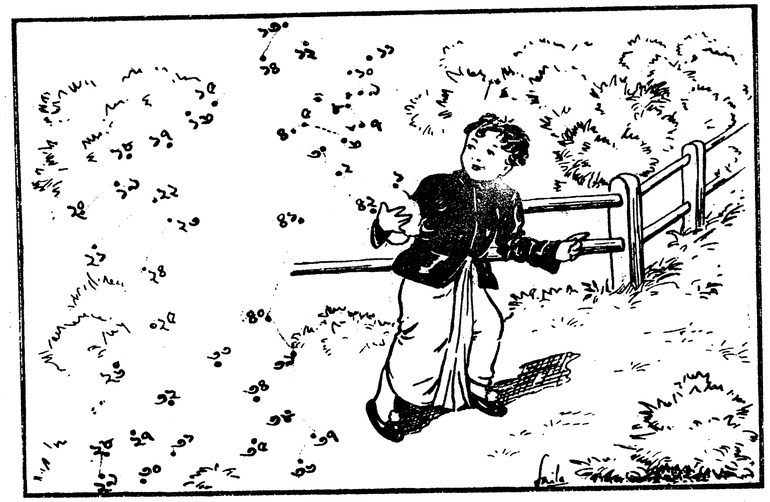

তোমরা বোধহয় তার বন্ধুটিকে দেখতে পাচ্ছ না। যদি তা'কে দেখ্‌তে চাও, একটা পেন্সিল নিয়ে ছবির ১, ২, ৩, ৪ বিন্দুগুলিকে পর পর লাইন দিয়ে জুড়ে দাও—১ থেকে ২, ২ থেকে ৩, ৩ থেকে ৪ এই ভাবে। সব বিন্দুগুলি যখন জোড়া শেষ হয়ে যাবে তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে ছেলের বন্ধুটি কে।



ধাঁধার উত্তর

চোর ধরা—পাহারাওয়ালা ৩০ পা গিয়ে চোরকে ধরতে পারবে।

দশ বেড়াল—পাশের ছবির মত ৩টি বৃত্ত এঁকে বেড়ালগুলিকে আলাদা করে ফেলতে হবে।

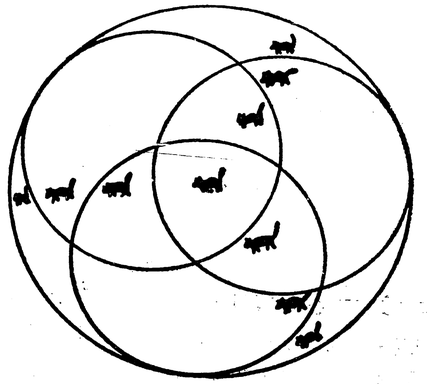

নূতন ধাঁধা

লুকানো নাম—

নীচে ৭টি লাইনে প্রত্যেকটিতে ৭টি ক'রে মোট ৪৯টা অক্ষর সাজানো আছে। ব্যাপারটা কি জানো? এর মধ্যে ৮টা জানোয়ার আর ৮টা পাখীর নামের অক্ষরগুলি পর পর লেখা আছে। হঠাৎ দেখলে কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে—যদি গোড়ার অক্ষরটা কোথায় আছে ঠিক ধ'রতে পারো, তাহ'লে সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে যেতে যেতে দেখতে পাবে যে, বাস্তবিকই ৮টা জানোয়ার আর ৮টা পাখীর নামের অক্ষরগুলি পর পর লেখা আছে। চেষ্টা ক'রে গোড়ার অক্ষরটি বের ক'রে, নামগুলি ঠিক পরের পর বের কর দেখি। অক্ষরগুলি

একটির নীচে একটি, একটির উপর একটি, অথবা একটির পাশে একটি থাকতে পারে। কোনও অক্ষরের উপর দিয়ে দু'বার যেতে পারবে না।

কু শ ণা য়ে হা স র
ন র পি টে ল চি সা
নে টি ল সী ই লো তা
ক য়া উ লা ড়া ডি চি
ড়ে সি ট মা চ মা ও
ব ন্ধু পা খী আ র ক
ক ঘো ট ক বৌ ক থা

—(শ্রীসত্যগোপাল সরকার)

মোটরে বেড়ান—পাশের ছবিতে ৬৪টি সহরের গোল গোল নক্‌সা আঁকা আছে। প্রত্যেকটি সহর তাহার পরেরটি থেকে এক মাইল দূরে। মাঝের লাইনগুলি তাদের মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা।

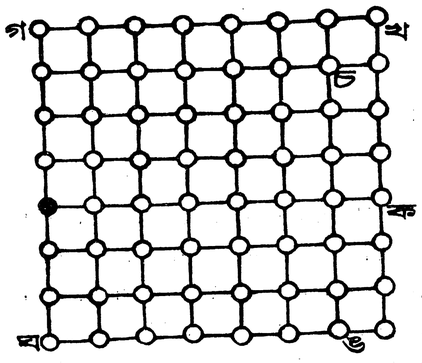

কালো সহরটির এক ভদ্রলোক তাঁর এক বন্ধুর মোটর গাড়ীখানা পেয়ে বেড়াতে বের হলেন। স্থির হলো যে তিনি যত মাইল ইচ্ছা যেতে পারেন, কিন্তু এক রাস্তা দিয়ে একবারের বেশী যেতে পাবেন না, অথবা মোট ১৫ বারের বেশী গাড়ী মোড় ফেরাতে পাবেন না। মনে কর, তিনি যদি কালো সহর থেকে ক, খ, গ, ঘ, ঙ সহরে মোড় ফিরিয়ে চ পর্য্যন্ত যেতেন তবে মোট ৫টি মোড় ঘুরে তাঁর ৩৭ মাইল যাওয়া হতো। তোমরা এখন বল দেখি, তিনি মোট ১৫টি মোড় ফিরে, কোন পথে, কত বেশী রাস্তা যেতে পারবেন।

ছেলেমেয়েদের জন্য
কয়েকখানি বাছাই বই

এগুলির পরিচয় ছেলেমেয়েদের কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যেমনি সরস সুন্দর ভাষা, তেমনি চমৎকার চমৎকার এক রঙের ও ৩-রঙের ছবি। মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত, এবং ডিরেক্টর-অব-পাবলিক-ইনস্ট্রাকসন কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র ...	॥০	কথাসরিৎ সাগর ...	॥৶০
,, বেতাল পঞ্চবিংশতি	॥০	রবিন্ হুড্	॥৶০
,, বত্রিশ সিংহাসন	॥০	ওডিসিয়ুস	।৶০
পুরাণের গল্প ...	॥০	ইলিয়াড	।৶০

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

নূতন সংস্করণ

স্বাস্থ্য

পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত

স্বাস্থ্যের কথা ছেলেমেয়েদের জন্য অতি সরল সরস ভাবে লেখা। ভাল কাগজে, বড় অক্ষরে, পরিষ্কার ছাপা। অনেকগুলি ছোট ছবি, সুন্দর মলাট। মূল্য—ছয় আনা

১। পড়া শুনা ।৶০
২। খেলার পড়া ।৶০

বই দুইখানির নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম-এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

COLOURED DOCUMENT.

Regd. No. C 700.

দি সান্ অপ্‌টিকাল কোম্পানি

নিখুঁত চোখ পরীক্ষা
এবং চশমা ফিটিংএর
— জন্য অদ্বিতীয় —

২৪।১ কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—বড়বাজার ২১৬৫

নূতন সংস্করণ! নূতন সংস্করণ!

সচিত্র

মহাভারতের গল্প

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত

৩য় সংস্করণ। দাম—১।০

মহাভারতের ৬৬টি বাছাই সুন্দর সুন্দর গল্প, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অতুলনীয় সরস ভাষায় লেখা। তাঁহার নিজের আঁকা একখানি ৩-রঙের ছবি ও অনেক গুলি এক-রঙের ছবিতে বইখানি আরো মনোরম হয়েছে। ছেলেমেয়েদের অতি সুন্দর বই। ঝকঝকে পরিষ্কার ছাপা; চমৎকার বোর্ড বাঁধাই।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,
১১৭।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা



COLOURED DOCUMENT.



দুধের বোতল্ টান্‌তে গিয়ে ঘুমিয়ে প'ল খুকু,
এই সুযোগে লাবাড় করি তাহার খাবারটুকু ;
আমার সরেস হাড্ডিটাকে দিলাম তারে খেতে,
একটুখানি অদল্ বদল্,—দোষ কি আছে এতে ?

সন্দেশ

নব পর্য্যায়
৩য় বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

৯ম সংখ্যা

জষ্টি সাঁঝে বিষ্টি

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

জষ্টি সাঁঝে বিষ্টি পড়ে
যষ্টি মধু ঝর্‌ছে কি !
নিঝুম রাতে হাস্‌নু হানায়
গন্ধে ব্যাকুল কর্‌বে কি !—

সোঁদা মাটীর গন্ধ ওঠে,
বেল ফুলেরা চম্‌কে ফোটে,
লক্ষ্মী মায়ের আশীষ ধারা
ভুবন আজি ভর্‌ছে কি !—

COLOURED DOCUMENT.

ঝোড়ো হাওয়া জামরুল বন
চপল পায়ে দুলিয়ে যায়,
কালো মেঘের সজল ছায়া
চোখে কাজল বুলিয়ে যায়।—

দুলে দুলে সুপুরিরা
নিচ্ছে মাথায় স্নেহের ধারা,
রামধনুকের রঙটী হঠাৎ
চম্‌কে পরাণ ভুলিয়ে যায়।

টিপ টিপ টিপ টিপ টিপ টিপ টিপ
ঝর ঝর ঝর শুন্‌বি আয়,
বিষ্টি সাথে শিল পড়্‌ছে,
এক দুই তিন গুণ্‌বি আয়।—

সোণা ঝরা আম বাগানে
নতুন খেলার খবর আনে,
বাঁশের বনে বাঁশি বাজে,
আয়রে তোরা শুন্‌বি আয়।—

জষ্টি সাঁজে বিষ্টি এলো
জোলো হাওয়া বইল রে,
ঝাপ্‌সা হ'য়ে আকাশ পানে
মাঠ যে চেয়ে রইল রে।—

মেঘের কোলে সাঁঝের তারা
আজ সে কোথায় পথটী হারা।
বিষ্টি দেশের মিষ্টি কথা
হঠাৎ কে আজ কইল রে—
জষ্টি সাঁঝে বিষ্টি এলো
বাদল হাওয়া বইল রে।—

ডিক্ ও ভূতুরে বাড়ী

(শ্রীদেবব্রত রায় চৌধুরী, এম্-বি)

— পূর্ব্বানুবৃত্তি —

রাত বেশী হ'তেই ডিক্ আলোটি নিবিয়ে দিলো। মশালটা হাতের কাছেই ঘরের এক কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে দিলো। অনেকক্ষণ কিছুই বুঝতে পারা গেল না। রাত যখন বেশ গভীর হয়েছে, তখন ঘরের জানালাটার গায়ে খচর খচর শব্দ হ'তে আরম্ভ হ'ল। মনে হ'তে লাগল যে কোনও গাছের ডাল পালা এসে জানালার গায়ে ঘসা খাচ্ছে। ডিক্ একবার ভাবল সে জানালাটা খুলে দেখে, কি ব্যাপার। কিন্তু তখনই তার মনে পড়ে গেল যে, আজ রাত্রে সে দরজা বা জানালা কিছু খুলবে না, স্থির হয়েছিল। কাজেই ডিক্ চেয়ারটার উপর বসে বসে সেই শব্দ শুনতে লাগল, আর শব্দটা যে কি হতে পারে এই কথা মনে মনে তর্ক বিতর্ক করতে লাগল। কিন্তু শেষে বড়ই বিরক্তি ধরল, কেন না শব্দটা অনবরত হচ্ছিল। ডিক্ এবার ভাবল যে জানালাটা একটু ফাঁক্ করে দেখবে বাহিরে কি হচ্ছে; মনে করল তাতে কোনও ক্ষতি হবে না। তাই সে জানালার অর্গল খুলতে আরম্ভ করলো। ডিক্ যদি জানালার তক্তার ভেতর দিয়ে বাইরে দেখতে পারত, তাহলে দেখতে পেত যে বাহিরে জানলার আল্‌সের ওপর, তার নীচেকার দেওয়ালের গায়ে, আর সামনের জমিটায় অসংখ্য বড় বড় গোল গোল অদ্ভুত ধরণের জীব জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর আসবার চেষ্টা করছে। ডিকের গায়ের গন্ধ পেয়ে তারা যেন ক্ষেপে উঠেছে। তাদের মধ্যে যারা জানালার ওপর উঠে পড়েছে, তারাই তাদের অনেকগুলা হাত পা দিয়ে জানালা আঁচড়াচ্ছে—আর সেই জন্যই ওরকম খচর খচর আওয়াজ হচ্ছে। সেগুলা দেখতে বেজায় রকম বিশ্রী আর বিকট। প্রত্যেকের আটটা করে ঠ্যাং আর সমস্ত গা ঘন লোমে ঢাকা। বড় বড় পুঁতীর মত চোখগুলা জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বলছে। এই রকম বিকট জীবগুলা আকারে বেশী বড় না হলেও, অতগুলীকে এক সঙ্গে দেখলে খুব সাহসী লোকেরও বুক কেঁপে উঠে। যা হোক, ডিক্ তো এসব দেখতে পাচ্ছিল না, কাজেই সে বেশী সাবধান না হয়ে জানালার অর্গলটা খুলে, পাটী দুটা একটু ফাঁক করল। ওপাশে তখন

৮।১০টা ঐ গুলা ভেতরে আসবার জন্য প্রাণপণে ঠেলাঠেলি করছিল। ডিক্ তত জোরে জানালার উপর হাত রাখে নি। কাজেই যেই জানালা খুলেছে, অমনি তারা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে হুড়মুড় করে ৫।৭টা এক সঙ্গে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। ডিক্ কখনও ও রকম জন্তু দেখে নি, সে তাড়াতাড়ি এক লাফে পেছনে সরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। যে ক'টা ঢুকেছিল, সে কটার অনেকগুলা হঠাৎ লাফিয়ে পড়ার দরুণ উল্টে গিয়ে ছিল, আর পরস্পরের চাপাচাপিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। তারা একটু সামলে নিয়েই, একযোগে ডিকের দিকে তাড়া করে গেল। ততক্ষণ আরও অনেকগুলা ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারা সবাই ডিক্‌কে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেল্ল। ডিক্ অনবরত লাথি মেরে, ছোরার খোঁচা মেরে এদের তাড়াতে লাগল। কিন্তু কোন দিক সামলাবে? সামনে দেখে তো পেছন থেকে তারা ডিকের গা বয়ে উঠতে সুরু করে। ভাগ্‌গিস্ ডিক্ খুব পুরু কাপড়ের জামা, উঁচু বুটজুতা আর দস্তানা পরে এসেছিল; তাই এরা বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারল না। এদের লক্ষ্য, ডিকের গা বয়ে উঠে ওর মুখ আক্রমণ করবে; কেন না, ডিকের মুখটাই শুধু খোলা ছিল। ডিক্ বুঝল যে এভাবে এদের সঙ্গে বেশীক্ষণ লড়তে পারবে না। এতক্ষণে সে বুঝেছিল এ জন্তুগুলা এক রকম খুব বড় আকারের বিষাক্ত রক্তচোষা মাকড়সা। এরা দল বেঁধে এসেছে, আর ডিক্ ১০টা কি ২০টা মেরে ফেল্লেও এদের ঝাড় শেষ হবে না। ইতিমধ্যে যদি কোনওটা ওর মুখের কাছে পৌঁছে কামড়ে ধরতে পারে তাহলে আর নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। অন্য কোনও উপায় আর নেই দেখে, ডিক্ এক লাফ দিয়ে ঘরে যে ৪টে দোলনা ছিল, তার মধ্যে একটার উপর উঠে বসল। তার পায়ে তখনও ৩টে মাকড়সা চড়ে বসেছিল। হাতের ঝাপ্‌টা দিয়ে সেগুলাকে ডিক্ ফেলে দিয়ে তখনকার মত নিরাপদ হ'ল। হাতের শিকার পালায় দেখে মাকড়সার দল কিন্তু ভীষণ ক্ষেপে উঠল। তারা খানিকক্ষণ নীচে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ডিকের দিকে জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে কট্ মট্ করে তাকাতে থাকল। কেউ কেউ ২।৪টে লাফও মারল। কিন্তু এরা বেশী লাফাতে পারত না, কেন না এদের শরীর বেশ ভারী ছিল। কিন্তু এগুলা এমন নাছোড়বান্দা ছিল যে, দলে দলে দেওয়াল বয়ে ছাদের দিকে উঠতে লাগল। ছাদে পৌঁছে, ছাদ বয়ে, যেখান থেকে ডিকের দোলনা শেকল দিয়ে ঝোলান ছিল, সেই দিকে আসতে লাগল। দোলনাগুলী দুটো করে শেকল

দিয়ে ঝোলান ছিল। তাদের মতলব যে ঐ শেকল বেয়ে দোলনায় নেমে ডিক্‌কে ধরবে। যখন শেকল ধরে ধরে, তখন ডিক্ বেগতিক দেখে, যেমন করে ট্র্যাপিজে লাফায়, তেম্নি করে প্রথমে খানিক দোল খেয়ে নিয়ে, শূন্যে লাফিয়ে অন্য দোলনায় গিয়ে উঠে বসল। মকড়সা গুলাও তেমনি জেদী, তারা আবার নতুন উৎসাহে এই দোলনায় যাবার জন্য এগুতে লাগল। ডিক্ ভাবল যে সারারাত তাকে এই রকম লাফালাফি করতে হবে, কিন্তু দেখল যে তাও হবার যো নেই। ডিক্ যে দোলনা ছেড়ে এসেছিল, সে দোলনায় অনেকগুলা মাকড়সা বসে থাকল। আরও দুটো দোলনা অবিশ্যি ছিল, কিন্তু সব কয়টাতেই যদি কতকগুলা করে মাকড়সা থেকে যায়, তা'হলে ডিক্ নীচেও নামতে পারবে না, দোলনার উপর থাকলেও বাঁচবে না। দ্বিতীয় দোলনায় বসে বসে ডিক্ তাই ভাবতে লাগল, এর পর কি উপায় ধরবে। এমন সময় তার মশালটার কথা মনে পড়ল। এবার যে দোলনাটায় বসেছিল, সেটাতে এক পা কোনও রকম করে আটকে হেঁট-মুণ্ডু হয়ে অনেক বেঁকে অনেক কষ্টে মশালটার নাগাল পেল। ডিক্ নানারকম জিম্‌ন্যাষ্টিক্ করত বলে ঐ রকম কায়দা করে মশালটা ধরতে পারলো। একটু অসাবধান হলে দড়াম করে মেজের উপর পড়ে যেত, আর সেই রাক্ষুসে মাকড়সাগুলো বুড়োকর্ত্তার যে দশা করেছিল, ডিকের বেলাও তাই করত।

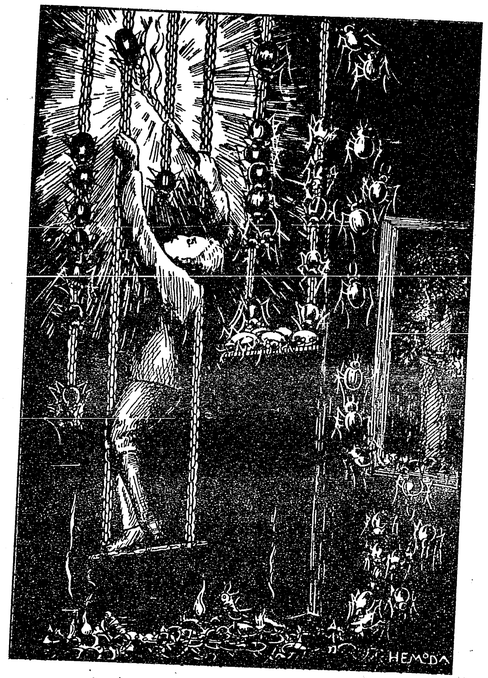

যা হ'ক্, ডিক্ মশালটা নিয়েই সেটাকে

দেশালাই দিয়ে ধরিয়ে নিল। এতক্ষণে এ দোলনাতেও মাকড়সারা এসে পড়েছিল, প্রায় ডিকের কাঁধে উঠে আর কি? ডিক্ তাদের গায়ে মশালের আগুনের ছ্যাঁকা দিতে আরম্ভ করল। তখন তারা থপ্ থপ্ করে নীচে পড়ে গেল। ডিক্ সেই দোলনায় ঝুলে ঝুলে যত মাকড়সার নাগাল পেল সবগুলার গায়ে আগুন লাগাতে লাগল। অনেকগুলা মরে গেল, অনেকগুলা ঝল্‌সে গিয়ে নির্জীব হয়ে গেল। বাকীগুলা হঠাৎ এত আলো, আগুন, আর বিপদ দেখে, বেজায় ভয় পেয়ে হুড় মুড় করে পালিয়ে গেল। যখন ডিক্ বুঝল যে ঘরে আর জ্যান্ত কিম্বা ক্ষতি করতে পারে এমন মাকড়সা নেই, তখন সে দোলনা থেকে নেমে এসে আবার জানলাটা বন্ধ করে দিলে। ঘরে মাংস পোড়ার পচা গন্ধে ডিক্ অস্থির হয়ে উঠল, কিন্তু জানালা আর খুলতে সাহস করল না। মশালের উজ্জ্বল আলোয় ডিক্ মরা আর আধ-মরা মাকড়সাগুলাকে ভাল করে দেখতে লাগল। এমন ভীষণ দেখতে তারা, যে ডিকেরও মনে ভয় হতে লাগল। মাকড়সাগুলাকে এক কোণে জড় করে রেখে ডিক ঘুমাবার চেষ্টা করল।

এর খানিক পরেই সকাল হ'ল। বেলা আন্দাজ ৮টায় অন্য লোকরা এসে উপস্থিত হ'ল। ডিক্ রাত্রের সব ঘটনা তাদের বল্ল আর মাকড়সাগুলাকে দেখাল। ভীষণ ভীষণ অতিকায় মাকড়সাগুলাকে দেখে, দিনে দুপুরেও সবাইকার গা ভয়ে শিউরে উঠেছিল। ডিক্ বল্ল, "কি কারণে পশুরা মরত, আর কি কারণেই বা বুড়োকর্ত্তার প্রাণ গিয়েছিল, তা তো বোঝা গেল; কিন্তু মাকড়সার পাল পালিয়ে কোথায় গেছে, তা ত এখনও জানা গেল না। আমার বিশ্বাস তারা কাছেই কোথাও বাসা করে থাকে। সেটা না জানলে, আর তাদের সব ক'টাকে একেবারে মেরে না ফেল্লে, আসল বিপদটাতো যাবে না!" তখন সবাই য়্যাশ্‌গাছের নীচেকার বেঞ্চগুলায় বসে, এর পর কি করা যায় তার পরামর্শ করতে লাগল।

জনের একটা সুন্দর বেড়াল ছিল। সেটা প্রায়ই জনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো, আজও জনের সঙ্গে ওখানে গিয়েছিল। ডিক্ হঠাৎ দেখতে পেল, যে বেড়ালটা য়্যাশ্ গাছের ওপর উঠে, যেখানে তিনটে ডালের ভাগ হয়েছে, সেখানে বসে, মাথা নীচু করে একমনে কি দেখছে; যেন গাছের গুঁড়ীটার ভেতর কিছু একটা হচ্ছে। খানিক পরে, বেড়ালটা যেই একটু নড়ে বসতে যাবে, অম্নি পা পিছলে হঠাৎ সুড়ুৎ করে গাছের গুঁড়ীর ভেতর পড়ে গেল। তখন ডিক্ বুঝলে

যে গাছের গুঁড়ীটার ভেতর একটা গর্ত্ত বা ফোকল আছে। পড়ে যাবামাত্র বেড়ালটা বিকট চিৎকার করে উঠলো। তারপরই হঠাৎ তার চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল, যেন কেউ তার মুখ চেপে বন্ধ করে দিল। তারপর একটু হুটো পুটির শব্দ, তারপর সব চুপ্ চাপ! বেড়ালের চিৎকার অন্য সবাই শুনতে পেয়েছিল, আর অবাক্ হয়ে গাছের দিকে তাকিয়ে ছিল। ডিক্ বেড়ালটার কি হয়েছিল তা তাদের জানাল, আর বল্ল, "আমার মনে হয়, মাকড়সারা এই য়্যাশ্ গাছটার গুঁড়ীর মধ্যেই থাকে। বেড়ালটা একেবারে তাদের ভেতর গিয়ে পড়েছে। ওকে আর বাচান যাবে না; কিন্তু য়্যাশ্ গাছটাকে প্রথমে ভাল করে



দেখে নি, তারপর কোনও উপায় চিন্তা করা যাবে। একটা মৈ আর একটা লণ্ঠন আনান।" মৈ আর লণ্ঠন এলে, ডিক্ গাছের গুঁড়ীতে মৈ লাগিয়ে, উপরে উঠে দেখল, য়্যাশ্ গাছটার গুঁড়ীটা আগাগোড়া লম্বালম্বী ফাঁপা। বড় অন্ধকার, ভেতরে বেশী দূর দেখাই যায় না, একটা বিশ্রী আঁস্‌টে গন্ধ নাকে আসছিল। ডিক্ লণ্ঠনটাকে একটা দড়িতে বেঁধে গর্ত্তটার ভেতর ঝুলিয়ে দিয়ে মুখ নীচু করে খানিকক্ষণ ভাল করে দেখল। তারপর নেমে এসে বল্ল, "ঠিকই মনে করেছিলাম।

খুব নীচে মাটীর ভেতর গর্ত্ত করে মাকড়সারা আছে। আমার গন্ধ পেয়ে কয়েকটা গুঁড়ীর গা বয়ে উপরের দিকে তাড়া করে আসছিল, কিন্তু লণ্ঠনের আলো দেখে ভয় পেয়ে আর এগুলো না। এখন এক কাজ করতে হবে। খানিকটা পুরাণ কাপড় আর কেরোসিন তেল চাই। কাপড়ে তেল লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে গুড়ীর ভেতর ফেলে দিলে মাকড়সাগুলা অনেকে মরে যাবে আর বাকী সব বেরিয়ে আসবে। আমরা গাছের চারিদিক ঘিরে দাঁড়াব। যে গুলা বের হবে সেগুলাকে পিটে মারব। এই করলে মাকড়সার পাল ধ্বংস হবে।" তাই করা হ'ল। য়্যাশ্‌গাছ শুকনা বলে, অল্পক্ষণের মধ্যে আসল গাছের ভেতরটাতেই আগুন লেগে গেল। গুঁড়ীর মুখ দিয়ে ঘন ধোঁয়া বের হ'তে থাকলো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাংস পোড়া দুর্গন্ধও আসতে লাগল। লাঠি আর বর্ষা নিয়ে, সব্বাই গাছটার ২০।২৫ হাত দূরে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল। একটু পরেই সেই রকম কালো কালো, লোমে ভরা, ৮ পা ওয়ালা, নারকেলের মত বড় বড় ভীষণ-আকৃতি মাকড়সারা গুঁড়ীর মুখ দিয়ে লাফিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। ডিক্ আর অন্যরা অমনি তাদের মারতে সুরু করে দিল। অনেকক্ষণ এই রকম চল্ল, অনেক মাকড়সা মারা হ'ল, আর ততক্ষণে য়্যাশ্‌-গাছটাও পুড়ে শেষ হয়ে গেল। দেখা গেল, যে গাছের নীচে মাটির ভেতর প্রকাণ্ড একটা গর্ত্ত রয়েছে। তার ভেতর মারবেলের মত বড় অসংখ্য ডিম্ আর অনেক বাচ্ছা মাকড়সা রয়েছে। এগুলাকেও নষ্ট করে ফেলা হ'ল। এই সব মাকড়সা রাত হলেই দলে দলে বেরিয়ে পশু, পক্ষী, জন্তু, জানোয়ার যাকে পেত আক্রমণ করত; তাদের রক্ত চুষে খেত। এদের তেজী বিষ তাদের গায়ে ঢোকায় তারা অবশ হয়ে যেত, পালাতে পারত না। মরে যাবার পর তাদের শরীর ঐ রকম ফুলে যেত, আর কালো রংএর হয়ে যেত। এই কারণে পরে আর তাদের গায়ে মাকড়সাদের কামড়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যেত না।

ডিকের সৎসাহসেই আসল কথা বার হ'ল, আর মাকড়সার পালও শেষ হ'ল। সব্বাই ডিকের খুব প্রশংসা করতে লাগল। নতুন ভদ্রলোকটি অনেক টাকা পুরস্কার দিতে চাইলেন। ডিক্ অবিশ্যি কিছুই নিলো না। বাড়ীটা সেই দিনই বিক্রি হয়ে গেল।

এবার ডিক্ পাহাড়ের ওদিকে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিলো। ২।৩ দিনেই সে যাত্রা করবে ঠিক করল। সে কাহিনী অন্যবার বলবার ইচ্ছা থাকল।

বর্ষা

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বাদলের মাদলের গুরুগুরু তালেতে
নীলাকাশে কোণ ঘেঁষে অপরূপ সাজেতে
হরিণের নয়নের কালিটুকু মাখিয়া
মেয়ে এক চেয়ে দেখ এলো ওই নাচিয়া।
বুকে তার দোলে হার বিজলীর চমকি,
সারা গায় আলো ছায়, নেচে যায় ঠমকি'।
এলো কেশ,—এ কি বেশ! আকাশের দুই কূল
উপ্‌চিয়ে পড়ে বেয়ে তার ঘন কালোচুল।
বনানীর থাকা থির হ'ল ক্রমে দায় রে,
দুর-দুর কোন্ সুর, বুকে বহে যায় রে!
কদমের মরমের মাঝখানে কার চুম
ছুঁয়ে যায় ব্যথা পায়, ভেঙে যায় তার ঘুম।
কেয়াবন বিতরণ করে তার সৌরভ
খেয়া তার গেছে পার বাকী এই গৌরব।
কামিনীর আঁখিনীর ঝ'রে পড়ে টুপ্‌টুপ্,
দুখ তার মুকুতার ছবি আঁকে অপরূপ।
আঁধিয়ার দুনিয়ার দেহে টানে অঞ্চল;
জোলো বায়, জাগে তায় শত ঢেউ চঞ্চল।
সারা বেলা একি খেলা ধরণীর গগনের,
জাল বোনে আন্‌মনে ফেলি জল নয়নের।

হিংসুটে

(শ্রীঅখিল নিয়োগী)

অনেক রাত্তিরে হঠাৎ খোকার ঘুম ভেঙে গেল। পিট্ পিট্ করে চোখ চেয়ে দেখ্‌লে মা পাশে নেই।

প্রায় রোজই রাত্তিরে উঠে মা তাকে দুধ গরম করে খাওয়ায়। খোকা মটকা মেরে পড়ে রইল; ভাব্‌ল মা এক্ষুনি আস্‌বে।

কিন্তু মার ফেরবার কোনো লক্ষণই সে দেখ্‌তে পেল না।

তা ছাড়া সে দেখ্‌ল সমস্ত বাড়ীতে আলো জ্বল্‌ছে, পিশিমা কাকার দল ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা কচ্ছে। বাইরের বারান্দায় ক্ষ্যান্ত ঝি ষ্টোভে জল গরম কচ্ছে। ব্যাপারটা তার একটুও ভালো লাগ্‌লো না।

খানিক বাদে দেখ্‌ল তার বড় কাকার সঙ্গে এক সাহেব ডাক্তার এসে গট্ মট্ করে পাশের ঘরে ঢুক্‌ল।

সে ভারী চটে গেল তার মার ওপর। তাকে এই ঘরে একা ফেলে কোথায় গিয়ে রইল তার মা? আসুক না একবার এই ঘরে ফিরে! সে পাশ ফিরে শুয়ে থাক্‌বে—একবার কথাও কইবে না।

কিন্তু মার ফিরে আস্‌বার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

হঠাৎ বারান্দায় ঘন ঘন শাঁক বেজে উঠ্‌ল। ঠাকুমা পিশিমার দল সবাই এক সঙ্গে উলুধ্বনি দিয়ে উঠ্‌ল।

ছোট পিশি কি কাজে ঘরে ঢুকেছিল; খোকা এইবার তার অভিমান ভুলে গিয়ে নেহাৎ মরিয়া হয়ে শুধাল, 'মা কৈ,—মা?' ছোট পিশির মুখে হাসি খুসী আর ধরে না। বল্লে, 'ওরে খোকন, তুই জেগেছিস্? তোর যে একটি লাল টুক্‌টুকে ছোট্ট বোন হয়েছে—আয় দেখ্‌বি আয়—।'

কথাটা খোকার একটুও ভালো লাগ্‌লো না। তার আবার বোন কোত্থেকে এলো? আর যদি এসেই থাকে—সেই কি মার কোল দখল করে রয়েছে নাকি? রাগে খোকার নাকটা ফুলে উঠ্‌ল। বল্লে, 'ছাইয়ের বোন—আমি চাই না।'

ছোট পিশি বল্ল, 'আচ্ছা, তুই তা হ'লে ঘুমো! আমার বড্ড তাড়া—'

বলে যেমন হন্তদন্ত হ'য়ে পিশি ঘরে ঢুকেছিল তেমনি ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খোকা জেগেছে শুনে ঠাকুমা ছুটতে ছুট্‌তে এসে বল্ল, 'ওরে খোকন, দেখ্‌বি আয়, দেখ্‌বি আয়, তোর কুচুমণি বোনটা কেমন পিট্ পিট্ করে তাকাচ্ছে!'

খোকন ভাব্‌ল, বা—রে! এত ভারী মজা! বাড়ী শুদ্ধ সবাই বোন নিয়ে ব্যস্ত! এতদিন তাকে ছাড়া গোটা বাড়ীতে আর কেউ কিছু জান্‌ত না। এখন এ বোনটা এলো কোত্থেকে?

রেগে মেগে উঠে সে বল্ল, 'মরুক গে তোমাদের পচা বিচ্ছিরি বোন—'

ঠাকুমা আঁৎতে উঠে বল্লেন, 'ষাট্ ষাট্, ওকথা কি বল্‌তে আছে? ও যে তোরই ছোট্ট একরত্তি বোন; তোকে দাদা বলে ডাক্‌বে। আয়, একবারটি দেখ্‌বি আয়।'

তারপর তাকে খুসী করবার জন্যে কোলে তুলে নিয়ে বল্ল, 'হ্যাঁরে খোকন, তুই তোর বোনকে কি দিবি রে?' কোল থেকে জোর করে নাম্‌তে নাম্‌তে খোকা বল্ল, 'ছাই দেবো—চাই না আমি পচা বোনকে দেখ্‌তে—।'

ঠাকুমা অবাক হ'য়ে গালের ওপর একটা আঙ্গুল রেখে বল্লেন, 'ওমা কি হিংসুটে গো! বোনটাকে একবার দেখ্‌তেও চায় না! হ্যাঁরে তুই কি একাই মায়ের কোল জুড়ে থাক্‌বি নাকি?'

খোকন কথা বল্ল না, গুম্ হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

ঠাকুমা মনে করল, বুঝি খোকন ঘুমিয়েই পড়ল। তাই একটা পাত্‌লা চাদর তার গায়ের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

ঠাকুমা চলে যেতেই খোকন চোখ খুল্‌ল।

জান্‌লা দিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ল নারিকেল গাছের সব চাইতে উঁচু পাতাটা জ্যোৎস্নায় যেন স্নান কচ্ছে। ঝিরঝিরে বাতাস থেকে থেকে পাতাটাকে দোলাচ্ছিল, —কত দিন খোকন মায়ের বুকে মুখ গুঁজে সে পাতার কাঁপন দেখেছে। কতদিন তার মা এই জান্‌লার ভেতর দিয়ে চাঁদা মামাকে ডেকে তার কপালে টু দিয়েছে। কতদিন রাত্তিরে ঘুমুবার আগে দুষ্টুমি করেছে ব'লে, মা এই জান্‌লার ভেতর দিয়েই তাকে জুজুর ভয় দেখিয়েছে।

আজ তার পাশে আদর করতেও কেউ নেই, ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াতেও নেই। অভিমানে তার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠ্‌ল।

আজ্‌কের এই রাত্তিরের ব্যাপারটা তার একটুও ভালো লাগ্‌ছেনা।

কোত্থেকে এলো এই বোনটা? আর তাকে নিয়েই বা বাড়ী শুদ্ধ লোকের এত মাতামাতির দরকার কি? কেন, এই বাড়ীতে ত' খোকনও রয়েছে। তার সঙ্গে সক্কলকার কত জানা-শোনা! হঠাৎ অচেনা একটা মেয়ে আস্‌তেই তাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ করার কি দরকার?

না, খোকন আর ভাব্‌তে পারেনা। সব চাইতে তার রাগ হচ্ছিল মায়ের ওপর। ছোট পিশি-টিশির কথা না হয় ও ছেড়েই দিল। কিন্তু মা? রাত্তিরে খোকন যদি তার বুকের ওপর না শুয়ে থাক্‌তো তা হ'লে ত' তার ঘুমই আস্‌ত না!

আচ্ছা, আজ আর সে কিছুই বল্‌বে না! কাল সকাল বেলা মা যখন দুধ খাওয়াতে আস্‌বে সে মুখটি বুজে শুয়ে থাক্‌বে; আর তখন যদি মা তার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে বলে 'সোনা আমার, মানিক আমার, খাও—'সে অমনি তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে বল্‌বে 'যাও না তোমার খুকীর কাছে, আমি তোমার কে?'

এই কথায় মা যে কেমন জব্দ হয়ে যাবে সেই কথা ভেবে খোকা ভারী আরাম পেলো। তারপর ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল তা জান্‌তেও পারল না।

সকাল বেলা ক্ষ্যান্ত ঝির ডাকাডাকিতে খোকার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ওমা! সে যা ভেবেছিল তার কিছুই নয়! মাকে সকাল বেলা কি করে জব্দ করবে তারি ফন্দী এঁটে রাত্তিরে ঘুমুলো, আর ঘুমের ভেতর সেই স্বপ্নও দেখ্‌লে। কিন্তু সক্কাল বেলা চোখ চাইতেই দেখে ক্ষ্যান্ত ঝি দুধের বাটী নিয়ে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্ষ্যান্ত বল্ল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও খোকন। জানো তো, তোমার নতুন বোন হয়েছে! আজ কি আমার মরবার ফুরসৎ আছে?'

দুত্তোর ছাই—সক্কলের মুখে ঐ এক কথা—নতুন বোন, নতুন বোন, নতুন বোন! নতুন বোন এসেছে ত' তার কি? ও না এলেই সে সব চাইতে খুসী হ'ত। রাগে ক্ষ্যান্তর হাত থেকে সে দুধের বাটী মেঝেতে ফেলে দিল; তারপর ঝড়ের মতো ঘর থেকে বাইরে চলে গেল।

খোকা গিয়ে বাড়ীর পেছন দিককার বাগানে বস্‌ল। কত রকমের পাখী গাছের ডালে ডালে বসে কিচির মিচির সুরু করে দিয়েছে! খোকার মনে হ'ল,

এরাই বুঝি তার আপনার—সত্যিকারের খেলার সাথী; বাড়ীতে কেউ তাকে ভালবাসে না। যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে সে যাবে কেন? থাক্‌ ওরা ওদের নতুন খুকী নিয়েই—খোকনকে তাদের কি দরকার!

টপ্‌ টপ্‌ করে দু'ফোঁটা জল খোকার গাল বেয়ে ঘাসের উপর পড়ল!

* * * *

খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ।

খোকাকে বাড়ীতে কোথায়ও পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ীর হীরু চাকর থেকে সুরু করে নটবর গোমস্তা পর্য্যন্ত সবাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

ক্ষ্যান্ত ঝি গোয়াল ঘরগুলো পর্য্যন্ত খুঁজে এসেছে কিন্তু কোথায়ও খোকার হদিশ পাওয়া যায়নি।

খোকার কাকারা মাঝিদের ডেকে পুকুরে জাল ফেলে হৈ—চৈ বাধিয়ে দিয়েছে! কিন্তু কোথায় তাদের খোকন?

আঁতুর ঘরে বসে মা কেঁদে কেটে বল্‌ছে, 'আমি আট্‌কা পড়ে আছি বলেই এমন কাণ্ড ঘট্‌ল—ওগো, আমি একবার বাইরে যাবো।'

ঠাকুমা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে মরা কান্না কাঁদছে, আর বল্‌ছে, 'ওগো, কেন আমি তাকে চোখের আড়াল করলুম!'

ঠিক এমনি সময় বাগানের দিক থেকে আওয়াজ এলো—'পাওয়া গেছে,—পাওয়া গেছে!

ঘুমন্ত পুরী যেন এক মুহূর্ত্তে সজীব হয়ে উঠ্‌ল। ছুটে এলো পিশির দল, কাকার দল, ঠাকুমা, ক্ষ্যান্ত ঝি, বাড়ীর সবাই!

কোথায় ছিলি—কোথায় ছিলি?

মা আঁতুর ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠে বল্ল, 'দাও, ওকে একবারটি আমার কোলে দাও।'

বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরিয়ে দিয়ে মা বল্ল, 'কোথায় ছিলি রে খোকন, আমার ওপর অভিমান করে?'

খোকন কোনো কথা বল্ল না,—শুধু পিট্‌ পিট্‌ করে তাকাতে লাগ্‌লো। সে চাওয়ার মানে হচ্ছে—কেমন জব্দ!

মাটির তেল

(শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি)

আজকাল আমাদের মধ্যে যারা বড় সহরে থাকি তাদের অনেকেই সুইচ টিপে ঘরে বিজলী বাতি জ্বালি, গ্যাস বা পাথুরে কয়লা পুড়িয়ে তাপ পাই। আগেকার কালে কিন্তু এসব কিছু আবিষ্কার হয় নি। একেবারে প্রথম প্রথম লোকে তো কাঠ ও পাতা পুড়িয়েই তাপ পেত, আলো পেত। তার পর নানারকম বীজ থেকে তেলের আবিষ্কার হ'ল ও দেশ বিদেশে নানা ঢংএর প্রদীপও তৈরী হ'ল। এখন পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে ও যে সব জায়গায় বিজলী বাতি জ্বালবার উপায় নেই, সে সব জায়গায় তেলের প্রদীপই জ্বলে। জানোয়ারের গায়ের চর্ব্বি থেকেও পলতে, মশাল ও বাতি তৈরী করে আলোর জন্যে তা ব্যবহার করা হ'ত। এখনও চর্ব্বিবাতি একেবারে উঠে যায় নি। তবে আজকাল কেরোসিন তেলের প্রদীপ ও মাটির নীচে থেকে পাওয়া প্যারাফিনের বাতিই বেশী চলে।

কেরোসিন তেলকে আমাদের দেশে সাধারণ লোকে মাটির তেল বলে। মাটির মধ্য থেকে এই তেল পাওয়া যায় বলেই তারা এ তেলের এই রকম নামকরণ করেছে। মাটির তেলের ব্যবহার অনেক দিন আগে থেকেই আমাদের দেশে ও অন্যান্য অনেক দেশে জানা ছিল। কতদিন আগে যে এই মাটির তেলের প্রথম আবিষ্কার হ'ল তাও বলা যায় না। নানা প্রাচীন গ্রন্থ পড়ে জানা যায়, এবং কোন কোন অতি প্রাচীন সহর খুঁড়েও প্রমাণ পাওয়া যায় যে অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর আগেও এই তেলের ব্যবহার জানা ছিল। অনেক দেশের আদিম অসভ্য লোকেরা পর্য্যন্ত বহুকাল থেকে এই তেল মাটি থেকে বের করে ব্যবহার করে এসেছে। তবে খুব বেশী পরিমাণে ও সস্তায় এই তেল পাওয়া যেত না বলে আগেকার দিনে এ তেলের চল তত বেশী ছিল না। প্রায় একশ বৎসর আগে থেকে এই তেল এত বেশী পরিমাণে পাওয়া যেতে আরম্ভ হয়েছে যে এখন এই তেল অন্যান্য সব তেলের চেয়ে সস্তা। সেই জন্য চলতিও হয়েছে খুব। কি করে যে এই মাটির তেল নূতন করে আবিষ্কার হ'ল, সে এক মজার গল্প।

বাংলায় একটি চলিত কথা আছে—কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হওয়া। পুরাণো

মাটির তেলকে নূতন ক'রে এই রকমেই পাওয়া গিয়েছিল।

ব্যাপারটা হয়েছিল আমেরিকায়। সে একশ বছরেরও আগেকার কথা। তখন পর্য্যন্ত সেখানকার লোকে মাটির তেলের কথা ভাল জানত না। সমুদ্রের তিমির

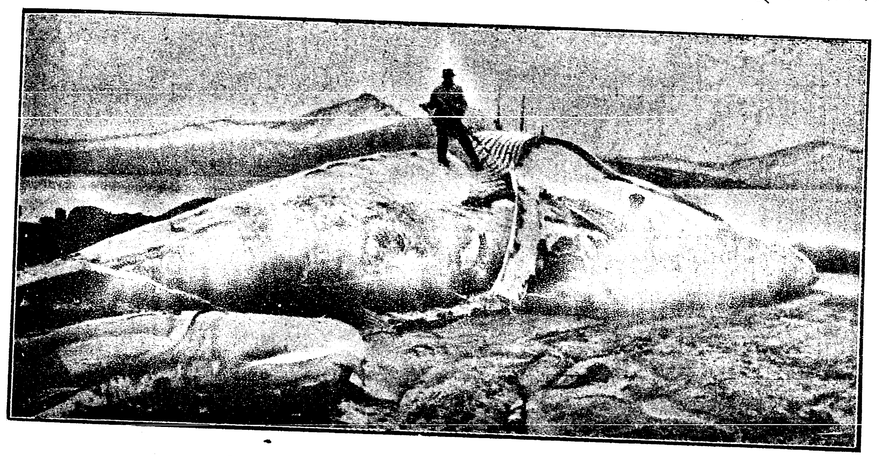

সমুদ্রের তিমি শিকার করে তার গা থেকে চর্ব্বি বের করা হচ্ছে

চর্ব্বিই জ্বালাত তারা। একবার এক নুনের কারখানায় নোনা জলের জন্য নলকূপ খুঁড়তেই তার ভেতর দিয়ে হু হু করে এসে হাজির হ'ল, বিশ্রী গন্ধওয়ালা মাটির তেল। এত জোরে আর এত বেশী বের হ'ল যে নুনের কারখানা গেল সব ভেসে। লোকেরা ত চটেই লাল—তাদের সব নুন নষ্ট হয়ে গেল! এর পরে আর একবার আর একটা কারখানায় ব্যাপার হ'ল আরো ভয়ানক। সে বারও তেল এসে সব ভাসিয়ে দিল। শুধু তাই নয়। তেলে গেল আগুন লেগে; আর জ্বলতে জ্বলতে সেই তেল আগুনের নদী হয়ে পঞ্চাশ মাইল পথ গাছ পালা জন্তু জানোয়ার পোড়াতে পোড়াতে চলল! অনেক কষ্টে আগুন যদি বা থামল, কিন্তু তেলের স্রোত আর থামতে চায় না। সে বয়েই চলতে লাগল।

তাতেও কিন্তু লোকদের খেয়াল হ'ল না যে আলোর জন্যে এ তেল আবার ব্যবহার করা চলতে পারে। তা ছাড়া তেলের গন্ধটাও ছিল এমন উৎকট যে তাকে

ঘরের মধ্যে পোড়ান একরকম অসম্ভব ছিল। কাজেই এত যে তেল তা সবই নষ্ট হ'তে লাগল। দুই একজন লোক কেবল এই তেল বোতল ভর্ত্তি করে ওষুধ বলে বিক্রী করে কিছু পয়সা করে নিল।

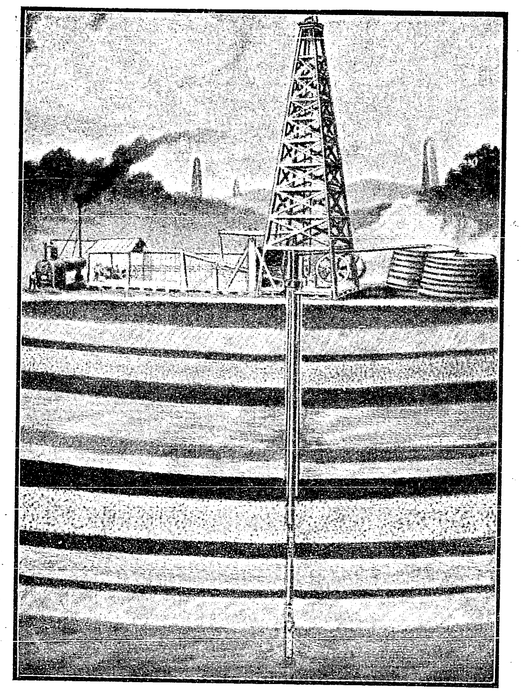

মাটির মধ্যে অনেক দূর মোটা নল নামিয়ে দিয়ে তেল তোলা হচ্ছে

কয়েক বৎসর পরে একবার তিমি শিকারীরা খালি হাতে ফিরে আসতে লাগল্; তিমি আর পাওয়া যায় না। তেল আর চর্ব্বির অভাবে দেশে হাহাকার উঠল। এই শাপেই কিন্তু বর হ'ল। বৈজ্ঞানিকেরা নানা পরীক্ষা করে দেখলেন যে অপরিষ্কার মাটির তেলকে পরিষ্কার করে নিলে আলোর জন্যে বেশ ব্যবহার করা চলে। আর কোথায় যাবে! সেই থেকে হু হু করে এই তেলের চল হয়ে গেল।

এখন আবার এই মাটির তেলেরই পরিষ্কার করা একটা ভাগ পেট্রল নামে মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়। মাটির তেলের চল তাই এখন সব রকমেই বেড়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ যেমন ভাবে আবিষ্কার হয়েছিল এখনও তেল সেই রকম ভাবেই মাটির নীচ থেকে বের করা হয়। একটা মোটা নল মাটির মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হয়, সেই নল দিয়ে তেল উপরে উঠে। আগে আগে শ ফুটের বেশী নীচে নল নামান বড় একটা হ'ত না। এখন ১০০০।১২০০ ফুট পর্য্যন্ত নীচে নল চালান হয়।

মাটির নীচে এই তেল এক রকম গ্যাসের সঙ্গে মিশে থাকে। চারিদিক চাপে থাকে বলে সাধারণ অবস্থায় এই গ্যাস বের হতে পারে না। উপর থেকে

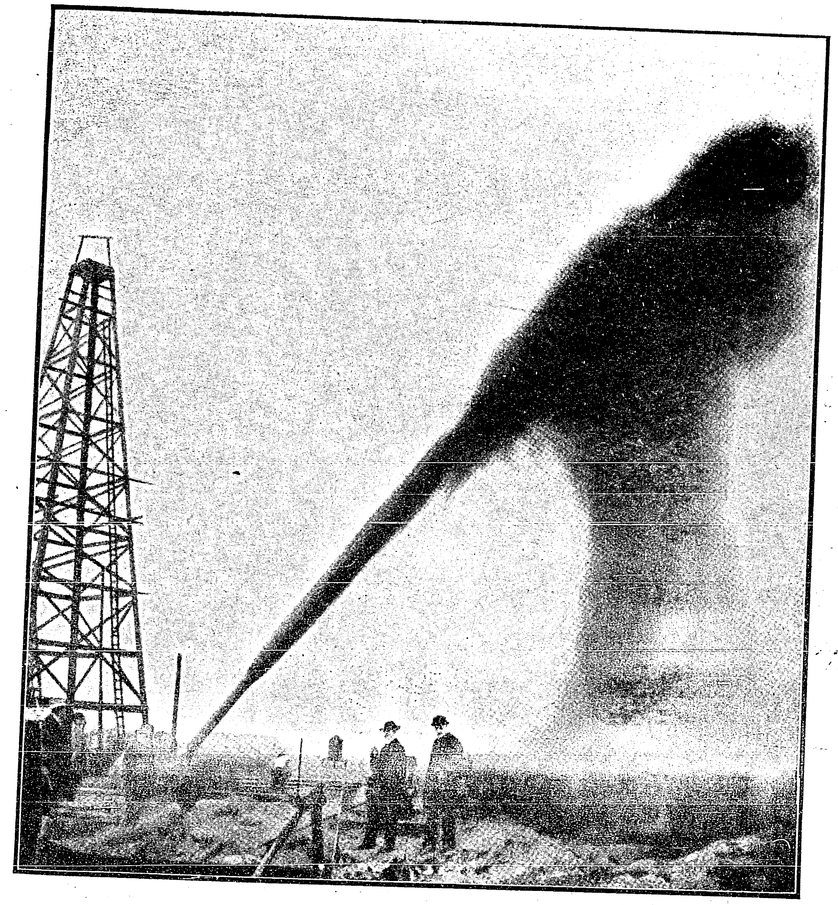

নলের মুখ থেকে জোরে তেলের ফোয়ারা বের হচ্ছে।

নলকূপ এসে যখন সেখানে পৌঁছায় তখন সেই পথে তেল ও গ্যাস হুহু করে উপরে উঠে আসে। চাপ বেশী না থাকলে শেষ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছায় না, তখন পাম্প করে তেল টেনে এনে খুব বড় বড় ট্যাঙ্কে রাখা হয়। পরে পরিষ্কার করে ব্যবহার করা হয়।

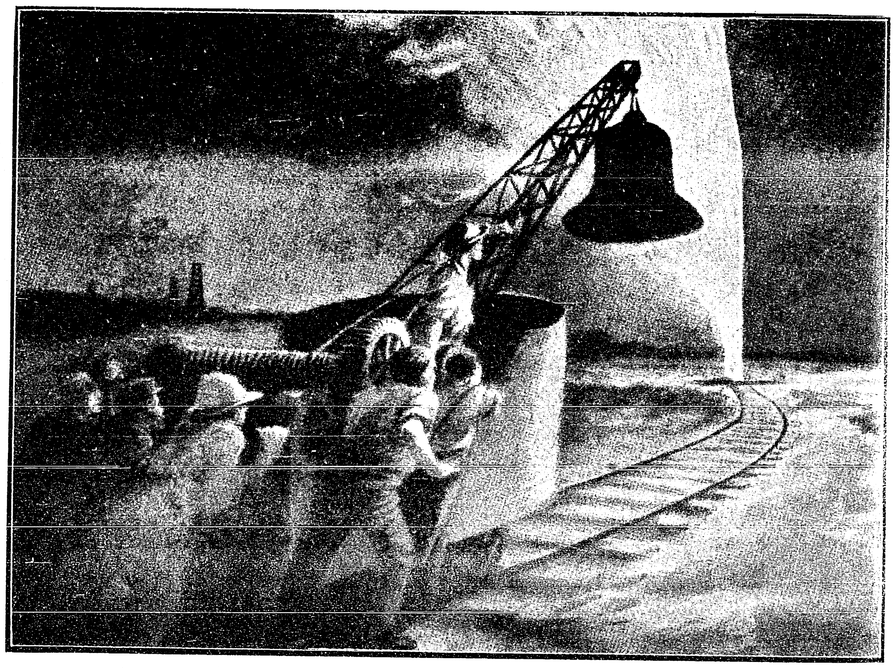

নলের মুখে তেলের ফোয়ারায় আগুন লেগেছে। একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টার মত ঢাক্‌না চাপা দিয়ে আগুন নেভাবার উদ্যোগ হচ্ছে।

মাটির নীচে তেল যদি খুব বেশী চাপে থাকে তা হলে সে নিজে নিজেই বের হয়ে আসে; পাম্প করার দরকার আর হয় না। এক এক সময় নীচের তেল এত বেশী চাপে থাকে, ও নল্ সেখানে পৌঁছবামাত্র এত জোরে তেল ও গ্যাস উপরে

উঠে আসে যে, আকাশ সমান উঁচু ফোয়ারা হয়ে তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তাকে বাগ মানান বড় সহজ নয়। এমনি করে অনেক তেল নদীর মত বয়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। সময় সময় এই তেলের নদীতে আগুন লেগে ধোঁয়া আর আগুনের নদী হয়ে চলতে থাকে। মাস দুই আগেও খবর এসেছিল যে একটা খনির তেল এই রকম ভাবে আগুনের নদী হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নেমে যাচ্ছিল।

অনেক সময় নলের মুখেই তেলে আগুন লেগে যায়। তখন হয় ভয়ানক ব্যাপার! আকাশ সমান উঁচু আগুনের ফোয়ারা উঠতে থাকে, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সব যায় ঢেকে। এ আগুন তাড়াতাড়ি থামাতে না পারলে সব দিক থেকেই সর্ব্বনাশ!

এক একটা নল থেকে কত তেল যে আসে তা জানলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। প্রতিদিন এক একটা নল থেকে যে পরিমাণ তেল বের হয় তাতে ছোট খাট একটা পুকুর তেলে টাইটুম্বু হয়ে ভরে যেতে পারে। নলের মুখে তেলের ফোয়ারা বাগে আনতে না পারায় যে টুকু তেল বয়ে যায় সেই টুকুতেই ছোট খাট একটা নদী বা

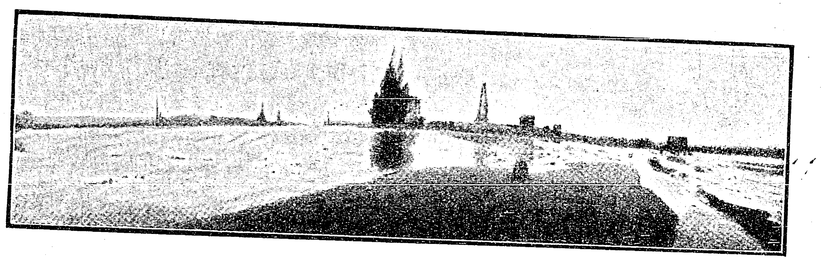

সব তেল বাগে আনতে না পারায় এত তেল পড়ে গেছে যে তাতে তেলের একটা হ্রদ হয়ে গেছে।

হ্রদের মত হয়ে পড়ে। এই জন্যেই নলকূপের কাছে তেল রাখার জন্যে যে সব ট্যাঙ্ক করা হয়, তা তৈরী করতে এক একটা গ্রামের মত প্রকাণ্ড জমি শক্ত দেওয়াল তুলে ঘিরে ফেলতে হয়। এ পর্য্যন্ত যত তেল মাটির নীচে থেকে বের হয়েছে তা

দিয়ে পঞ্চাশ ফুট চওড়া ও পনের ফুট গভীর একটা লম্বা তেলের খাল তৈরী করে পৃথিবীটাকে একেবারে ঘিরে ফেলা যেতে পারত।

এত তেল যে মাটির নীচে জমা হয়েছে তা কোথা থেকে এল সে মীমাংসা এখনও ভাল করে হয় নি। কেউ কেউ বলেন, অতি প্রাচীন কালের জীব জন্তু মাছ



গ্রামের মত প্রকাণ্ড একটা জমি ঘিরে এই তেলের ট্যাঙ্কটি তৈরী হয়েছে—

ও গাছপালা মাটির নীচে চাপে পড়ে ও পচে এই তেল হয়েছে। তা হওয়া অবশ্য অসম্ভব নয়; তবে পৃথিবীর নীচে যে সব জায়গায় এই তেল পাওয়া যায়, সেখানে গাছপালা ও মাছ টাছ থাকার সম্ভাবনা সব সময়ে থাকে না। তবে এমনও হতে পারে যে তেল এক জায়গায় তৈরী হয়ে চুইয়ে চুইয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে জড় হয়েছে।

মাটির তেল প্রথম যখন বের হয় তখন তার রং থাকে—হয় কালো, নয় কাল্‌ছে, বা মাটি মাটি রংএর। তখন তা থাকে ঘোলাটে অবস্থায় আর তার গন্ধও থাকে খুব বিকট। সে অবস্থায় পোড়ালে আলো তো ভাল হয়ই না, ধোয়া ও দুর্গন্ধও হয় খুব।

এই খারাপ তেলকে পরে নানারকম মাত্রার উষ্ণতায় ভাগে ভাগে পরিশ্রুত ও পরিষ্কার করা হয়। এই জন্যে এই তেলকে নলের মধ্যে দিয়ে শত শত মাইল দূরে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৫০°—৩০০° ডিগ্রী উষ্ণতায় যে ভাগটা পরিশ্রুত হয় সেইটাকেই কেরোসিন তেল ব'লে আমরা জ্বালাই।

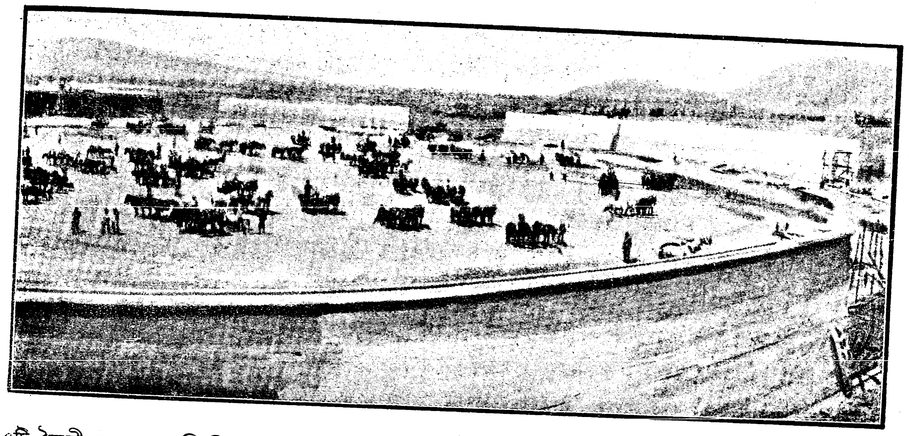

এটি তৈরী করতে প্রতিদিন ৬০০ লোক ও ৬০০ ঘোড়া এতে খাটতো।

এর চেয়ে কম বেশী নানা রকম উষ্ণতার পরিশ্রুত হয়ে মাটির তেল থেকে নানা রকম জিনিষ বের হয়। তার মধ্যে মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন চালাবার পেট্রলই প্রধান। তা ছাড়া বাতি তৈরীর প্যারাফিন, ঔষধাদির জন্য প্যারাফিন তেল, রাস্তার মেঝে তৈরীর আষ্‌ফাল্ট, মলম ও পমেটম তৈরীর ভ্যাসেলিন প্রভৃতিও এই মাটির তেল থেকেই পাওয়া যায়।



আর ঝগড়া নয়

(শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)

রাজ্যে যখন মড়ক লাগল রাজা ভেবেই পেলেন না, কি করে করা যায় তার প্রতিকার। এমন দলবেধে লোক মরা এদেশে কেউ কখনো দেখেনি আর। সামান্য একটু ঘুষঘুষে জ্বর বা বুক ধরফর, এমনি খুটিনাটি রোগগুলোর সঙ্গেই ছিল তাদের কাজ কারবার। অসময়ে এমন মরা কোনদিনই দেখেনি এরা; বুড়ো হয়ে লোকে মরে তাইতো এতদিন দেখে আসছে তারা।

কিন্তু একি কাণ্ড এবার! চাষা আর ভদ্র, রোগা আর মর্দ্দ, সবাই যেন সল্লা করে পাল্লা দিচ্ছে যমের বাড়ী ভরাট করবার। নাতি আর ঠাকুর্দ্দা একই চারপায়ায় চেপে স্বর্গদ্বারের ভাগীদার হ'তে ছুটে চলেছে দুর্দ্দার। রাজা কি যে করবেন, গালে হাত দিয়ে কেবল ভাবছেন!

এমন সময় এক বিদেশী এসে খবর দিল পাকা—উত্তর দিকে আছে জলন্ধরি দেশ, সেখানে থাকেন মস্ত এক ধন্বন্তরি বৈদ্য; তাঁকে যদি পারেন এদেশে একবার আনতে, মহামারী আর পথ পাবেনা ছুটে পালাতে। এক একটা তাঁর ওষুধের ফোঁটায় দশদশটা ঘাটের মরা প্রাণ পায়, আর তখনই উঠে পনের-বিশটা সন্দেশ নিয়ে কপাকপ জল খায়—নিজের চোখে পষ্ট দেখা।

রাজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, মন্ত্রিকে ডেকে তখনই জলন্ধরি নগরে পাঠালেন। তিন'শ ঘোড়ায় টানা গাড়ী, ধন্বন্তরীকে নিয়ে ফিরে এলো রাজবাড়ী। লোকের ভীড়ে পথ ঘাট সব ছেয়ে গেল, পথের ধূলো সব ছাদে গিয়ে উঠল। সবার মনেই হ'ল মস্ত আশা, এত বড় বদ্যি যদি এখানে নিলেন বাসা, তবে যমরাজাকে এবার হতেই হবে কোণঠাসা।

হ'লও সত্যি তাই; মহামারী তার চার'পা তুলে হলেন উধাও দু'চার দিনের মধ্যেই।

কিন্তু এদিকে আর এক অনাসৃষ্টি সকলকে অস্থির ক'রে তুলল। রাজবৈদ্য যখন এলেন, সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর একটি মাত্র মা-মরা মেয়ে। মেয়েটি ছিল তাঁর

নয়নের মণি। বাপের কাছে আদর পেয়ে পেয়ে আর আব্দার করে করে মেয়েটি দিনের দিন বেশ খেয়ালী হয়ে উঠেছিল। তার নাম ছিল তন্দ্রা। তন্দ্রা আর সব দিক থেকেই রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। কিন্তু হলে কি হয়, তার সব রূপ গুণ চাপা পড়ে গেল কেবল একটি দোষে। তন্দ্রা ছিল বেজায় রকম ঝগড়াটে।

এমন ঝগ্‌ড়াটে মেয়ে সে তল্লাটে কেউ কখনো জন্মাতে দেখেনি। রোজ তার কারুর সঙ্গে না কারুর সঙ্গে ঝগড়া করা চাইই চাই, বিশেষ করে রাজগুরুর ছেলে কমলকুমারের সাথে। কমলকুমার দু'দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সে এখন কাজের ওজর দেখিয়ে দূরে দূরেই থাকে।

কমলকুমারকে কাছে না পাওয়ায় এবার তন্দ্রার ঝগ্‌ড়া সুরু হ'ল সখীদের সাথেই। বিভাবতী চন্দ্রাবতীর দল যখন অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল তখন সবাই মিলে স্থির করল এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ঠিক হ'ল, বোবার যখন শত্রু নেই তখন এবার তারা সবাই বোবা হবে।

কিন্তু এদিকে ঝগ্‌ড়া করতে না পেয়ে বেচারি তন্দ্রা যে মারা যায়! আজ ক'দিন থেকে সে ঝগ্‌ড়া করতে পায় নাই; কিছুই তার ভাল লাগছে না, ভাত হজম হচ্ছে না, খাওয়ায় আর রুচি নাই, সে উপোস করতে লাগল।

রাজবদ্যি যথাসাধ্য চিকিৎসা করতে লাগলেন। তাঁর এত আদরের একটি মাত্র মেয়ে আজ বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে, তিনি কি দিয়ে কি করবেন কিছুই ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছেন না। চিকিৎসাশাস্ত্রের সবগুলি পাতাই তন্ন তন্ন করেও এ রোগের কোন ওষুধই তিনি খুঁজে পেলেন না। চোখের উপর মেয়ে যে দিনের পর দিন শুকিয়েই যাচ্ছে!

বদ্যিরাজ গিয়ে রাজার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন—ঝগড়া করার লোক দিন মহারাজ, নইলে মেয়ে আমার আর বাঁচে না। আমি আপনার রাজ্যের সব লোককে বাঁচিয়ে দিলাম, এবার আমার নিজের মেয়েই যে মারা যায়—সামান্য একটা ঝগড়া করার লোকের অভাবে!

রাজা হুকুম দিলেন। তখ্‌খুনি ঢেঁড়া পড়ে গেল—তন্দ্রার সঙ্গে যে কেউ এক ঘণ্টা ক'রে ঝগড়া ক'রে যাবে সেই পাঁচটা করে মোহর বকশিস পাবে।

আস্ত পাঁচটা মোহরের লোভে অনেকেই ব্যস্ত হ'য়ে ঝগড়া করতে এল বটে,

কিন্তু পাঁচমিনিটের মধ্যে চোস্ত লাফ মেরে রাস্তায় প'ড়ে দোস্তদের খবর দিল, — মস্ত ভাগ্যি ছিল তাই আর প্রাণটা নিয়ে টানটা দেয়নি।

দু'চার দিন পরই দেখা গেল অর্থের লোভেও কেউ ঝগড়ায় রাজি নয়। তন্দ্রা আবার বিছানা নিল।

আবার রাজার হুকুমে নানা লোক ধরে আনা হ'ল। কেউ এলো রক্ত চোখ শক্ত করে, কেউ এলো মোলাম সুরে সেলাম ঠুকে, কেউ এলো সভয় চোখে, কেউ এলো লোভের ঝোঁকে। কিন্তু কেউই টিঁকতে পারল না।

কত পাড়ার কত বড় বড় পদিপিসীরা দাঁতে মিশি মেখে রাশি রাশি তীক্ষ্ণ কথা শানিয়ে এল—অতটুকু একটা মেয়ে, একেবারে কেঁচো বানিয়ে দেব না? কিন্তু ফেরার সময় তারাও জানিয়ে গেল, এ রোজগারের চেয়ে ভেক নিয়ে ভিক্ষে করাও ঢের ভাল।

ক্রমে ক্রমে ঝগড়ার লোক আর কাউকে পাওয়াই অসম্ভব হ'য়ে উঠল, তন্দ্রার অসুখও ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ একদিন তন্দ্রা যেন তন্দ্রাভেঙ্গে বলে উঠল—কমলকে ডাক।

কমল আসতেই এতদিনের সমস্ত ঝাঁঝ তার ওপর সুদে আসলে ঝেলে নিয়ে তন্দ্রা অনেকটা সুস্থ হ'ল। তন্দ্রার বাবা দেখলেন, এই-ই ঠিক ওষুধ, কমলকে কাছে রাখতে পারলেই মেয়ে ভাল থাকবে। তাই বৈদ্যরাজ কমলকে অনুরোধ করলেন, সে যেন রোজ একবার করে আসে। কমলেরও বোধহয় তন্দ্রাকে ভাল লেগেছিল; তাই সে অত গালাগালি খেয়েও সব সহ্য করত এবং রোজই একবার করে আসত। সে মনে মনে আশা করেছিল যে তর্কে বাধা না পেলে তন্দ্রা বোধ হয় ক্রমে ক্রমে শুধরিয়ে যাবে।

কিন্তু ফল হ'তে লাগল তার ঠিক বিপরীত। কমল যতই চুপ করে সহ্য করে যায়, তন্দ্রার গালাগালির মাত্রা এবং তীব্রতা ততই যায় আরো বেড়ে। শেষে একদিন তন্দ্রা বিনা কারণে হঠাৎ এমন বিষম কটূক্তি ও গালাগালি করে বসল, যে কমল আর সহ্য করতে পারল না। সে ধীরে ধীরে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

গালাগালি দিয়ে ফেলে তন্দ্রাও যেন হঠাৎ কি রকম হয়ে গেল। কমলের ব্যথা-ভরা মুখের দিকে চেয়ে তার মুখও হয়ে গেল কেমন ফ্যাকাসে। তাই তো,

গালাগালি তো সে অনেককেই আগে দিয়েছে, কিন্তু আর কেউই তো এমন ভাবে সব ব্যথা নিজের বুকে পেতে নিয়ে নীরবে এমন সহ্য করে নাই! কমল তখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, তন্দ্রা বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ছুটে গিয়ে কমলের হাত ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে এলো। কমল অবাক হয়ে দেখল, তন্দ্রার বড় বড় চোখ দু'টি ছাপিয়ে মুক্তার মত অশ্রু ঝরে পড়ছে তার গাল বেয়ে। এ কী ব্যাপার!—তন্দ্রার চোখে জল!

কমল বলল, "তন্দ্রা আমায় যেতে দাও, আমারও সহ্যের একটা সীমা আছে। ওরূপ গালাগালি কেউ সয়ে থাকতে পারে না।"

তন্দ্রা ভাঙ্গা গলায় বলল, "আমার ঐ মুখের কথাটাই কি সব চাইতে বড় হ'ল? আর আমার এই চোখের জলটা কিছুই নয়? কথায় কথায় ঝগড়া করে করে এমন বিষম অভ্যাস হয়ে গেছে যে ঝগড়ার ঝাঁঝটাকে আর কিছুতেই যে সামলাতে পারি না, হঠাৎ মুখে দিয়ে যা তা বেড়িয়ে পড়ে! যাহোক, আমারও আজ মস্ত শিক্ষা হয়েছে। কটু কথা বলে অন্যের মনে অনর্থক ব্যথা দেওয়া যে কত নীচতা তা আজ বেশ বুঝতে পেরেছি। আজ থেকে সঙ্কল্প করছি—আর ঝগড়া নয়!

আত্ম-তৃপ্তি

(শ্রীমতী নিভাননী দেবী)

ধনীর প্রাসাদে চোর প্রবেশিয়া রাতে,
টাকাকড়ি চুরি করি নিল নিজ সাথে;
আঁধারেতে যেতে যেতে টাকা পড়ে যায়,
বহু সন্ধানেও তাহা খুঁজিয়া না পায়।
পরদিন সেই টাকা ভিখারীর ছেলে
ভাগ্য ভাবি আনন্দেতে নিল তাহা তুলে;
টাকা ভাবে এতদিন ছিলাম নগণ্য,
দরিদ্রের উপকারে হব আমি ধন্য।

মাণিক জোড়

(শ্রীনিতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়)

শোনা কথা। আমাদের গাঁয়ের চৈতল পাড়ায় অনেক দিন আগে উদো আর বুদো ব'লে দু'ভাই নাকি বাস ক'রত। দু'জনেই ছিল মহা কৃপণ। লোককে চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়াই ছিল তাদের প্রধান ব্যবসা। বড় ভাই উদো; পরিবার ছেলেপুলে কেউই তার ছিল না। বুদোর সংসার তার বৌ আর একটী মেয়ে নিয়ে।

বুদো ভাবতো, দাদার সংসারে যখন কেউই নেই তখন আমার চেয়েও দাদা দু'পয়সা গুছিয়েছে। এদিকে উদোরও ধারণা বুদোটা বেশ কিছু জমিয়েছে, কেন না ওটা একটা রাম কৃপণ। দু'ভায়েই প্রাণপণে চেষ্টা ক'রত কিসে নিজের টাকাকড়ি ভাইএর চেয়ে বেশী হবে। তাই সব চেয়ে মজা হ'ত, খরচ কম নিয়ে যখন দু'ভায়ের পাল্লাপাল্লি চ'লত। উদো যদি কোনদিন ঝোঁকের মাথায় এক পয়সার মাছ কিনে ফেলল, বুদো সেদিন আধ পয়সার বেশী আর উঠল না। আবার ভাইটি হয়ত এক দিন আধ পয়সার খৈ-মুড়কী কিনে জল খেল, দাদা সে বেলাটা উপোস ক'রেই কাটালো।

এমনি ক'রে দিন যায়। হঠাৎ উদো পড়ল অসুখে। মুখে জল দেয় এমন কেউ নেই, অথচ ভাইকেও সাহস ক'রে ডাকতে পারে না,—যদি ভাই এসে যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে সরে পড়ে! তার চেয়ে এমনি ক'রে মরাও আরামের। বুদোও সে দিক্ মাড়ায় না,—মনে ভয়, গেলেই যদি দাদার জন্য ফল-ফুলুরীতে দু'চার পয়সা খরচ করতে হয়! না যাওয়াই ভাল।

উদোর অসুখ যখন ক্রমে খুব বেড়ে উঠল তখন আর বুদো স্থির থাকতে পারল না। দাদার অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছে, তাতে কখন কি হয় বলা যায় না। এ অবস্থায় তার টাকাকড়ি কি শেষ পর্য্যন্ত পাড়াপড়শি অন্য লোকে হাতরাবে? সে দাদার কাছে গিয়ে বলল, তার এই অসুখের সময় টাকাকড়ি আর নিজের কাছে রাখা উচিত নয়, কে কোথা দিয়ে নিয়ে যাবে; তার চেয়ে টাকাগুলি কোথায় পোঁতা আছে বলে দিলে বুদো সেগুলি তুলে যত্ন করে রেখে দেবে। উদোর তখন প্রায়

শেষ অবস্থা, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। সে একটু জল খেতে চাইল। উদোর ঐ অবস্থা দেখে বুদো আরো ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন কি আর সে জল আনতে যেতে পারে! এখন যদি টাকার সন্ধানটা জেনে নিতে না পারে তো পরে আর জানার যে উপায়ই থাকবে না! সে উদোকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। উদোও কিছুতে বলবে না, বুদোও নাছোড়বান্দা! এমনি করে দেখতে দেখতে দু'চার বার খাবি খেয়ে উদোর শেষ হয়ে গেল।

মাস দুই কেটে গেছে। দাদার টাকার শোক তখনও বুদোর যায় নি। হঠাৎ একদিন নিজের মজুত টাকা মেলাতে গিয়ে দেখে যে দুটো টাকা কম। গুণতে ভুল হ'য়েছে ভেবে ফের গুণলো,—ফের একবার। হায়, হায়! সত্যিইত কম! বুদো একেবারে পাগলের মত চেঁচাতে লাগলো। চীৎকার শুনে তার বৌ দৌড়ে এল। বুদো তাকে টাকার কথা জিজ্ঞাসা করাতে বৌ বল্ল, কাল সকালে জামাই এসেছিল তাকে গোটা দুই টাকা দিয়েছ, গাড়ীভাড়া বলে। বুদোর অবস্থা তখন মারাত্মক, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, কপাল ঠুকে, হাত পা চাপড়ে সে মরে আর কি! খানিক এই ভাবে কেটে গেলে পর সে প্রতিজ্ঞা করল, যতদিন না ঐ টাকা সুদসমেত উসুল হয় ততদিন সে উপোস ক'রবে। সুদে আসলে দুটো টাকায় তার ষোলটী দিন চ'লত, ষোল দিন সে ঝাড়া উপোস করে ঐ টাকা উসুল করবে।

চার দিন উপোসের পর তার বৌ সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। অনেক সাধাসাধি করেও বুদোকে যখন কিছুতেই খাওয়াতে পারল না, তখন গিয়ে গাঁয়ের মাতব্বরদের শরণাপন্ন হ'ল। বুদো তখন টাকার শোকে ঘোর উন্মাদ! গাঁয়ের লোক এসে তাকে জোর করে খাওয়াবে শুনে সে ঘরে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিল।

গাঁয়ের লোক বুদোকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে খাওয়াতে এসে দেখে ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকিতেও যখন বুদো দরজা খুলল না, তখন তারা দরজা ভেঙ্গেই ঘরে ঢুকবে স্থির করল। বুদো তাই শুনে আরো ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবার আশায় ঘরের কড়িকাঠে গিয়ে উঠল। কিন্তু ক'দিন অনাহারে শরীর ছিল তার একেবারে দুর্ব্বল, হঠাৎ পা পিছলে গিয়ে নীচে পড়ে গেল। গাঁয়ের লোক যখন দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকল, তখন বুদো মেজের উপর মাথা ভেঙ্গে পড়ে আছে।

—*—

কাণ্ড শোন

(শ্রীসত্যগোপাল সরকার)

বিলাতের কোন্ এক চিড়িয়াখানায়
একদিন আমাদের ধনিরাম রায়
কি ব্যাপার ক'রে এলো সোজা ঢুকে গিয়ে হে—
শোনো নিকো? শোন তবে,—শোন মন দিয়ে হে।—



অষ্ট্রিচ পাখীটার খাঁচাটার ভেতরে
ইয়া বড়া ডিম এক নিয়ে এলো হাত্ড়ে।
মন দিয়ে শোন শোন করলে কি নিয়ে তা,—
ঘুমন্ত ময়ূরকে রেখে দিল দিতে তা'!
ঘুমে ঘোর সে বেচারী কিছুই তো জানে না,
অষ্ট্রিচ কি যে পাখী তাও তো সে জানে না।



কিছু পরে তা' পেয়ে ডিমটাতো ফুট্লো,
অষ্ট্রিচ ছানাটাও মাথা তুলে উঠ্লো।
ময়ূরটা তন্দ্রায় বুঝ্লো সে উঠ্ছে,
উপরের দিকে ক্রমে অনেকটা উচ্চে।
ভেবে ভেবে পায়না তো কি ক'রে সে উঠ্লো,
নাড়া পেয়ে শেষে তার তন্দ্রাটা টুট্লো।
চোখ মেলে নীচু পানে চেয়ে দেখে ভাইরে,
বিদ্ঘুটে কি যে প্রাণী কভু দেখে নাইরে!
গোম্ড়া কি মুখ তার—কি ভীষণ বাস্ রে!
ঘাড় গুঁজে ফোঁস্ ফোঁস্ ফেল্ছে যে শ্বাসরে!
অষ্ট্রিচ ছানা চোখ পিট্ পিট্ কর্লো,
গো-বেচারী ময়ূরটা ভয়ে প্রায় ম'রলো।
মহা ভয়ে প্রাণ তার গেল যেন থ'ম্কে,
জুড়লো সে চীৎকার ভয়ানক চম্কে!

অনেকেরই জোড়া আছে

(শ্রীসুবিনয় রায়)

কিছুদিন আগে একটা কাগজে পড়্ছিলাম, দুনিয়ার বহুলোকেরই নাকি চেহারায় জুড়িদার আছে। অনেক বড়লোকের জোড়া হয় তো কোন দূর দেশে থাকেন; ঘটনাক্রমে কোনদিনকেউ তাঁকে সেই বড়লোক ব'লে ভুল ক'রে বসেন।

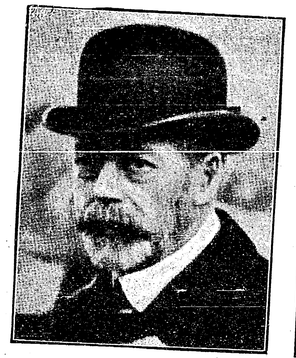



সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জুড়িদার স্যার হেন্রি হোয়াইট-হেড ইংলণ্ডেরই লোক। দু'জনের চেহারা পাশাপাশি কাগজে বেরিয়েছিল, আমরাও এখানে দিলাম। স্যার হেন্রির গোঁফ একটু বেশী পাকা; তা না হ'লে চেহারার সাদৃশ্যটা আরো ভাল রকম বোঝা যেত।



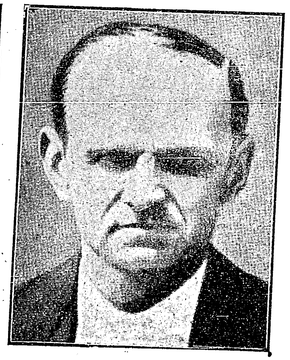

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট কূলিজের জুড়িদার ছিলেন একজন ফিলাডেল্ফিয়ার হোটেলের কর্ম্মচারী। একদিন তাঁকে দেখে প্রেসিডেণ্ট কূলিজের এক বন্ধু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, "বন্ধুবর, এ সময় আপনাকে এখানে

দেখ্‌ব ব'লে মনে করি নি।" সেই ভদ্রলোকটি একটু অপ্রস্তুত হ'লেন, কারণ অভ্যর্থনাকারীকে তিনি আগে চোখেও দেখেন্ নি। তারপর কথায় কথায় ধরা পড়্‌ল, হোটেলের কর্ম্মচারী ভদ্রলোকটিকে প্রেসিডেণ্ট কুলিজ্ ব'লে ভুল করা হয়েছে। আমেরিকা হুজুগের দেশ; তাই পরের দিন সেই ঘটনা কাগজে বেরিয়ে গেল, আর হোটেলের কর্ম্মচারী ভদ্রলোকটিও প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন; তাঁর ছবি প্রেসিডেণ্ট কুলিজের ছবির সঙ্গে ছাপা হয়ে গেল। আমরা সেই ছবি এখানে দিলাম। বাঁ দিকের ছবিটা প্রেসিডেণ্ট কুলিজের।

ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মুঁসিয়ো ক্লেমেন্সো যখন মারা যান্ তখন তাঁর ছবি খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। সেই চেহারার সঙ্গে পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেহারার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল। আরও আশ্চর্য্যের কথা, ক্লেমেন্সো সাহেবকে "The Tiger" অর্থাৎ "বাঘ" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল; স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কেও "The Bengal Tiger" (বেঙ্গল টাইগার) বলা হ'ত।





বায়োস্কোপের বিখ্যাত অভিনেতা রুডল্‌ফ্ ভ্যালেন্টিনো মারা যাবার অল্প দিন পরে ভিয়েনা নগর থেকে টাইবর ডি মিন্‌শ্যেন্টি নামে একজন অভিনেতা চাকরীর খোঁজে আমেরিকার হলিউডে গেলেন। তাঁকে দেখে হলিউডের অনেক কুসংস্কারওয়ালা লোকেরা কানাকানি করেছিলেন—ভয়ও নাকি কেউ কেউ পেয়েছিলেন। এই লোকটির চেহারায় নাকি ভ্যালেন্টিনোর চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল। আমরা দুটি চেহারাই পাশাপাশি দিলাম; বাঁ দিকেরটি ভ্যালেন্টিনো।

ইটালির মন্ত্রী মুসোলিনীর জুড়িদার হচ্ছেন নিউ ইয়র্কের এক নাপিত;

নাম তাঁর ফ্রাঙ্ক্ ভ্যালেন্টিনো। ইনি নাকি একবার মুসোলিনী সেজে অভিনয় করায় অনেকেই বিশ্বাস করেছিল যে মুসোলিনী স্বয়ং অভিনয়ে নেমেছেন। পাশাপাশি ছবি দেখ্‌লে দুজনের সাদৃশ্য বেশ বোঝা যায়।



ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের জুড়িদার আমেরিকার ওক্‌লাহামা জেলার জর্জ্জ কিং সাহেব। তিনি নিজের ফটো লয়েড জর্জ্জকে পাঠিয়েছিলেন; লয়েড জর্জ্জও ফটো পেয়ে খুব এক চোট হেসেছিলেন। দু'জনের পাশাপাশি ছবি দিলাম; বাঁ দিকেরটা লয়েড জর্জ্জের।



এই ধরণের চেহারার মিল আরও অনেক দেখতে পাওয়া যায়। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট উড্‌রো উইল্‌সনের সঙ্গে আর একটি লোকের চেহারার আশ্চর্য্য মিল ছিল। একদিন সেই লোকটি হঠাৎ রাস্তা চল্‌তে চল্‌তে প'ড়ে মারা গেল। চারিদিকে অম্নি খবর গেল, প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে প'ড়ে মারা গেছেন।

সব লোক টুপি খুলে সেখানে এসে জড় হ'লো; পুলিশ ভিড় সরা'তে আর পারে না। পরে জানা গেল প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন তখন অন্য সহরে।

একজন হল্যাণ্ডদেশীয় বৈজ্ঞানিক বলেন, চেহারার সাদৃশ্যওয়ালা লোকদের সম্বন্ধে খোঁজ কর্‌লে দেখতে পাওয়া যাবে, তাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কোন রক্তের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ পুরুষ পর্য্যন্ত খোজ কর্‌লে সেটা হয়তো পাওয়া যাবে। একজন আবার তাঁকে ঠাট্টা ক'রে বলেছেন, "হ্যাঁ, তা' পাওয়া যাবে বৈকি! আলবাৎ যাবে। কুড়ি, ত্রিশ না হোক্, কুড়ি ত্রিশ হাজার পুরুষের খবর নিলে আরো পাবার সম্ভাবনা, কারণ, প্রথম যে আদিম মানুষ ছিল তাদের বংশধর তো আমরা সকলেই!" যাক্ গে সে কথা! আমরা তো আর এ বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্‌তে বসি নি।

বেচারী দীনু

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

দীনু ভিখারিণীর ছেলে। সারাদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে মা যা ভিক্ষা ক'রে, আন্‌তো তাতেই কোনো রকমে মা ছেলের দিন গুজ্‌রাণ হোত।

দীনু ছেলেমানুষ—দশ বছরের বেশী তার বয়স হবে না কিছুতেই। এই বয়সেই সে তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝায়—"মা, আমি আর একটু বড় হয়ে নেই, তোর সমস্ত দুঃখ কষ্ট ঘুচিয়ে দেব।" ছেলের কথায় দুঃখিণী মায়ের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—মনে মনে কতই আশা না জানি জাগে।

আজ কয় দিন হোল ভিখারিণী অসুখে প'ড়ে আছে। ছোট ছেলে দীনু যে কি করবে ভেবেই আর কুল কিনারা পাচ্ছে না। মায়ের ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা তো দূরের কথা—পেটের ভাত জোটানোই এখন দায় হয়ে উঠেছে। রুগ্না মায়ের পথ্যের ব্যবস্থা না করলে তো মাকে বাঁচানোই কঠিন হয়ে উঠ্‌বে। দীনু পাগলের মত ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল।

দীনুদের বাড়ী গাঁয়ের প্রায় শেষ সীমানায়। দীনু যদি গাঁয়ে ভিক্ষায় বের হয়, তবে তার মায়ের কাছে থাক্‌বে কে? মা'র যে অবস্থা অতি খারাপ—কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না।

দীনু নিজের জন্যে পরোয়া করে না। না খেয়ে সে অনেক দিন থাক্‌তে পারে—এতে তার বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু মায়ের যে পথ্য চাই।

দীনুর মুখের ভাব্ দেখে তার মায়ের বুক্‌টা হু হু ক'রে ওঠে; বলে "দীনু, তুই আমার জন্যে ভাবিস্‌না রে; উপোস ক'রে থাকাটাই হচ্ছে আমার অসুখের ওষুধ,—কিছু পেটে পড়্‌লে আমার ব্যামো যাবে বেড়ে'। তুই যা, গাঁয়ের জমিদার চৌধুরীদের বাড়ী গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্—জমিদার বাবুদের দয়া হ'লে কিছুদিন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারবি। তুই আমার জন্যে কিছু ভাবিস্ না।"

মায়ের কথা শুনে দীনু জমিদার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হোল। সমস্ত কথা শুন্‌লে হয়ত জমিদার বাবুরা তাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন। দীনু শুনেছে চৌধুরীরা খুব দয়ালু লোক, গরীব দুঃখী কেউ তাঁদের বাড়ী থেকে শুধু হাতে ফেরে না। দীনুর অবস্থার কথা শুন্‌লে নিশ্চয় তাঁরা সাহায্য করবেন।

সারা বছরের মধ্যে পূজোর একটা মাস জমিদাররা এই দেশের গাঁয়ে এসে বাস করেন। এবারও এসেছেন। দীনুর মা সে কথা জেনেই দীনুকে জমিদার বাড়ী যেতে উপদেশ দিয়েছে।

গাঁয়ে জমিদার বাবুরা এসেছেন, তাই সারা গাঁয়ে ধূম্ লেগে গেছে। এবারের ধূমধামের একটি বিশেষ কারণ, জমিদার বাবুর একমাত্র নাতির মুখে ভাত দেশের বাড়ীতেই হবে ঠিক্ হয়েছে।

গ্রামশুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, কেউ বোধ হয় আর বাকী নেই।

এসব খবর দীনু জান্‌তো না। জান্‌বেই বা কেমন ক'রে? ভিখারিণীর ছেলেকে কে নিমন্ত্রণ করবে?

দীনুদের বাড়ী থেকে জমিদার বাবুদের বাড়ী অনেকটা পথ। দীনু চলেছে তো চলেইছে। জমিদার বাবুদের কাছে সে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্‌বে; দীনুর মায়ের অবস্থার কথা শুন্‌লে তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু সাহায্য করবেন, এমন কি ওষুধ পত্রের ব্যবস্থাও ক'রে দিতে পারেন।

কয়দিনের উপোসী দীনু তার দুর্ব্বল শীর্ণ পা টেনে টেনে চলেছে, মন্‌টা তার আশার আলোতে উজ্জ্বল।

পথের দুই ধারে ধানের ক্ষেত, তারই মাঝে মাঝে কাশ্‌ফুলের ঝাড় হাওয়ায় হেল্‌ছে দুল্‌ছে। টল্‌টলে পুকুরগুলিতে কেমন শালুক ফুল ফুটে আছে! ঐ শালুক ফুলের নাল দিয়ে তরকারী হয়,—দীনুর মা একবার তাকে রেঁধে খাইয়েছিল। ওঃ, খেতে সে কী চমৎকার! দীনু ভাব্‌লে বাড়ী যাবার পথে কিছু শালুক ফুল তুলে নিয়ে যাবে।

সাম্‌নে প্রকাণ্ড তাল-পুকুর, তার পরেই জমিদার বাড়ী। তৃষ্ণায় দীনুর ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। একটু জল না খেলে দীনু আর হাঁট্‌তে পারে না। দুপুর বেলার রোদে তার মাথা তেতে উঠেছিল।

দীনু আঁজ্‌লা ভ'রে জল খেয়ে তাল-পুকুরের শান্ বাঁধানো সিঁড়ির উপর একটু বস্‌ল। পা দুটো তার ধরে গেছিল। একটু না জিরিয়ে আর পারে না।

"বাঃ রে, ওটা কি?"—সিঁড়ির এক পাশে কি একটা জিনিষ চক্ চক্ করছে! কাছে গিয়ে দীনু দেখ্‌লো একটা ছোট্ট চুড়ি। দীনু সোনা কোনো দিনও দেখে নাই,—বুঝ্‌তে পার্‌লো না চুড়িটা কোন্ জিনিষের তৈরী। বাড়ী গিয়ে মাকে দেখাবে ব'লে দীনু চুড়িটা তার কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিল।

জমিদার বাবু সত্যিই দয়ালু লোক। সমস্ত শুনে বল্লেন, "কাল্‌কে আসিস্, এখানে কাল্‌কে কাঙ্গালী ভোজন করানো হবে।" তারপর নায়েবকে ডেকে হুকুম দিলেন—"ছোক্‌রা দূর থেকে এসেছে, আজ্‌কে ওকে কিছু খাবারের ব্যবস্থা ক'রে দাও; আর কবিরাজ মশাইকে খবর দাও যেন কাল ভোরেই তিনি রোগিণীকে দেখে এসে ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করেন।"

দীনু জীবনে এত আনন্দ কোন দিন আর পায় নাই। এত রকম খাবার সে জন্মে কোন দিন দেখে নাই। দীনু একটার পর একটা খেয়ে চলেছে—কোন দিকেই তার হুঁশ্ নাই। খাবার আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল ঝরছিল।

হঠাৎ একটা গোল্‌মাল্ শুনে দীনু চম্‌কে উঠ্‌ল। একদল লোক দীনুর দিকে আস্‌ছে, সকলের আগে আস্‌ছে বামুন ঠাকুর—যে দীনুকে পরিবেশন করছিল।

কাছে এসে বামুন দীনুকে দেখিয়ে বল্ল, "এই চোর—ঐ যে কাপড়ের খুঁটে খুকুমণির চুরি-যাওয়া সোনার চুড়িটা!"

ব্যস্! আর কথা বার্ত্তা নাই,—চটাপট্ চটাপট্ চাঁটি আর চড় পড়্‌তে লাগলো দীনুর মাথায় পিঠে। দীনু ব্যাপারটা ভালো ক'রে বুঝ্‌তে না বুঝ্‌তে তাকে সবাই মিলে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে চল্ল জমিদার বাবুর কাছে। দীনুর এত সাধের খাওয়া ফেলে রেখেই উঠ্‌তে হোল। তার এখনও পেট ভরে নি।

জমিদার বাবু গম্ভীর গলায় বল্লেন, "তোকে ভালো মানুষ ভেবে উপকার করতে গেছিলাম—এখন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারছি তুই চোর—।"

জমিদারদের অনেক দিনকার বিশ্বাসী হিন্দুস্থানী চাকর চূড়ামন বল্ল—"হামি খোঁখীকে পুকুর ঘাটে বসিয়ে আস্নান্ করছিলাম, তখনই বদ্‌মাস এই কাম্ করেছে। হামি যেই জলে ডুব দিয়েছি অমনি চুড়ি চুরি করিয়েছে—আস্নান্ সেরে দেখি একঠো চুড়ির পাত্তা নাই।"

ব্যস্ অকাট্য প্রমাণ। জমিদার বাবু বল্লেন—"আমার বাড়ীতে চোরের স্থান নাই। আমার চোখের সাম্‌নে থেকে এখুনি বেরিয়ে যা, না হ'লে চৌকিদার ডেকে ধরিয়ে দেব। আর ব্যাটা, আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আস্‌বি তো জুতিয়ে পিঠের ছাল তুলে দেব বলে রাখছি।"

এর উত্তরে দীনু আর কি বলবে,—আর বল্লেই বা বিশ্বাস করবে কে? জমিদার বাড়ীর ঠাকুর, চাকর, ছেলের দল সবাই মিলে তাকে "চোর" "চোর" ব'লে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌ল। বাড়ীর মেয়েরা চোরের চেহারা দেখ্‌তে বাইরে বেরিয়ে এলো।

দীনু যে জায়গায় খেতে বসেছিল একবার সজল চোখে তাকিয়ে দেখ্‌ল —একটা খেঁকী কুকুর তার পাত থেকে খাবার তুলে তুলে খাচ্ছে।

বেচারী দীনু! করুণ জলভরা চোখে সে ধীরে ধীরে জমিদার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেল।



(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

"দেরে কেটে নাক্ দেরে কেটে"

(শ্রীমান সুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী—গ্রাহক নং ১২৮৮)

ভোর বেলাতে ডুক্‌রে কেঁদে
উঠ্‌লো সুরেন গোঁসাইজী।
শুধোয় সকল ছেলে বুড়ো,
"ব্যাপার কিহে ব্যাপার কী ?"

"কাদ্‌ছ কেন হ্যাঁগো গোঁসাই
কী হোয়েছে কওনা মোরে !"
শুধোয় পাড়ার ধূম্রলোচন ;
গোঁসাই কাঁদে উচ্চস্বরে।

কয়না কথা শুধুই কাঁদে,
মুখটী ঢেকে কম্বলে।
ভাব্‌লো সবাই জ্বরে কিম্বা
কষ্ট পাচ্ছে অম্বলে।

অনেক পরে ফুঁপিয়ে কেঁদে
বল্‌ল তখন গোঁসাই প্রভু,—
"এমন যে হায় কাণ্ড হবে,
কেউ কি ভেবেছিলো কভু !

আস্‌তেছিনু একাই কাল
চরণ দাসের বাড়ী থেকে,
পথটা যেথায় কামার পাড়ায়
পূবের দিকে গেছে বেঁকে,—

তারই মোড়ে অশথ তলায়
আছে যে এক পোড়ো বাড়ী—
শুন্‌নু সেথায় অবাক হোয়ে
হচ্ছে গান জবর ভারী।

হাজার বাতী জ্বল্‌ছে দ্বারে,
ভাব্‌নু বুঝি থিয়েটার
সহর হোতে আস্‌লো হেথা,
ফূর্ত্তি হবে খুব দেদার।

এই না ভেবে যেই গো দাদা
পা দিয়েছি চৌকাঠে,
দেখ্‌নু চেয়ে—ভূত রে বাবা
লম্বা, মোটা আর বেঁটে।

লম্বাটা সে গান ধোরেছে
মোটা ভূতটা তব্‌লা বাজায়,
বেঁটে বেটা বেজায় পাজী
নাচ্‌তে ছিলো ঘুঙ্‌র পায়।

আমায় দেখেই সমস্বরে
বল্ল, 'দাদা কোথায় যাও ?
এসো, এসো, গানটা ধরো,
ফূর্ত্তি একটু করে নাও !'

ভয়ের চোটে আঁত্‌কে ক'ন্নু,
'শরীর কেমন ঠেক্‌ছে যেন।'
লম্বাটা সে বল্‌লে তেড়ে,
'গাইতে হবেই, ছাড়বো কেন?'

'ছাড়বো কেন?' বল্‌লে তখন
অন্য দুটো সমস্বরে,—
'নাই যদি-গাও, বাজাও খানিক,
নইলে তোমায় ফেল্‌বো মেরে।'

কী করি আর প্রাণের ভয়ে,
তব্‌লা ধোরে বুঝ্‌লে দাদা,
চাঁট্‌ লাগান্নু, বোল্‌ ধরিন্নু,
'ধা-তে-রে-কে-টে-তাক-ধা।'

বল্‌ল তখন মোটা বেটা,
'সাবাস্‌ দাদা সাবাস্‌ দি;
তোমার হাতে বাজ্‌ছে তো বেশ,
একটু খানি শেখাও যদি···।'

পাজীর ধেড়ে ছোট্‌কা ছুঁচো
বল্‌ল, 'একটু নাচ্‌বে না?
কেমন যেন জম্‌ছে নাকো,
মজ লিশ্‌টা নাচ বিনা!'

এই না বোলে ঘুঙুর গুলো
দিলো আমার পায়ে বেঁধে;
বল্‌ল, 'দাদা নাচ্‌তে হবে,
বল্‌ছি তোমায় বিশেষ সেধে!'

ভয়ের চোটে কাতর স্বরে
বল্‌নু, 'না ভাই নাচ জানিনে,
একটু খানি বাজাই বরং
যা দুটো তাল আছে মনে।'

'বাজাও তবে, বোল্‌ বোলে যাও,
শিখ্‌ব মোরা সাথে সাথে।'—
যেই রে দাদা বোল্‌ বোলেছি,—
'তেরে কেটে তাক্‌ তেরে কেটে তে···'

অট্ট হেসে উঠলো সবাই
লম্বা, মোটা আর সে বেঁটে;
সুর কোরে সব চেঁচিয়ে বলে,
'দেরে কেটে নাক দেরে কেটে।'

যেই বলা ভাই অমনি সেই
ছুঁচো পাজী বদের ধাড়ি
ক্ষুর এনে এক, নাকটা কেটে
দিলে আমায় পথে ছাড়ি'।

কম্বল খুলে দেখায় সবে,
'এই দেখো ভাই কী হোয়েছে!'
অবাক্‌ হোয়ে দেখে সবাই—
সত্যি গোঁসাইর নাক্‌টা গেছে।



দিবা স্বপ্ন

(শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ ব্যানার্জ্জি—গ্রাহক নং ৮০৩)

সিনেট হলে আই-এস্-সি পরীক্ষার ফলাফল যখন টাঙ্গিয়ে দেওয়া হ'ল তখন দুই দুইবার উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত চোখ বুলিয়েও টুকলু তার নামটা আবিষ্কার করতে পারল না। এই তার প্রথম নয়, এর আগের বারেও সে ফেল হয়েছিল। কাজেই টুকলুর দুঃখ সে ছাড়া অন্যে বোধ হয় বুঝবে না।

বাড়ীতে থাকেন তার-মা আর বড় দা। দাদা বড় চাকরি করেন, কাজেই তাদের এই ক্ষুদ্র সংসারে অভাব অনটন কিছুই নেই।

টুকলু যে ফেল হ'ল তাতে তার বড় দোষ ছিল না। প্রথম থেকেই সে সাধারণ বাঙ্গালী ছেলেদের থেকে একটু ভিন্ন। লেখা পড়ায় মন যতটা থাক না থাক, সাহসের অভাব তার নাই। ম্যাট্রিকুলেশনের পর হ'তেই সে চেয়েছিল জাহাজের কাজে লাগবার জন্যে, অন্তত—নাবিক। কিন্তু তার কথার কোন মূল্যই দেওয়া হয় নি বাড়ী থেকে। মা শুনে বললেন—পাগল, আর দাদা কেবল একটু হাসলেন। তারা যদিও সেখানেই ওটার যবনিকা টেনে দিলেন, টুকলু কিন্তু তা' পারে নি।

সিনেট্ থেকে বাড়ী ফিরে টুকলু সোজা গিয়ে নিজের ঘরটাতে ঢুকল, হাতে নিয়ে একটা ডিটেক্‌টিভ বই—দুঃখটা ভোলবার জন্যে। বইটার কয়েক পাতা পড়বার পর টুকলুর মনে হঠাৎ আবার সেই জাহাজের কথা উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল। টুকলু তখন ভাবতে লাগল, সে ত এখন বড় হয়েছে, এখন আর দাদার ভাত ধ্বংশ করা কি তার উচিত? তার উচিত এখন নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়ান। মা দাদা তার কথা নাই বা শুনলেন, সে কি আর চেষ্টা করলে নিজের পথ নিজে করে নিতে পারবে না? পারবে না কেন?—খুব পারবে! কত লোক তো এমনি করেই নূতন নূতন কাজে সফল হয়েছে! এই সব ভাবতে ভাবতে টুকলু কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল—সমস্ত দুঃখ যাতনা ভুলে গিয়ে।

ওরিয়েন্ট কোম্পানীর জাহাজ ছুটে চলেছে প্রশান্ত মহাসাগরের সীমাহীন

বক্ষে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে কে ঐ খালাসী পরিষ্কার করছে জাহাজের তামা ও পিতলের সাজ সরঞ্জাম? দেহে তার অপরিষ্কার পরিচ্ছদ কিন্তু মুখে তার একটা প্রচণ্ড উৎসাহের দীপ্তি। এই কি আমাদের সেই টুকলু? এই সেই টুকলু বাবু? সত্যই কি সেই টুকলু হঠাৎ একদিন কাকেও কিছু না জানিয়ে জাহাজের খালাসী হয়েছে! কাপ্টেন প্রথমে তাকে নিতে চান নি বাঙ্গালী ব'লে। কিন্তু টুকলুর উৎসাহ আর সবল সুস্থ চেহারা দেখে শেষ পর্য্যন্ত তাকে ভর্ত্তি করে নেন। তারপর কতদিন কেটে গেছে। টুকলু আর এখন সে টুকলু নাই। নিজের প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমে ক্রমশঃ উন্নতি করতে করতে সে এখন একজন কর্ম্মঠ নাবিক। অন্য কারো চেয়েই সে এখন কম নয়।

জাহাজখানা যাত্রীবাহী জাহাজ নয়, মাল জাহাজ। এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে মাল বয়ে নিয়ে যাওয়াই তার কাজ। হংকং থেকে ছেড়ে আসার পর দু'দিন বেশ ভালই কেটেছিল। তৃতীয় দিনে হঠাৎ আকাশে ভীষণ ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিল। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় কাপ্তেন বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হবার জন্য জাহাজের সকলের ত্রস্ত আয়োজন চলতে লাগল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই ভীষণ ঝড় সুরু হ'ল। সে কী দারুণ ঝড়! রুদ্র তাঁহার প্রলয় বিষাণ বাজিয়ে আজ যেন ধ্বংসের নেশায় উন্মত্ত। প্রকৃতির এমন ভয়ানক সংহারিণী মূর্ত্তি টুকলু আগে কোন দিন দেখে নাই। সে বুঝতেই পারল না কি করে তাদের জাহাজখানি এই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে টিঁকে থাকতে পারে। বাঁচবার আশা সে রাখে না। কিন্তু সেজন্য প্রাণের ভয়ে কাতর হবার ছেলেও নয় সে মোটেই।

নিবিড় অন্ধকার ও প্রচণ্ড ঝড় জলের মধ্য দিয়ে জাহাজখানি ছুটে চলেছে। তার মাস্তলগুলি ভেঙ্গে গেছে। অন্যান্য অনেক অংশও ভেঙ্গে চুরে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে। এখন জাহাজটিকে নিজের ইচ্ছামত কোন দিকে চালান অসম্ভব। ঝড়ের মুখে থামাতে গেলেও জাহাজ সেই মুহূর্ত্তেই ডুবে যাবে। তাই কাপ্তেন ঝড়ের দিকেই তাকে ছেড়ে দিয়েছেন, জাহাজ তীর বেগে ছুটেছে। এক রাত এক দিন এমনি ভাবে কেটে গেল। পরের দিন বিকালের দিকে ঝড়ের বেগ কমে এল। জাহাজখানার অবস্থা তখন যেরূপ, তাতে দরকারমত মেরামত না করে আর তাকে বেশী দূর চালান যাবে না। এদিকে সন্ধ্যাও প্রায় হয়ে এসেছে। কাপ্তেন হিসাব

করে দেখলেন যে সেখান থেকে চীন দেশের উপকূল বেশী দূর নয়। তিনি স্থির করলেন যে জাহাজখানিকে নিয়ে গিয়ে উপকূলের কোনও সুবিধামত স্থানে নোঙ্গর করে সেখানে থাকবেন, এবং তার পর বিশেষ জরুরী মেরামতগুলি হয়ে গেলেই নিজের গন্তব্যস্থানে রওনা হবেন।

জাহাজ নোঙ্গর করা হ'লে কাপ্তেন সকলকে ডেকে খুব সাবধানে থাকতে বলে দিলেন। সে অঞ্চলটায় নাকি বিষম চীনা জলদস্যুর ভয়। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই কাপ্তেন সকলের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করলেন যে রাত্রিবেলা সকলে পালা করে পাহারা দেবে, এবং যারা ঘুমুতে যাবে তারাও যেন যথাসম্ভব হুসিয়ার থাকে, যাতে বিন্দুমাত্র গোলমাল শুনলেই সকলে অবিলম্বে ডেকে এসে হাজির হয়।

প্রথম রাতটা খাওয়া দাওয়া প্রভৃতিতেই কেটে গেল। সকলের মনেই একটা দারুণ উদ্বেগের ভাব। দুর্দ্দান্ত চীনা দস্যুদের নানারূপ লুট পাট ও অত্যাচারের গল্প জাহাজের অনেকেই আগে শুনেছে। তাদের জ্বালায় কোন জাহাজ প্রভৃতির এ অঞ্চলে নিরাপদে থাকার উপায় নাই। কাপ্তেন নিজে জাহাজের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে লাগলেন, এবং দরকার মত নানা আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করালেন। জাহাজের চারি পাশেই প্রহরী রাখা হ'ল, এবং তাদের বিশেষ ভাবে বলে দেওয়া হ'ল যেন সব সময় সজাগ থেকে খুব সতর্ক ভাবে পাহারা দেয়।

দুই দিন দারুণ খাট্‌নীর পর টুকলু আজ একটু বিশ্রাম করার সময় পেয়েছে। তাই বিছানায় গিয়ে শোয়া মাত্র তখনই ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে তার ঠিক নাই, হঠাৎ গোলমাল শুনে উঠে তাড়াতাড়ি ডেকের উপর গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে দেখে যে জাহাজের সকলে মহা ব্যস্ত হয়ে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। অন্ধকার রাত্রি, দূরের জিনিষ ভাল দেখা যায় না। অস্পষ্ট আলোতে টুকলু দেখল যে অনেকগুলি বোম্বেটেদের পান্‌সী জাহাজের দিগে তীর বেগে ছুটে আসছে। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে, সেদিকেও অনেকগুলি পানসী আসছে, সামনে পিছনে সব দিকেই জাহাজকে ঘিরে ফেলেছে। পানসীগুলি তখন কাছেও এসে পড়েছে খুব। দেখতে দেখতে তারা একেবারে জাহাজের গায়ে এসে পড়ল। তারপর আরম্ভ হ'ল এক সে কুরুক্ষেত্র ব্যাপার।

টুকলু আগে কখন লড়াই করে নাই, এমন কি লড়াই কোনদিন দেখেও নাই। প্রথমটা সে বেশ ভয় পেয়েছিল, কিন্তু তার পর সেও প্রাণপণ লড়্‌তে লাগল। জাহাজের লোকেরা প্রথম দিকে খুবই তেজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে সামনে দিকের দস্যুরা হটে যেতে লাগল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন পিছনের পানসীগুলিও এসে পড়ায় অসংখ্য দস্যু চারিদিক থেকে তাদের আক্রমণ করল তখন আর তাদের উপায় রইল না। তারা ক্রমেই হট্‌তে লাগল। টুকলু যেখানে লড়াই করছিল সেখানে চীনা দস্যুতে একেবারে ভরে গেছে। চারিদিকে হতাহত নাবিক ও দস্যুদের রাশিকৃত দেহ। টুকলুও শরীরের নানা স্থানে আহত হয়ে যারপরনাই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। তবুও সে এবং বাকি যে কয়জন নাবিক তখনও বেঁচে ছিল তারা ক্রমে ক্রমে পেছিয়ে গিয়ে অপর পাশে কাপ্তেনের দলের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করল। টুকলুর আর তখন তাড়াতাড়ি চলবার শক্তি নাই। যেই সে অন্যদের সঙ্গে পিছনে হটতে গেছে, অমনি হোঁচট খেয়ে সজোরে পড়ে গেল। আহত দুর্ব্বল শরীর এই নূতন আঘাতে ঝিমঝিম করতে লাগল, তার আর উঠবার শক্তি রইল না। এবার আর টুকলুর রক্ষা নাই! উপর দিকে চেয়ে দেখে, এক বিকটাকার চীনার উদ্যত তরবারি তাহার মাথা লক্ষ্য করে নাম্‌ছে। উঃ, কি রক্তলোলুপ হিংস্র চেহারা সেই দস্যুটার! ভয়ে টুকলু চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

টুকলুর যখন জ্ঞান হ'লো, চেয়ে দেখে যে তার মা ব্যস্ত হয়ে তার গায় হাত দিয়ে ঠেলছেন। সে চোখ মেলতেই তার মা বললেন, "হাঁরে টুকলু, তুই কি দিনের বেলায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিলি না কি? টুকলু খানিকক্ষণ কিছুই বুঝতে পারল না, কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। তার পর চোখ মুখ মুছে চারিদিক ভাল করে দেখতে লাগল। তাইত, এ যে তারই সেই পুরাণ ঘরটা। তবে কি এত সব কাণ্ড একেবারে মিথ্যা? তবে কি সে এতক্ষণ কলিকাতায় তার নিজের ঘরটিতে শুয়ে শুয়ে জাহাজের ও চীনা বোম্বেটের স্বপ্ন দেখছিল মাত্র! টুকলু আর কোন কথা বলল না, ধীরে ধীরে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল।

গল্প-স্বল্প

সিংহের মুখে—সিংহের মুখে মানুষ পড়্লে তা'র কি দশা হয় তা সবাই অনুমান করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সিংহ কি ভাবে কি করে, তার চাক্ষুস পরীক্ষা করার জন্য মানুষের একটি মূর্ত্তি বানিয়ে এক দল সিংহের মাঝখানে মূর্ত্তিটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই সিংহ-গুলি ক্যালিফোর্ণিয়ার সিংহ-ওয়ালার (সিংহ ব্যবসায়ী) সম্পত্তি; প্রকাণ্ড ঘেরাও করা জায়গায় তারা থাকে। এক জন ফটোগ্রাফার বাইরে থেকে ক্যামেরার সাহায্যে এই ব্যাপারের ছবি তুলে-ছেন। প্রথমেই দুটি সিংহ দৌড়ে এসে মূর্ত্তির মুণ্ডু আর একখানা হাত কামড়িয়ে ধর্‌ল। তারপর সাত আটটা সিংহ এসে আধ মিনিটের মধ্যে মূর্ত্তিকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে, যে যা'র অংশ নিয়ে সরে পড়্‌ল। অবিশ্যি শেষটায় তারা বুঝ্‌তে পেরেছিল যে পরিশ্রমটা বৃথাই হয়েছিল, কারণ মাটির মূর্ত্তিকে তো আর খাওয়া চলে না! উপরের ছবিটিতে দেখ, দুটি সিংহ মূর্ত্তির মুণ্ডু আর হাত কামড়ে ধরেছে। দ্বিতীয় (নীচের) ছবিতে একদল সিংহ মিলে মূর্ত্তিটিকে খণ্ড খণ্ড করতে আরম্ভ ক'রেছে।

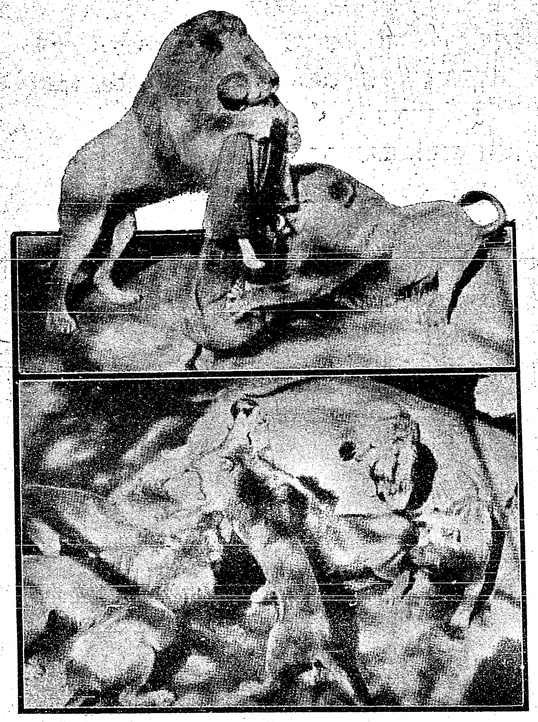

মেজে পরীক্ষা—যখন মজবুত বাড়ী তৈরী করা হয় তখন তার মেজেখানিও উপযুক্ত রকম শক্ত করা দরকার। মেজের উপর ভারি জিনিষ রাখ্‌লে বা ভারি জিনিষকে মেজের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেলে মেজে যাতে ফেটে বা ভেঙে, বা অন্য কোন রকমে জখম না হয়ে যায় সে দিকে আগে থেকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

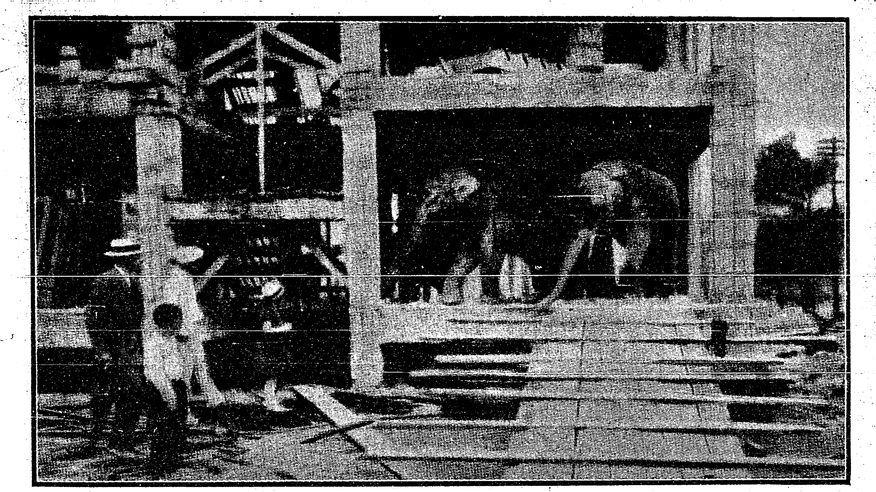

তাই আমেরিকার এক ইঞ্জিনিয়ার বাড়ী তৈরী করার সময় একতালার মেজের উপর গোটা দু'চার হাতী চড়িয়ে তাদের দস্তুর মত হাঁটিয়ে মেজে পরীক্ষা ক'রে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। হাতীর ভারেও যদি মেজের কোন অনিষ্ট না হয় তা' হলে অনিষ্টের আর কোন ভয় নেই ব'লে স্বচ্ছন্দে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

ঐ স্বাঃ! তেতাল্লিশ!—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যত উঁচু বাড়ী আছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তত উঁচু বাড়ী নাই। এই সব বাড়ীকে "Sky-scraper" "আকাশ-চাঁচা" বলে। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তলা বাড়ী—তার উপর থেকে পড়্‌লেই

দফা রফা! প্রতি বছরই এই সব বাড়ীর উপর তলা থেকে অনেক লোক পড়ে মারা যায়। তাই আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে নাকি অনেক ডাক্তার বাড়ীর উপর থেকে পড়া রোগীর চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নাকি আবার বিভিন্ন উচ্চতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। পাশের ছবিতে সে বিষয়েই ঠাট্টা করা হয়েছে। বেয়াল্লিশ তলা থেকে পড়া রোগীর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রাস্তা দিয়ে চলেছেন, আর তাঁর সাম্নে একজন লোক উপর থেকে ধুপ্ ক'রে পড়্ল। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গুণ্তে আরম্ভ কর্লেন কত তলা থেকে লোকটি পড়েছে। গুণ্তে গুণ্তে—একচল্লিশ, বেয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ গুণে বল্ছেন, "ঐ যাঃ! তেতাল্লিশ!" অর্থাৎ, তাঁর দ্বারা আর ঐ রোগীর চিকিৎসা হ'তে পারে না, কারণ তিনি বেয়াল্লিশ-তলা-থেকে-পড়া রোগীর চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ!



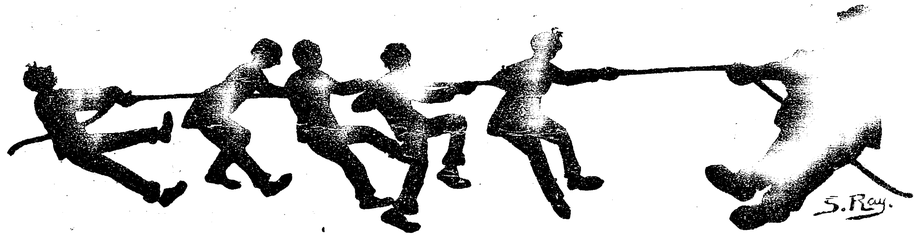

ধাঁধার উত্তর

লুকানো নাম—৭টি লাইনে যে ৪৯টি অক্ষর আছে, তাদের মাঝের "লা" অক্ষরটি থেকে আরম্ভ করে, পর পর ঘুরে ঘুরে গেলে, নীচের এই নামগুলি পাওয়া যাবে। তাদের মধ্যে নীচে লাইন দেওয়া ৮টি নাম জানোয়ারের, এবং বাকি ৮টী নাম পাখীর।—লামা, চড়াই, সীল, উটপাখী, আরমাডিলো, চিল, টেপির, টিয়া, সিন্ধুঘোটক, বৌ কথা কও, চিতা, সারস, হায়েণা, শকুন, নেকড়ে, বক।

মোটরে বেড়ান—

১৫ বার গাড়ী মোড় ফিরিয়ে তিনি ঊর্দ্ধসংখ্যা ৭০ মাইল যেতে পারেন। কালো সহরটি থেকে রওনা হয়ে কি ভাবে পর পর মোড় ফিরিয়ে যাবেন, তা পাশের ছবিতে দেখানো হ'লো।

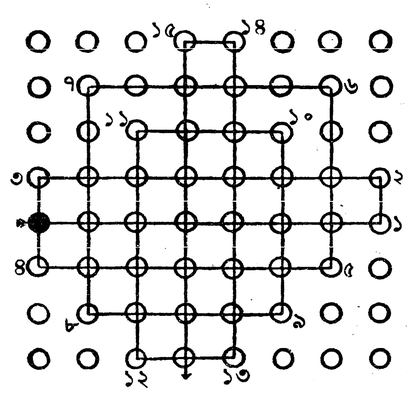

উত্তর দাতাগণের নাম

কয়েক মাস হইতে "সন্দেশে" ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হয় নাই। নাম ছাপিতে যে স্থান লাগে, সে স্থানে তৎপরিবর্ত্তে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা প্রভৃতি বেশী করিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যেই নাম ছাপান বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু অনেক গ্রাহক গ্রাহিকা কয়েক মাস হইতে আপত্তি করিয়া নাম প্রকাশ করিবার জন্য লিখিতেছেন। সুতরাং শ্রাবন সংখ্যা হইতে আমরা পূর্ব্বের মত "সন্দেশে" ধাঁধার উত্তরদাতাগণের নাম বাহির করিব।

—সঃ সঃ

নূতন ধাঁধা

শিকল জোড়া দেওয়া—একটি লোকের ৯ টুকরা শিকল আছে। সে টুকরাগুলিকে জুড়ে এমন একটা আস্ত শিকল করতে চায় যে তার কোন মুখ খোলা থাকবে না।

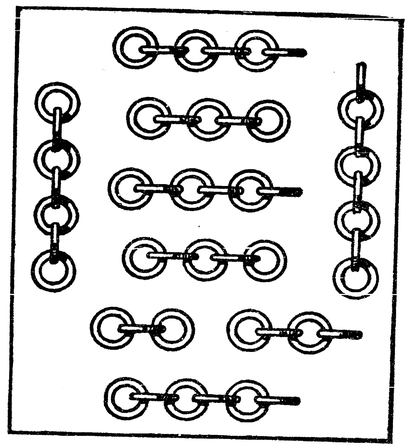

শিকলের এক একটি আংটা কাটতে /০ এক আনা, এবং প্রত্যেক আংটা ঝালাই করে জুড়তে ৵০ খরচ পড়ে। নূতন একটি সেরূপ আস্ত শিকলের দাম দেখল মোটে ১৷৷৵০ আনা। সে ভাব্‌তে লাগল যে কি করে সে টুকরো-গুলিকে জুড়বে যাতে নূতন শিকলের চেয়ে তার খরচ কম পড়ে, এবং কত কম খরচেই বা জোড়া দিয়ে ওরূপ আস্ত শিকল গড়া যাবে। তোমরা বলত, কি ভাবে জুড়লে সব চেয়ে কম খরচায় সে টুকরাগুলিকে ঐ ভাবে জুড়তে পারবে।

গড় পরতার হিসাব—নরেন বাবু মোটর সাইকেলে বেড়াতে বেরোলেন। তিনি তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেখেন যে ঘণ্টায় ১০ মাইল হিসাবে এসেছেন। খানিক পরে সেই একই পথে তিনি ফিরে এলেন। কিন্তু ফেরবার সময় রাস্তায় ভীড় না থাকায় ঘণ্টায় ১৫ মাইল হিসাবে এসেছেন দেখলেন।

তোমরা কি বলতে পার যে তাঁর আসা-যাওয়ার গরপরতা বেগ (Speed) ঘণ্টায় কত মাইল করে? ভাল করে একটু ভেবে বলো, নইলে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে।

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ উপহারের বই

রত্নদ্বীপ (সচিত্র)

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত

প্রাইজের জন্য ডিরেক্টর কর্ত্তৃক অনুমোদিত

২য় সংস্করণ—মূল্য ৷৷৵০ আনা

গৃহে, জঙ্গলে, সাগরে, দস্যু তস্করের মধ্যে বালকের অসীম সাহসিকতা ও কর্ম্মতৎপরতার কাহিনী পড়িয়া ছেলেদের মন সাহসে ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিবে। R. L. Stevenson এর Treasure Island-এর গল্প—অতি চিত্তাকর্ষক। ভাল কাগজে ঝকঝকে ছাপায় ও সুন্দর সুন্দর ছবিতে বইখানি সুশোভিত।

সচিত্র

সাঁওতালী উপকথা

শ্রীমতী নির্ম্মলা রায় প্রণীত

কত যে সুন্দর তাহা না পড়িলে বোঝান যায় না। সরল সিধা সাঁওতালদের উপকথাগুলি অতি মনোরম। তাহার উপর গল্পের ভাষা ও পদ্ধতি এমন চমৎকার যে, পড়িলে মন আনন্দে ও শান্তভাবে ভরিয়া উঠে। বহু সুন্দর সুন্দর ছবিতে, উৎকৃষ্ট কাগজে ও ঝকঝকে ছাপায় বইখানি ছেলেমেয়েদের উপহারের পক্ষে অতুলনীয়। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

সচিত্র

২য় সংস্করণ **ছেলেদের কাদম্বরী** মূল্য ।৵০

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত

বাণভট্টের সুবিখ্যাত পুস্তক হইতে ছেলেদের অনুপযোগী স্থানগুলি বাদ দিয়া, অতি সুন্দর সরল ভাষায়, ছেলেদের মত করিয়া লেখা। সমস্ত গল্পটি একখানি ছবির মতই সুন্দর। পরিষ্কার ছাপা ও চমৎকার চমৎকার ছবিতে বইখানি অতি মনোরম।

অক্ষয়বিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

COLOURED DOCUMENT.

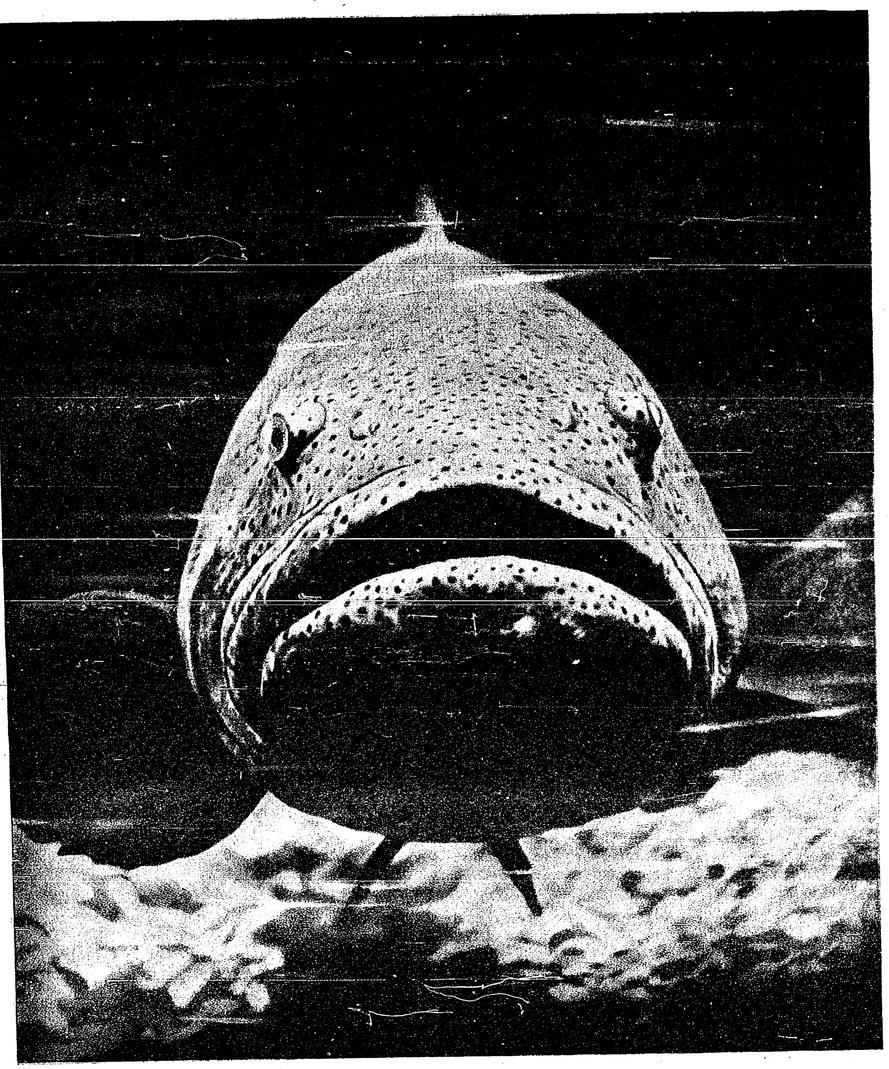

রাক্ষুসে জু-ফিস্ (Jew fish)— বাস এঁর গভীর সমুদ্রে

COLOURED DOCUMENT.

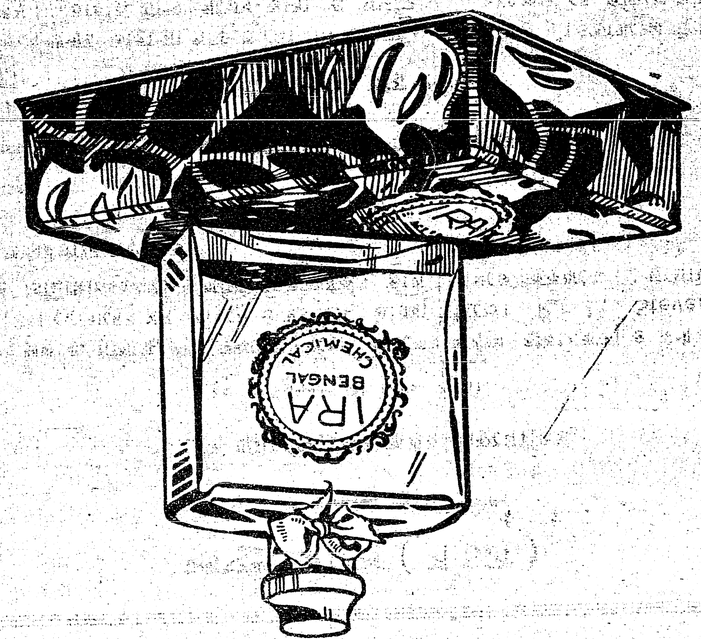

DIFFECTIVE BINDING.

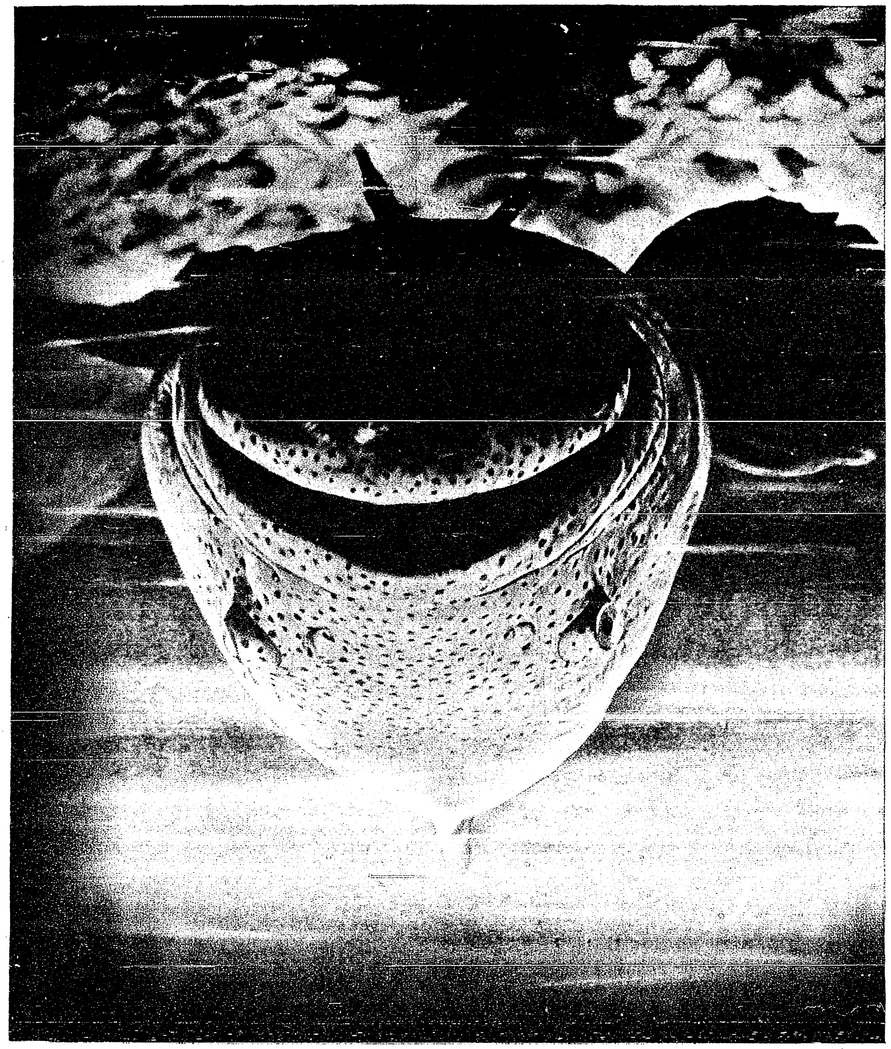

রাঙ্গুলে জু-ফিস (Jew fish) — বাস ও'র গভীর সমুদ্রে



প্রত্যেকদিন তোমাদের রুমালে ব্যবহার করবার জন্যে

'ইরা'র মত এমন সুন্দর অথচ দামে কম

— সুগন্ধি বাজারে আর নাই —

চমৎকার বাক্সে, সুমনোহর কাচের শিশিতে থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল, কলিকাতা

COLOURED DOCUMENT.

DIFFECTIVE BINDING.



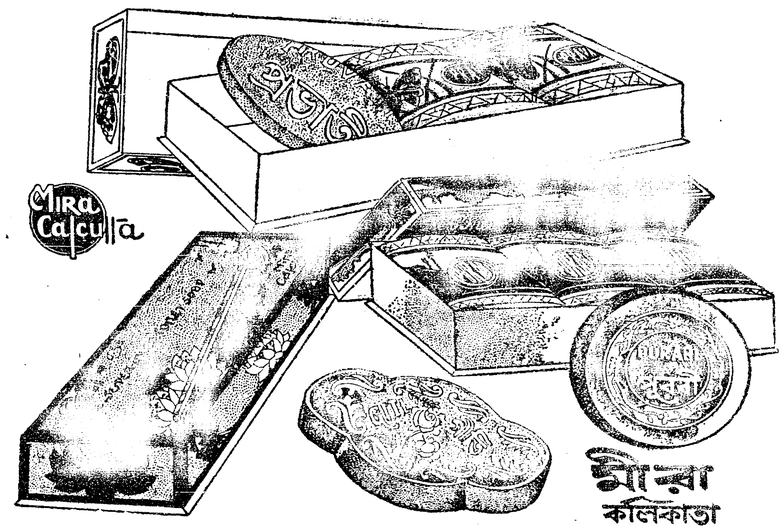

COLOURED DOCUMENT.

ডোঙ্গরের বালাম্‌ত

বালকবালিকার পক্ষে যথার্থই অমৃততুল্য।

ইহা শিশুদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরে বলসঞ্চার করে। ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক। ইহা পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাশি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট; অনেকের ধারণা ইহা 'ফুড' বিশেষ। বস্তুতঃ ইহা অতি উপাদেয় সুমিষ্ট ঔষধ। বর্দ্ধনশীল শিশুদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা চলে।

মূল্য প্রতি বোতল এক টাকা মাত্র।
সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটর—
কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং
BOMBAY, Girgaon.

DONGRE'S
BALAMRIT



IDEAL TONIC FOR CHILDREN.

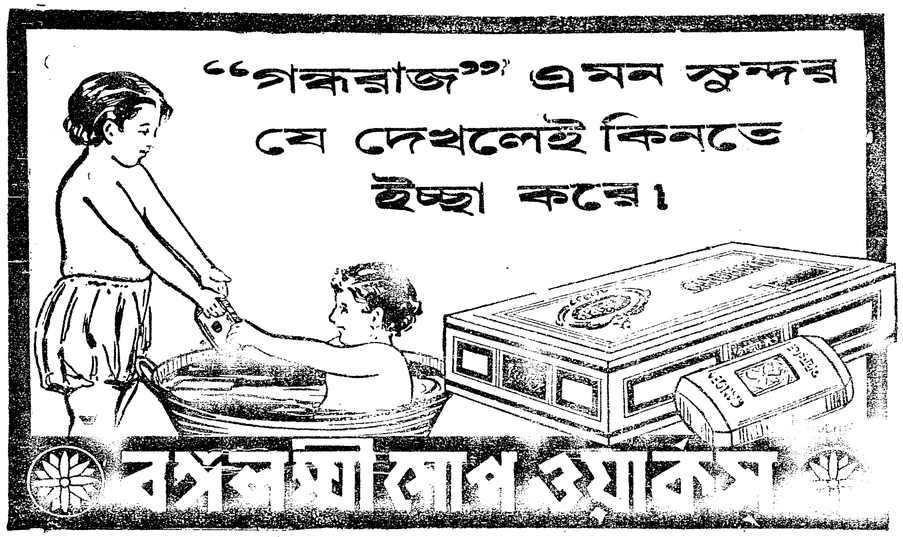

ধূলো বালি ঘাঁটা ছেলেদের স্বভাব।



ধূলাবালি থেকে নানা রকম সংক্রামক চর্ম্মরোগের সৃষ্টি হয়। ছেলেপিলেদের গা হাত পরিষ্কার করতে ও স্নান করাতে

মার্গো সোপই

সব চেয়ে ভাল। এতে বীজাণু নষ্ট হয়, অথচ অন্য ওষুধযুক্ত সাবানের মত গা জ্বালা করে না।

ছোটদের নরম শরীরের জন্য স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর ফেনাযুক্ত : মার্গোসোপই উপযোগী ; মার্গো-সোপ সুন্দর গন্ধযুক্ত ও ব্যবহারে আরামদায়ক।

ক্যালকেমিকো'র

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট—সর্দ্দিজ্বরের জন্য।
মাগুয়েণ্টাম—ঘা পাঁচড়ার জন্য।
টাইকোসোডা ট্যাবলেট—অম্বল ও পেটফাঁপা প্রভৃতিতে।
ছেলেমেয়েদের ঘরে সব সময় রাখা দরকার—বিশেষ করে শীতের দিনে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড।

BLEED THROUGH.

"সন্দেশ"এর নিয়মাবলী

আশ্বিন হইতে "সন্দেশ"-এর বৎসর আরম্ভ হয়।

"সন্দেশ"-এর বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৷৷৵০ ; প্রতি সংখ্যা ।০ আনা। চার আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

ভিঃ পিঃ খরচ আলাদা। টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়াই ভাল।

সন্দেশ মাসের ১লা বাহির হয়। কোন গ্রাহক সময়মত সন্দেশ না পাইলে, ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। তাহার পরে প্রতিখানার আলাদা দাম লাগে।

চিঠিপত্র, টাকা পয়সা, লেখা প্রভৃতি সবই নীচের নামে পাঠাইবেন। অন্য নামে পাঠাইলে অসুবিধা হয়।

ম্যানেজার, "সন্দেশ"

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রত্নমেশা

যখন

প্রথম বের হয়

তখন

সন্দেশের গ্রাহকেরা

কিনেছিল সকলেই।

প্রথম সংস্করণ কয়েক খণ্ড

এখনও আছে।

নতুন গ্রাহকেরা সত্বর হও।

দাম একটাকা

ইউ রায় এণ্ড সন্স,

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুভা (সচিত্র)

শ্রীসুখলতা রাও প্রণীত

ছেলেমেয়েদের একখানি নূতন ধরণের নাটক।

খেলাচ্ছলে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, নানা নীতিকথা এমন চমৎকার সুললিত ভাষায় লেখা যে পড়তে বস্‌লে শেষ না ক'রে উঠা যায় না।

দাম ।৵০ ছয় আনা।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

U. RAY & SONS

for

THE BEST QUALITY PROCESS BLOCKS —

HALFTONE, LINE,
DUO-TONE AND
3-COLOUR BLOCKS
OF ALL VARIETIES.

and

THE HIGHEST CLASS OF ART, COLOUR, AND GENERAL PRINTING

in

ENGLISH, BENGALI,
ASSAMESE, HINDI,
AND ORYIA, ETC.

***Office:*—117-1, Bowbazar Street, Calcutta.**

PHONE : B.B. 2211 TELE : "RAYTONE". CALCUTTA

BLEED THROUGH.

"জোড়া-কথা-ছাড়া বই" সিরিজের প্রথম পুস্তক

ভেক রাজকুমার

শ্রীবিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ, বি-এ প্রণীত

বাংলা দেশের শিশুসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব জিনিষ

এই বইখানির পরিকল্পনা এবং রচনা করিয়া বিনয়বাবু বাংলা দেশের শিশুসম্প্রদায়ের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এমন কৌশলে এ বইখানি রচিত হইয়াছে যাহাতে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকবালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাদের মাত্র অক্ষর পরিচয় হইয়াছে তাহারাও এ বইখানির দ্বারা জ্ঞান এবং আনন্দ লাভ করিবে। সমস্ত পুস্তকটিতে এমন একটি কথাও ব্যবহার করা হয় নাই যাহাতে যুক্তাক্ষর আছে। যুক্তাক্ষর-যুক্ত কথাকে হসন্তের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া অযুক্ত করিয়া লইলে শিশুদের মনে বানান সম্বন্ধে পরে গোলযোগ ঘটিতে পারে। এ পুস্তকে সে প্রথা অবলম্বন করা হয় নাই, কারণ এ পুস্তকে ব্যবহৃত সকল কথাই যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত। কিন্তু তাহাতে ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও বাধা পায় নাই।

এই বইখানি শিশুদের হস্তে পড়িলে এক সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি এবং কল্পনাবৃত্তি উন্মেষিত হইবে। বইখানিতে যে রেখাচিত্রগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রঙ্ লাগাইবার প্রণালীও নির্দ্দেশ করা আছে। ছবিগুলিতে রঙ ফলাইবার সুযোগে শিশুদের শিল্প-বোধ বিস্তার লাভ করিবে। মূল্য তিন আনা।

প্রকাশক—বিচিত্রা নিকেতন, ২৭।১ ফরিয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

যতীন বাবুর
লেখা আরো ৪ খানা ভাল বই

যাদুকর
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
আট আনা

চিচিং ফাঁক
আট আনা

আঁধার রাতের
মুসাফির
আট আনা

সোনার-ঘড়া
চৌদ্দ আনা

— মনে আঁচর রেখে যাওয়া গল্প—
—চোখে ছাপ রেখে যাওয়া ছবি—

যতীন সাহার লেখা
সমর দের আঁকা

"ঝিকিমিকি"

এনে দেবে তোমাদের মনে সত্যিকারের ছাপ
শিগ্‌গীরই বেরুবে!
দাম আট আনা

সমস্ত বড় বড় বইয়ের দোকানে
পাওয়া যায়।

ছেলেমেয়েদের সুন্দর উপহারের বই

এই বইগুলি ছেলেমেয়েদের যে কত প্রিয় তা এদের এতগুলি সংস্করণ থেকেই বোঝা যায়। সরল সুন্দর লেখায়, চমৎকার চমৎকার ছবিতে, ঝরঝরে ছাপায়, বইগুলি ছেলে মেয়েদের বিশেষ উপযোগী।

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

ছেলেদের রামায়ণ

এরূপ সুন্দর ভাবে সরল ভাষায় বইখানি লেখা যে ইহার মত ছেলেমেয়েদের রামায়ণ আর নাই। ৮ খানি হাফটোন ছবি, ১ খানি রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

২০শ সংস্করণ। দাম ॥৵০

ছেলেদের মহাভারত

এখানিও ছেলেমেয়েদের একখানি অতুলনীয় বই। মহাভারতের মূল গল্প উপেন্দ্র বাবুর সুন্দর সরস ভাষায় লেখা। ৮ খানি হাফটোন ছবি, কয়েকখানি অন্যান্য ছবি, ১ খানি রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

১৮শ সংস্করণ, দাম ১॥০ টাকা

টুনটুনির বই

ছেলেমেয়েদের অতি সুন্দর গল্পের বই। ২৭টি চমৎকার গল্প, ৩০ খানি মজাদার ছোট ছবি, ও রঙ্গিন মলাট।

১১শ সংস্করণ, দাম ॥০ আনা

৺সুকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

আবোল তাবোল

পাতায় পাতায় হাসি, পাতায় পাতায় মজার ছবি! মোটা কাগজে সুন্দর ছাপা, চমৎকার রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট। ছেলে-মেয়েদের উপহারের এমন বই আর নাই।

৪র্থ সংস্করণ। দাম ৸৵০

হ-য-ব-র-ল

নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এমন মজার বই খুব কম। পড়িতে পড়িতে হাসির চোটে পেটে খিল ধরিবে। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বই। রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট, সুন্দর ঝকঝকে ছাপা।

দাম ।৵০ আনা।

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

গল্পের বই

২০টি মজার গল্প, ১৬ খানি সুন্দর হাফটোন ছবি। ১ খানি রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট।

৯ম সংস্করণ। দাম ॥৵০

আরো গল্প

১৫টি সুন্দর গল্প, ১৬ খানি চমৎকার হাফ-টোন ছবি। ১ রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

৮ম সংস্করণ। দাম ॥৵০

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

PAGES CONTAINS
DIFFERENT COLORS.

—দেশনায়কগণের অভিমত—

যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য

দেশপূজ্য
৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির
অভিমত

"আমি মিঃ এইচ, বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে ইহাই ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।"

স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জননেতা
লালা লাজপৎ রায়ের
অভিমত

"আমি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি মিঃ এইচ, বসুর "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" বাস্তবিক ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধ অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"

স্বাঃ লালা লাজপৎ রায়

কেশতৈল—কুন্তলীন, কোকোলীন, ম্যাকেসার, চামেলীন প্রভৃতি।

হেয়ার লোসন—দেলখোস, দিলতোষ, হার্টস্ ডিলাইট, প্রভৃতি।

পমেটম—দেলখোস পমেড, গোলাপ ও বকুল পমেটম প্রভৃতি।

এসেন্স—দেলখোস, হোয়াইট রোজ, অপরাজিতা, বকুল, মাস্ক, যুঁই, বেলা, চামেলী, খস, অরিগ্যান প্রভৃতি নানা সিরিজের বিবিধ প্রকার সুগন্ধি।

নানাবিধ অটো, হেয়ারওয়াস, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, লাইম যুস ও গ্লিসারিন ক্রীম এবং স্নো প্রভৃতি।

সাবান—হোয়াইট রোজ, চন্দন, খসখস, মাস্ক, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ ফলের সিরাপ।

বিশ্ববরেণ্য
রবীন্দ্রনাথ
বলেন

"কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহারে একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক
৺ মতিলাল নেহেরুর
অভিমত

"ভারতবর্ষের প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এইচ, বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

এইচ, বসু, পারফিউমার,
৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
আষাঢ়ে ছড়া	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...		৪১৯
ভবিষ্যৎ	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম্-এ	...		৪২২
পেলিকান	শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি	...		৪২৬
ঠিক দুপুর বেলা	শ্রীসুকুমার দে সরকার	...		৪৩১
নাতির যুক্তি	শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য	...		৪৩৫
নিশুর ব্যথা	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...		৪৩৭
সব চেয়ে ছোট	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	...		৪৭২
চালিয়াৎ চীৎপাত		...		৪৪৮
পল্লী-কুসুম	শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস	...		৪৫১
পশুর ভাব ও ভাষা	শ্রীসুবিনয় রায়	...		৪৫২
সিদ্ধার্থ	শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, কবিভূষণ	...		৪৫৬
টাকার শোক	কুমারী হেমলতা লাহিড়ী	...		৪৫৮
অভাগা	শ্রীঅরুণকুমার দত্ত	...		৪৬০
গল্প-স্বল্প	...	...	...	৪৬১
ধাঁধার উত্তর	...	...	...	৪৬৩
নূতন ধাঁধা	...	...	...	৪৬৪

বাঁধানো "সন্দেশ"

পূর্ব্বের কোন কোন বৎসরের বাঁধানো সন্দেশ এখনো আছে—
১৩২৭, ১৩২৮, ১৩২৯ ও ১৩৩০ সাল —প্রতিখণ্ড, ১৷৷০
নব পর্য্যায়, ১ম বর্ষের (১৩৩৮-১৩৩৯) বাঁধানো সন্দেশ—৫৮০ পৃষ্ঠার প্রকাণ্ড বই—
১৭ খানি রঙিণ ছবি, এবং ৩০০ খানির বেশী ১-রঙা ছবি—দাম ২৲ টাকা
সন্দেশ কার্য্যালয়—১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

PAGES CONTAINS
DIFFERENT COLORS.

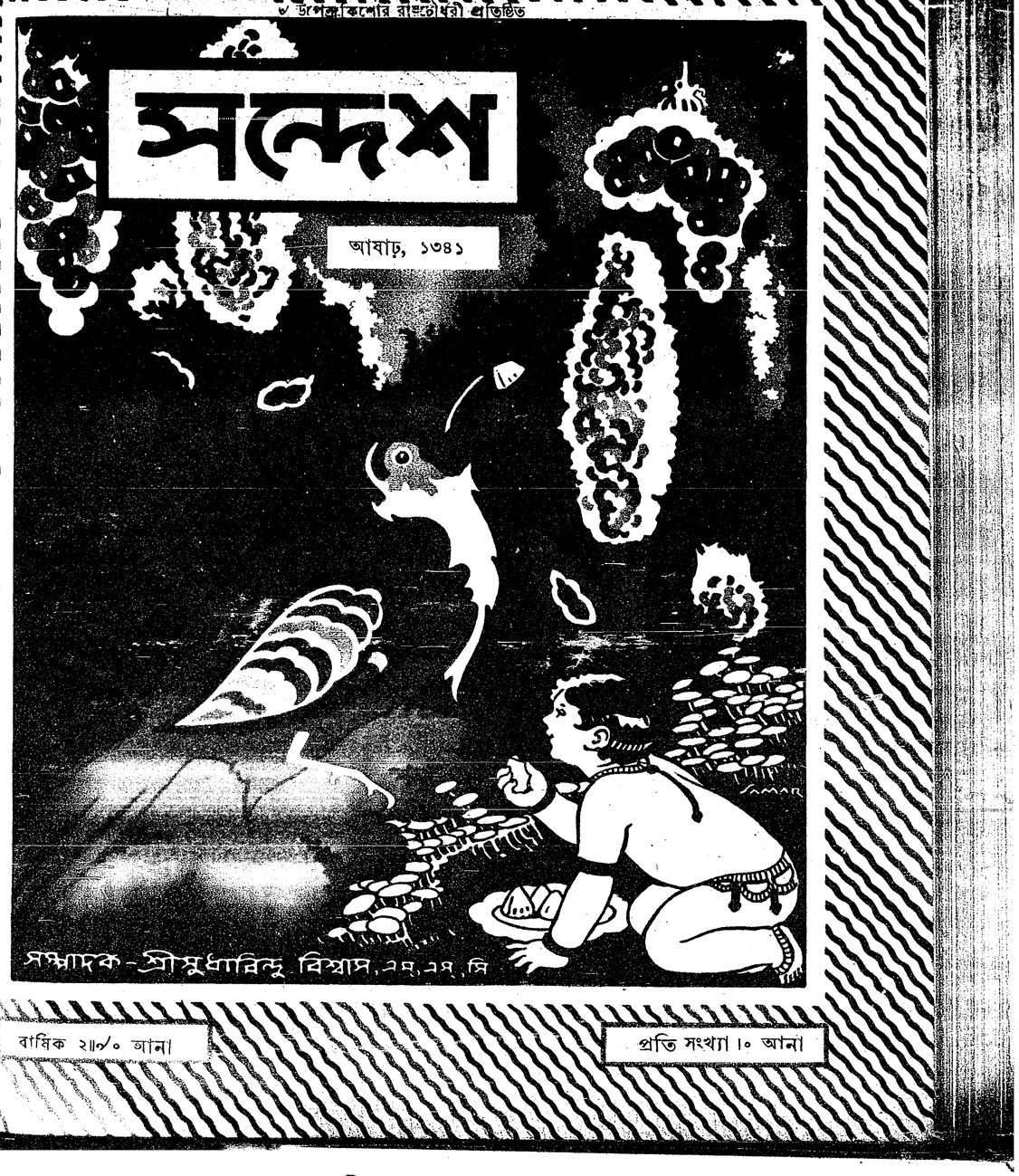

৺ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

নব পর্য্যায়
৩য় বর্ষ

আষাঢ়, ১৩৪১

১০ম সংখ্যা

আষাঢ়ে ছড়া

(শ্রীসুবিনয়কৃষ্ণ বসু)

আষাঢ় মেঘে আষাঢ় এলো,
ঐ যে ঘন ঘটা,
আকাশ জুড়ে আসছে উড়ে
কালো মেঘের ছটা ;

কে এলো আজ ভোরের বেলায়
মেঘের ভেলায় ভেসে ?
ঝমঝমিয়ে নামল বাদল,
আষাঢ় এলো দেশে ।

DIFFECTIVE BINDING.

COLOURED DOCUMENT.



নব পর্য্যায়
৩য় বর্ষ

আষাঢ়, ১৩৪১

১০ম সংখ্যা

আষাঢ়ে ছড়া

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

আবার দেশে আষাঢ় এলো,
ঐ যে ঘন ঘটা,
আকাশ জুড়ে আস্‌ছে উড়ে
কালো মেঘের জটা ;

কে এলো আজ ভোরের বেলায়
মেঘের ভেলায় ভেসে ?
ঝম্‌ঝমিয়ে নাম্‌ল বাদল,
আষাঢ় এলো দেশে।

COLOURED DOCUMENT.

DIFFECTIVE BINDING.

আশার কথা শোনালো কে ?—
আষাঢ় এলো জানি,
ফুলের বনে, ঘাসের রাশে
তাইত কাণাকাণি।

ঝাপ্‌সা আলোয় বৃষ্টি ঝরে
আকাশ ছেপে ছেপে,
বাঁশের ঝাড়ে বাউল বাতাস
উঠ্‌ছে যেন ক্ষেপে ;

দূরের মাঠে বৃষ্টি ঝরে,
দৃষ্টি নাহি চলে,
জল ঝ'রে যায় বাদাম তলায়
কদম দীঘির জলে ;

বৃষ্টি ঝরে ঝম্‌ ঝমা ঝম্‌
কাঁঠাল চাঁপার গাছে,
ব্যাংএর আসর জম্‌লো রে আজ
শাপ্‌লা ঝোপের কাছে ;

কে চলে আজ দূরের গাঁয়ে—
নাই রে সেটা জানা,
জল্‌-ছপ্‌ছপ্‌ পিছল্‌ পথে
আজ্‌কে যেতে মানা ;

বাদলধারা ঝরছে অঝোর,
বাড়্‌লো ক্রমে বেলা,
দেখ্‌ছি বসে দূর আকাশে
রোদ-বাদলের খেলা।

ঝড় উঠেছে শালের বনে
সারা সকাল ধ'রে,
ঝুর্‌ ঝুর্‌ ঝুর্‌ বন-কদমের
পরাগ পড়ে ঝ'রে।

আষাঢ় এলো,—টের পেয়েছি
ভোরের বেলা উঠি',
আজ্‌কে বুঝি সূর্য্যি মামার
সকাল থেকেই ছুটি ?

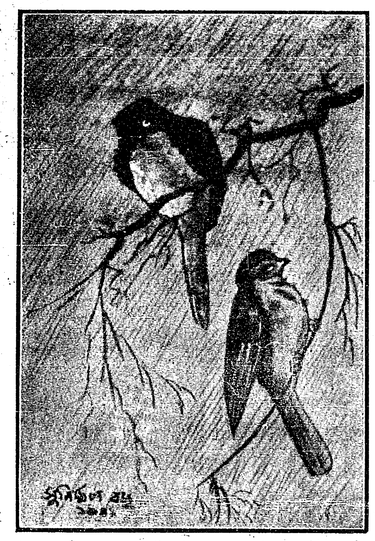

ঝির্‌ ঝির্‌ ঝির্‌ ইল্‌সেগুঁড়ি
ঝরছে থেকে থেকে,
সূর্য্যি মামা ঘুমায় তোফা
মেঘের চাদর ঢেকে।

নাম-না-জানা কোন্‌ সে পাখী
ভিজ্‌ছে বাদল জলে,
গাছের শাখায় ঐ যে তাকায়
ছাতিম গাছের তলে।

ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক্‌ শোনা যায়
ঝাউয়ের ঝোপে ঝোপে,
'বকম্‌ বকম্‌' পায়রাগুলি
ডাক্‌ছে বসে খোপে।

আষাঢ় এলো—আষাঢ় এলো
সারা ভুবন ছেয়ে,
কাজল মেঘের আঁচল নেড়ে
নাচ্‌ছে বাদল মেয়ে।

ভবিষ্যৎ

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম্-এ)

মায়ের আঁচল ধরিয়া টানিতে টানিতে অনু বলিল, "মা, একটু আমসত্ত্ব দাও না, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মা বলিলেন, "তেষ্টা পেয়েছে তো আমসত্ত্ব খাবি কেন? ভাঁড়ার ঘরে ডাব কাটা আছে, নিয়ে খা।"

অনুযোগের সুরে অনু বলিল, "না মা, ডাব খেলে আবার একটু পরেই তেষ্টা পাবে। এই দেখনা তোমাকে থুতু ফেলে দেখাচ্ছি।" বাহিরে গিয়া টানিয়া টানিয়া থুতু ফেলিয়া বলিল, "দেখেছ? আমসত্ত্ব খেলেই কিন্তু সব সেরে যাবে।" একটু পরে মায়ের কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, "ওদের বীরেনটা মা এতোখানি আমসত্ত্ব একলা খাচ্ছে। ওতে অসুখ করে, না মা?"

ছেলের তেষ্টা পাওয়ার কারণ জানিয়া মনে মনে হাসিয়া মা বলিলেন, "আচ্ছা, রেণুকে ডেকে দে, দেখ্‌ছি। তোদের যে কি সব উদ্ভট ইচ্ছে বাপু জানি না। এই গরমের সময় কোথায় ডাবের জল, ঘোল এই সব খাবে, তা' না আমসত্ত্ব!"

রেণু আসিলে বলিলেন, "ভাঁড়ার ঘর থেকে একটু আমসত্ত্ব এনে অনুকে দাও। আর, তুমিও একটু নিও, নইলে খানিক পরেই তো খাই খাই কর্‌বে।"

ছোট ভাইয়ের সাম্‌নে তাহার লোভের কথা প্রকাশ করায় রেণুর আত্ম-সম্মানে ঘা লাগিল। সে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "ওসব খাবার আমার সময় নেই। আজ আমার মেয়ে-জামাই আন্‌তে হবে। কতদিন তাদের দেখিনি!

অনাদি ডাক্তারের মেয়ে কমলার আলুর পুতুলের সহিত তাহার কাচের পুতুলের বিবাহ হইয়াছিল।

ভাইটিকে ডাকিয়া লইয়া রেণু চলিয়া গেল। পিছন হইতে মা ডাকিয়া বলিলেন, "আজ আবার দুপুরবেলা যেন সে রকম চেঁচামেচি ক'রো না। আমার শরীর খারাপ, একটু ঘুমুব।"

ঘণ্টা দুই পরে রেণু ছুটিয়া আসিয়া চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া চাপা গলায় বলিল, "মা, দেখ্‌বে এসো খোকা কি কর্‌ছে।" ভোর হইতে পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া

মা সবে একটু ঘুমাইয়াছিলেন, তাছাড়া তাঁর শরীরও সেদিন ভাল ছিলনা। বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোরা কি একটু ঘুমুতে দিবি না? যা, খেলা কর্‌গে যা।"

রেণু বলিল, "খোকা যে বাবার টেবিলে বসে কি সব করছে।" মা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন, "কি করছে?"

রেণু বলিল, "জানিনে বাবা কি করছে। খাতা খুলে বাবার মত গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাব্‌ছে। তুমি দেখ্‌বে চলনা।"

তাড়াতাড়ি পড়িবার ঘরে গিয়া মা দেখেন, অনু তাহার বাবার চশমাখানি নাকে লাগাইয়া চেয়ারে বসিয়া চাম্‌ড়াবাঁধান খাতাখানির উপর একখানি সাদা কাগজ রাখিয়া কি লিখিতেছে। হাতে তাহার বাবার হল্‌দে ফাউণ্টেন পেনটী। টেবিল পর্য্যন্ত হাত যায় না বলিয়া হাঁটুর উপর রাখিয়াই লিখিতেছে। সাম্‌নে একখানি শিশুশিক্ষা ও একখানি মোটা ডিক্‌স্‌নারী খোলা রহিয়াছে

রেণু বলিয়া উঠিল, "টেবিল থেকে নেবে আবার চেয়ারে বসা হ'য়েছে। বাবা আসুক না, মজা দেখাচ্ছি।"

দৃশ্য দেখিয়া মায়ের মাথার ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। স্বামীর কত সাধের কত প্রিয় এই জিনিষগুলি! প্রত্যেক দিন আদালত হইতে ফিরিয়া ওই উঁচু চেয়ারটীতে বসিয়া অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যও তাঁহার এই খাতাগুলির সহিত আলাপ করা চাই। আর ঐ চাম্‌ড়াবাঁধান সুদৃশ্য খাতাখানি! কতদিন তিনি ইহা আনন্দময়ীকে দেখাইয়া বলিয়াছেন—এর ভিতরে তাঁর জীবনের অনেক দিনের পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা আছে। হতভাগা ছেলেটা কি না তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেই গুলিকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছে।

শক্ত করিয়া অনুর একটী কাণ ধরিয়া তিনি বলিলেন, "হতচ্ছাড়া ছেলে! এই জন্যে তোমাকে আমসত্ত্ব খেতে দিলাম? বারণ করেছি না এই টেবিলের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করতে? আর করবি কখনো?"—বলিয়া পিঠে ঘা কতক চড় বসাইয়া দিলেন। রেণুকে বলিলেন, "কাল থেকে দুপুর বেলা দু'জনেই আমার কাছে শোবে। কথা যদি না শোন তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।"

এই মারের কথা অনু ভুলিতে পারিল না। দুর্জ্জয় অভিমানে তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ব্বেও অনেকবার সে কাণমলা এবং চড় খাইয়াছে, কিন্তু এত গভীর দুঃখ কোন দিন অনুভব করে নাই। সে ভাবিয়া

পাইল না কি দোষ সে করিয়াছে। সত্য বটে, মা বারণ করিয়াছিলেন ওদিকে যাইতে, কিন্তু তিনি কি করিয়া জানিবেন তাহার এই ছোট্ট কচি বুকের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা ওই টেবিলটিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। বাবাই তো কতদিন আদর করিতে করিতে বলিয়াছেন—বড় হইয়া সে এই চেয়ারখানিতে বসিয়া ওই টেবিলের উপর তাঁহার মত লেখা পড়া করিবে। আর ঐ খাতাখানি! সেও কি ওটাকে কম ভালবাসে! পাছে কোন দাগ লাগে তাই অন্য কাগজে লিখিয়াছে—ওটাকে খোলেও নাই। অনুর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিকালে রাগ করিয়া সে কিছুই খাইল না। আনন্দময়ীর মনে মাঝে মাঝে দুঃখ হইতে লাগিল—অতটা তিরস্কার না করিলেই হইত।

সন্ধ্যার সময় অনু-রেণুর পিতা সমরবাবু আদালত হইতে ফিরিয়া আসিলেন। টেবিলের নিকট আসিয়া জিনিষপত্র ছড়ানো দেখিয়া তাঁহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। এত করিয়া বলেন টেবিলটিকে পরিষ্কার রাখিতে, তবুও এই অবস্থা! বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরকম কর্‌লে কে?"

মা কিছু বলিবার আগেই রেণু বলিয়া উঠিল, "ঐ খোকা করেছে বাবা। দুপুর বেলা চেয়ারে বসে তোমার খাতা নিয়ে কি সব আঁকিবুকি কাট্‌ছিল। তাই মা মেরেছে। সেই থেকে রাগ করে বাবু ছাতে ব'সে ব'সে কাঁদছিলেন। এখন ওঘরে অন্ধকারে বসে আছে। মা ওকে মেরেছে বাবা, তুমি আর কিছু বোলো না।"

কিন্তু কে তার কথা শোনে? অত্যন্ত প্রিয় খাতাখানিতে আঁক কাটিয়াছে শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধস্বরে অনুকে ডাকিলেন।

অনু ভাবিয়াছিল, বাবা আসিলে তাহার সাম্‌নে সে তাহার সমস্ত দুঃখ অভিমান নিবেদন করিয়া দিবে। তাহার গোপন দুঃখ আর কেহ না বুঝুক তিনি নিশ্চয়ই বুঝিবেন, আদর করিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিবেন। তাই যখনই মা'র উপর দিদির উপর রাগ করিয়া মনে মনে গঙ্গায় ডুবিয়া যাইবার বা ছাত হইতে লাফাইয়া পড়িবার কল্পনা করিয়াছে তখনই তাহার বাবার হাসি হাসি মুখখানি মনে পড়িয়া সেই চিন্তায় বাধা দিয়াছে। পাখীর মত তাহার যদি উড়িবার দু'টী ডানা থাকিত, তাহা হইলে কখনই সে মা কিম্বা দিদির কাছে যাইত না—আমসত্ব দিলেও না; কেবল ইচ্ছামত বাবার কোলের কাছে উড়িয়া আসিয়া বসিত।

তাই পিতার ক্রুদ্ধ ডাকে তাহার বুকের যেটুকু স্থান খালি ছিল তাহাও

অভিমানে ভরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলে পিতা কঠোর স্বরে বলিলেন, "তুই খাতায় আঁক কেটেছিস্?"

একবার মনে হইল বলে যে, সে খাতা খোলেও নাই, তাহার নামে মিথ্যা করিয়া লাগানো হইয়াছে। কিন্তু কোন কথা না বলিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সমর বাবু তাহার মাথাটা ধরিয়া জোরে নাড়া দিয়া বলিলেন, "আর কখনো করো না। যাও।"

সকলে চলিয়া গেলে তিনি খাতাখানি উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে লাগিলেন, কি ধরণের আঁক কাটিয়াছে, আর লেখা চলিবে কিনা। কিন্তু অনেকক্ষণ দেখিয়াও একটী আঁচড়ও দেখিতে পাইলেন না। ফাউণ্টেন পেনটী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন তাহা ঠিকই আছে, কোন ক্ষতি হয় নাই। চশমাখানিও ভাঙ্গে নাই। তবে কোথায় ক্ষতি হইল? ডিক্সনারীখানি তুলিয়া দেখিলেন, তাহার নীচে একখানি শাদা কাগজে কি সব লেখা রহিয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—উপর দিকটায় একটা ছোট ছেলের মুখ আঁকিবার ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে, বোধ হয় শিশুশিক্ষার কোন ছবি চিত্রিত করিবার চেষ্টা। নীচে বড় বড় কাঁচা অক্ষরে তিন চারিবার লেখা "বাবার মত হবো"। সমর বাবুর চোখ দু'টী স্পষ্টতার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শিশুর মনের এই গোপন আকাঙ্ক্ষাটীকে তিনিই নানাপ্রকার গল্প ও উৎসাহের দ্বারা বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাই এই ছোট বড় অপক্ক অক্ষরগুলি তাঁহার চোখের সাম্‌নে বিদ্যুতের লেখার মত ফুটিয়া উঠিল।

পরদিন সকালেই সমর বাবু বাহির হইয়া গেলেন। ঘণ্টাখানেক পরে কি একটা জিনিষ হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাকিলেন, "অনু কৈ, অনু!" সন্দেহাকুল মনে ধীরে ধীরে অনু আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, "আয়, এই টেবিলের কাছে আয়। এই খাতাখানা আর এই পেনটা তোকে দিলাম। এগুলো তোর।"—বলিয়া একখানি নূতন ঝক্‌ঝকে চাম্‌ড়া বাঁধানো খাতা ও একটী সবুজ রংএর পেন তাহাকে দিলেন।

অনু মহানন্দে সেগুলি লইয়া দেখিতে লাগিল। খাতাখানি খুলিতেই দেখিল, প্রথম পৃষ্ঠায় লাল কালিতে বড় বড় করিয়া লেখা—"বাবার চেয়েও বড় হতে হবে।"

আনন্দে শিশির ধোয়া গোলাপের মত টুক্‌টুকে মুখখানি তুলিয়া সে পিতার মুখের দিকে চাহিল।

পেলিকান

(শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি)

তোমাদের কাগজে (১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসের সন্দেশে) আমার একটা বিশ্রী ছবি এঁকে আমাকে তোমরা 'ধুচুনী-ঠোঁটি' বলে ঠাট্টা করেছিলে। কিন্তু আসলে আমার নাম পেলিকান। আমি সব ক'টা মহাদেশেই বাস করি। বাস আমার বড় বড় জলা ও হ্রদের ধারে। আমরা যেখানে থাকি, ঝাঁকে ঝাঁকে দল বেঁধে বাস করি। কিন্তু তোমাদের জ্বালায়, অর্থাৎ বড় বড় মানুষদের অত্যাচারে আমাদের বংশ অনেক জায়গায়ই এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তারা দলে দলে বন্দুক



ঠোঁটের নীচে মস্ত বড় থলি —হাঁ ক'রে সে থলি শুকোই

নিয়ে এসে গুলি করে আমাদের মেরে ফেলে। আবার বাড়ী ফিরে গিয়ে বড়াই করে বলে, এত মা র লা ম, অ ত মারলাম! তাদের

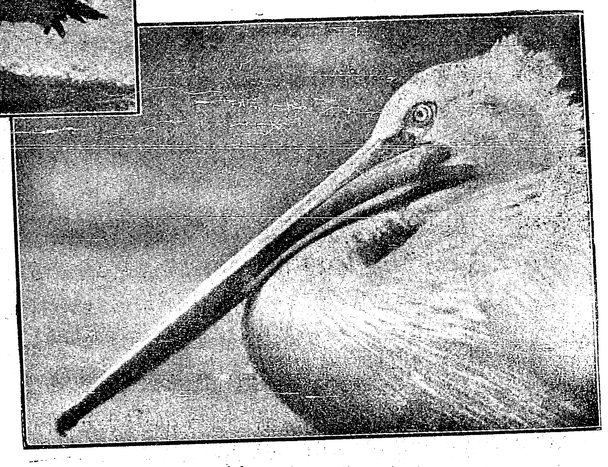

ঠোঁটটা দেখ্‌ছো তো!

লজ্জাও করে না! আমাদের কাছে বন্দুকও নেই, অন্য কোন হাতিয়ারও নেই, আর আমরা তোমাদের উপর কোন অত্যাচারও করি না। তবে তোমরা আমাদের মার কেন? আর দূর থেকে গুলি করে মেরে বাহাদুরীটাই বা কি? খালি হাতে সামনাসামনি এস তো দেখি। এমনই ঠুকরে দেব যে টের পাবে। ঠোঁটটা দেখ্‌ছো তো!

আমাদের শরীরটাও বড় কম নয়। আমরা যদি ডানা ছড়িয়ে বসি তো ১৩।১৪ ফুট পর্য্যন্ত জমি ঢেকে ফেলতে পারি। লম্বালম্বি ভাবে শুইয়ে দুটো বড় বড় মানুষকে আমরা আনায়াসে ডানা দিয়ে ঢেকে রাখতে পারি তা জানো?



ডানা মেলে ১৩।১৪ ফুট জায়গা ঢেকে ফেলতে পারি

আমরা কি খাই জানো? আমরা মাছ খাই। জলের উপর দিয়ে উড়ে বেড়াই, আর এই লম্বা ঠোঁট ও তার নীচের মস্ত থলিটা দিয়ে জালের মত করে মাছ ধরি। নীচের ঠোঁটটার তলায় বড় একটা কেমন থলি আছে দেখেছ তো?



পাশাপাশি বাসা করে থাকি



বাচ্চারা আমাদের পথ চেয়ে থাকে

আমাদের এই লম্বা ঠোঁট ও মস্ত থলি পেরিয়ে কারো পালাবার যো-টি নেই। মাছ ধরে ধরে এই থলিতে জমা করি। যখন ভরে যায় তখন ডাঙায় নিয়ে গিয়ে আরাম করে খাওয়া হয়। আমরা এক একজনে যা খেতে পারি ও খেয়ে থাকি তোমরা ৫।৬জনে মিলেও ততটা খেতে পার না।

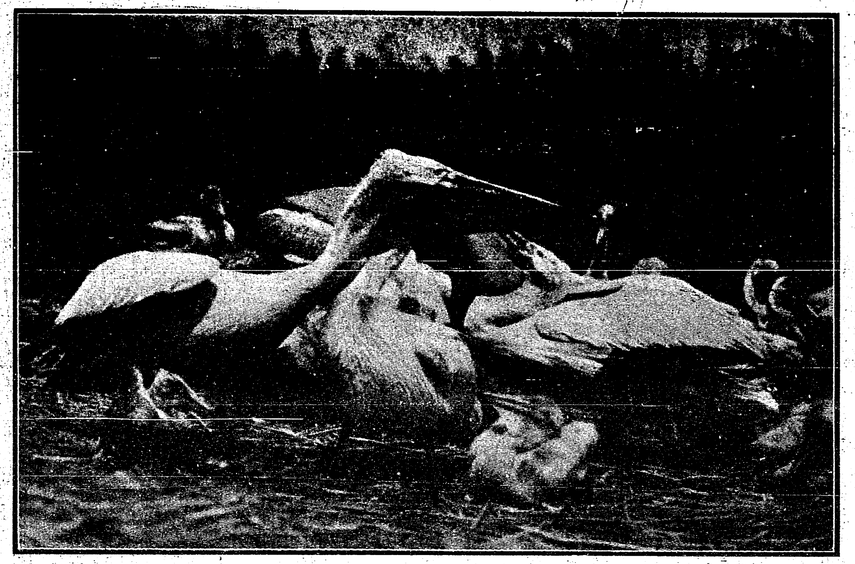

ঠোঁট উঁচিয়ে তাড়া করি

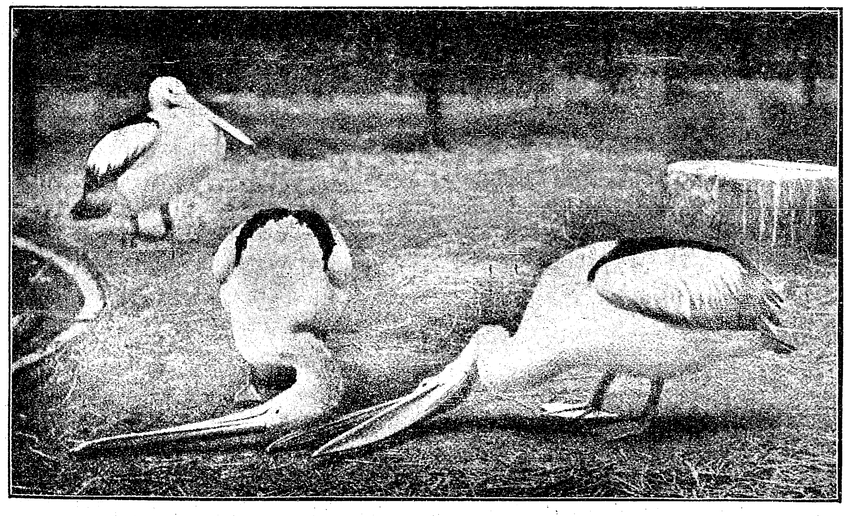

কেমন মজার মজার খেলা করি

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আমরা মুখ হাঁ করে, ঠোঁটের নীচের থলিটি গলার উপর ছড়িয়ে দিয়ে আরাম করে শুকোই।

আমরা জল থেকে একটু দূরেই বাসা তৈরী করি। শর ও খড় প্রভৃতি দিয়েই আমাদের বাসা তৈরী হয়। এক সঙ্গে মিলে অনেকগুলো বাসা পাশাপাশি থাকে। ডিম ফুটে তাতে যখন বাচ্চা হয় তখন তারা পাশা-পাশি বাসার অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মিলে খেলা করে। খিদে পেলে সবাই মিলে আমাদের পথ চেয়ে থাকে।



ঠোঁটের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে খাবার বের করে নেয়

আমরা ঠোঁটের নীচের থলি ভ'রে খাবার নিয়ে আসি, আর বাচ্চারা তাই খায়। কেমন করে খায় জানো? আমাদের ঠোঁটের মধ্যে তাদের মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে তারা খাবার বের করে নেয়।

বাচ্চারা ঘুমোলে আমরা জেগে পাহাড়া দেই। তখন যদি কেউ দিক্ করতে আসে তো আমাদের এই লম্বা ঠোঁট উঁচিয়ে তাড়া করি। সে ঠোঁটের সামনে দাঁড়াতে কেউ সাহস পায় না।

আমাদের পায়ের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে পর্দ্দা লাগান আছে, ঠিক হাঁসের পায়ের মত। তাই আমরা সাঁতার কাটতেও পারি। তোমরা শুনেছি অনেক রকম খেলা করে থাক। আমরাও যে কেমন মজার মজার খেলা করি তা তো তোমরা জান না!



(শ্রীসুকুমার দে সরকার)

বেলা প্রায় বারোটা, সকাল বেলাটা গড়িয়ে এসে দুপুরবেলার সঙ্গে মেশবার জোগাড় করছিল। রবিবারের আকাশে খটখটে অলস রোদ, বাতাসে ঘুমপাড়ানি ক্লান্তি। রায়েদের বাড়ীর দাওয়া থেকে যে তাল গাছটা দেখা যায়, তার পাতাগুলো ঝিলমিল করে একবার উঠছে আবার নুয়ে পড়ছে, যেন ঘুমের ঘোরে গাছটা ঢুলছিল।

রায়েদের বাড়ীর খাওয়া দাওয়া সব চুকে গেছে। পটলার বাবা শনিবার বাড়ী এসেছেন। সঙ্গে কিছু তপ্‌সে মাছ এনেছিলেন, তাই খাওয়াটা আজ জোর হয়েছে। পাতের পাশে মেনী বেড়ালটা এখনও মিউ মিউ করে ঘুরছে। বেচারীর ভাগে কাঁটা ছাড়া কিছু জোটেনি; কিন্তু বোকাটা তাই সাবাড় করেছে, আবার গোঁফ চাটার কি কায়দা! পটলার সে কথা মনে পড়ে ভারি হাসি এল।

সবাই একটু গড়িয়ে নিতে গেছে, খালি পিসীমা কানে এক সুতো বাঁধা চশমা এঁটে সুর করে পড়ছিলেন, আর মাঝে মাঝে ঢুলছিলেন।—

মুনি বলে অত্যাশ্চর্য্য শুন জন্মেজয়—
করে যে অদ্ভুত যুদ্ধ অর্জ্জুন-তনয়,
তিন কোটী রথীবৃন্দ পড়িল সমরে,
ছয় বৃন্দ মদমত্ত .....

এই অবধি প'ড়ে পিসীমার স্বর জড়িয়ে গেল, চিবুকটা এসে বুকে ঠেকল—ঠক! পটলা দেখল পিসীমা ঘুমিয়ে পড়েছে।

—"ও পিসীমা, তারপর কি হোল?"

—"এই যে, হ্যাঁ হ্যাঁ···

ছয় বৃন্দ মদমত্ত পড়ে করিবরে।
সপ্ত পদ্ম অশ্ব পড়ে রণে আসোয়ার
পদাতিক সৈন্য পড়ে সংখ্যা নাহি তার॥
শোণিতে সাঁতার ·····",—ঠক!

দূর ছাই! সবে জমে এসেছে, অভিমন্যু ভীষণ যুদ্ধ করছে, কর্ণ দ্রোণ সবে পালাচ্ছে, আর পিসীমাটা—হ্যাঁঃ, আবার নাক ডাকতে সুরু করেছে দেখনা! গোঁ গোঁ গো—যেন ভীমের গদা ঘুরছে। পটলা ভাবল, দেব নাকি একটা কিছু দিয়ে নাকের মধ্যে সুড়সুড়ি? না, কাজ নেই, বাবা বাড়ী রয়েছে! কিন্তু অমন পালাটা ··।—হ্যাঁ, বীর বটে অভিমন্যু!

পটলা আবার ডাকল,—"ও পিসীমা?"

—"উঁ"

—"তা'পর কি হোল?"

—"উঁ—অ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ···"

শুন যুধিষ্ঠির রাজা অপূর্ব্ব কথন—
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন,

"—ওকি পিসীমা?"

—"ওমা তাইত, পাতাটা কখন উল্টে গেছে রে! আবার বৌমাকে বলতে হবে খুঁজে রাখতে। তা শোন্ না পেল্লাদের কথা ···"

রাগে পটল কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। বাবা আজ না থাকলে···!

—"হুঁঃ পেল্লাদ! তোমার পেল্লাদ যুদ্ধু করতে পারে? যাও শুনব না। কক্‌খনো না।" রাগ করে পটলা ছুটে বেরিয়ে গেল।

পিসীমা একবার ডাকলেন, "পটল, অ···পটলা—!" ঠক্—পিসীমার আবার নাক ডাকতে সুরু হোল—গোঁ গোঁ ·· ।

কৈবর্ত্তদের দামু লোকটাকে সবাই বোকা বলে; কিন্তু তা' হলে কি হয়, পেটে পেটে তার সয়তানী বুদ্ধি গজ গজ করছে। লোকটাকে বল দিকিনি যে, "দামু ষষ্ঠীতলায় পুজোটা দিয়ে আসবি বাবা?" হতভাগা এমন বোকার মত তাকাবে যে ষষ্ঠীতলাটা লণ্ডনে কি প্যারিসে সে খুঁজে বার করবার জন্যে যেন প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু এদিকে লোকের বাগানের কলাটা, মূলোটা তার জ্বালায় আর থাকবার জো নেই।

সেদিন দুপুরে দামু চুপি চুপি চলেছে,—বোসেদের বাঁশঝাড় পেরিয়ে, পদ্ম-দীঘির ধার দিয়ে, শিবতলার পাশ দিয়ে—চলেছে চুপি চুপি ধার্ম্মিক বকের মত, ঠ্যাং বাড়িয়ে বাড়িয়ে। মুখটা রোদে পুড়ে ঘামে কালো হয়ে উঠেছে, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ী, কতকালের তেলচিটে কাপড় পরা—চলেছে দামু চুপি চুপি! এমন আস্তে আস্তে যে বাঁশতলার ফোক্‌লা শেয়ালটা কিছু টের পেলনা, তেঁতুল গাছের ওপরে কাগটাও একবার ডাকল না, পদ্মদীঘির ধারে ঢোঁড়া সাপ শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল সেও সর্ সর্ করে জলে নেমে পড়ল না। চলেছে দামু চুপি চুপি। আজ রায়েদের বাগান সাবাড় করতেই হবে। কাল রাতে পট্‌লার পিসীমা বেজায় তাড়া লাগিয়েছিল, ভাগ্যিস চিনতে পারেনি। কিন্তু আজ আর বাগানে কিছু থাকবে না—লাউ দুটোও নয়, আনারসটাও নয়, আমের বোলগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে, কচি বেগুন গাছগুলোর ঘাড় মটকে দিতে হবে। দামু ভাবল, চালাকি আমার সঙ্গে!—লোকটার মাংসহীন বুকের পাঁজরগুলো রাগে ফুলে উঠল।

এদিকে পটলা তো বেরিয়ে পড়ল। নাঃ, বাড়ীতে আর থাকা নয়! অমন পালাটা কি না পিসীমা···হুঁ, ঘুম পেয়েছে বললেই হ'লো? পটলা সিন্দুরে আমগাছটার গুঁড়িতে বসে হাতের উপর মাথা রেখে হেলান দিয়ে পড়ল। আজ সে বাড়ী যাবে না; পিসীমা এসে খেতে ডাকলেও না—এমনকি বাগানের আনারসটা কেটে খেতে ডাকলেও···। তাইত, সে হলে কি করা যাবে? পাটলা দাঁত কড়মড় করে ভাবল,—না, তাহ'লেও না। ছেলেমানুষ পেয়েছে আমাকে? অমন অভিমন্যুর পালাটা শেষ না করেই···না, আজ আর বাড়ী নয়! হাতের কাছে একটা কঞ্চি পড়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে ঘাসের উপর মারতে মারতে পটলা বলল, আপন মনে,—কেমন যুদ্ধ হচ্ছিল···! না, পিসীমাটার খালি ঘুম!

ওঃ, অভিমন্যু কি যুদ্ধটাই না করছিল! এই হাজারটা সৈন্যের মুণ্ডু কেটে

ফেলল, এই অগ্নিবাণ ছেড়ে সব আগুন জ্বালিয়ে দিল, এই আবার একশোটা লোক এসেছে। হঠাৎ পাটলা লাফিয়ে উঠে কঞ্চিটা ঘুরতে সুরু করে দিল—বোঁ বোঁ বোঁ!

এই একশোটা লোকের মুণ্ডু কাটা গেল,—পটলার কঞ্চিটা একদল বুনো গাছের ওপর সপাং করে গিয়ে পড়ল, গাছগুলো মাথা-কাটা হয়ে লুটিয়ে গেল। আবার পটলার কঞ্চি ঘুরছে। সে সামনে দেখ্‌ছে একাদশ অক্ষৌহিনী কৌরব সৈন্য! ঐ মাথা উঁচু ভেরেণ্ডার চারাটা কর্ণ, দড়ীর মত শক্ত অশথের চারাটা দ্রোণ। শন্ শন্ করে বাণ আসছে। পটলা কঞ্চি ঘোরাচ্ছে বোঁ বোঁ, আর লাফাচ্ছে তড়াং তড়াং, আর মুখে শব্দ করছে—হিস্-ঘ্যাঁচ ঘ্যাচাং-হিস্!

বোসেদের গরুটা জামতলায় দাঁড়িয়ে জাবর কাটছিল। সে হঠাৎ দেখল, একটা মানুষের ছ্যানা লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। ভারী মজা ত! গরুটার কি মনে হোল, সেও হঠাৎ ল্যাজ তুলে চার ঠ্যাং ছুড়ে শিং নেড়ে লাফাতে সুরু করে দিল। পটলার ভ্রুক্ষেপও নেই, সে তখন যুদ্ধ করতে ব্যস্ত।

ধান-কাটা ক্ষেতের আলের ওপর একটা বেতো ঘোড়া শুকনো শুকনো হলদে ঘাস ছিঁড়ে চিবোচ্ছিল। সে হঠাৎ দেখল, একটা মানুষের ছ্যানা আর একটা গরু নাচ্‌ছে। সে চিঁ-হি-হি-হি করে বলে উঠল, বাহাবা বাহাবা! তারপর একটা বেতো ঠ্যাং মাটিতে ঠুকে তাল দিতে লাগল আর লেজ নেড়ে মাছি তাড়াতে লাগল।

তেঁতুল গাছের ওপর কাগটা ডেকে উঠল, কা-আ-কঃ! বাঁশ ঝোপ থেকে ফোকলা শেয়ালটা বেরিয়ে এসে সব দেখে শুনে আমীরি চালে বলল,—হুয়া হুয়া হুয়া! পদ্মদীঘির সাপটার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় সে রেগে গিয়ে সরসর করে জলে নেমে গেল।

দামু তখন সবে রায়েদের আনারসটা কেটে কোঁচড়ে পুরেছে, হঠাৎ সে নানা রকম শব্দে চমকে উঠল। সামনে ধূ ধূ করছে রোদ, আর তারি মাঝে সে দেখল,—রায়েদের পটলা কঞ্চি হাতে লাফাচ্ছে, বেতো ঘোড়াটা লেজ নেড়ে পা ঠুকে ঠুকে নাচছে, আর ভুঁড়ী ফুলিয়ে বসে এক শেয়াল বাহবা দিচ্ছে,—হুয়া হুয়া হুয়া! ও বাবা, সব ভূতে পেল নাকি? ও পাশের ঝোপে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল, টিক্ টিক্ টিক্! বোকা দামু আর দাঁড়াল না, বেড়াটা ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

ভাবল, আজ তো প্রাণে বাঁচি! কিন্তু পাকা আনারসটা হতভাগা কোঁচড়ে সামলে নিতে ভুলে নাই।

হঠাৎ দামু পেছনে আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো। পেছন ফিরতেই দেখল, একটা গোভূত লেজ তুলে, শিং নেড়ে, চার ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে তেড়ে আস্‌ছে! ওদিকে চেয়ে দেখে, পটলারও নজর পড়েছে তার দিকেই; বোঁ বোঁ ক'রে কঞ্চি ঘোরাতে ঘোরাতে সে এগিয়ে আস্‌ছে। দামুর তখন আত্মারাম খাঁচা ছাড়া! —দৌড়, দৌড়, দৌড়! কাপড় গেল ছিঁড়ে, কোঁচর থেকে আনারস পড়ল গড়িয়ে; কিন্তু সেখানে কি আর সে দাঁড়ায়; দৌড় দৌড়!

আনারসটা কুড়িয়ে নিয়ে পটলার মনে হ'ল যেন বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে। ঘণ্টা দুই আগেই খেয়েছে তাতে কি? অত লড়াই করে অভিমন্যুর কি আর ক্ষিদে পায় নি? পেয়েছিল কি না ততদূর অবশ্য গল্পটা তার শোনা হয় নি। কিন্তু পেয়েছিল নিশ্চয়, পটলা কি আর জানে না? সাবধানে আনারসটা বগলে পুরে পটলা বাড়ী ফিরে চলল।

নাতির যুক্তি

(শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য)

দাদু তোমায় দেখ্‌ছি আমি ছোট্ট বেলা থেকে,—
তোমার মাথার চুলগুলি সব কবে গেছে পেকে!
ডেকে মোরে বল তুমি,—"পাকা চুল তোল্ বুলি";
চুল ত তোমার সবই পাকা, কোনটীকে বা তুলি?
সব পাকাচুল তুল্‌তে হ'লে যুক্তি বলি ভালো,
নাপিতটাকে ডেকে এনে নেড়া ক'রে ফেলো।

বাত ধরেছে তোমার পায়ে, যন্ত্রণা পাও তা'তে,
একটী যুক্তি বল্‌ছি তোমায় কষ্ট না পাও যা'তে।—
রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি অনেক লোকে,
কাঠের পায়ে তর তরিয়ে চল্‌ছে কেমন সুখে ;
তুমিও তোমার পা দু'খানি কাটিয়ে ফেল গিয়ে,
চল্‌তে তখন পারবে তুমি আমায় কোলে নিয়ে।

একটী দাঁতও নাইক তোমার সব গিয়াছে পড়ি',
চিবিয়ে খেতে পারো নাক' কড়াইভাজা মুড়ি।
আমার যদি দাঁত প'ড়ে যায়, আবার তাহা ওঠে,
তোমার কিন্তু একটীও দাঁত উঠ্‌ল না'ক মোটে !
তুমি যদি আমার মত লক্ষ্মী হ'য়ে থাক,
দাঁত গজাবে, খেতে তখন কষ্ট পাবে না'ক।

বুকে পিঠে নাকে কানে গজিয়েছে সব চুল,
বুনো মানুষ ব'লে তোমায় কর্‌বে সবাই ভুল।
দিন থাকিতে যদি তুমি নাহি ফেল কেটে,
বন্‌মানুষের বুদ্ধি তোমার জমা হবে পেটে।
তোমায় দেখে এক একদিন ভয় হয় মোর মনে,
আমায় নিয়ে ঢুক্‌বে কবে অজিগজি বনে !



নিশুর ব্যথা

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

ইয়া মোটা এক কাব্‌লি বেড়াল, পিসে মশাই আঙ্গোরা না কোথায় ওই দিকে চাকরি করতে গিয়ে এনেছেন। ওকে দেখে প্রার্থী জুটল অনেক। পিসেমশাই বল্লেন, নিশু বেড়াল ভালবাসে, ও নিক্। টুনু, হাবু, বিলু, সবারই মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগ্‌ল। ভেল্‌ভেটের মত কালো চক্‌চকে প্রাণীটাকে একটা দুর্লভ জিনিষ বলেই সকলের মনে হ'ল। নিশু ওর গলায় মোটা একটা বগলস বেঁধে ওদের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে গেল, পেছনে তার ভীড় বাধালো টুনু বিলু এরা সব।

সারাটা দিন নিশু সেদিন ঘর থেকে বেরোলো না। ভারি ভালো লেগেছে ওর বেড়ালটাকে, জান্‌লার গরাদের সঙ্গে তার বগ্‌লসটা বেঁধে একখানা মাদুর বিছিয়ে নিশু বস্‌ল ওকে নিয়ে জান্‌লার কাছে! মাথার ওপর একটা হাত রেখে বল্লে, "তোর কি নাম রাখা যায় বল্ দেখি ?" নাম একটা না হলে ত চলে না—মেনি, টেবি, বাঁটুল তাদের পাড়ার বেড়ালদের এমনি সব নাম। ওসব নাম কিন্তু নিশুর পছন্দ হ'ল না! দিদি পান সাজছিল বারান্দায় বসে, তার কাছে গিয়ে নিশু বল্ল, "আচ্ছা বলো ত দিদি, বেড়ালটার কি নাম রাখা যায়।" দিদির বুদ্ধির ওপর নিশুর ভারি বিশ্বাস ছিল। জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাট্‌তে কাট্‌তে দিদি একটু ভাব্‌নার ভাণ করে রইল ; তারপরে মুখ তুলে বল্ল, "নামের জন্য ভাব্‌না কিরে! সুপুরির ইংরিজি ত বিট্‌ল, এর নাম রাখ্‌গে যা বিট্‌লে! যে চেহারা ওর, এই নামেই মানাবে!" বলেই দিদি হি হি করে হেসে উঠ্‌ল। নিশুর কিন্তু ভারি রাগ হল দিদির কথা শুনে। দিদি তাকে ঠাট্টা করছে! এইটে কি ভাল হ'ল ? আগেও অনেক বিষয়ে সে দিদির কাছে পরামর্শ নিয়েছে, কখনো ত দিদি তাকে এমন করে ঠাট্টা করেনি। তবে আজ,—নিশুর মনটা খারাপ হয়ে গেল, মুখ ভার করে সে ঘরের ভিতর ঢুকল।

সেখানে দেখে নিশু এক অদ্ভুত ব্যাপার! নাম কিছু ঠিক করতে না পারলেও সে মনে মনে ওটাকে কাব্‌লি বলেই ডাক্‌তে লাগ্‌ল। নিশু দেখ্‌ল, জান্‌লার কাছে

গিয়ে কাব্‌লিটা একবার উঁকি দিয়ে কি দেখ্‌ছে আর পিছিয়ে পিছিয়ে আস্‌ছে; একটু পরেই আবার ছুটে যাচ্ছে জানলার দিকে। ওদিকেও কি একটা ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ আওয়াজ হচ্ছে। ছুটে এসে নিশু দেখ্‌ল, জান্‌লার ঠিক ওপরে উঠে একটা বেজি কাব্‌লির দিকে চেয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। কাব্‌লিও একটু পিছিয়ে গিয়ে থেকে থেকে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে। নিশু চিন্‌ল বেজিটা কালুর। তাদের বাড়ীর চার পাঁচখানা বাড়ীর পরে কালুদের বাড়ী। বেজিটা নিশ্চয়ই দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে। হ্যাঁ—ওই যে ওর গলায় টুক্‌রো কাপড়ের ফালি ঝুলছে!

বেজিটার দিকে চেয়ে নিশুর মনটা যেন জ্বলে উঠ্‌ল! ওঃ, ওরই জন্যে কালুর কি অহঙ্কার! বলে এমন বেজি দেখেছিস্, একেবারে আফ্রিকার কোন এক সাহেবের কাছ থেকে ওর দাদা নাকি পঞ্চাশ টাকায় কিনেছেন। তিনি জাহাজের ডাক্তার। ওকে নিয়ে কালুর কি জাঁক! পাড়ায় সকলকে দেখিয়ে বেড়ায় আর বলে, নাটালের সোনার খনিতে এটা থাক্‌ত! নিশু বল্‌ত—ইস্, জানিস্ কোথায় নাটাল? তখুনি দাঁতে ঠোঁট কামড়ে এ্যাট্‌লাস খুলে বসে পড়ে। হটবার পাত্র ও নয়!

বেজিটাও যায় না, বেড়ালটাও নড়ে না। নিশু পড়ল ভারি মুস্কিলে। জানালা থেকে দড়ি খুলে সে বেড়ালটাকে টান্‌তে টান্‌তে ঘরের বাইরে আন্‌তে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। ও কি আস্‌তে চায়? টানাটানি করতে করতে হঠাৎ ফস্ করে নিশুর হাতের দড়ি ছিঁড়ে গেল। তারপর বেধে গেল কুরু-পাণ্ডবের লড়াই! ততক্ষণে হাবু, বিলু প্রভৃতি সবাই এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের দরজায়। নীচে থেকেও কেউ কেউ ওপর দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে। নিশু যত চেঁচাচ্ছে 'ওরে ও ভোলা, ও দিদি, বেজিটাকে ধরনা, এযে খেয়ে ফেল্লে কাব্‌লিকে একেবারে'—ততই সবাই যেন মজা দেখছে আর হাস্‌ছে! সদর দরজার কাছেই গলির মোড়ে একটা পুলিশ কনষ্টেবল দাঁড়িয়ে ছিল, নিশুর উপস্থিত বুদ্ধি জোগালো। সে দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে যখন ঘরে এনে তুল্‌ল, তখন বেজি দিয়েছে চম্পট আর কাব্‌লিও থাবা পেতে মাটিতে বসে ধুঁকছে! ব্যাপার শুনে পাহাড়ওয়ালাটা হেসে চলে গেল। নিশু বল্ল, "আমি ওর নামে কেস্ আনবো; আমার কাব্‌লিকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে।" নিশুর বাবা ওকালতি করেন। তাঁর মুখে মোকর্দ্দমার কথা শুনে শুনে ওর বিশ্বাস হয়েছে, কারোর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করলেই সে একেবারে ঠাণ্ডা! তার

বাবা ত তাই বলেন। কিন্তু বেজিকে আদালতে হাজির করবে কে?

নিশুর বাবা আদালতে যাবার জন্যে গাড়ীতে উঠে দেখ্‌লেন, নিশু গাড়ীর এক কোণে চুপটি করে বসে আছে। মুখখানি তার শুক্‌নো। বল্লেন, "তুই এখানে কেন রে?" নিশুর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল। সে বল্ল, "বাবা, কালুর বেজি আমার কব্‌লির গা কামড়ে দিয়েছে। আমি ওর নামে নালিশ করব তোমার সঙ্গে কোর্টে গিয়ে। বাবার মুখ খানা গম্ভীর হয়ে গেল, তারপর তিনি হেসে ফেল্লেন। নিশুর মাথায় হাত রেখে বল্লেন, "আচ্ছা সে যা হয় আমি ঠিক করে দেব। তুমি এখন ঘরে যাও।"

বেজিটা সত্যিই কাব্‌লির পা কামড়ে ঘা করে দিয়েছিল, কিন্তু কাব্‌লি যে বেজির কি করেছিল তা সে জান্‌তে পারল না। ন্যাকড়ার ফালিতে রেড়ির তেল নিয়ে নিশু কাব্‌লির পরিচর্য্যায় রত হ'ল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দিদি দেখে মুখে কাপড় দিয়ে হাসছিল, নিশু তা দেখ্‌তে পায়নি। দেখ্‌লে সহজে রেহাই দিত না।

কালুর গায়ে জোর আছে বটে কিন্তু ও ভারি ভীতু। কারো সাম্‌নে গিয়ে জোর করে দুটো কথা বল্‌তে গেলে ওর যেন জিভ জড়িয়ে আসে। তাই সেদিন যখন তাদের পাড়ার ভোঁদা, সোনা ও রাখাল তাকে সঙ্গে নিয়ে নিশুর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে এল, তখন সে প্রথমে আস্‌তেই চায় না। কিন্তু কাব্‌লি যে বেজির মাথাটা এক রকম চিবিয়েই খেয়েছে! বাগানের লিচু গাছ তলায় হ'ল ওদের দেখা। উঁচু ডালে লাল লিচু পেকে টক টক করছে, নিশু সেইদিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল; কাব্‌লি তার পেছন পেছন হেঁটে যাচ্ছিল। নিশু কিছুই বুঝতে পারে নি, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চম্‌কে উঠে পিছন পানে তাকিয়ে দেখ্‌ল,—ভোঁদা একটা শুক্‌নো কঞ্চি নিয়ে কাব্‌লির মাথাটা লক্ষ্য করে দাঁড়িয়েছে, কালুর বেজিটা প্রাণপণে ভোঁদার পা কামড়ে ধরেছে। কালু, সোনা, এরা সব তখন চোঁ চোঁ দৌড়! ব্যাপার দেখে নিশু অবাক হয়ে গেল। ভোঁদা মাটির ওপর বসে বেজিটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পালালো। ওরা যে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে আর কাব্‌লিকে মারতে এসেছিল নিশু তা ভাব্‌তে পারল না; তার মনে হ'ল ওরা বুঝি তাদের বাগানের লিচু চুরি করতে এসেছিল! কিন্তু বেজিটা ভোঁদার পা কামড়ে ধরলে কেন? সে ত ওদেরি দলের!

সেদিন আর একটা ঘটনা দেখে নিশু অবাক হয়ে গেল। বিকেলবেলা স্কুল থেকে এসে দেখে, কাব্‌লি কার সঙ্গে খেলা করছে। কাছে এসে দেখে কালুর বেজি! অন্যদিন বেজিটা তাকে দেখেই পালাতো, আজ পালালো না। দু'জনে লাফালাফি করে কত খেলাই না খেল্‌ছিল! আজ দশদিনও হয়নি ওরা কামড়া কামড়ি করে ঝগড়া করেছে, আর এই ক'দিনের মধ্যেই এমন ভাব হ'ল ওদের কি ক'রে, নিশু তা বুঝতেই পারল না!

সেদিন থেকে বেজি আর কাব্‌লি সব সময়ে এক সঙ্গে থাকে। দু'জনের গলায় গলায় ভাব! কালু এসে মাঝে মাঝে বেজিটাকে বেঁধে নিয়ে যায়, দুদণ্ড যেতে না যেতেই ও বাঁধন কেটে পালিয়ে আসে। রাত হ'লেও আর বেজিটা ঘরে যায় না! নিশুর ঘরেরই এক পাশে কাব্‌লির কাছাকাছি এক টুক্‌রো চটের ওপর মেজেতে পড়ে থাকে। নিশুরও কেমন বেশ ওকে ভাল লাগে। ওর বোঁয়া ভরা লম্বা শরীর, ছুঁচোলো মুখের ডগায় একটু রঙিন আভা, ভারি সুন্দর! খুর খুর করে ছোট ছোট পা দিয়ে ও কেমন হাঁটে!

কালু বেজিটার আশা ছেড়েই দিয়েছে; বলে, ও নেমকহারাম যার সঙ্গে আমার মনের অমিল তার ঘরে গিয়েই কিনা বাসা বেঁধেছে! একদিন বেজিটাকে সে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিল। আগে যদিও বেজিটা ওর ঘরে দু'একবার যেতো সেদিন থেকে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিল। নিশুও ভুলে গেল যে বেজিটা তার নয়; কাব্‌লির সঙ্গে সঙ্গে বেজিটাও তার মন জুড়ে বস্‌ল। দেখে শুনে দিদি মুখ টিপে টিপে হাসে আর বলে, "কিরে নিশু, আর এখানে কেন, এবার জঙ্গলে যাবার যোগাড় করলেই ত হয়।" নিশু ক্ষেপে উঠে বলে, "কি! আমি জঙ্‌লি নাকি!"

মেজো মামার পৈতের নিমন্ত্রণে নিশু মামার বাড়ী গিয়েছে। প্রথমে সে কিছুতেই যেতে চায়নি। বলেছিল, যদি কাব্‌লি ও বেজিকে তার সঙ্গে যেতে দেওয়া হয় তবেই সে যাবে। সে কি সম্ভব হয়! শেষে রাশু চাকর ওদের দুজনের ভার নিলে তবে নিশু গেল মামার বাড়ী। সেখানে সে বেশী দিন থাক্‌তে পারল না, সব সময় তার মনে পড়ত বেজি আর কাব্‌লির কথা। যদিও এখন ওদের ভাব হয়েছে, কিন্তু যদি ক্ষণেকের ঝগড়ায় আবার ওদের পুরাণো শত্রুতা জেগে ওঠে, তারপর যদি আবার ওরা কামড়া-কামড়ি আরম্ভ করে। এই সব ভাবনায় নিশু বেশি দিন মামার বাড়ী থাক্‌তে পারল না!

গাড়ী থেকে নেমেই নিশু দেখ্‌ল, রাশু তাদের সদর দরজা থেকে পালাচ্ছে, আর পিসেমশাই বিদেশ থেকে ফিরেছেন। নিশু ছুটে গিয়ে পিসেমশায়ের একখানা হাত চেপে ধরল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্ল, "কবে আপনি এলেন পিসেমশাই? দেখেছেন আপনার দেওয়া সেই কাব্‌লি কেমন ওদের বেজিটার সঙ্গে ভাব করেছে! চলুন দেখ্‌বেন।" রাশু, ওরে রাশু,—বল্‌তে বল্‌তে নিশু পিসেমশায়ের হাত ধরে টান্‌তে লাগ্‌লো।

পিসেমশাই নড়লেন না। তাঁর চোখ দুটো একবার ছল্ ছল্ করে উঠ্‌ল, ঠোঁট্‌টা একবার কাঁপল। রোয়াকের ওপর বসে তিনি সস্নেহে নিশুকে তুলে কোলের ওপর বসালেন; বল্লেন, "জঙ্গলের প্রাণী কি ঘরে থাকতে চায় রে বোকা? এবার ফিরে এসেই শুনলাম যে তোর কাব্‌লি বেড়ালটা সেই বেজির সঙ্গে মিলে কোথায় পালিয়ে গেছে। কি করে যে কখন তারা এখান থেকে পালিয়ে গেল তা বুঝে উঠ্‌তে পারছিনা। তাদের বোধ হয় এখানে আর কিছুতেই মন টিঁকছিল না। যাক, তাদের জন্য ভেবে আর কি হবে? তারা থাকতে না চাইলে জোর করে কি রাখা চলে?" নিশু হাঁ করে পিসেমশায়ের মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে তাঁর কোল ছেড়ে দুড় দুড় করে দোতালায় উঠে গেল, সমস্ত বাড়ীটা পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে দেখল। কিন্তু কাব্‌লি বা বেজিকে সে কোথায় পাবে! আস্তে আস্তে নীচে নেমে এসে সে পিসেমশায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল!

নিশু যদি তখন একবার চোখ তুলে চাইত তা হ'লে দেখ্‌তে পেত, পেয়ারা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কালু হাস্‌ছে। কাব্‌লি আর বেজি সত্যি সত্যি কোথায় গেল, কে বল্‌তে পারে!

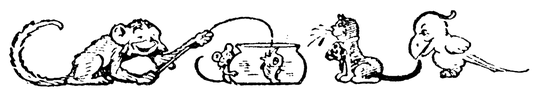

সব চেয়ে ছোট

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

দোকানে একটা টাকা ভাঙ্গালে সবচেয়ে ছোট মুদ্রা যা মিল্‌তে পারে তা হ'লো পাই পয়সা। আমাদের শরীরটাকেও যদি ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারা যেত, তা হ'লে সব চেয়ে ছোট জীবন্ত অংশ যা মিল্‌তো তার নাম হ'লো 'কোষ' বা 'সেল' (Cell)। এই কোষগুলি পর পর সাজিয়েই আমাদের এই শরীর। এই কোষের প্রত্যেকটিই জীবন্ত, এদের জীবনের উপরই আমাদের জীবন নির্ভর করে।

তোমরা হয়তো ভাব্‌ছো, প্রত্যেকটি কোষ যদি জীবন্ত হয় তবে কত সময়ে কত কোষ যে নষ্ট হ'য়ে যায়, কেটে যায়, তাতে কই আমরা মরি না তো। না, তা মরি না ; দু'চারটে কোষ নষ্ট হয়ে গেলেও শরীরে আরো অনেক জীবন্ত কোষ থাকে, তাতেই আমরা বেঁচে থাকি। তা ছাড়া, যে কোষটি মরে যায়, তার জায়গায় আবার নূতন কোষও জন্মায়।

চারিদিকের জন্তু জানোয়ার দেখে তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছো যে, আমাদের শরীরে রাশি রাশি কোষ সাজিয়ে এই হাত পা সব হয়েছে বলে না হয় আমরা খেয়ে চলে বেঁচে থাক্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু ঐ ক্ষুদে 'কোষটা' তাহ'লে বেঁচে আছে কি করে? হ্যাঁ, তারাও বেঁচে থাকে। শুধু কি তাই? এমন অনেক জন্তু দেখ্‌তে পাওয়া যায় তাদের সবশুদ্ধু পুঁজিই হ'লো মাত্র একটি কোষ, তাদের শরীরে একটি ছাড়া আর কোষ নেই। তা দিয়েই তাদের চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, সব কাজ চলে। আজ তোমাদের সেই এক কোষ-ওয়ালা কতগুলি প্রাণীর গল্প বল্‌বো। ইংরেজীতে এই প্রাণীর নাম প্রাটোজোয়া (Protozoa)।

এই এককোষ-ওয়ালা প্রাণীগুলি অনেক রকমের হয়, আর এদের জন্যই অনেক সময় মানুষের অসুখ বিসুখ সহ্য কর্‌তে হয়। কালাজ্বর, পালাজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির আসল কর্ত্তা হ'লেন এঁরাই। মশারা এঁদের জ্বালাতেই টিক্‌তে না পেরে মানুষের শরীরে দেয় ইন্‌জেকসন্।

সবার আগে নেওয়া যাক 'আমিবা'-কে (Amoeba)। 'আমিবা' ছোট্ট জীব। এম্‌নি চোখে দেখাই যায় না, অনুবীক্ষণে এর চেহারাটা দেখায় গোল গাল,

এক তাল জেলির মত। অবশ্য রং বিশেষ কিছু থাকেনা। সেই জেলির ভিতরে একটা গোল জায়গা, তা'তে জলের মত একটা জিনিষ থাকে। এই জায়গাটার নাম Contractile vacuole ; এই 'ভ্যাকুল'-টা ক্রমে বড় হ'তে হ'তে হঠাৎ কুঁচকে যায়, আর তার ভিতরের জিনিষ বাইরে বেরিয়ে যায়। প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে জন্তুটার শরীরের খানিকটা একদিকে একটু এগিয়ে গেল ; এটি যেন তার পা—এই ছোট্ট পা-টির নাম সুডোপোডিয়া (Pseudopodia)। আস্তে

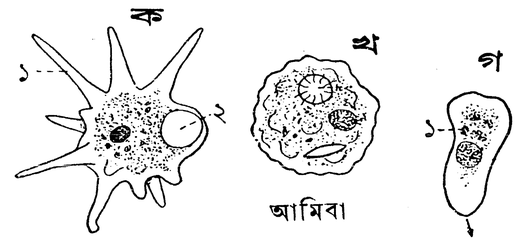

(ক)

(১) সুডোপোডিয়া।
(২) Contractile Vacuole—আমিবারা খাবার খেয়ে বাজে জিনিষ এর ভেতর ফেলে দেয়। এটা ক্রমে বড় হতে থাকে, পরে হঠাৎ একবার কুঁচকে গিয়ে ভেতরের জিনিষ বাইরে বের করে দেয়।

(খ)

আমিবা হাত পা গুটিয়ে চুপ করে আছে। ঘুমিয়ে নেই তো?

(গ)

এই আমিবাটি একটি লোকের পেট থেকে জোগার করা হয়েছে। লোকটির হয়েছিল পেটের অসুখ—ইনিই নাকি তার কারণ। ১নং অংশে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হলো মানুষের রক্তকণা—মানুষের রক্ত থেকে খেয়েছিলেন।

আস্তে ক্রমে সমস্ত শরীরটাই এই সুডোপোডিয়ায় এসে পড়ে, ফলে সমস্ত জন্তুটাই ততটুকু সেদিকে এগিয়ে যায়।

জন্তুটার খাওয়াও ভারী মজার। সামনে একটা খাবার জিনিষ পেলে আমরা যেমন দু'হাত বাড়াই, এও তেম্‌নি খাবারটার দুদিক দিয়ে দুটো সুডোপোডিয়া খুব ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দেয়। তারপর, খাবারটার সাম্‌নে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা সুডোপোডিয়া অন্য সুডোপোডিয়ার সঙ্গে জুড়ে যায় ; কাজেই খাবারটাও চলে

আসে আমিবার শরীরের মধ্যে। ছবি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে কি মজার ব্যাপার! তারপর আমিবার শরীর থেকে তার মধ্যে 'পাচক-রস' (Digestive juice) চলে যায়। খাবার হয়ে গেলে বাকিটা এরা Contractile vacuole-এ ফেলে দেয়, পরে সেখান থেকে বাইরে বের ক'রে দেয়।

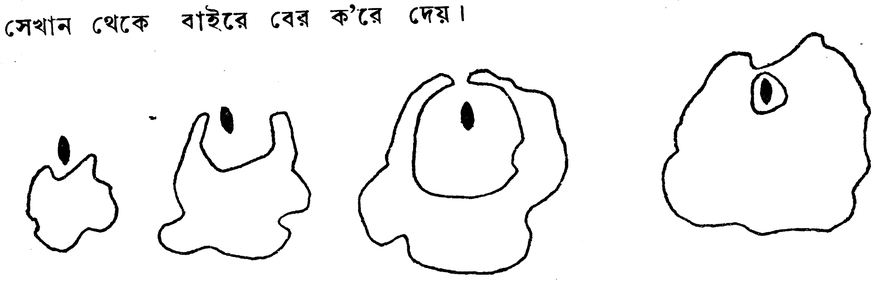

আমিবা কেমন খাবার খাচ্ছে—

প্রথম ছবিতে আমিবা যেন খাবারের একদিকে একটা হাত বাড়াচ্ছে; দ্বিতীয়টায় দু'দিক থেকে দু'টো হাত এগিয়ে চলেছে; তৃতীয়টায় খাবারটা প্রায় চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। শেষ ছবিতে খাবারটাকে শরীরে আটকে ফেলে, জলের মত এক ফোঁটা পাচক-রস তার চারিদিকে লাগিয়ে দিয়েছে।

আমিবা সাধারণতঃ থাকে পুকুরে। গ্রীষ্মকালে এদের বড় মুস্কিল। জল শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই এরা শরীরের চারদিকে একটা শক্ত আবরণ দিয়ে নেয়। এতে এদের খাওয়া দাওয়া না করেও বেঁচে থাকার সুবিধা হয়। সোজা করে বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যে এরা এ সময়টায় আচ্ছা করে ঘুমিয়ে নেয়। পরে আবার জল এলে, এরা এই আবরণ থেকে বেরোয়। পাশের ছবিতে দেখো, আমিবা গ্রীষ্মকালে কেমন একটা গোল শক্ত আবরণের মধ্যে ছিল, পরে বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে আবরণ থেকে বেরিয়ে আসছে। গ্রীষ্মের পর আকাশে যেই ঘন ঘটা ক'রে বর্ষা আসে, আমিবা অম্‌নি তার শক্ত ঘরটার মধ্যে বসে সে খবর পায় কি করে তাই ভাবি!

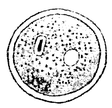

আমিবার গোল শক্ত আবরণ

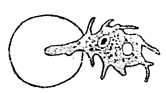

বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে আবরণ থেকে বেরিয়ে আসছে

আমিবারা দেখতে এমন ক্ষুদে হ'লেও এঁদের কীর্ত্তি অনেক। পেটের

আমাশয় অসুখের (Dysentery) ইনিও একটি কারণ। মানুষের পেট থেকে যে আমিবা বের করা হয়েছে ছবিতে তার চেহারাখানা দেখেছো তো!

আফ্রিকার Sleeping Sickness বা ঘুম পাড়ানো রোগের মূলেও আর একটি এক কোষ-ওয়ালা প্রোটোজোয়া; তার নাম হ'লো ট্রিপানোসোমা (Trypanosoma)। এরা আমিবার থেকে একটু বড়—প্রায় এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ হ'লো লম্বায়। একদিক একটু মোটা, অন্যদিক সরু। সাম্‌নে একটা ছোট্ট ডানার মত জিনিষ আছে। এখান থেকে আরম্ভ করে একটা পর্দ্দা এর শরীরের একপাশ দিয়ে পেছন অবধি আসে। এরা এই পর্দ্দাটা

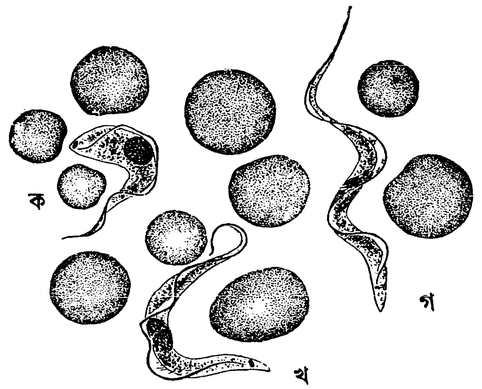

ট্রিপানোসোম

'ক' টি হ'লো জাতে স্ত্রী, বেশ মোটা গোছের; 'গ' হ'লো সরু—এটি পুরুষ; আর 'খ' হ'লো তাদের মাঝামাঝি। সুন্দর দেহটি দেখছো তো, একদিকে কেমন মোটা আর একদিকে কেমন সরু! তারপর তার সারা গায়ে কি রকম একটা পাখনা জড়িয়ে জড়িয়ে গেছে দেখ। হঠাৎ দেখ্‌লে তো স্ক্রুর প্যাঁচ বলেই মনে হয়। নয় কি?

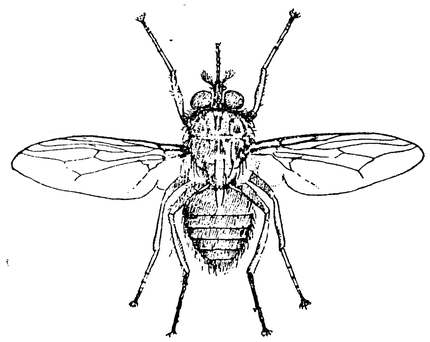

আফ্রিকার Tse Tse মাছি

চালিয়ে চালিয়েই সাম্‌নে দিকে এগিয়ে যায়। পণ্ডিতেরা বলেন এরা তিন জাতের—মোটা, সরু আর মাঝামাঝি। মোটারা হ'লো স্ত্রী, সরু হ'লো পুরুষ, আর মাঝামাঝি থেকে স্ত্রী পুরুষ দুইই হয়।

Tse Tse মাছি ব'লে একরকম মাছি আছে, তারা এদের বহন ক'রে নিয়ে

যায়। ছবিতে দেখে তোমরা হয় তো ভাবছো এদের আর নূতন কি আছে, এমনি মাছির মতই তো। আসলে কিন্তু এরা ভারী সাংঘাতিক জীব। এরা আফ্রিকার বাসিন্দা। কাউকে একবার কামড়ালে তার ঘুম পাড়ানো অসুখ হয়; আর একবার ঘুমিয়ে পড়লেই হলো, ব্যস্ এক্কেবারে ঠাণ্ডা।

তোমরা কালাজ্বরের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো। তার কারণও একটি এক কোষ-ওয়ালা প্রোটোজোয়া। এর নাম হ'লো (Leishmania Donovani) লিস্-মানিয়া ডোনোভেনি। দেখতে কতকটা ট্রিপানোসোমেরই মত—একদিক সরু আর একদিক মোটা। তবে এর পাখ্না সারা শরীরে আটকানো নয়, একদিকে মাত্র থাকে। ছবিতে দেখ্ছো কেমন মজার! মনে হয় যেন ঠিক একটি লেজ, নয়কি? তার পাশেই একটার আবার দু'টো লেজ, দেখ্ছো তো? এ হ'লো জন্তুটার দু'ভাগ হবার পূর্ব্বলক্ষণ। সব শেষের ছবিটায় দেখ একটা লিস্মানিয়া ভাগ হয়ে কতগুলি বাচ্চা হয়েছে!

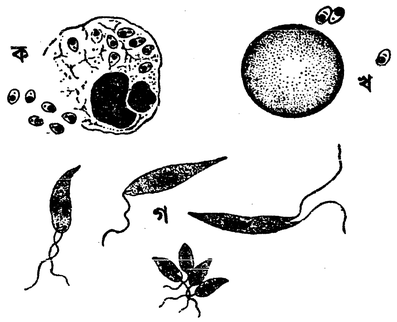

লিস্মানিয়া ডোনোভেনি

ইনি হলেন কালাজ্বরের কারণ। 'ক' ছবিটায় দেখ, মানুষের রক্তে ঢুকলে এদের চেহারা কি রকম হয়; কয়েকটা লিস্মানিয়া রক্তের কণা থেকে বেড়িয়ে আস্ছে। 'খ'-তে তাদেরই আরও কয়েকটা। 'গ' তে এদের আসল চেহারা দেখা যাচ্ছে।

মানুষের শরীরে ঢুকে এর চেহারা বদ্লে যায়, এ দেখ্তে হয় গোল গাল। আর প্লীহাতেই এর সব চেয়ে বড় বাসা, কাজেই কালাজ্বরে প্লীহাটা বড় হয়ে যায়। এর বাহনও হলো Sand fly নামে এক রকম মাছি, তারাই এদের মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়।

ম্যালেরিয়ার জন্মদাতাকে এবার তোমাদের সঙ্গে চেনা শোনা করিয়ে দি। এর নাম হ'লো প্লাস্মোডিয়াম (Plasmodium), ইনি দেখ্তে গোল। মানুষের শরীরে ঢুকে ইনি রক্তের কণার মধ্যে ঢুকে পড়েন।

পরের ছবিটা দেখলে এদের কাণ্ডকারখানা বুঝতে পারবে। "মানুষের রক্তে" বলে লেখাটার চারি পাশে যে গোল গোল ছবিগুলি রয়েছে সেগুলি হলো

মানুষের রক্তকণা। ১ ও ২ নম্বরে দেখ প্লাস্মোডিয়ামটা কেমন রক্তের কণায় ঢুকেছে। পরের গোলগুলি দেখলেই বুঝ্বে ইনি খেয়ে খেয়ে কেমন বড় হচ্ছেন, আর রক্তের কণাটার সব জায়গাই ক্রমে দখল করে বস্ছেন। আর তারপর কি রকম ভাগ ভাগ হয়ে অনেক গুলি হচ্ছে দেখ। দল বাড়াবার এ ফন্দীটা মন্দ নয়। শেষ ছবিটায় এরা রক্তের কণা থেকে বেড়িয়ে আবার নতুন কণায় ঢুকবার জন্য প্রস্তুত।

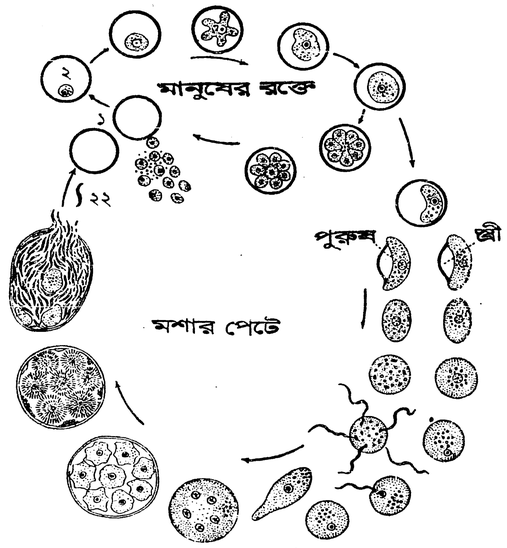

মানুষের রক্তে ও মশার পেটে প্লাসমোডিয়াম।

কিন্তু মশাই তো হ'লো এর বাহন। মশার পেটে এ কি করে বড় হয়, বলা যাক। মশা কোন রোগীকে কামড়ালে মশার পেটে ঢুকে যায় একটি রক্তের কণা, আর তার মধ্যে

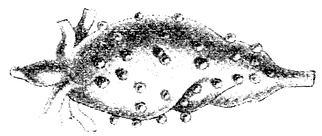

মশার পেট—দেখতে অনেকটা শাখের মত। তার গায়ে ঐ ছোলা ভাজার মত জিনিষ দেখ্তে পাচ্ছো, ওগুলি হ'লো ম্যালেরিয়া পোকার অর্থাৎ প্লাসমোডিয়ামের চেহারা। কী সাংঘাতিক ভাবে পেট আঁকড়ে পড়ে আছে দেখেছো?

ঐ প্লাসমোডিয়ামটি। সেখানে গিয়ে প্লাসমোডিয়ামটি কেমন দু'ভাগ হয়ে গেল, তা ছবির "মশার পেটে" অংশটায় দেখতে পাবে। একটা হ'লো স্ত্রী আর একটা হ'লো পুরুষ। দুটোই বড় হচ্ছে, পুরুষটা ক্রমে হয়ে গেল লম্বা লম্বা—সরু সরু সুতোর মত। আর স্ত্রীগুলি হ'লো গোল গোল মোটা মোটা—গিন্নীবান্নিদের মত। তার পর দু'জনে মিলে তৈরী হ'লো একটা ডিম। এই ডিম ভাগ হয়ে হয়ে অনেকগুলি ছোট ছোট প্লাসমোডিয়াম

জন্মাল। এদেরই এক একটি প্লাসমোডিয়াম আবার মশার হুল দিয়ে কেমন করে মানুষের রক্তে ঢোকে তা ২২ নম্বরে দেখান হয়েছে। খুব মজার নয় কি?

তোমাদের কাছে যে ক'টা প্রোটোজোয়ার কথা বলা হ'লো তাছাড়া আরও অনেক প্রোটোজোয়া আছে। কিন্তু প্রধানতঃ এদের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—যারা শরীর এগিয়ে নিয়ে চলে, যেমন আমিবা; যাদের চলবার জন্য পাখ্না আছে যেমন ট্রিপানোসোম; আর যারা এ দু'ভাবের এক ভাবেও চল্তে পারে না, যেমন প্লাস্মোডিয়াম।

—০—

চালিয়াৎ চীৎপাত

আমরা যখন থার্ড ক্লাশে পড়তাম তখন বিপিন নামে একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ত। তার জ্যেঠামশাই ক'লকাতায় কি যেন কাজ করতেন। বিপিনকে তিনি একবার একমাসের জন্যে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সে এক মাসের মধ্যে সেখান থেকে সেই যে কত রকম চাল আর কায়দা শিখে এল তার আর শেষ নেই। একে বড় লোকের ছেলে তাতে ক'লকাতা দেখে এসেছে, তার সঙ্গে কথায় তাই কেউ পারত না। আমরা সব গ্রামে থাকি, বড় সহর পর্য্যন্ত দেখি নি। কাজেই বিপিনের মুখ থেকে কলকাতার যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প বের হ'ত তা অবাক হয়ে দুই কাণ দিয়ে গিলতাম আর হাঁ করে থাকতাম।

কথায় কথায় সে মারামারীর নানা রকম ক'লকাতাইয়া প্যাঁচের কথা, নিজের নানা রকম ওস্তাদি আর বীরত্বে কথা শুনিয়ে দিত। আমরা ভয়ে ভয়ে থাকতাম। ভাল করে কথা পর্য্যন্ত বলতাম না। কি জানি কখন কোন্ ক'লকাতাইয়া প্যাঁচ দিয়ে ঘায়েল করে ফেলে।

সেদিন টিফিনের সময় ছুটিতে আমরা সকলে স্কুলের ধারে বড় মাঠটাতে ডাংগুলি খেলছিলাম। কেন জানি না হঠাৎ ঘোড়ার গাড়ীর কথা উঠল। আমরা

তখন পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী দেখি নি। একেবারে আজ পাড়া গাঁয় থাকি, পাল্কি ডুলি ছাড়া যাতায়াত করার অন্য কোন কিছু তখন জানা ছিল না। কচিৎ কাউকে খুব ছোট ছোট ঘোড়ায় চড়তে দেখেছি।

বিপিন কলকাতার ঘোড়ার গাড়ীর গল্প করতে গিয়ে বলল—"সে ঘোড়া দেখতিস তো বুঝতিস ঘোড়া কাকে বলে! হাতির চেয়েও বড় বড়। গায় তাদের জোর, হাতীর চেয়েও বেশী। আস্ত বাড়ীর মত এক একটা প্রকাণ্ড গাড়ী তারা একলাই টেনে নিয়ে যায়। তাও কি আস্তে যায়—মিনিটে দুইমাইলের কম হবে না! এই রকম একটা ঘোড়া তো ভাই একদিন দুপর বেলা গেল ক্ষেপে। বাঁধন ছিঁড়ে সে সোজা ছুট মারল। এক মিনিটের মধ্যে তার পায়ের তলায় পড়ে ২৩৫টা লোক খুন হয়ে গেল। তারপর পালা পালা! চারিদিকে লোকের ছুটোছুটি লেগে গেল। এ ওর ঘাড়ে পড়ে, ও পড়ে এর ঘাড়ে, এই রকম। আমি আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম ঘোড়াটাকে না ধরলে হচ্ছে না। গেলাম ছুটে তার পিছু পিছু। ধরলাম তার ছেঁড়া লাগামটা চেপে। এক হেঁচকা মারল সে আমাকে। সে কি সহজ হেঁচকা! পড়ে গিয়েছিলাম প্রায়। আমিও ছাড়বার পাত্র নই। সামলে নিয়ে, কসে তার মুখে বসিয়ে দিলাম এক এল্বাট্টা ঘুসি! তারপর সেই ছেড়া লাগামটা দিয়েই সপাসপ্ বেশ কয়েক ঘা। আধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর ঘোড়াটা হার মানল। তখন ঘোড়া নয়ত, যেন মেনি বেড়ালের ছানাটা! রাস্তার চারিদিকে লাখ লাখ লোক বাহবা দিতে লাগল। স্বয়ং লাটসাহেব পর্য্যন্ত বলে ছিলেন একটা মেডেল দেবেন। কিন্তু মেডেল নিয়ে কি হবে—আমি চলে এলাম।"

গল্প শুনতে শুনতে আমরা সব অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের মুখের হাঁ যত বড় হতে লাগল চোখ দুটোও সেই রকম। এমন সময় দেখি বিপিন দেবুর দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে। চেয়ে দেখি দেবু মুখ টিপে টিপে হাস্ছে।

বিপিন দুই চোখ কটমটিয়ে বলল—"হাসছিস্ যে বড়! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এমন এক "কালী গোপ্তা" প্যাঁচ লাগিয়ে দেব যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবি!"

আমাদের মধ্যে এক দেবুই বিপিনের কোন কথা বিশ্বাস করত না। সে বলল—"শরীরের বহরে না হয় তুই হাতির মতই হ'লি, তাই বলে কি হাতির মত জোরের সঙ্গে তুই পারিস? আর ওই সাড়ে তিন মনী শরীর নিয়ে তুই মিনিটে ২।২॥ মাইল দৌড়তে পারিস?"

বিপিন বলল—"বটে, বিশ্বাস হচ্ছে না! গায়ের জোর বুঝিয়ে দিতে হবে, কেমন? আচ্ছা, কামন্ বক্‌সিং—কাম অন্ বক্‌সিং" এই ব'লে, লাটাইয়ে যেমন করে সুতো জড়ায় সেই রকম ভাবে হাত দুটো বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে লাগল।

ভয়ে তো আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। এইবার বুঝি সে তার সেই বিখ্যাত বিলিতি "হিট্-টি-পটিং" প্যাঁচ বসিয়ে দেবুকে সাবাড় করে ফেলে! দেবুও দেখি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে,—বিপিনের মুখের দিকে নয়, তার পিছনে মাঠের দিকে। তাকিয়ে দেখি, ছোট্ট একটা বাছুর চার পা তুলে লাফাতে লাফাতে আমাদের দিকে আস্‌ছে। তাই দেখেই বিপিন তো দিল চোঁচা ছুট! একটু দূরেই একটা গাছ ছিল, লাফিয়ে সেইটার উপর উঠতে গেল। অত মোটা শরীরে পারবে কেন—চিৎ হয়ে পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগল।

আমরা তো একেবারে অবাক! দেবু কিন্তু একেবারে গলা ছেড়ে হাস্‌তে আরম্ভ করেছে। সে হাসি আর থামেই না! শেষটা বেদম হয়ে যখন থামল, তখন বলল—"হ্যাঁ ভাই, আমার ভুল হয়েছিল। আমি ভাই স্বীকার করছি, মিনিটে তুই দুই মাইল ছুটতে পারিস্—অবশ্য বাছুরে যদি ভয় দেখায়।"

বিপিন মাটি থেকে ধুলো মেখে উঠে বলল—"আমি পালাচ্ছিলাম বুঝি! আমিতো লাঠি ভাঙতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ঐ নন্‌সেন্, ফুলিশ, বগ্‌লাটার জন্য হ'ল না। একটু সরে যাবে তা নয়।"

তাকিয়ে দেখি নীচের ক্লাশের বগলা নামে একটি ছেলে গাছটার নীচের ডালে ব'সে। হাতে একটা আধ খাওয়া পেয়ারা নিয়ে অবাক হয়ে বিপিনের দিকে তাকিয়ে আছে। বেচারা কিছুই জানে না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাচ্ছে।

বিপিনের এই কাণ্ড দেখে, বিশেষ করে তার লাঠি ভাঙার ছুতোর কথা মনে করে, দেবু আবার হো হো করে হেসে উঠল। এবার সবাই তাতে যোগ দিল। বিপিনকে সেই থেকে সবাই ডাকতো 'বাছুরে বিপিন' ব'লে।

—০—

পল্লী-কুসুম

(শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস)

পল্লী-কুটীরে যে কুসুমগুলি
ফুটি' থাকে নিরালায়,
ওদের নিকটে পরাণ আমার
অহরহ ছুটে যায়।
আজি তোমাদের মিনতি জানাই,
সাবধানে পা' ফেল যেন ভাই;
নতুবা তোমরা হেলায় ওদের
দলে যেতে পার পায়।

ও কুসুমগুলি তোমাদের কাছে
পরিচিত ভাল নয়;
ওরা বার মাস উজলি' কুটীর
নিরজনে ফুটি' রয়।
ওদের মরমী পল্লীর বালা,
তারা তুলে রোজ গাঁথে যে গো মালা;
বুড়ো শিব আর গ্রাম্য দেবীর
ওই দিয়ে পূজা হয়।

ওরাই সাজায়ে দীনের কুটীর
তপোবন গড়ি' তুলে;
ও কুসুম পরি' কৃষাণী খোঁপায়
গহনার শোক ভুলে।
উদাস বাউল আদর করিয়া
নাচে ওর মালা গলায় পড়িয়া;
আসব-ভুখারী ভ্রমরের দল
ওর মধু পিয়ে ঢুলে।

তোমরা ওদের ঘৃণা কর যদি
রাগ মোর তা'তে নাই;
সাবধানে যেন ফেলিও চরণ
এই অনুরোধ ভাই।
ওরা নিরজনে ঘোমটা খুলিয়া,
নাচে তালে তালে হেলিয়া দুলিয়া;
শতকাজ ফেলি ওদের নাচন
আমি রোজ দেখে যাই।

পশুর ভাব ও ভাষা

(শ্রীসুবিনয় রায়)

পশুপাখীর কি ভাষা আছে? তা'রা কি মনের ভাব কোন বিশেষ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে? পরস্পরকে বোঝাবার জন্য তারা কি কোন ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করে? এই সব প্রশ্ন মানুষের মনে বহুকাল থেকেই জেগেছে এবং এই বিষয়ে নানা রকমের পরীক্ষা বহুকাল থেকে হয়ে আস্‌ছে।

পশুদের মুখের কয়েকটি বিশেষ শব্দ যে তাদের মনের ভাবকে প্রকাশ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বেড়াল বা কুকুর ঝগড়া করার সময় যে শব্দ করে কান্নার সময় সে রকম শব্দ করে না। দূর থেকে শুনেই বোঝা যায় ঝগড়া কর্‌ছে কি কাঁদ্‌ছে। অনেক পশুই এই ধরণের শব্দ ক'রে থাকে। পাখীরাও ভয়, রাগ প্রভৃতি প্রকাশ কর্‌বার জন্য বিশেষ শব্দ ক'রে থাকে।

রিউবেন ক্যাষ্টাং নামে একজন সাহেব বলেন, "আমি পশুর ভাষা জানি। কতবার আমি জংলি হাতীর সাম্নে প'ড়েছি; বাঘের গরম নিশ্বাস অনুভব ক'রেছি; প্রকাণ্ড ভাল্লুকের থাবা মুখের সাম্নে দেখেছি; গরিলায় প্রায় জড়িয়ে ধ'রে ফেলেছে আমাকে। কিন্তু একটি জিনিষ প্রত্যেক বারই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে; সেটি হচ্ছে, পশুদের ভাষা। আমি তাদের ভাষা জানি ব'লেই এতবার সাক্ষাৎ যমকে এড়িয়ে যেতে পেরেছি।"

তিনি আরো বলেন, "সিংহকে যদি তা'রই ভাষায় বল্‌তে পার, তুমি তা'র বন্ধু, তা' হ'লে তুমি অনেকটা নিরাপদ হবে। তারপর যদি তাদের জাতের আদব-কায়দা অনুসারে তা'র কাছে যেতে পার তা' হ'লে ভয়ের বিশেষ কোনও কারণ থাক্‌বে না।"

এই সাহেব চল্লিশ বৎসর বন্য জন্তুদের সঙ্গে থেকেছেন। খাঁচার এবং জঙ্গলের এই দুই অবস্থার জন্তুদের সঙ্গেই তাঁর আলাপ পরিচয়ের বিশেষ সুযোগ ঘটেছে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে শিম্পাঞ্জি, গরিলা, সিংহ, গ্রিজ্‌লি ভাল্লুক আর শ্বেত ভাল্লুক।

তিনি বলেন, "এই সব পশুর গলার শব্দের অবিকল নকল করার ক্ষমতা

থাকায় শুধু যে বহুবার আমার প্রাণ বেঁচেছে তা' নয়, এদের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাবারও অনেক সুবিধা হয়েছে। পশুরা শুধু শব্দের সাহায্যে কথা বলে না; নানা রকম ইসারায়ও বলে। কুকুরের ল্যাজনাড়া আর কাণ নাড়ার মধ্যে কত অর্থ আছে তা' অনেকেই আমরা জানি। একেও ভাষা বল্‌তে হবে।"



ক্যাষ্টাং সাহেব তাঁর এক-নম্বর বন্ধু 'জনি' ওরাং-এর সঙ্গে প্রাণের কথা বল্‌ছেন

পোষা জন্তুরা নাকি জঙ্গলের জন্তুর চেয়ে অনেক বেশী চেঁচামেচি করে। পোষা কুকুর আর ঘোড়া কত চেঁচায়, কিন্তু জংলী কুকুর বা ঘোড়ার শব্দ বড় একটা শোনা যায় না। জঙ্গলের পশুকে সর্ব্বদাই প্রাণ বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়, তাই তারা স্বভাবতঃই নীরব।

পশুর মধ্যে শিম্পাঞ্জি ওরাং-ওটাং জাতীয় বড় বানর ছাড়া অন্য সকলের ভাষার শব্দ অতি সামান্যই। ক্যাষ্টাং সাহেব এই সব ভাষা নিয়ে বহু বৎসর গবেষণা ক'রেছেন।

তিনি বলেন, ভাল ক'রে লক্ষ্য কর্‌লে পশুদের বিভিন্ন মনের অবস্থায় বিভিন্ন আওয়াজগুলি বেশ স্পষ্টভাবে ধরা যায়। এই সব আওয়াজের অবিকল নকল কর্‌তে শিখ্‌লে পশুদের সঙ্গে ভাব পাতাবার সুবিধা হয়।

ক্যাষ্টাং সাহেব হাতী, সিংহ, বাঘ আর শ্বেত ভালুকের কয়েকটি আওয়াজের

একটা ফর্দ্দ দিয়েছেন আর ব'লেছেন, চিড়িয়াখানায় গিয়ে এর কয়েকটিকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার। ফর্দ্দটি নীচে দিলাম।

১। হাতী

মনের ভাব	আওয়াজ
"এই যে মশাই" (Hullo)...	"স্-স্-ক্ স্-স্-ক্"
"সকলকে নমস্কার" (Welcome)	"আঘ্-উঃ-উঃ"।
"ক্ষিদে পেয়েছে" ...	"উঃ— উঃ" (চড়া গলায়)
"তাড়াতাড়ি কর" ...	"ওঃ-ওঃ-ওঃ-ওঃ"

২। সিংহ

"গুড্‌মর্ণিং" বা "প্রাতঃপ্রণাম"...	"বূটি-ব্-মুটী"
"তোমাকে ভাল লেগেছে" ...	"চু-মূট্‌ছি"
"ক্ষিদে পেয়েছে" ...	"ক্-র্-র্ ক্-র্-র্"
"রেগেছি"	"ক্-গ্-র্-র্ ক্-গ্-র্-র্"

৩। বাঘ

"গুড্‌মর্ণিং" বা "প্রাতঃপ্রণাম"...	"মা-া-র মা-া-র মা-া-র"
"বন্ধুতা পাতাও না কেন ?"...	"প্-র্-র প্-র্-র্"
"এস !" (অন্য বাঘের প্রতি)...	"এর্-এর্-এর্-এর্"
"তোমাকে ঘৃণা করি" ...	"গ্-র্-র্ ! ক্-গ্-র্-র্"

৪। শ্বেত ভাল্লুক

বন্ধুতা ...	নীরব
"এখানে আসুন না।"...	"স্-স্-ট্—চ্ট্-চ্ট্"

উপরের ফর্দ্দের আওয়াজগুলি পড়্‌তে যেমন, উচ্চারণে বোধ হয় তা'র সঙ্গে বিশেষ কোন তফাৎ আছে। সিংহ কি কখনও 'বূটি-ব্‌মুটী' বল্‌তে পারে ? বাঘও কি কখনও "মার মার মার" বল্‌তে পারে ?

সিংহ বাঘের চেয়ে অনেক ভদ্র ; বন্ধুতাও সহজে ক'রে ফেলে। বাঘ কিন্তু বড় বেখাপ্পা জানোয়ার ; সহজে তা'র কাছে এগুতে নাই। গায়ে হাত দেবার

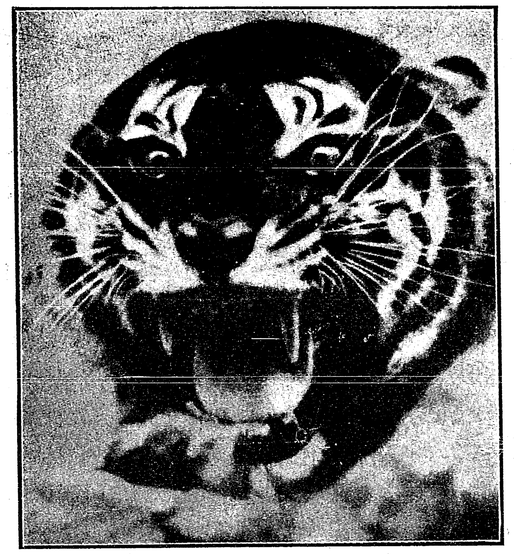

"গ্-র্-র্ ক্-গ্-র্-র্" (তোমাকে ঘৃণা করি)

আগে বিশেষ ক'রে লক্ষ্য কর্‌তে হবে, তোমার আওয়াজের জবাব সে দিচ্ছে কিনা। তারপর, খুব সাবধানে, অত্যন্ত ধীরে এগিয়ে আস্তে আস্তে গায়ে হাত দিতে হবে। বাঘের চেয়ে চিতা ঢের সহজে ভাব করে। তা'র মুখটি দেখ্‌লেই অনেকটা বেড়াল-বেড়াল ভাব মনে হয়।

ভালুক নিরামিষাশী আর লোভী ; তা'কে খাবার দিলেই সহজে ভাব কর্‌বে। আমিষাশী জন্তু কিন্তু কখনও খাবারের লোভে ভাব করে না। খাবার সময় তা'র কারো সঙ্গে ভাব নাই—সকলকেই তখন অবিশ্বাস।

শিম্পাঞ্জি, ওরাং, এদের বিষয় কিছু লেখা হয় নি। এরা তো মানুষেরই জাত-ভাই ; ভাষাও এদের অনেক বড়। তবে, এদের সঙ্গে ভাব পাতান কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। ভালবাসা, সহানুভূতি এরা খুব বোঝে ; ভাবও পাতায় সহজেই। তবে, এদের মুখের ভাষা বেশী নয় ; মনের ভাব মুখেই বেশী।

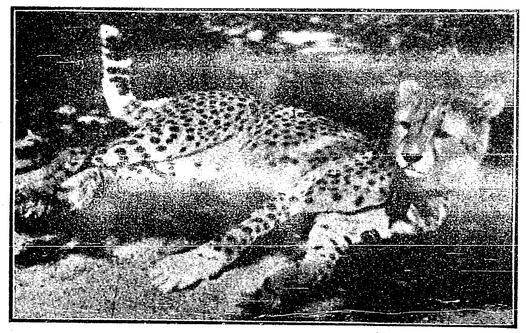

বাঘের জাত ভাই চিতা বেড়াল-বেড়াল গোছের চেহারা। এদের ভাষা একটু বিভিন্ন।

সিদ্ধার্থ

(শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, কবিভূষণ)

কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজা শুদ্ধোধন ও তাঁর পুত্র সিদ্ধার্থের নাম বোধ হয় তোমরা অনেকেই শুনেছ। এই সিদ্ধার্থই পরে বড় হয়ে বুদ্ধ নামে জগতে পরিচিত হন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থাপন করেন।

রাজার একমাত্র ছেলে সিদ্ধার্থ ছিলেন বড়ই আদরের, বড়ই যত্নের ধন। রাজা তাঁকে চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। কত রকম আমোদ প্রমোদ ও সুখ ঐশ্বর্য্য দিয়েই না তাঁকে দিনরাত ঘিরে রাখা হ'ত।

সিদ্ধার্থ কিন্তু আমোদ প্রমোদ মোটেই ভালবাসতেন না। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ধীর ও ভাবুক স্বভাবের। প্রায়ই তিনি নির্জ্জন নদীর ধারে বসে বসে মুগ্ধনয়নে প্রকৃতির শোভা দেখতেন, আর উন্মুক্ত আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে কত কি ভাবতেন। অন্যান্য রাজপুত্ররা বনে বনে মহা ফুর্ত্তিতে শীকার করে বেড়াতেন; আর তিনি সেই শীকারের প্রাণীগুলি দেখে এবং তাদের যাতনার কথা ভেবে চোখের জলে ভাসতেন।

একদিন সিদ্ধার্থ নদীর তীরে সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছেন। হঠাৎ আকাশের বুক চিরে এক করুণ আর্ত্তনাদ ভেসে এল। তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি পায়রা যাতনায় ছটফট করতে করতে মাটির পানে পড়ছে। তার সেই কাতর স্বরে সিদ্ধার্থের প্রাণে বিষম বেদনা বেজে উঠল, তাঁর চোখ দু'টি জলে ভরে এলো।

দেখতে দেখতে পায়রাটি নদীর তীরে একটি ছোট গাছের তলায় এসে পড়ল। তিনি দৌড়ে গিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে সযত্নে কোলের উপর তুলে নিলেন। দেখলেন, একটি তীর পাখীটির বুকে বিঁধে আছে। তিনি অতি সন্তর্পণে তাকে নদীর ঘাটে নিয়ে গিয়ে তীরটি তুলে ফেলে দিলেন, ধীরে ধীরে আপন কোমল হাতটি বুলিয়ে দিয়ে রক্তের লেখা মুছে দিলেন, একটু একটু করে জলবিন্দু মুখে দিয়ে তাকে ক্রমে সুস্থ করে তুললেন।

জ্যোৎস্নার মত ধবধবে সাদা পায়রাটির পানে চেয়ে চেয়ে তার মনে হল, এত হিংসা কেন এ সংসারে? এই নিরীহ পাখীটি কাহারো কোন অপকার করে

না, আপন মনে সুনীল আকাশে উড়ে বেড়ায়; তবে কেন মানুষ অনর্থক এমন করে এর বুকে যাতনার আগুন জ্বেলে দেয়।

এমন সময় দেবদত্ত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনিও একজন রাজপুত্র। হাতে তীর ধনু, পিঠে তূণ ভরা বাণ, নির্ম্মম চোখ দু'টিতে যেন আগুন জ্বলছে। দেবদত্ত এসে বল্লেন, "এই যে তুমি আমার পায়রাটি পেয়েছ। আমি খুঁজে খুঁজে মরছি, ভাব্‌ছিলাম গেল কোথায়।"

সিদ্ধার্থ শান্তস্বরে উত্তর দিলেন, "এ তো তোমার নয়, এ পায়রা আমার।"

দেবদত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার হলো কেমন করে?"

সিদ্ধার্থ বললেন, "তুমি এ পায়রাটি শীকার করলে কেন? কি দোষ করেছিল এই নিরীহ প্রাণী? আপন মনে আপন জনের সঙ্গে সে নীল আকাশের কোলে ভেসে চলেছিল, কারও কোন অনিষ্টই করে নি। তুমি কেন একে বাণবিদ্ধ করলে?"

দেবদত্ত—শীকার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

সিদ্ধার্থ—ধর্ম্ম! সে এ শীকার নয়। সিংহ বাঘ প্রভৃতি যে সব হিংস্র জানোয়ার আছে, তাদের হাতে থেকে মানুষকে নিরাপদ করার জন্য তাদের শীকারই হ'ল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। নিরীহ প্রাণীর প্রাণ নষ্ট করা কখনই ধর্ম্ম নয়। ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্মই হ'ল দুষ্টকে দমন করে শিষ্টকে রক্ষা করা।

দেবদত্ত—থাক, থাক! তোমার কাছে এখন আমি ধর্ম্মের কাহিনী শুনতে আসি নাই। এ পায়রা আমি শীকার করেছি, অতএব পায়রাটি আমার।

সিদ্ধার্থ—তুমি এর প্রাণ নষ্ট করতে গিয়েছিলে ব'লে এ পাখী তোমার হবে? না! আমি এর মৃতপ্রায় প্রাণকে শুশ্রূষা করে আবার সজীব করে তুলেছি, এ পাখী আমার। একে আমি উড়িয়ে দেব।

সিদ্ধার্থ পায়রাটিকে সস্নেহে তুলে নিয়ে, দুই একবার তার গায় আপন কোমল হাতটি বুলিয়ে দিয়ে তাকে আকাশে উড়িয়ে দিলেন। পাখী মনের আনন্দে দু'পাখা মেলে সুনীল আকাশে উড়ে গেল।

এক অপার্থিব আনন্দে সিদ্ধার্থের মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেবদত্ত অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে তাঁর হাত থেকে ধনুকটি খসে প'ড়ল।

(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

টাকার শোক

(কুমারী হেমলতা লাহিড়ী —গ্রাহক নং ৯৪৭)

এবার দেশে বেড়াতে এসেছিলাম। বাবার কর্ম্মস্থান থেকে দেশ আমাদের খুব দূরে, তাই আসা সহজ ছিল না। বাবার ছুটি ছিল খুব অল্প। যা দু'চার দিন ছুটি পেতেন, তাতে অল্পদিনে শুধু পথের কষ্ট সার হবে মনে করে আমাদের না নিয়ে বাবা একাই ঘুরে যেতেন।

মার কাছে বাড়ীর অনেক গল্প শুন্‌তাম। বড় ইচ্ছে হ'ত একবার দেশে আসি। এবার অনেক করে ধরে তবে আসতে পেয়েছি। বাড়ী পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল। একটু বিশ্রামের পর খাওয়া দাওয়া করে দিদিমার কাছে শুয়ে রইলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত কত তাও ঠিক জানি না। কি রকম এক আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হল যেন দু'জনে চাপা গম্ভীর স্বরে কথা কইছে। ভয় পেয়ে উঠে বস্‌লাম। পাশে দিদিমা ঘুমাচ্ছেন। বুড়ো মানুষ, রাস্তার পরিশ্রমে বড় কষ্ট হয়েছে। তাই তাঁকে আর না জাগিয়ে, আস্তে আস্তে যেদিক থেকে শব্দ আস্‌ছিল সেই দিককার জানালা খুলে বাইরে তাকালাম। বাইরে চমৎকার জোৎস্নায় সব বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সামনে ছাদের আলসের ওপর মনে হ'ল দু'টো মানুষের মুখ। খুব ছোট। শরীরটা দেখ্‌তে পেলাম না, শুধু আলসের ওপর মানুষের মত মুখ। মুখে যেন দাড়ী রয়েছে। দু'জনে মুখোমুখী করে কথা বলছে। কি যে বলছে তা স্পষ্ট না বুঝলেও কথা যে মানুষের মত তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। ভয়ে প্রায় কেঁপে উঠে বিছানায় দিদিমাকে ঠেলে তুল্‌লাম, "ও দিদিমা, শীগ্‌গীর ওঠো, সামনের ছাদে দুটো লোক উঠেছে।"

'লোক উঠেছে' শুনেই দিদিমা তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে বাইরে এলেন; আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। দরজা খোলার শব্দে তারা সেই ছাদ থেকে

একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর ঠিক পাখীর মত উড়ে তারা বাগানের দিকে চলে গেল। ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। একি, পাখী হ'ল কি করে! তাদের মানুষের মত মুখ স্বচক্ষে দেখেছি, মানুষের মত কথা নিজে স্পষ্ট শুনেছি।

কিছুক্ষণ আমার মুখে কথা বেরুল না। দিদিমা কিন্তু সব ব্যাপারটা ততক্ষণে বুঝে নিয়েছেন। হেসে বল্লেন, "ওই দেখে ভয় পেয়েছিলি? ও ত মানুষ নয় রে, ওরা যে সত্যিই এক রকম পাখী।" তখনও আমার ভয় কাটে নি। পাখী শুনে আমি অবাক হয়ে রইলাম। খানিক পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললাম, "সত্যি? না দিদিমা, তুমি ওদের মুখ দেখ নি, কথাও শুন্‌তে পাও নি। তাই বলছ।" দিদিমা বল্লেন, "দেখেছি রে দেখেছি। আমরা ত চিরকালই ওদের দেখে আসছি। সত্যিই যারা ওদের জানে না তারা হঠাৎ ওদের দেখে ভয় পেতে পারে। ওদের মুখের ভাব প্রায় মানুষেরই মত। ওদের নাম ভূতুম পাখী। ওদের সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে, শোন।

"ওরা এক সময় মানুষই ছিল। ওদের কিছু টাকা ছিল, সেই টাকাগুলি কোন রকমে হারিয়ে যায়। সেজন্যে ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধে। স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি রেখেছ, স্ত্রী স্বামীকে বলে তুমি রেখেছ। তারপর তারা এরকম ঝগড়া কর্‌তে করতে টাকার শোকে পাখী হয়ে উড়ে যায়। এখনও তাই গভীর রাত্রে স্বামী স্ত্রীর সেই ঝগড়া চলে। এ বলে, 'তুই থুলি'; ও বলে, 'মুই থুলি না তুই থুলি'। নিশীথ রাত্রে ওদের সেই গম্ভীর স্বর শুন্‌লে সত্যই ভয় করে।"

দিদিমার কাছে সমস্ত শুনে আমার ভয় ভেঙ্গে গেল এবং বড়ই লজ্জা হতে লাগল। ছিঃ, পাখী দেখে এমন ভয় পেলাম! ভাগ্যে দিদিমা ছাড়া আর কেউ ঘরে ছিল না।

[* * * 'সন্দেশের' গল্প প'ড়ে সন্ধ্যা বেলা দিদিমাকে শোনাই। সেদিন দিদিমা হঠাৎ বল্লেন, "তোর সেই ভূতুম পাখীর গল্পটা লিখে দেনা রে। সম্পাদক মশাই যদি ছাপেন ত একটা নূতন পাখীর কথা, সহরের অনেকে যারা জানে না তারা পড়তে পারবে। —লেখিকা]

অভাগা

(শ্রীঅরুণকুমার দত্ত—গ্রাহক নং ২১৫৮)

মা গেছে হারায়ে তার ;
তাই করি মুখ ভার,
দাঁড়ায়ে রয়েছে পথ 'পরি।
কত কেহ গেল চ'লে
তাহারে পথেতে ফেলে,
তার পানে নাহি চাহে ফিরি' ॥

মা গেছে হারায়ে ব'লে,
স্নেহভরে কোলে তু'লে,
কেহ কিগো লবে নাকো তারে ?
একটু স্নেহের লাগি',
সবা কাছে ভিখ্ মাগি' ;
পথ মাঝে রবে কি সে প'ড়ে ?

এই জগতের মাঝে
কতশত মাতা আছে,
তারা তাকে লবে নাকো কোলে ?
এতটুকু স্নেহ দিয়া
মার অভাব ঘুচাইয়া
দিবে না কি মাতৃহারা ব'লে ?

গল্প-স্বল্প

সর্ব্বোচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ—পৃথিবীর অনেক দেশেই নানা রকম স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যায়। কোন না কোন মহাপুরুষের কথা লোকের মনে জাগিয়ে রাখবার জন্যই সাধারণতঃ এই সব স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা হয়। ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতি ছাড়াও, কোন দেশজয়, যুদ্ধজয়, ধর্ম্মপ্রচার, অথবা কারো মহৎ আত্মোৎসর্গ বা কোন অসাধারণ কাজের জন্যও স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হয়ে থাকে। আমাদের দেশের নানা স্থানের অশোক স্তম্ভ, দিল্লীর কুতব মিনার ও লৌহ-স্তম্ভ এবং কলিকাতার অক্টর-লোনি মনুমেণ্ট প্রভৃতির কথা তোমরা অনেকেই জান।

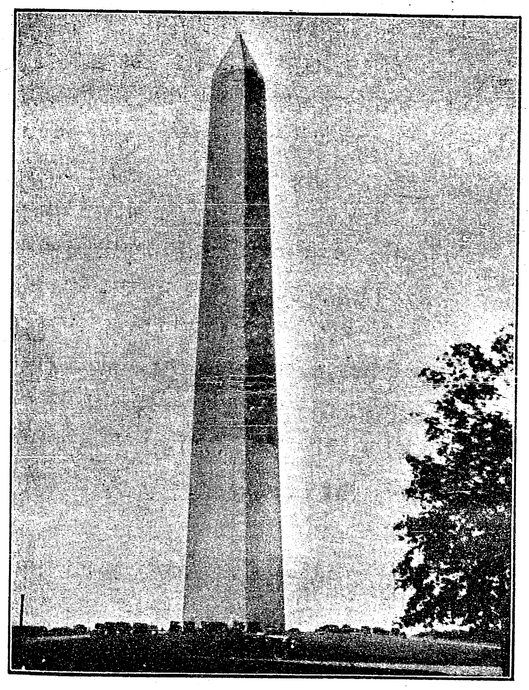

পাশে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, সেটি হচ্ছে জর্জ্জ ও য়া শিং টনের স্মৃতি-স্তম্ভ। আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরে এই স্তম্ভটি আছে। পৃথিবীর মধ্যে এত উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ আর নাই। স্তম্ভটি ৫৫৫ ফুট উঁচু, সুন্দর সাদা মারবেল পাথরের তৈরী। নীচ থেকে উপর পর্য্যন্ত মোট ৯০০টি সিঁড়ির ধাপ আছে। অত' উঁচুতে অবশ্য লোকে সাধারণতঃ সিঁড়ি বেয়ে উঠে না, উঠবার জন্য ইলেক্‌ট্রিক লিফ্‌টের (Electric lift) ব্যবস্থা আছে।



বুদ্ধিমান টিকিট-কল—হাবড়া ও অন্যান্য বড় ষ্টেসনে তোমরা অনেকে টিকিটের কল দেখে থাকবে। একটা এক-আনি কলের মধ্যে দিয়ে হাতল ধরে টানলেই একখানা টিকিট কল থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে, টিকিট বেচবার জন্য আর কোন লোকের দরকার হয় না। টিকিটের কলের মত চকোলেটের কল, ওজনের কল প্রভৃতি আরো অনেক কল আছে; তাদের ভিতর নির্দ্দিষ্ট দামটি দিয়ে দিলেই কল আপনা আপনি জিনিষ বের করে দেয় বা তার যা কাজ করবার তা নিজেই করে দেয়। কিন্তু পাশে যে টিকিট-কলের ছবি দেখছ এটির একটু বিশেষ বাহাদুরি আছে। ৩ পেন্স এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, এ তো অন্যান্য কলের মত একখানি টিকেট বের করে দেয়ই; কিন্তু কারো কাছে ভাঙ্গানো ৩ পেন্স না থাকলে সে যদি এক শিলিং দিয়ে দেয়, তাহলে এ তাকে বাকি ৯ পেন্স ফিরিয়ে দিতে পারে। বুদ্ধিমান নয় কি?

সবচেয়ে ছোট পাখী—এতদিন পাখীদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট পাখী ছিল মধুপায়ী পাখী (বা Humming bird)। আকারে তারা টুনটুনি পাখীর প্রায় অর্দ্ধেক। তারা ফুলের মধু খেয়ে খেয়ে বেড়ায়। সম্প্রতি Dr Alexander Wetmore নামে একজন সাহেব এক রকম পাখী আবিষ্কার করেছেন। এই পাখী আয়তনে বড় একটা মৌমাছির মত। এখন এরাই হচ্ছে পৃথিবীর জানা পাখীদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট।

এত ছোট পাখী, তবু এদের সাহস ও বিক্রম বড় কম নয়। এর চেয়ে ঢের বড় বড় পাখীকেও এরা আক্রমণ করতে ভয় পায় না।

সূর্য্য মোটর—প্রকাণ্ড এক গামলার মত এই জিনিষটা কি জান? এটি হচ্ছে সূর্য্য-মোটর। নানা রকম মোটর দিয়ে নানা রকম কল চালান হয়, তা তো মরা জানো। কয়লা জ্বালিয়ে বাষ্প তৈরী করে রেলগাড়ীর এঞ্জিন ও অন্যান্য বাষ্পীয় এঞ্জিন চালান হয়। পেট্রোল ও অন্যান্য তেল পুড়িয়ে মোটর-গাড়ী প্রভৃতির এঞ্জিন চলে। ইলেকট্রিক মোটর দিয়েও কত রকমের কল কারখানা চালান হয়। এখানে যে সূর্য্য-মোটরটা দেখছ, এর ভিতর দিকটা আয়না দিয়ে তৈরী। সূর্য্যের কিরণ এই আয়নায় এসে প'ড়ে মাঝের চোঙ্গাটার মধ্যে যে জল থাকে সেটা বাষ্প করে দেয়। সেই বাষ্পের চাপে এঞ্জিন প্রভৃতি চলে। সূর্য্য-মোটরের একটা সুবিধা এই যে এর চালাবার খরচ খুব কম। কয়লা ও পেট্রোল প্রভৃতির মত সূর্য্য-কিরণের জন্য তো আর দাম দিতে হয় না।

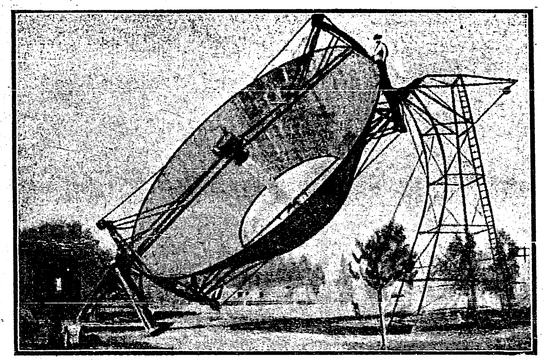

ধাঁধার উত্তর

১। **শিকল জোড়া দেওয়া**—শিকলের এক একটি আংটা কাটতে ও জুড়তে মোট ১/০ খরচ লাগে। কাজেই ৯টি আংটা কাটতে ও জুড়তে গেলে খরচ পড়বে ১৷৷১/০, অথচ নূতন শিকলের দাম তার থেকে কম। তার চেয়ে যদি ৮-আংটাওয়ালা টুকরোটির সব কয়টি আংটা কেটে ফেলা যায়, তবে সেই ৮টি কাটা আংটা দিয়ে বাকি ৮ টুকরো শিকল জুড়ে ফেলা যাবে। তাতে খরচ পড়বে মোট ১৷৷০ আনা। তার চেয়েও কম খরচে করা যায়, যদি ৩ ও ৪-আংটাওয়ালা টুকরো দু'টির আংটাগুলি কেটে ফেলা যায়। তখন সেই ৭টি আংটা দিয়ে বাকি ৭টি টুকরো জোড়া যাবে, এবং খরচ তাতে পড়বে মাত্র ১।/০ আনা।

২। **গড় পড়তার হিসাব**—গরপড়তা বেগ (Speed), ঘণ্টায় ১২ মাইল।

উত্তর দাতাগণের নাম

কয়েক মাস হইতে ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম "সন্দেশে" প্রকাশ করা হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে সে স্থানে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা বেশী করিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যেই নাম ছাপান বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু অনেক গ্রাহক গ্রাহিকার অনুরোধে আমরা শ্রাবন সংখ্যা হইতে পূর্ব্বের মত ধাঁধার উত্তরদাতাগণের নাম বাহির করিব। —সঃ সঃ

—*—

নূতন ধাঁধা

প্রাচীর সমস্যা—এক ভদ্রলোক একটি গোল জমির উপর ৪টি বাড়ী তৈরী করেছিলেন। জমিটার চার দিকে গোল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। তিনি স্থির করলেন যে জমিটার মধ্যেও নূতন প্রাচীর দিয়ে বাড়ীগুলিকে এমন ভাবে পৃথক করে দেবেন, যাতে প্রত্যেক বাড়ীর অংশেই একই আকারের ও একই পরিমাণ জমি পড়ে। নূতন প্রাচীর বাঁকা লাইনের হ'লে চলবে না, সোজা লাইনের হওয়া চাই। কি ভাবে প্রাচীর দিতে হবে তোমরা বলতে পার কি?

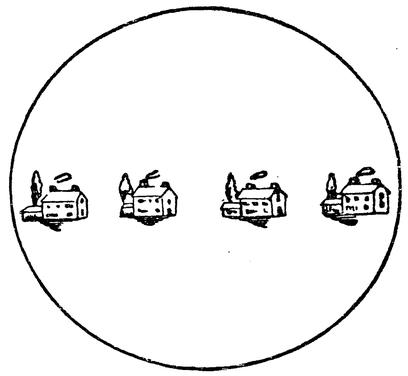

মাছের হিসাব—ফটিক দুই থলি মাছ নিয়ে আসছিল। কতগুলি মাছ পেয়েছে জিজ্ঞাসা করায় সে ওস্তাদী করে বললো,—"১ম থলির মাছ যদি ১০গুণ করে ২য় থলির মাছের সঙ্গে যোগ করা যায় তবে মোট ৬৭টি মাছ হবে। আবার ২য় থলির মাছ ৭গুণ করে ১ম থলির মাছের সঙ্গে যোগ করলে মোট ৫৫টি মাছ পাওয়া যাবে।" তোমরা বল দেখি কোন্ থলিতে কত মাছ ছিল।

—(শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়—গ্রাহক নং ২১৭৯)

ছেলেমেয়েদের জন্য

কয়েকখানি বাছাই বই

এগুলির পরিচয় ছেলেমেয়েদের কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যেমনি সরস সুন্দর ভাষা, তেমনি চমৎকার চমৎকার এক রঙের ও ৩-রঙের ছবি। মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত, এবং ডিরেক্টর-অব-পাবলিক-ইনস্ট্রাকসন কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র ...	॥০	কথাসরিৎ সাগর ...	॥৵০
,, বেতাল পঞ্চবিংশতি	॥০	রবিন্ হুড্	॥৵০
,, বত্রিশ সিংহাসন	॥০	ওডিসিয়ুস	।৵০
পুরাণের গল্প ...	॥০	ইলিয়াড	।৵০

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

নূতন সংস্করণ

স্বাস্থ্য

পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত

১। পড়া শুনা ।৵০

২। খেলার পড়া ।৶০

বই দুইখানির নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

স্বাস্থ্যের কথা ছেলেমেয়েদের জন্য অতি সরল সরস ভাবে লেখা। ভাল কাগজে, বড় অক্ষরে, পরিষ্কার ছাপা। অনেকগুলি ছোট ছবি, সুন্দর মলাট। মূল্য—ছয় আনা

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম-এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Regd. No. C 700.

দি সান্ অপ্‌টিকাল কোম্পানি

নিখুঁত চোখ পরীক্ষা
এবং চশমা ফিটিংএর
— জন্য অদ্বিতীয় —

২৪।১ কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—বড়বাজার ২১৬৫

নূতন সংস্করণ ! নূতন সংস্করণ !

সচিত্র

মহাভারতের গল্প

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত
৩য় সংস্করণ। দাম—১।০

মহাভারতের ৬৬টি বাছাই সুন্দর সুন্দর গল্প, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অতুলনীয় সরস ভাষায় লেখা। তাঁহার নিজের আঁকা একখানি ৩-রঙের ছবি ও অনেক গুলি এক-রঙের ছবিতে বইখানি আরো মনোরম হয়েছে। ছেলেমেয়েদের অতি সুন্দর বই। ঝকঝকে পরিষ্কার ছাপা; চমৎকার বোর্ড বাঁধাই।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,
১১৭।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা



বার্ষিক ২৷৵০ আনা
প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

COLOURED DOCUMENT.

—দেশনায়কগণের অভিমত—

যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য

দেশপূজ্য
৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির
অভিমত

"আমি মিঃ এইচ, বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে ইহাই ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।"

স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জননেতা
লালা লাজপৎ রায়ের
অভিমত

"আমি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি মিঃ এইচ, বসুর "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" বাস্তবিক ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধ অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"

স্বাঃ লালা লাজপৎ রায়

কেশতৈল—কুন্তলীন, কোকোলীন, ম্যাকেসার, চামেলীন প্রভৃতি।

হেয়ার লোসন—দেলখোস, দিলতোষ, হার্টস্ ডিলাইট, প্রভৃতি।

পমেটম—দেলখোস পমেড, গোলাপ ও বকুল পমেটম প্রভৃতি।

এসেন্স—দেলখোস, হোয়াইট রোজ, অপরাজিতা, বকুল, মাস্ক, যুঁই, বেলা, চামেলী, খস, অরিগ্যান প্রভৃতি নানা সিরিজের বিবিধ প্রকার সুগন্ধি।

নানাবিধ অটো, হেয়ারওয়াস, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, লাইম যুস ও গ্লিসারিন ক্রীম এবং স্নো প্রভৃতি।

সাবান—হোয়াইট রোজ, চন্দন, খসখস, মাস্ক, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ ফলের সিরাপ।

এইচ, বসু, পারফিউমার,
৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বিশ্ববরেণ্য
রবীন্দ্রনাথ
বলেন

"কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহারে একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক
৺মতিলাল নেহেরুর
অভিমত

"ভারতবর্ষের প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এইচ, বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



নতুন ছাতা যে !

সন্দেশ

নব পর্য্যায়
৩য় বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৪১

১১শ সংখ্যা

নতুন ছাতা যে !!

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

বিকেল বেলা মাঠের পথে
চলেছিলাম ভাই,—
সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টিধারা
নাম্‌লো সহসাই :
ওঃ কী ভীষণ বৃষ্টিরে ভাই,
ভাব্‌তে পার না,
আকাশ যেন পড়ছে ভেঙ্গে,
—হচ্ছে ধারণা।
গুরুম্‌ গুরুম্‌ মেঘের ডাকে
আঁৎকে ওঠে প্রাণ,
মাঠেই মারা গেলাম বুঝি,—
হায়রে ভগবান!

COLOURED DOCUMENT.

জলের তোড়ে বন্যা এলো
জলার পাশে ওই,
পাথর ছিল তার উপরে
চুপ্‌টি ক'রে রই।
আঃ কি আপদ, এম্‌নি ধারা
ভিজব কতক্ষণ ?
ডুব্‌ল জলে ব্যাঙের ছাতা,
কচু গাছের বন।
ঝোড়ো কাকের মতন দেখে
আমার দশাটাই
ফচ্‌কে ব্যাঙা মুচ্‌কি হেসে
ভ্যাঙায় এসে তাই।
ঝম্‌ ঝমা ঝম্‌ বৃষ্টি ঝরে,—
ঈস্‌, কি করি আর !
জলের স্রোতে পথ ভেসেছে,
ডুব্‌ল চারিধার।
সর্দ্দিকাশী লেগেই আছে
শরীর ভাল নয়,
এমনি ধারা বৃষ্টি ভেজা
উচিত নাহি হয়।
ভিজ্‌ল জামা, ভিজ্‌ল জুতো,
ভিজ্‌ল মাথা যে,
কেমন ক'রে খুল্‌ব ছাতা ?—
"নতুন ছাতা" যে !

"ক্ষিপ্রপদ ক্ষেত্রপদ"

(শ্রীসুবিনয় রায়)

রণজয়ের চেহারাখানা বেশ—দিব্য বলিষ্ঠ ; হাতে, পায়ে সুন্দর মাংসপেশী বা মাস্‌ল্‌ (Muscle)। খেলাধূলায় তা'র খুব সখ—বিশেষতঃ ফুটবলে। সে নাকি আগে চিট্‌-টুনের শিষ্য ছিল ; এখন আর তা'র গুরুর দরকার নেই—গুরুর চেয়েও নাকি সে এখন বড়। ফুটবলে সে আর অল্পদিনেই 'গোষ্ঠপাল' হবে।

পাশের বাড়ীতে অজয়রা থাকে। সে বেচারা নিতান্ত ছেলেমানুষ ; এখনও জিম্‌নাষ্টিক বা এক্সারসাইজ আরম্ভ করে নি। রণজয় রোজ তাদের বাড়ীতে আসে আর প্রায়ই তা'কে ঠাট্টা করে—"আতুরে-গোপাল হয়ে থাক্‌লে পৃথিবীতে কোন কাজ করা যায় না। যেমন তোর নাম, তেমন তুই কাজেও হবি। 'অ-জয়'-মানে, কাউকে জয় কর্‌তে পার্‌বি না কোনদিনই। নামের গোড়াতেই 'অ জ'—তা'র মানেই ছাগ্‌লা ;—তা' হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌। তা' ছাড়া 'অ জ পাড়াগেঁয়ে' 'অজ মূর্খ'—আরো কত কিছু হ'তে পারে। কোনটাই তো আর সুবিধার নয় !"

অজয় বেচারা ছেলেমানুষ ; সে কিছু বলে না। আর, ব'লেই বা কি হবে ? রণজয়ের সঙ্গে তো আর কথায় পেরে উঠ্‌তে পারে না সে ! কাজেই চুপ্‌টি ক'রে শোনে।

ক্ষেত্রপদ অজয়ের বন্ধু। সে অজয়ের স্কুলেই পড়ে ;—দু' ক্লাস ওপরে। তা'র ছবি আঁকা আর মূর্ত্তি গড়ায় আশ্চর্য্য হাত আছে ; যে দেখে সেই প্রশংসা করে—বাদে রণজয়। কেন জানি না, ক্ষেত্রপদকে সে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। তা'র আঁকা নাকি 'রাবিশ', রং দেওয়া নাকি 'দেওয়ালে চুণকামের মত', আইডিয়া নাকি 'মগজে ঢুক্‌বার জায়গাই নাই', মূর্ত্তি গড়া নাকি 'কুমোরের মাটির পুতুলের অধম' —ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্ষেত্রপদ নানারকম জন্তুর মূর্ত্তি গড়ে স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়েছিল ; তা'র জন্য সে 'গোল্ড মেডেল' পেয়েছে আর সেই মূর্ত্তিগুলি স্কুলের লাইব্রেরীতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রণজয় মাঝে মাঝে ক্ষেত্রপদকে জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁরে, তোর সেই ঘুঁটের মেডেলটা কোথায় রে ?"

ক্ষেত্রপদও কথায় বেশী পটু নয়; সে বিশেষ কোন জবাব দেয় না।

সেদিন বিকালে অজয়ের জন্মদিনে রণজয় আর ক্ষেত্রপদর নেমন্তন্ন হয়েছিল। ক্ষেত্রপদ নিজের হাতে ফুটবল খেলোয়াড়ের একটা সুন্দর মূর্ত্তি গ'ড়ে অজয়কে জন্মদিনে উপহার দিল। মূর্ত্তিটি ভারি সুন্দর হয়েছিল;—একজন খেলোয়াড় বল 'কিক্' কর্‌ছে। রণজয় অনেকক্ষণ মূর্ত্তিটা দেখে, তা'র বিশেষ কোন দোষ ধর্‌তে না পেরে বল্‌ল, "এইবারে বাবা যাবে কোথায়? আমায় দেখে মূর্ত্তিটি গড়েছ তা' কি আর বুঝ্‌তে পারি না? সে দি ন গোরাদের সঙ্গে খেলা হচ্ছিল; —দুটো গোরা আমার দিকে তেড়ে এলো আর আমি মাঝখান দি য়ে দা রু ণ এ ক 'কি ক্' বসালাম। এতো তা'রই হুবহু মূর্ত্তি। নকল করা ছাড়া তোমার ঘটে আর কিছু বুদ্ধি লেখে নি!"



ক্ষেত্রপদ বল্‌ল, "আমি সে খেলা দেখ্‌তেও যাই নি। এ মূর্ত্তি আমার মাথা থেকেই ভেবে করা।" রণজয় অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্‌ল, "মিছে কথাটাও একটু ভেবেচিন্তে বল্‌তে হয় দাদা!" অজয় বল্‌ল, "কেন! সেদিন তো তুমি নিজেই খেলার পর এসে আমাকে আর ক্ষেত্রপদকে বল্‌লে 'তোরা খেলা দেখ্‌তে গেলি না? এমন খেলাই দেখিস্ নি জীবনে'—ব'লে খেলার কত বিবরণ দিলে আমাদের।" রণজয় কোন উত্তর দিল না।

বিকালে খাবার পর সকলে মিলে বাগানে খেলা কর্‌তে গেল। একটা রবারের বল নিয়ে লোফালুফি কর্‌তে কর্‌তে রণজয় হঠাৎ আনাড়ির মত বলটাকে এমন জোরে আর এত উঁচু ছুঁড়ে মার্‌ল যে একেবারে পাশের বাড়ীতে পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়্‌ল। রণজয় কিন্তু দম্‌বার পাত্র নয়। সে ক্ষেত্রপদকে দেখিয়ে

বল্‌ল, "এই আনাড়িটার জন্যই তো বলটা উড়্‌ল। ফুটবল খেলা যদি জান্‌ত তা' হ'লে আর বলটাকে যেতে দিত না;—লাফিয়ে খপ্ ক'রে ধরে ফেল্‌ত।" ক্ষেত্রপদ বল্‌ল, "আনাড়ির মত নিজে ছুঁড়ে এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা!" "রণজয় একটুও না দ'মে বল্‌ল, "থাক্! থাক্! আর চাল মেরো না। আমি তো দক্ষিণ দিকে বল ফেলেছি; আর তুমি যে তখন উত্তর দিকে ছুঁড়েছিলে—একটু হ'লেই তো পাশের বাড়ীর উঠোনে গিয়ে পড়্‌ত। ওদের মেঝো মামার মাথায় একটিবার পড়্‌লে তখন বুঝ্‌তে ঠেলা! তিনি যা রাগী! বলটা নিয়েই চেপ্টে, ছিঁড়ে, টুকরো টুকরো ক'রে উনুনে ফেলে দিতেন। তারপর যখন রবার-পোড়া গন্ধ বের হ'তো তখন দেখ্‌তে মজাখানা। রাস্তায় বের্‌টি হ'তে আর ঘ্যাঁক্ ক'রে টুঁটি চেপে ধর্‌তেন!"

ক্ষেত্রপদ আর অজয় কিছু বল্‌ল না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল ব'লে রণজয় আর ক্ষেত্রপদ যা'র যা'র বাড়ী ফিরে গেল।

* * * *

ক্ষেত্রপদ আর অজয় পড়ে গিরীশ একাডেমিতে; রণজয় পড়ে হাইস্কুলে। দুই স্কুলে বৎসরে একবার ফুটবল ম্যাচ্ হয়। গত বৎসর হাইস্কুল ৪ 'গোলে' জিতে-ছিল; এবারও আশা আছে ৩।৪ 'গোলে' জিত্‌বে। হাই স্কুলের গোল-কিপার হরিশ খুব নামজাদা খেলোয়াড়; 'ব্যাকে' রণজয়ও নাকি খুব ভাল খেলে। অনেকে বলে, রণজয় ভাবী 'গোষ্ঠ পাল'। 'হাফ-ব্যাকে' ধীরেশ আর 'ফরোয়ার্ডে' কণক, রবি, বিজয়, সকলেই ওস্তাদ খেলোয়াড়।

আজ বিকালে কেল্লার ময়দানে ম্যাচ হবে। সকাল থেকে রণজয় খেলার কথাই ভাব্‌ছে। দুপুরে টিফিনের সময় খেলোয়াড়েরা একত্র হয়ে খুব জমাট মজ্‌লিস্ বসাল। কেমন করে কে গোল দেবে তারই পরামর্শ চল্‌তে লাগ্‌ল। রণজয় বল্‌ল, "কালকের কাগজে হয়তো লিখ্‌বে, সাবাস হাইস্কুল!"

বিকালে ময়দানে ভীড় কিছু কম হয় নি। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এসেছেন; উকিল, মোক্তার, ডাক্তার,—কেউ বাদ যান্ নি। একজন রিপোর্টারও এসেছেন 'সরস সমাচার' থেকে।

ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় যখন দুটি টীম মাঠে নাম্‌ল তখন চারিদিকে কি উৎসাহ! রণজয় খুব ষ্টাইল করে নী-ক্যাপ্‌ (Knee-cap) লাগিয়ে খেল্‌তে নেমেছে আর চারিদিকে হুকুম দিচ্ছে। হঠাৎ সে চেয়ে দেখে, সাম্নে ছোট্টখাট্ট ক্ষেত্রপদ দাঁড়িয়ে। ও হরি! ওদের কি আর ফরোয়ার্ড জুটল না? এই টীম নিয়ে খেল্‌তে আস্‌তে ওদের কি লজ্জাও হ'লো না?

খেলার কথা বেশী ব'লে আর দরকার নেই। শুধু এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে ক্ষেত্রপদ ১৩ বার রণজয়কে কাটিয়ে বল নিয়ে গিয়েছিল আর সে নিজেই দুটো গোল দিয়েছিল। গিরীশ একাডেমি সেদিন দু'গোলেই জিত্‌ল।

খেলার পর সকলে ক্ষেত্রপদকে কাঁধে নিয়ে নেচেছিল আর রণজয় মুখ চুণ ক'রে সেই যে খেলার মাঠ থেকে দৌড় দিল, একেবারে নিজের ঘরে গিয়ে থাম্‌ল। রাত্রে তা'র নাকি ক্ষিধে হয় নি। সে এক ঘুমে রাত কাবার করে দিল।

পরের দিন সকাল বেলায় "সরস সমাচার" ম্যাচের কথা লিখ্‌তে গিয়ে বড় বড় অক্ষরে হেডিং দিল।—

"রণজয়ের পরাজয়"
"ক্ষিপ্রপদ ক্ষেত্রপদ"

রণজয় বিড়বিড় ক'রে বল্‌ল, "নিশ্চয় ঘুষ দিয়েছে, নইলে হেডিং অমন ক'রে লিখ্‌তে পারে কখনও? দেখে নেবো আস্‌ছে বছর! তখন বেরোবে ক্ষিপ্রপদমী।"

* * * *

কয়েক দিন বাদে ক্ষেত্রপদর জন্মদিনে রণজয়ের নেমন্তন্ন হ'লো। "কি করা যায়?" রণজয়ের তো মহা সমস্যা। দেখা হ'লে কি বল্‌বে তাই ভেবেই সে অস্থির। অথচ নেমন্তন্নটাও ছাড়া যায় না। ক্ষেত্রপদদের মগ্‌ খান্‌সামা রাঁধে চমৎকার। কাজেই, সাহসে ভর ক'রে সে যেতে প্রস্তুত হ'লো।

বিকালে স্কুল থেকে ফিরে, হাত মুখ ধুয়ে রণজয় ক্ষেত্রপদর বাড়ী গেল। বাইরের বাড়ীর বৈঠকখানা দিয়ে ঢুকে, উঠোন পেরিয়ে, ভিতরের একটা ঘরে ক্ষেত্রপদর বন্ধুরা সব জড় হচ্ছে। রণজয় সেখানে পৌঁছেই দেখ্‌ল, ঘরের এক

অন্ধকার কোণায়, একটু উঁচুতে কোণাকুণি ভাবে একটি লোহার ডাণ্ডা লাগান আছে; তা'র উপর একটা পেঁচার মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটা বাস্তবিকই খুব স্বাভাবিক।

একেই তো মেজাজ বিগড়ে আছে; তার উপর অমন সুন্দর স্বাভাবিক মূর্ত্তিটি দেখে হিংসায় সে জ্বলে উঠ্‌ল। পেঁচাটার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বল্‌তে লাগ্‌ল, "যা না পেঁচা বানিয়েছেন! হয়তো হনলুলু কিম্বা ম্যাডাগাস্কারে ঐ রকম পেঁচা থাক্‌তে পারে; আমাদের দেশে তো ওরকমের পেঁচা জন্মে দেখিনি। পেঁচার গায়ের রং ওরকম তো হ'তেই পারে না; তা' ছাড়া, পেঁচার মাথাও অত বড় কোন দিনই হয় না। গায়ের পালক হয়েছে যেন পাকান দড়ি; মাথার ঝুঁটি দুটো যেন দুই টিকি। পা দু'খানা একবার দেখ;—যেন হাতীর পা। আর, পেঁচা কখনও ঐ রকম ক'রে বসে থাক্‌তে পারে? ওরকম বস্‌বার চেষ্টা কর্‌লেই একেবারে চিৎপটাং হবে।"

এত কথা বল্‌তে বল্‌তে ক্ষেত্রপদর অন্যান্য বন্ধুরা এসে পড়্‌ল। তা'রা রণজয়ের মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে সব কথা শুন্‌ছিল। কেউ কেউ পেঁচাটাকে দেখ্‌তে পেয়েছিল; কেউ কেউ দেখ্‌তেও পায় নি।

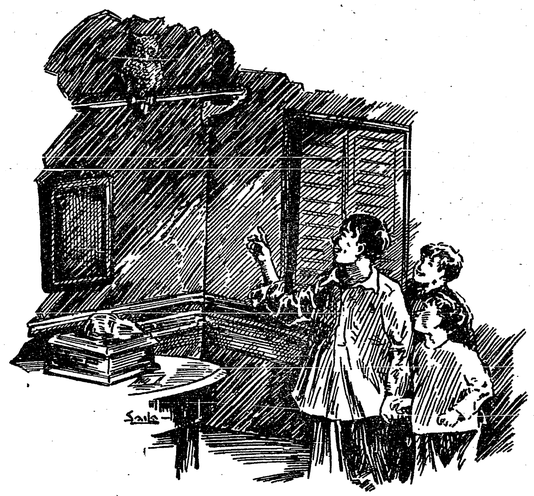

সকলকে আস্‌তে দেখে রণজয় আরো উৎসাহ ক'রে বল্‌ল, "পেঁচাটা দেখেছ তো? কি ছিরিরই বানিয়েছে! যেমন তা'র গড়ন, তেমন তা'র ভঙ্গি! হাতীতে আর আরশুলায় যত তফাৎ, এতে আর আসল পেঁচায় তার চেয়েও বেশী তফাৎ। একে কিনা আবার সকলে প্রশংসা করে!

হঠাৎ মনে হ'লো পেঁচাটার চোখ যেন একবার ঘুর্‌ল, আর পেঁচাটার মুখে

যেন হাসি-হাসি ভাব দেখাল। রণজয় একটু চম্‌কে উঠে হাঁ ক'রে তাকাল। মনে মনে ভাব্‌ল, "ছেলেটার ওস্তাদী আছে; ভিতরে এমন কল লাগিয়েছে যে কায়দা করে পেঁচাটা চোখ ঘোরাতে পারে, মুচ্‌কি হাসে!

ধীরেন বেচারা চোখে ভাল ক'রে দেখ্‌তে পায় না। সে একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "পেঁচা পেঁচা কি বল্‌ছ? কোথায় পেঁচা?"

রণজয় বল্‌ল, "আরে, তালকাণা! এটাও দেখ্‌তে পাও না—" ব'লে সে একটা ছোট ডাণ্ডা হাতে তুলে নিয়ে পেঁচাটার দিকে দেখিয়ে দিল।

যেমন ডাণ্ডা তোলা, অম্নি "স্যাঁ—াঁ—াঁ" আওয়াজ ক'রে সেই পেঁচা শূন্যে উড়্‌ল আর দু'চার বার ঘরের চারিদিকে ঘুরে, জানালা দিয়ে বাইরে উড়ে গেল।

রণজয়কে যদি তখন দেখ্‌তে! বেচারা তো চম্‌কে উঠে একেবারে চিৎপটাং! অন্য কেউ দেখ্‌বার আগেই সে উঠে একেবারে চোঁ চোঁ দৌড়্। বাইরের ঘরে মিস্ত্রীদের লাল রঙের বাল্‌তি ছিল, তা'তে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়ে হাতে মুখে লাল রং লেগে গেল, পায়ে একটু চোটও লাগ্‌ল। বাড়ী গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়েই হাত মুখ বেশ ক'রে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌ল; কিন্তু মুখ থেকে লাল রংএর আভা গেল না!

* * * *

পরদিন ইস্কুলে যাবার সময় ছেলেরা তা'র লাল মুখ দেখে তা'কে 'নকল সাহেব' 'রেড্‌-সী ফেরৎ' ইত্যাদি নানারকম ঠাট্টার কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। বেচারা তখন চুপ ক'রে সব কথা সহ্য ক'রে গেল,—পাছে কাউকে লাল-মুখের কারণ বল্‌তে হয়।

যাক্‌গে সে কথা। মোটের উপর ফল হ'লো এই, তা'র পর থেকেই ক্ষেত্রপদর সঙ্গে তা'র গলাগলি ভাব হয়ে গেল, আর সে হাই স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে গিরীশ একাডেমিতে ভর্ত্তি হয়ে গেল।



জীবজন্তুর কথা

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

গাছ-জানোয়ার—১

তোমাদের যদি একদল লোকের সঙ্গে একটা দ্বীপে ছেড়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে কি ক'রো বলতো। নিজেদের মধ্যে কাজগুলি তোমরা ভাগ ক'রে নেও, কেমন? কেউ যাও ঘরবাড়ী তৈরী কর্‌তে, কেউবা যাও খাবারের জোগাড়ে। আমাদের শরীরেও তেম্‌নি। আগের মাসে প্রোটোজোয়াদের কথা তোমাদের বলেছি; তাদের শরীরে মাত্র একটি কোষ, তাদের সব কাজই কর্‌তে হয় ঐ একটি কোষ দিয়ে। কিন্তু আমাদের শরীরে যেই কোষ বাড়্‌লো, অম্‌নি কাজ ভাগ করবার পালা সুরু হ'লো। একদল গেল খাবার চিবুতে, একদল গেল ভাত মাখ্‌তে। আজ তোমাদের এমন একটা জন্তুর কথা বল্‌বো যার শরীরে অনেক কোষ আছে বটে কিন্তু তা'তে কাজের খুব বেশী সুবিধা সে কর্‌তে পারেনি।—সে হ'লো স্পঞ্জ।



এঁরা জাতে ছোট হ'লেও বাস ক'রেন বড় জায়গায়। চারিদিকে সমুদ্রের মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ্‌ছো তো। এ স্পঞ্জটা দেখ্‌তে বেশ মজার—মনে হয় যেন একটা হাতের আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে আছে।

স্পঞ্জের নাম শোননি এমন ছেলে মেয়ে বোধ হয় কেউ নেই। বাগবাজারের স্পঞ্জ রসগোল্লার নামে তো তোমাদের জিভেই জল গড়ায়।

তোমরা অনেকে হয় তো স্নান করবার সময় গা রগ্‌ড়াবার জন্য স্পঞ্জ ব্যবহার

কর। কিন্তু ভাবতে পারো কি ঐ স্পঞ্জ ভদ্রলোক একদিন জীবন্ত ছিলেন? এর দেহে ঠিক আমাদেরি মত একটা অনুভূতি, একটা সুখ দুঃখ বোধ ছিল? ভাব্‌তে পারো কি, এরও খাওয়া দাওয়ার জন্য কাজ কর্‌তে হ'তো?

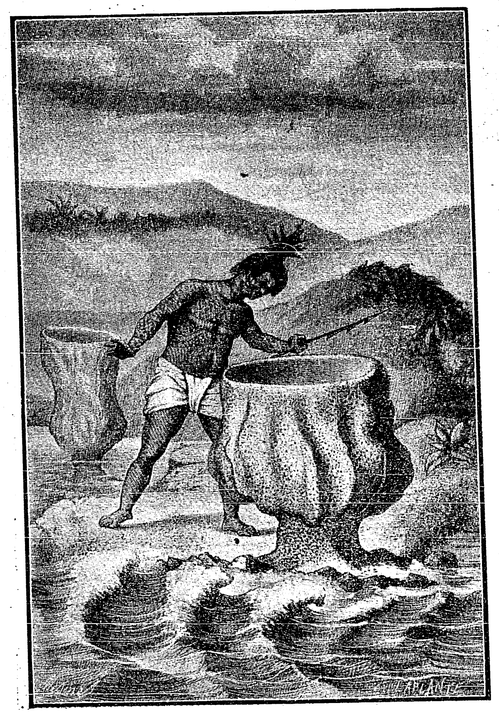

এই অদ্ভুত প্রকাণ্ড বাটীর মত জিনিষটা হ'লো একটা স্পঞ্জ। সমুদ্রের বুকে এরা ভেসে ভেসে থাকে, তাই নাবিকেরা এদের নাম দিয়েছে, Neptune's Cup বা জলদেবতার পেয়ালা।

পুকুর পাড়ে ঘুরে বেড়ালে মধ্যে মধ্যে দু'একটা স্পঞ্জ জুটে গেলেও যেতে পারে, শ্যাওলার মত চেহারার। কিন্তু এদের আসল আস্তানা হ'লো সমুদ্রে। এঁরা জাতে ছোট হ'লেও বাস ক'রেন বড় জায়গায়।

তোমরা হয় তো ভাব্‌ছো স্পঞ্জ আমার এমন কি ক্ষতিটা করলো যে তাকে যা তা ব'লে গালাগাল করছি। আসলে গালাগাল আমি মোটেও কর্‌ছিনে। তবে সত্যি কথা বল্‌লে বল্‌তে হয় যে স্পঞ্জরা কুলে শীলে মানে খুব বেশী কুলিন নন। দেখেছো তো মানুষরা কেমন হাত পা তৈরী করে ভাত ডাল মেখে খায়; বাঘ, সিংহী, দাঁত মুখ তৈরী করে কাজের সুবিধা করেছে। মাছ যে মাছ, সেও চলবার জন্যে পাখ্‌না করেছে। কিন্তু স্পঞ্জ, গাছ না জন্তু তাই বোঝা মুস্কিল! 'আমিবা' যাও চল্‌তে পারে এ তাও পারে না। কিন্তু তা

হ'লে হবে কি, 'আমিবা'র শরীরে একটি মাত্র কোষ, এর শরীরে অনেক; কাজেই 'আমিবা'কে দেখে নাক উঁচু করবার দাবী এর আছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তার থেকে একটু উপরে উঠ্‌তে গেলেই অন্য জন্তুরা সব তেড়ে বল্‌বে, 'চুপ রও ছোট লোক'।

এঁরা নানা রঙের নানা চেহারার হয়ে থাকেন। কেউ বা খুব ছোট ছোট, আবার কেউ কেউ হন খুব মস্ত মস্ত—তোমাদের অনেকের মত প্রায় ৪।৫ ফুট উঁচু। কেউ বা দেখতে গাছের মত, কেউ বা পেয়ালার মত, কেউ বা ফানেলের (funnel) মত, এইরূপ ছোট বড় নানা চেহারার স্পঞ্জ দেখতে পাওয়া যায়। ছবিতে

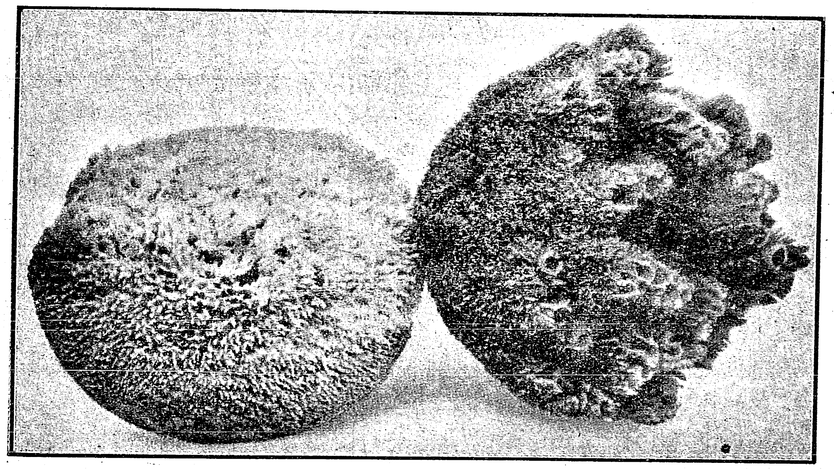

সাধারণ ঘেসো স্পঞ্জ (common grass sponge)—ডান দিকেরটি আছাঁটা অবস্থায়; বাঁ দিকেরটি কেটে ছেঁটে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়েছে।

দেখছো, সারা গায়ে এদের কেমন অসংখ্য ছিদ্র থাকে? এরই জন্য তো পণ্ডিতেরা এদের নাম দিয়েছেন Porifera অর্থাৎ বহু ছ্যাঁদাওয়ালা জীব।

ছবিতে যে চেহারা দেখ্‌ছো এ কিন্তু এর আদত চেহারা নয়। এ হ'লো এর ছোব্‌রা বা দেহের কাঠামো। পরের ছবিতে একটা ছোট জীবন্ত স্পঞ্জের

আদত ছবি দেওয়া হয়েছে। কেমন একটা তাঁবুর মত চেহারা, নয় কি? আসলে স্পঞ্জ ভায়ার চেহারাটা তোমরা যা দেখ সেরকম সে মোটেই নয়। তার সারা শরীরে ছোট ছোট কাঁটা বেরিয়ে থাকে, তার উপরে একরাশ কোষ একখানা পর্দ্দার মত চারিদিক ঘিরে থাকে। আর সেই পর্দ্দা ছ্যাঁদা ক'রে এর অসংখ্য মুখ। এই ছ্যাঁদাগুলি ভালো ক'রে দেখ্‌লে দেখা যায়, এদের কতগুলি হ'লো বড় আর কতগুলি ছোট। এই ছোট ছ্যাঁদা



একটা ছোট জ্যান্ত স্পঞ্জের আবরণ-সমেত চেহারা।

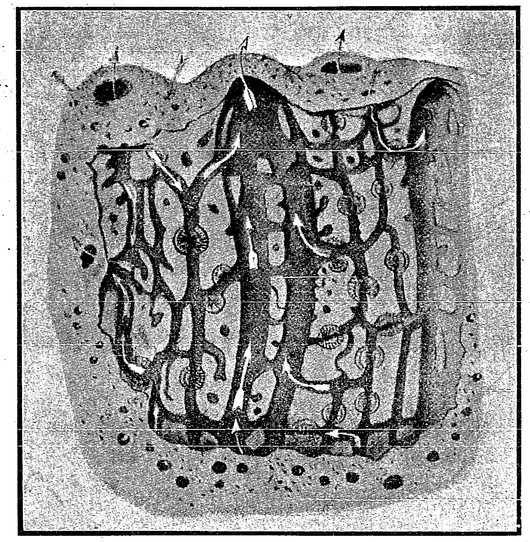

ছবিটা দেখ্‌লে স্পঞ্জের জলযোগের ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পার্‌বে। ছোট ছ্যাঁদা দিয়ে নলের মধ্যে জল ঢুকে কি রকম করে আবার বড় ছ্যাঁদা দিয়ে বেড়িয়ে যায় তা ছবিতে তীর-গুলি এঁকে দেখানো হয়েছে।

দিয়ে এক একটা নলে ঢুক্‌তে পারা যায়, তারই পাশে পাশে আবার ছোট ছোট কোষ; সো জা কথায় নলের দেয়াল তৈরী হ'লো ইঁটের মত পর পর কোষ সাজিয়ে; কোষগুলির আবার এক একটী ক'রে লেজ আছে। এরা সবেগে লেজ নাড়েন, আর সঙ্গে সঙ্গে জল এই নল দিয়ে ভেতরে ঢোকে। আর এই জলের সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে অক্সিজেন আর খাবার। কিন্তু খাবার খেতে হবে তো! তারও ব্যবস্থা

আছে চমৎকার। সেই নল বা পেটের জলে একদল 'আমিবা' ঘুরে বেড়ান। এই আমিবারা অবশ্য বাইরে থেকে আসেনা, এরা শরীরের মধ্যেই থাকে। অন্য আমিবার মতই সুডোপোডিয়া বের করে এরা খাবার খায়। খেয়ে তারপর ছড়িয়ে দেয় স্পঞ্জের সমস্ত শরীরে। বেশ মজার নয় কি?'

কিন্তু স্পঞ্জগুলি কি পেটুক দেখ। ঐ অত গুলি ছ্যাঁদা হ'লো ওদের মুখ, আর প্রত্যেক



জল থেকে খাবার নিয়ে খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর বড় বড় ছ্যাঁদাগুলি দিয়ে জল বের করে দেয়।



স্পঞ্জের নল বা পেট—'ক' হলেন কোষ; ইনি ল্যাজ নাড়েন আর তারই টানে মুখে জল ঢোকে। 'খ' দিয়ে হ'লো তাঁবুর চাদর তৈরী; 'গ'-এর দল হ'লো 'আমিবা'রা—চারিদিকে হাত পা দেখেই বোধ হয় চিনেছো; ভুঁড়িতে এদের কত খাবার জমেছে দেখ।

ছ্যাঁদা দিয়ে ঢুক্‌তে পারা যায় এক একটা পেটে। রাবণের মুখ ছিল দশটা কিন্তু পেট ছিল একটী। ইনি তারও উপরে যান। এঁর সহস্রটি মুখতো আছেই আবার পেটও আছে ততটী!

খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে জলটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বড় ছ্যাঁদা দিয়ে বাইরে চালান দেওয়া হয়। কাজেই জ্যান্ত জীবটির চেহারাটা যে কি রকম হয় তা বুঝ্‌তেই

পার্‌ছো ;—যেন সহস্রমুখী ফোয়ারা আর কি!

কিন্তু মুস্কিল হ'লো ঐ সব কোষগুলির থাকা নিয়ে। পর পর দাঁড়িয়ে গেলেই তো আর হয়না, একটা কিছু বাঁধা ধরা চেহারা কর্‌তে গেলেই একটা অবলম্বন দরকার। অর্থাৎ আমাদের যেমন হাড় রয়েছে তেম্‌নি একটা কাঠামো চাইতো। এদেরও তা আছে, কাঁচের মত জিনিষ দিয়ে তৈরী। তারই বা রকম কত। ছবিটা দেখলেই বুঝবে।

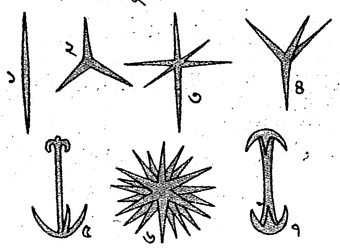

স্পঞ্জের কাঠামোর নক্সা কত কত রকম দেখ। কেউবা সোজা দাঁড়িয়ে, কেউবা হ'লো ত্রিকোণী, কেউবা লাঙলমুখো, কেউবা আবার তারার মত।

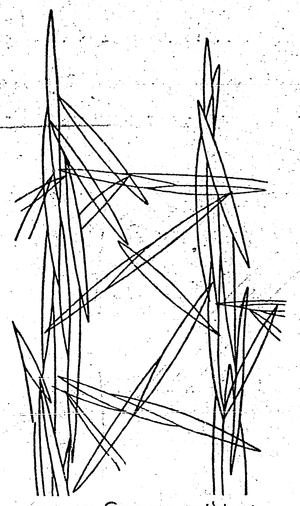

স্পঞ্জের ভিতরের কাঠামো।

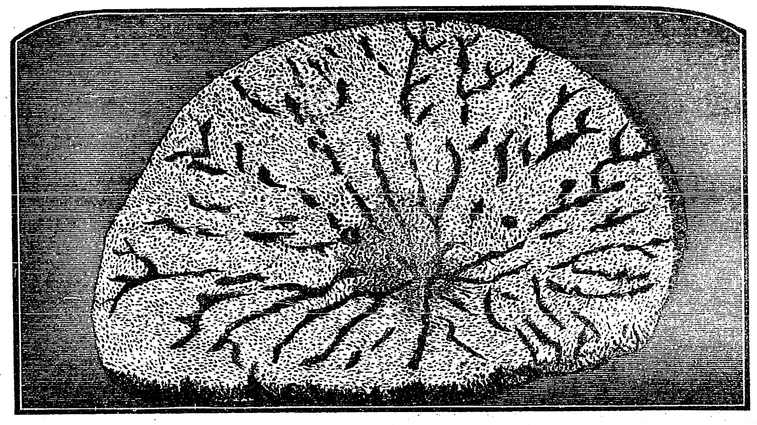

চেহারা দেখে একে একখানা পাথর বলে মনে হচ্ছে তো। ইনি এক রকম স্পঞ্জ, কিন্তু ভীষণ শক্ত। এর নাম হ'চ্ছে, Pumice-stone স্পঞ্জ।

এই হাড়গুলি প্রায়ই জোড়া লাগানো থাকে স্পঞ্জটির চেহারামাফিক একটা আবরণ দিয়ে। বাজারে যে স্পঞ্জ বিক্রী হয় তা এই খোলসটাই।

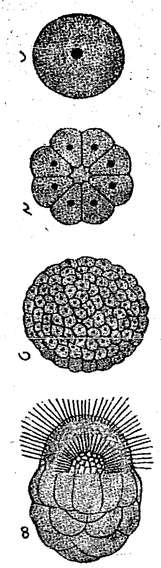



দু'টিতে মিলে হ'লো একটী কোষ; পরে তাই ভাগ ভাগ হয়ে কেমন হ'ল দেখ। ৪র্থতে তার দাড়ী গজিয়েছে। শেষ ছবিতে তার অর্দ্ধ চন্দ্রাকার অবস্থা দেখতে পাচ্ছো।

গোড়ায়ই বলেছি স্পঞ্জের চলবার ক্ষমতা নেই। শ্যাওলা যেমন পাথর, মাটী বা গাছের গুঁড়ির উপর বাসা বাঁধে, স্পঞ্জও তেম্‌নি। স্পঞ্জ চল্‌তে পারে না, গাছের মত এক জায়গায় থাকে। মধ্যে মধ্যে কিন্তু ভারী মজার কাণ্ড হয়। স্পঞ্জ ভাসতে ভাসতে এসে একটা শামুক, গুগ্‌লী, কিম্বা ঝিনুক জাতীয় জন্তুর গায়ের উপর বাসা বাঁধে; কাজেই ঐ জন্তুগুলি যখন চলে, তখন এদেরও বেড়ানো হয়ে যায়।

গাছের কেমন কুঁড়ি হয় দেখেছো? স্পঞ্জেরও কুঁড়ি হ'তে দেখা গেছে। তা থেকে হয় নতুন স্পঞ্জ-ছানার জন্ম। গাছের ডাল কেটে যেমন 'কলম' ক'রে নতুন গাছ করা যায়, এদেরও তেম্‌নি খানিকটা কেটে জলে রাখলে নতুন স্পঞ্জ জন্মায়।

এদেরও স্ত্রী পুরুষ দু'রকম আছে। কিন্তু দুইই এদের শরীরের মধ্যে। স্ত্রীটী ডিম পেড়ে দেয় শরীরের নলের জলে, সেটি গিয়ে একটী ছোট্ট ছ্যাঁদার কাছে চুপচাপ বসে থাকে। একটী পুরুষ ডিম এলেই সেটী তার সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়ে ছোট্ট একটী স্পঞ্জ তৈরী হয়ে যায়। স্পঞ্জটি ভাগ ভাগ হ'য়ে হ'য়ে একতাল কোষ হ'য়ে বেড়িয়ে পড়ে একটা বড় ছ্যাঁদা দিয়ে মার শরীর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তার দাড়ী গজাতে থাকে, আর সেই দাড়ীর দাঁড় বেয়ে বেয়ে সে চলে তার বাড়ীর খোঁজে। পছন্দসই বাড়ী যেই পেলো, সঙ্গে সঙ্গে দাড়ীশুদ্ধ তার শরীরের অর্দ্ধেকটা দেহের মধ্যে ঢুকে গেল। ছিল একটা গোল দাড়ীওয়ালা জন্তু, হয়ে গেল

একটা অর্দ্ধচন্দ্র গাছের মত পদার্থ। তারপরে তার আরম্ভ হ'লো নিজকে গড়া—এদিক সেদিক চারদিকে সমানে বাড়তে লাগ্‌লো।

এই অদ্ভুত কলাকুশলের কে যে ইঞ্জিনিয়ার তাই ভাবি। এদের এক-দিককার কোষগুলি অন্যদিকের বাড়ার খবর ঠিক রেখে তাল সামলায় কি করে তা ভেবে অবাক হই। আমাদের না হয় মগজ আছে, কিন্তু ওদের ?

ছোটদের আশা

(শ্রীকালীপদ শর্ম্মা)

ছোট ছোট ছেলে মোরা, বড় মন চাই ;
সকলের হৃদয়েতে যেন ঠাঁই পাই।
ভাইবোন সকলেরে প্রণয়ের ডোরে
বেঁধে মোরা রাখি যেন আপনার ক'রে।

আমাদের কুঁড়ি প্রাণ ফুটিবে যখন,
সুবাসে মাতায় যেন আকাশ ভুবন।
আমাদের অন্তরের পবিত্র শোভায়
সংসারের যেন সব জীবন জুড়ায়।

মানুষে করেছে যাহা, মোরাও করিব ;
জগতের ইতিহাসে অমর হইব।
অতীত গৌরব দীপ্তি করিব উজল,
ভারতের বার্ত্তা বহি' লঙ্ঘিব অচল।

উঠে' প'ড়ে জীবনের হবে অভিযান,
মাথা পেতে মেনে নেব বিধাতার দান।

বেহালা

(শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী)

কুল কুল ক'রে ছোট নদী বহে গেছে তাদের কুটিরখানির কাছ দিয়ে। কত শত রঙ বেরঙের ফুলে ফলে ভরা গাছপালা চারিদিকটি সৌন্দর্য্যে ভরে রেখেছে। তারি মাঝে ছোট্ট কুটিরখানিতে বাস করে কাঠুরে আর তার স্ত্রী। সকাল হ'লেই অসংখ্য পাখীর গানে তাদের ঘুম ভাঙ্গে। চন্দনা, টিয়া, ফিঙে, বুলবুল, বউ-কথা-কও, কত রকমের পাখী জায়গাটিকে সারাদিন ভরপুর করে রাখে তাদের আনন্দোৎসবে।

প্রায় ক্রোশ খানেকের মধ্যে অন্য লোকের বসতি নাই। গাছপালাগুলি ক্রমে ঘন হ'তে হ'তে দূরে মিশে গেছে গভীর জঙ্গলে। রাত্রে মাঝে মাঝে হিংস্র জন্তুর গর্জ্জন ক্ষীণভাবে ভেসে এসে কাঠুরেণীর মনে আতঙ্ক তোলে। দিনের বেলা কাঠুরে কুড়ুল কাঁধে বনে কাঠ কাটতে যায়, আর কাঠুরেণী ব্যস্ত থাকে ঘরের কাজ-কর্ম্ম নিয়ে। এমনি ভাবেই তাদের দিন যায়।

সেদিন ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলেই কাঠুরে একেবারে অবাক! ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। তার দরজার কাছ দিয়েই ছোট বড় নানারকম জন্তু জানোয়ারের পায়ের ছাপ! এক একটা দাগ বড় বড়, বোধ হয় ভালুকের পায়ের চিহ্ন। অপর দাগগুলি ছোট ছোট—নেকড়ে বাঘের থাবার মতন। কাঠুরে সাহস করে খানিকটা এগিয়ে গেল। কিছু দূর গিয়ে যা দেখল, তাতে গা শিউরে ওঠে। দেখল সে রক্ত—চাপ চাপ তাজা রক্ত পথের মাঝে। কাঠুরে ভাবল, বুঝি বা কোন মানুষ জানোয়ারদের কবলে পড়েছে। ছুটে সে বাড়ী গিয়ে কুড়ুলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কাঠুরে পায়ের ছাপ আর রক্তের দাগ দেখে এগিয়ে চলল। জঙ্গলের কাছা-কাছি একটা ঝোপের কাছে দাগগুলি যেন মিলিয়ে গেছে। কাঠুরে থেমে দাঁড়াল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, ঝোপের ভেতর থেকে ঘর্ ঘর্ শব্দ হচ্ছে। কুড়ুলটাকে বাগিয়ে ধরে কাঠুরে সাবধানে গাছের পাতা সরিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল। কাঠুরে থমকে দাঁড়াল—এ কী ব্যাপার! আশে পাশে তিন চারটা নেকড়ে বাঘ ম'রে প'ড়ে আছে, আর তার কিছু দূরে মস্ত বড় একটা ভালুক আধমরা হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। ভালুকটার সারাদেহ রক্তমাখা। আরও খানিক এগিয়ে গিয়ে কাঠুরে

দেখে, এক অদ্ভুত দৃশ্য! এই মরণাপন্ন অবস্থাতেও ভালুকটা বুকে করে আঁকড়ে রয়েছে একটি ছোট্ট মেয়েকে! মেয়েটিও পরম নিশ্চিন্তভাবে ভালুকের গলা জড়িয়ে রয়েছে, কিছুমাত্র ভয় ভাবনা নাই। চমৎকার দেখতে মেয়েটি; ফরসা তার রং, টানাটানা চোখ, কোঁকড়ান তার চুল। কাঠুরেকে দেখেই মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠে তার ছোট্ট হাত দুখানি কাঠুরের দিকে বাড়িয়ে দিল। ভালুকটাও তখন চোখ মেলে একবার করুণ ভাবে তাকিয়ে ধরমর করে নড়ে উঠল; তারপর তার চোখ বুজে এল। কাঠুরে বুঝল যে ভালুকটার সব শেষ হয়েছে। সে তখন মেয়েটিকে ধীরে ধীরে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

মেয়েটিকে নিয়ে কাঠুরে যখন বাড়ী পৌঁছাল, তখন বেশ রোদ উঠেছে। দরজার কাছ থেকে হেঁকে সে বল্ল, "গিন্নি, এই দেখ তোমার জন্যে কি এনেছি।" কাঠুরেণী বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়াল। তারপর কাঠুরেকে কোন কিছু বলবার অবসর না দিয়েই, তার কোল থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে, চুমোয় চুমোয় বেচারার নরম গাল দুটি লাল করে তুল্‌ল। মেয়েটির কিন্তু একটুও ভয় নেই, সে তার ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে কাঠুরেণীর গলা জড়িয়ে ধরেছে।

কাঠুরের কোন ছেলে পুলে হয় নি, মেয়েটিকে পেয়ে তাদের দু'জনের কি আনন্দ! কাঠুরেণী আদর করে মেয়েটির নাম রাখল 'বেহালা'।

কাঠুরে আর তার স্ত্রীর পরম যত্নে বেহালা ক্রমে বড় হ'ল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপও যেন ফেটে পড়তে লাগল। একটা হাল্কা মেঘের মতন সে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। নিজের মনেই সে হাসে, মনের আনন্দে নাচে, হাত তালি দেয়। খেয়াল হ'লে গান করে; ক্ষিদে পেলে খায় গাছের মিষ্টি ফল। সে যখন গান করে পাখীরা স্তব্ধ হয়ে যায়। সে যখন হাসে, যেন শত শত মুক্তা ঝ'রে পড়ে; তার চঞ্চল পা দু'খানিতে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। বেহালার সবই সুন্দর!

মাঝে মাঝে সে কাঠুরের সঙ্গে বনে যায়। কাঠুরে কাঠ কাটে, বেহালা অবাক হয়ে দেখে, কখনও বা বনময় ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তাকে দেখে বনের পশুরা পালায় না, সেও তাদের দেখে ভয় পায় না। তাকে দেখে হরিণছানার দল থমকে দাঁড়ায়, সেও ছুটে গিয়ে তাদের গলা জড়িয়ে চুমো খায়। কখনও বা পাখীর গানের অনুকরণ করে। এই রকম ভাবেই তার দিনগুলি কেটে যায়। সন্ধ্যাবেলায় দাওয়ায় বসে কাঠুরেণীর কোলে মাথা রেখে সে গল্প শোনে। কত গল্প!—

দেশবিদেশের গল্প, রাজপুত্তুরের গল্প, রাজকন্যার গল্প! ক্রমে ঘুমে তার চোখ জুড়ে আসে; স্বপ্নে তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে—একটা পরীর রাজ্য, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্র আরও কত কি!

* * *

বেহালা আজকাল একাই বেড়াতে যায়। একদিন একটা হরিণের ছানাকে তাড়া করে সে বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ল—সেই নদীর তীরে। নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে বসে সে হাঁসের সাঁতার কাটা দেখতে লাগল। অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ব'সে ব'সে সে নদীর ঢেউয়ের মিষ্টি আওয়াজ শুনছিল, হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে তার চমক ভাঙ্গল। পিছন ফিরে সে দেখল, একজন লোক অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভারী সুন্দর দেখতে সে—ফরসা রং, চওড়া বুক, উন্নত দেহ, আর সব চেয়ে সুন্দর তার ভাসা ভাসা চোখ। বেহালা মনে মনে ভাবল, এ কোন রাজ্যের রাজপুত্র না হয়ে যায় না। মনে খানিকটা সাহস এনে সে মুখ তুলে বল্ল, "তুমি কি কোন রাজপুত্র?"

লোকটি হেসে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তুমি জানলে কি করে?"

বেহালা বল্ল, "শীকার করতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছ বুঝি। বা রে! তোমার মুকুট কোথায়? এ কি রকম রাজপুত্র! তোমার নাম কি?"

রাজপুত্র আবার হেসে বল্ল, "অতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেব কি করে? এক একটা করে বলছি শোন। পথ আমি হারাই নি। আমার নাম অরুণ। আমার বাবার একটা পোষা পাখী ছিল; পাখীটা রোজই আমায় ব্যাকুল ভাবে জানাতো তার মুক্তির প্রার্থনা। একদিন তার কষ্ট দেখে তাকে ছেড়ে দিলাম। বাবা আমাকে শাস্তি দিলেন চার বছরের জন্যে বনবাস। আমার মুকুট আমি ঐ জলে ফেলে দিয়েছি। আজ হঠাৎ শুনতে পেলাম তোমার গান, সেই সুরের টানে এখানে এসে হাজির হয়েছি।"

—"তুমি থাক কোথায়?"

—"ঐখানে।" অরুণ একটা পাতার ছোট ঘর দেখিয়ে দিল। হঠাৎ অরুণ বল্ল, "বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার। কিছু খেতে দেবে আমায়?"

বেহালা বল্ল, "সে কি। তুমি এখনও খাও নি?"

অরুণ বল্ল, "না।"

বেহালার চোখ দু'টি ছলছল করে উঠল। সে বল্ল, "তোমায় কি দেব খেতে? আমরা যে বড্ড গরীব। তুমি রাজপুত্র, আমরা যা খাই, তা তোমায় কেমন করে দেব?"

অরুণ—"তুমি যা দেবে তাই মিষ্টি হয়ে উঠবে, তাই আমি খাব।"

বেহালা তখনই রাজপুত্রকে নিয়ে কাঠুরের ঘরের দিকে চল্ল। সেখানে রাজপুত্রকে দেখে কাঠুরেণী তো ভয়েই অস্থির! সসঙ্কোচে তাড়াতাড়ী নিজেদের যথাশক্তি আয়োজন করে তারা তাকে খাইয়ে দাইয়ে বিদায় দিল।

* * *

বেহালা আর অরুণের এখন খুব ভাব। রোজ তারা দু'জনে নদীর তীরে বসে গান গায়, গল্প করে, খেলে।

অরুণ খুব চটপটে। বেহালা যখন গান করত, তার ইচ্ছে করত সে কিছু বাজায়। কিন্তু বনে জঙ্গলে আর বাজনা পাবে কোথায়? অনেক ভেবে চিন্তে খেটে খুটে অরুণ অদ্ভুত একটা যন্ত্র তৈরী করল। বাজনাটি চমৎকার। বনের জন্তুর তাঁত পাকিয়ে অরুণ তৈরী করল বাজনার তার, আর বেহালার মাথার এক গোছা চুল দিয়ে তৈরী করল ছড়ি। বাজনাটি তৈরী হলে অরুণের কি স্ফূর্ত্তি!

এই রকমেই দিন যায়। কিন্তু এত সুখ ছিলনা তাদের কপালে। অরুণ এসে একদিন করুণ ভাবে বল্ল, "আমায় যে যেতে হবে বেহালা।" বেহালা কেঁদে ফেল্ল; বল্ল, "আবার এসো।" অরুণ তার হাত দু'টি ধরে বল্ল, "আসবো বেহালা, আবার আসবো। সেদিন এসে তোমায় আমার রাজ্যে নিয়ে যাব। আমি যদি রাজা হই, তুমি কি আমার রাণী হবে বেহালা?" চোখের জলে বেহালা এই প্রশ্নের উত্তর দিল।

যাবার সময় রাজপুত্র বেহালাকে সেই বাজনাটা দিয়ে বলে গেল, "আমার যদি কোন কারণে ফিরতে দেরী হয়, তাহলে কাউকে দিয়ে এই বেহালাটা আমায় পাঠিয়ে দিও, কোন বিপদ হলে; আমি তখনই ছুটে আসব।"

* * *

অরুণ রাজ্যে ফিরে এসেছে। এতদিন পরে ছেলেকে ফিরে পেয়ে রাজা রাণীর আনন্দ আর ধরে না। এক মাস ধরে রাজ্যে উৎসবের আয়োজন হ'ল। লোকের

মুখ হাসিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। রাজা তার ভাণ্ডার খুলে দিলেন; গরীব দুঃখীরা প্রচুর পয়সাকড়ি পেয়ে রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগল। প্রথম দু একদিন বেহালার জন্য অরুণের মন কেমন করেছিল। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই উৎসবের কোলাহলের মাঝে, নানা কাজ কর্ম্মের ভীড়ে সে বেহালাকে ক্রমে ক্রমে ভুলে যেতে লাগল।

ওদিকে অরুণ চলে যাওয়ার পর বেহালার মনে সুখ নেই। কেবলই ভাবে অরুণ কবে ফিরে আসবে। ক্রমে যখন অনেক দিন কেটে গেল, বেহালা ভেবে ভেবে শুকিয়ে যেতে লাগল। মুখে তার হাসি নাই। অমন সোনার মত রং তার তামাটে হয়ে গেছে। কাঠুরের মহা ভাবনা হ'লো। মেয়েটা ভাল করে খায়না, হাসে না,—একটা অসুখ বিসুখ না হলেই হয়। কাঠুরেণী বল্ল, "তার কথা ভেবে আর কি করবি মা!"

বেহালা কিন্তু না ভেবে থাকতে পারে না; অরুণ যে ফিরে আসবে বলেছে গেছে—অরুণ যে বলেছে তাকে রাজরাণী করবে।

একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বেহালা দেখল যে তাদের দোরের সামনে দিয়ে দলে দলে লোক চলেছে। সকলের মুখেই হাসি আর উল্লাসের চিহ্ন। একটি ছেলেকে ডেকে সে শুধাল, এত ভীড় করে তারা চলেছে কোথায়?

অবাক হয়ে ছেলেটি বল্ল, "তাও জাননা বুঝি? রাজা প্রতাপনারায়ণের ছেলে অরুণকুমারের বিয়ে। সেখানে একমাস ধরে উৎসব হবে। তাই আমরা চলেছি।"

বেহালার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল; তবু সে জিজ্ঞেসা করল, "কার সঙ্গে?"

—"রূপনগরের রাজকন্যা কাঞ্চনবালার সঙ্গে।"

ছেলেটি হন হন করে চলে গেল। বেহালা সেখানেই ব'সে পড়ল। দু'চোখ বেয়ে তার গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা জল। অরুণ কি সত্যি সত্যিই তাকে ভুলে গেছে!

* * *

বেহালার ভারী অসুখ। কাঠুরে কাঠুরেণীর ভাবনার অন্ত নেই। বেচারাদের এমন পয়সাও নেই যে বদ্যি ডেকে চিকিৎসা করায়। অসুখ ক্রমে বেড়েই চল্ল।

বেহালার জ্ঞান নেই, ভুল বকে, কাঁদে। শেষে একদিন বেহালা কাঠুরেকে বল্ল, "বাবা তুমি এই বাজানার যন্ত্রটা নিয়ে একবার রাজধানীতে যাও, সেখানে গিয়ে অরুণের হাতে এটা দিও।"

কাঠুরে ভাবল, মেয়েটা তো মরতেই বসেছে। যাই একবার রাজধানীতে গিয়েই দেখি। পরদিন ভোরবেলা কাঠুরে রাজধানীরদিকে রওনা হ'ল।

রাজসভা গম গম করছে। আজ অরুণকুমারের অভিষেক হবে, রাত্তিতে হবে বিয়ে। রাজপুত্র তার বন্ধুদের সঙ্গে দরবারে ব'সে মৃদু হেসে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। এমন সময় প্রহরী এসে নমস্কার করে দাঁড়াল; বল্ল, "যুবরাজ, একটা পাগলা বলছে যে আপনার সঙ্গে দেখা করবে; তাকে বেঁধে এনেছি।" যুবরাজ বল্লেন, "আজকের দিনে আমি কারো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখব না। তাকে নিয়ে এস এবং তার বাঁধন এখনই গিয়ে খুলে দাও।"

কাঠুরেকে যুবরাজের সামনে এনে হাজির করা হ'ল। ভয়ে তার তখন জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে সে তার ময়লা কাপড়ের খোঁট থেকে একটা চিঠি বার করে রাজপুত্রকে দিল, আর দিল সেই অদ্ভুত বাজনার যন্ত্রটা। সকলে ভাবল, পাগলা বুঝি যুবরাজকে কিছু উপহার দিচ্ছে।

বাজনাটি দেখেই রাজকুমারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এক নিঃশ্বাসে তিনি চিঠিটা পড়লেন্—

"অরুণ,

আমি মরতে বসেছি। একবার শেষ দেখা দিও।

—বেহালা"

সভা ভেঙ্গে গেল। বন্ধুর দলকে তখনই বিদায় দিয়ে, রাজপুত্র রাজবেশ পরেই সেই পাগলাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বেড়িয়ে পড়লেন। কোথায়, কে জানে? সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল, কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। নগরের রাজপথ ছাড়িয়ে ঘোড়া দু'টো তীরের মত ছুটে চলল পথের ধূলো উড়িয়ে।

* * *

"মা, অরুণ এল না, আমার সঙ্গে বুঝি আর দেখা হ'ল না। এই ব'লে বেহালা চোখ বুজল। ঠিক সেই সময় ছুটতে ছুটতে দোরের কাছে এসে থামল একটা ঘোড়া। অরুণ ঘরে ঢুকল, বেহালার শিয়রের কাছে গিয়ে বল্ল, বেহালা

বেহালা, এই আমি এসেছি, আমায় ক্ষমা কর।" বেহালা চোখ মেলে তাকাল, অরুণের হাত দুটি ধরে বল্ল, "অরুণ এসেছ?—আমার যে সব শেষ হয়ে এসেছে; আমি চললাম।" অরুণ বল্ল, "না, তুমি যেতে পাবে না বেহালা, তোমায় আমি বাঁচিয়ে তুলব।"

অরুণ কিন্তু তাকে রাখতে পারল না। অরুণের সকল চেষ্টা সকল চিকিৎসা ব্যর্থ করে বেহালা তাকে ছেড়ে চলে গেল। অরুণ ঝাঁপিয়ে পড়ল বেহালার মৃতদেহের উপর। তারপর তাকে কাঁধে ক'রে ঘোড়ায় চাপিয়ে রওনা হ'ল তার রাজধানীর দিকে।

রাজধানীতে ফিরে একটা সোনার মন্দির করে অরুণ সেখানে রেখে দিল বেহালার শেষ চিহ্নটুকু। বাপ মায়ের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও অরুণ আর বিয়ে করতে রাজী হোল না। রাজ্যের নিয়মানুসারে বিয়ে না করলে রাজা হওয়া যায় না। অরুণ বল্ল, "চাইনা আমি রাজা হ'তে।" অরুণের ছোট ভাই রাজা হ'ল।

তার হাতে গড়া যন্ত্রটিকে বেহালা বড়ই ভালবাসতো, তাই অরুণ বাজনাটির নাম দিল 'বেহালা'। রাত্তিরে যখন চাঁদ উঠতো, অরুণ নির্জ্জনে ব'সে এক মনে বেহালা বাজাতো। তার মনে হ'ত বেহালা বুঝি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

যক্ষের দ্বীপ

(শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি)

যক্ষের ধন সম্পত্তি নাকি মাটির নীচে পোঁতা থাকে। এ রকম গল্প তোমরা অনেক পড়েছ ও শুনেছ। ডাকাতদের টাকা কড়ি পোঁতা দ্বীপের গল্পও তোমরা রত্নদ্বীপ* প্রভৃতি বইতে পড়ে থাকবে। কিন্তু আজ যে যক্ষের দ্বীপের কথা বলছি তা গল্পমাত্র নয়, একেবারে সত্য কাহিনী।

এই দ্বীপটির আসল নাম "কোকোস" দ্বীপ। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার

---

* রত্নদ্বীপ—শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত

মধ্যে পানামা যোজক আছে তা তোমরা জান। এই পানামা যোজকের দক্ষিণ-ঘেঁসা পশ্চিম দিকে প্রায় ৫০০ মাইল দূরে, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে এই দ্বীপটি

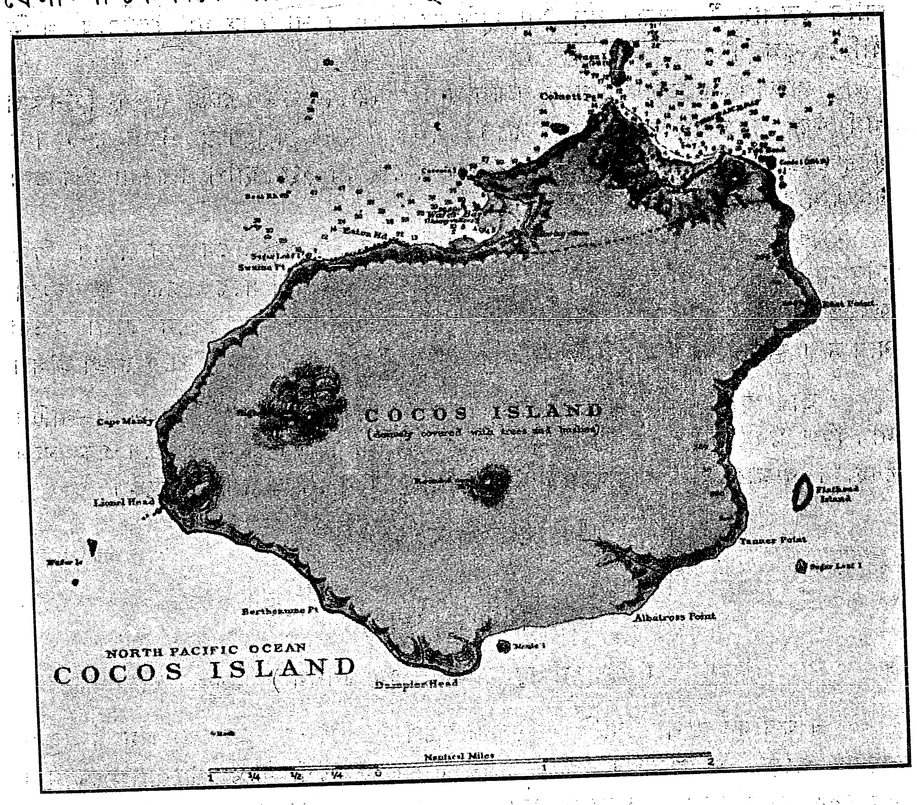

কোকোস দ্বীপ

আছে। দ্বীপটি নিতান্তই ছোট। বড় একটা সহরের মতও হবে না। এর ঘের মাত্র ১৩।১৪ মাইল হবে।

দ্বীপটি ছোট, কিন্তু তাকে বাগে আনা বড় সহজ কথা নয়। সমুদ্রের ধারে

দ্বীপটির কিনারগুলি বিষম রকম খাড়া। আর সেই খাড়া পাড়গুলি ৩০০।৪০০ ফুট উঁচু। কোন কোন জায়গায় ৬০০ ফুট পর্য্যন্ত খাড়া। কাজেই জাহাজে করে দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলেও, জাহাজ থেকে নেমে দ্বীপে গিয়ে ওঠা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তবে দ্বীপটির উত্তর দিকে ছোট ছোট দু'টি উপসাগরের মত আছে। সেই পথে দ্বীপে ওঠা সম্ভব হ'তে পারে।



কোকোস দ্বীপের উঁচু খাড়া কিনারা

দ্বীপটির আগা গোড়া সবটাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ ও মানুষের চেয়েও লম্বা বড় বড় ঘাসের গভীর জঙ্গলে ঢাকা। পথ বলে কোন কিছুর নাম গন্ধ নেই। তার উপর আবার সেখানকার জমি প্রায় সবই খানা, নালা, গর্ত্ত ও বড় বড় পাথরে ভরা। কাজেই সেই জঙ্গল ভেঙ্গে সেই সব খানা, নালা, ও পাথর পার হ'য়ে দ্বীপে চলা ফেরা করা একরকম অসম্ভব। মানুষ তো দূরের কথা, বুনো জানোয়ার পর্য্যন্ত সে জঙ্গলে সর্ব্বত্র পথ করে যেতে পারে না।

দ্বীপটিতে যে মানুষের অস্তিত্ব নেই তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। মানুষ নেই; আছে বুনো শুয়োর আর পোকা মাকড়। সেখানকার পিঁপড়েগুলো তেড়ে এসে কামড়ায়, মশাগুলোও যেন তাদেরই মাসতুতো ভাই। আর ইয়া বড় বড় কদাকার যে মাকড়সা আছে তাদের কথা তো একেবারেই স্বতন্ত্র! সমস্ত দ্বীপটাতে তাদেরই রাজত্ব।

এই ছোট্ট অথচ ভয়ানক দ্বীপটিতে যক্ষের ধন আছে। এত ধন দৌলত এই দ্বীপটিতে কেমন করে এল জান? প্রায় দেড়শ বছর ধরে ছোট বড় অনেক জলদস্যু বা বোম্বেটে টাকাকড়ি লুট-পাট করে এনে এই দ্বীপে পুঁতে রেখে দিয়েছে। তাদের হয়ত মতলব ছিল পরে সে সব টাকাকড়ি নিয়ে ভোগ করবে। কিন্তু

ভাগ্যে আর তা হয়ে ওঠে নি। সকলের কথা না ব'লে দুই এক জনের কথা বললেও তোমরা বুঝতে পারবে কি পরিমান দৌলত এই দ্বীপটিতে মাটি চাপা পড়ে আছে।

প্রায় আড়াই শ বছর আগে ডেম্পীয়ার, কুক ও ডেভীস নামে তিনজন ইংরেজ বোম্বেটে তাদের লুটতরাজের টাকা কড়ি এই দ্বীপে পুঁতে রাখে। এ সম্বন্ধে লেখা যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায় তারা এই দ্বীপে রেখেছিল প্রায় ৪০০০ মণ রূপা, ৭ পিপে ভর্ত্তি মোহর, ৭৩৩ খানা সোণার ইট (bar)। তারপর ছোট খাট আরো অনেক বোম্বেটে কম বেশী অনেক কিছুই এই দ্বীপে রেখে গিয়েছে। পরে প্রায় সওয়া শ বৎসর আগে বোণিটো নামে একজন জল-দস্যু এই দ্বীপে প্রায় ১০০০০ (দশহাজার) মণ সোণা রূপা ও জহরত পুঁতে রেখেছে। এই সব টাকা কড়ি ধন দৌলত সে পেরু দেশের কতকগুলো মন্দির লুট করে পেয়েছিল।

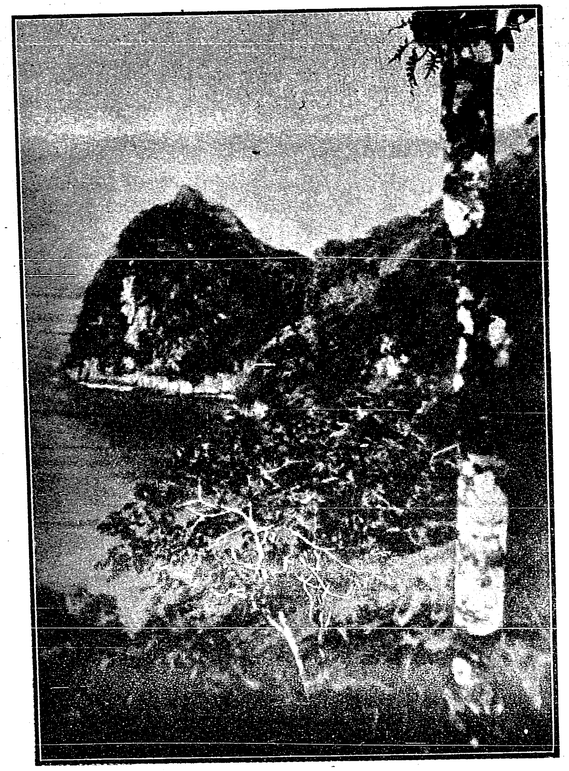

কোকোস দ্বীপের খাড়া কিনার ও গভীর বন জঙ্গল

বোণিটোর প্রায় আট বৎসর পরে উইলিয়াম টমসন নামে আর একজন ডাকাত এই দ্বীপে প্রায় ৪,০০,০০,০০০ চার কোটি টাকার সোণারূপা জহরত পুঁতে রেখেছে।

এই সব হিসাব করে দেখ্‌লে মনে হয় যে এই দ্বীপে এতদিন ধরে যে পরিমাণ যক্ষের ধন জমা হয়েছে তার মূল্য সম্ভবতঃ কুড়ি কোটি টাকার কাছা-কাছি হবে।



মাটির নীচে সোণারূপার সন্ধান বা'র করার যন্ত্র।

এই অতুল সম্পত্তি উদ্ধার করবার চেষ্টা হচ্ছে। যে সব লোক এই সব সম্বন্ধে ভাল রকম খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা দল বেঁধে এই কাজে লাগ্‌ছেন। কিন্তু সেই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে কোথায় টাকা কড়ি পোঁতা আছে তা বের করা যাবে কি করে? সে জন্যে তাঁরা একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য নেবেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায় কোন্ জায়গায় মাটির নীচে সোণারূপা প্রভৃতি আছে।

তাঁদের এই চেষ্টায় সত্যি সত্যি যদি এই যক্ষের ধন পাওয়া যায়, তা' হলে অন্য সব গল্পের চেয়ে এই সত্য ব্যাপারটাই সকলকে বেশী অবাক করে দেবে।



শ্রাবণের ঝর্ণা

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রাবণের ঝর্ণা ঝরে ঝর ঝর,
ভরা নদী গ্রাম পাশে ছোটে তর তর !
কেয়া ফুল ফুটেছে,
পরিমল ছুটেছে,
কালো মেঘে ঢেকে আছে
সারা অম্বর।
স্বরগের বারিধারা
ঝরে ঝর ঝর।

শ্যামলের বন্যায় ভরি' বন্‌তল
কে এলো গো সুদূরের চির চঞ্চল !
ওরি হাসি উপ্‌ছে
ধরে শ্যাম রূপ যে
আউষের ক্ষেতখানি
করি' ঝলমল ;
মাঠে মাঠে খেল্‌ছে
চির চঞ্চল !

চাঁপা বনে দোল খায় কারা ওই হর্ষে,
বিষ্টির ধারা যেন যুঁই ফুল বর্ষে !
ভুঁই চাঁপা থমকে
ফুটে উঠে চমকে,

বেল ফুল ফোটে আজ
নব ধারা স্পর্শে।
চাঁপা বনে দোল খায়—
কারা ওই হর্ষে !

মেঘলা সকালে আজ জল ঝরছে,
বাদল পাখীর গানে ধরা ভরছে !
খেয়া তরী থেমেছে,
ঘাটে জল নেমেছে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কল্‌মির
দল নড়্‌ছে,
অঝোরে শ্রাবণ ভোরে
ধারা ঝরছে !

শ্রাবণের ঝর্ণায় ধরা ভরপুর,
বকুলের ঝর্ণা ঝরে ঝুর ঝুর !
সবুজের বন্যায়
গিরি মাঠ বন ছায়
মেঘের বাঁশীতে শোন
বাজে কার সুর !
শ্রাবণের ঝর্ণায়
ধরা ভরপুর !

স্মৃতি

(শ্রীমতী অশ্রু দাস)

বয়স আমার তখন নয় কি দশ। দাদার সবে বিয়ে হয়েছে। গুরুজনেরা সাব্যস্ত করলেন—নব বধূর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যখন পশ্চিমে নূতন বাড়ী কেনা হ'ল, তখন এই নবাগতা লক্ষ্মীই সেখানে প্রথম অধিষ্ঠান করবেন, তারপর বৃদ্ধেরা গিয়ে পশ্চিমে হাওয়ার জয় ঘোষণা করবেন। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। অভিভাবকদের আদেশ হ'ল, যাবে শুধু Youngরা; তোমরা হেস না, সেই দলে আমিও পড়ে গেলাম। নতুন বৌর সাহচর্য্যলাভ ও নতুন দেশ দেখার লোভ আমাকে বেশ মাতাল করে তুলেছিল। শুভস্য শীঘ্রম্, বাঁধাছাঁদা সুরু হয়ে গেল। যথাসময়ে সকলের ছলছল হাসিমুখের বিদায়সম্ভাষণান্তে আমরা যাত্রা করলাম। তখনও চোখে রঙীন নেশা! দিনের বেলার গাড়ী, দু'ধারে অগণ্য দৃশ্য, বিচিত্র ষ্টেশন আর প্রচণ্ড জঠরানলজ্বালা!—প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই খেতে হয়েছে।

গিয়ে পৌঁছলাম। সুন্দর দেশটি। পাহাড় বন ঝরণা যা কিছু এতদিন স্কুলের 'সরল ভুগোল বিবরণে'র একচেটে সম্পত্তি বলে জানা ছিল, এখন একেবারে তাদের সঙ্গে নিবিড় কোলাকুলি। কয়েকটা দিন বেশ কাট্‌ল। কিন্তু সে আর কতদিন? ঐত এতটুকু বয়েস, মাকে ছেড়ে, ছোট ভাইবোনদের ছেড়ে, সঙ্গীসাথীদের ছেড়ে, বিদেশ বিভূঁয়ে, বিশেষতঃ Youngদের দলে পড়ে, প্রাণ শীগ্‌গিরই হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। দু'বেলা ৭।৮ মাইল হারজিত করে বেড়াবার ধুম, সে ভালই লাগত। হুটোপাটি করত, পাহাড়ে চড়তে, হেঁটে ঝরণা পার হতে, আমিই ছিলাম ওদের পাণ্ডা। কিন্তু ভোরে উঠ্‌তে কিছুতেই ঠিক মত পারতাম না। তারপর বাড়ীতে যতক্ষণ থাকতাম সে অসহ্য ব্যাপার! ওরা হয়ত দল বেঁধে গল্প করছে, আমিও ব'সে আছি, হঠাৎ হয়ত ব'লে বসল, "যাওত লক্ষ্মী ওঘরে গিয়ে একটু পুতুল খেল গে!" বলা বাহুল্য এ শুধু আমাকে সরাবার ফন্দি। আমি থাকলে তাদের উচিত অনুচিত গল্প প্রবাহে বোধহয় বাধা পড়ে, তাই আমাকে সরান চাই। দু চোখ

ফেটে আমার জল আসতে চাইত। কেন এত অপমান? আমি ত সেধে আস্‌তে চাইনি?

সেদিনকার বিকেলটা বড় মেঘ্‌লা—বেড়াতে যাব কি যাবনা ভেবে ভেবে শেষ পর্য্যন্ত কাছেই শালবনে আমরা বেড়াতে বের হ'লাম। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক বেড়িয়েছি এমন সময় হঠাৎ ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে নেমে এল পাহাড়ে বৃষ্টি। সবাই ভাবনায় প'লাম এখন যাই কোথা! ঈশ্বরের অপার করুণা, ঐ বৃষ্টিতে ভিজে অদ্ভুত উল্লাসধ্বনি করতে করতে একটা কাঠবেড়ালীর পেছনে দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হলো এক সাঁওতাল কিশোরী। আমাদের দেখেই সে ভুলে গেল তার খেলা, অবাক জিজ্ঞাসু তার চোখ দুটি এসে স্থির হ'ল আমার কৌতুহলভরা দুটি চোখের উপর। কতক্ষণ দু'জনে দু'জনকে দেখলাম জানিনা—জ্ঞান ফিরল তার মধুর স্পর্শে। ধীরে ধীরে সে তার দুই হাত দিয়ে আমার হাত দু'টি চেপে ধরল। তারপর যেমন সাপকে বশ করে ঘরে নিয়ে যায় ওঝারা, তেমনি করে সে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চল্ল। ঘণ্টা তিনেকের মত তার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে আমাদের আশ্রয় মিলল। বৃষ্টি থাম্‌লে পর বাড়ী ফিরলাম।

ঐ সূত্রে সাঁওতালী মেয়েটি হ'ল আমার সাথী। বড় বড় সরলতা-ভরা চোখ দু'টি হাসিতে ঢল্ ঢল্ করে, চুলে এক গোছা ফুল গুঁজে, দুয়ারে এসে সে হাঁক দিত "আরে সঁইয়া রে"—ব্রজবালার নন্দদুলালের বংশীধ্বনির চেয়েও পাগল করা সে বাণী! দৈ-এর বাটীভাঙ্গার জন্য বকুনি খেয়ে মা'র কথা বড় বেশী মনে পড়ে যখন চোখে জল এসেছিল, কোথা থেকে সেই বন্য হরিণী চঞ্চল বেগে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধ'রল; দ্বিগুণ ছল্ ছল্ আঁখি নিয়ে শুধাল, "গোঁস্যা হইয়ে তুঁ?" সব ভুলে গেলাম; পরমুহূর্ত্তেই ছুটে গিয়ে দু'জনে পিয়াল গাছে চড়লাম।

সে চাটার্জ্জি নার্সারীর মালীর মেয়ে, রোজ কত রং-বেরংয়ের ফুল নিয়ে আস্‌ত। তার আন্তরিক প্রীতিউপহারের মূল্য ত তখন বুঝতাম না! বয়সে ছোট হয়েও প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে তাকে একদিন খুব বক্‌লাম—"বাড়ীতে এত ফুল, তবুও তুই পরের বাড়ীর ফুল কেন নিয়ে আসিস্? ফের আন্‌লে তোর সঙ্গে আড়ি।" দলিতা ছিন্নপত্রের মত মাটির দিকে চেয়ে সে জানাল—প্রাণ যে তার চায়!!

পরের দু'টি মাস হেসে খেলে স্বপ্নের মত কেটে গেল। তারপর এল বিদায়ের

পালা। ছেলেমানুষি মন; ট্রেণে চড়ব, পশ্চিমের কত শত বর্ণনা ভাইদের বোনদের কাছে গল্প করব, সর্ব্বোপরি মাকে পাব—আহ্লাদে আমি দিশেহারা। আর সে কেবলি ঘুরে ফিরে কাছে কাছে আনাগোনা করছে; কথা বলে না, শূন্য উদাস তার চাউনি। বুকে আমারও একটু খচ্‌খচ্‌ করছিল বটে তাকে ছাড়বার কথা মনে হলে, কিন্তু বাইরে পাছে বা তা প্রকাশ পায় সেই ভয়ে দ্বিগুণ কোলাহল করছিলাম। ছোট ষ্টেশন, ট্রেণ বেশী ক্ষণ থামেনা; হুড়াহুড়ি করে সব উঠে পড়লাম, সইয়ের খোঁজ নেবার আর অবসর পাইনি। টং টং টং, টং টং টং করে ঘণ্টা বেজে উঠল, ট্রেণ নড়ে উঠ্‌ল; স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে একটু বসবার জায়গার সন্ধান করছি —হঠাৎ কোত্থেকে কে দৌড়ে এসে আমার জানালা দিয়ে ছুড়ে দিল কি জানি কি একটা। ফিরে চেয়ে দেখি সই আমার প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে।

গাড়ী তখন বেশ চল্‌তে সুরু করেছে। কলাপাতার ঠোঙ্গাটা খুলে সবিস্ময়ে দেখি, তাতে আছে কয়েকটি 'ফেণী' বাতাসা। বড় প্রিয় জিনিস আমার; প্রথম সেই বৃষ্টির দিনে তাদের বাড়ীতে দু'টি করে ঐ বাতাসা দিয়ে জল খাইয়ে তারা আমাদের সম্মান রক্ষা করেছিল। কেন জানিনা বাতাসা ক'টি খেতে প্রবৃত্তি হ'ল না, কৌটায় ভ'রে সযত্নে তুলে রেখে দিলাম। দাদারা খুব ঠাট্টা করেছিলেন, কাণ দেবার ইচ্ছে হ'ল না।

তখনও ঠিক বুঝিনি সে কী দিল, আর তার সঙ্গে তার প্রাণ ছিল কতখানি। এখন যতই দিন যাচ্ছে, তার গভীর স্নেহডোর যেন আমাকে আরো নিবিড় মায়াজালে বেষ্টন করে ফেল্‌ছে; এখন বড় আনন্দ, বড় সুখ পাই সেই স্মৃতিটিকে বার বার নেড়ে চেড়ে দেখতে। বনের ফুলটিকে ভ্রমণপথে মুহূর্ত্তের জন্য আদর করেছিলাম; কিন্তু যখন চলবার ডাক এল তাকে সঙ্গে নেবার কথা মনেই এল না— বনের ধন বনেই ফেলে এলাম! ভুল করেছি বলে মনে এখন দ্বিধা জাগে। কে জানে স্বর্গের মন্দার সে-ই কিনা!



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্‌-চ্যান্সেলার

(শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ, বি-টি)

গত মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার সার হাসেন সারওয়ার্দির কার্য্যকাল শেষ হইয়াছে। সে স্থানে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বার-য়্যট্‌-ল, মহাশয় নূতন ভাইস্‌-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহার এ নিয়োগে দেশবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন। এতকাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ও সদস্যরূপে যেরূপ দক্ষতা ও দৃঢ়তার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে সকলেই তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছেন। তাই, আজ যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম আসনে আরূঢ় হইয়াছেন তাহাতে সকলেই আনন্দিত। এত অল্প বয়সে আর কেহ পৃথিবীর অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সম্মান অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার বয়স এখন মাত্র ৩৩ বৎসর।

বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার পুরুষ-সিংহ আশুতোষের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। 'আমাদের দীনা জননী বঙ্গভাষা' যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ এম-এ পরীক্ষা-তেও পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে। তিনি বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ জননীর যথার্থ প্রিয় সন্তান ছিলেন। তাঁহারই মধ্যমপুত্র শ্যামা-প্রসাদ আজ নিজের প্রতিভায় পিতার নিজের হাতে গড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্যামাপ্রসাদ এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখন হইতেই তিনি পিতার সঙ্গে থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম দেখিতেন। পরে বিলাত হইতে বারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিবার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। শ্যামাপ্রসাদ পিতার বহু সদগুণেরই অধিকারী হইয়াছেন।

যে কোন বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করেন, তাহার সমুদায় তথ্য ও বৃত্তান্ত তিনি সম্যকভাবে আয়ত্ত না করিয়া অগ্রসর হন না। তাঁহার এই গুণেই স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেরই তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দিল্লির ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যরূপে তিনি যে কৃতিত্বের ও সুযুক্তিপূর্ণ বগ্মিতার পরিচয় দেন তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন।

শ্যামাপ্রসাদ যে কেবল জ্ঞানী ও গুণী তাহা নহে। যে মহৎ গুণ লোকের প্রতিভাকে আরও উজ্জ্বল ও মনোরম করিয়া গেলে, শ্যামাপ্রসাদকেও সকলের নিকট এত প্রিয় করিয়াছে তাঁহার সেই নিরভিমান ও বিনয়। পিতার ন্যায় তিনিও ছাত্র-সমাজের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তাঁহার মত এরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার রূপে দেখিয়া বাংলার যুবক ও ছাত্রসমাজ আজ আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেছে।

সম্ভাষণ

(শ্রীমতী নিভা নিয়োগী)

"আপনি" কহিছে, "তুমি" অতি ছোট লোক
খর্ব্ব কর গর্ব্ব সবাকার।
"তুমি" কহে—আছ মোহে,
যে কেহ সম্ভাষে দোঁহে
তারি মাঝে খোঁজ শুধু
প্রভেদ দোঁহার ॥



কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্-চেন্সেলার
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম এ, বার-য়্যাট-ল



(শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন)

মণি ও অনু। বাবার লাইব্রেরী ঘরে মণি বইয়ের পাতা খুলে পড়ার নাম ক'রে অনুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছিল। সমুখে খোলা বইখানি জিয়মেট্রী; তাতে সরল, বক্র, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বিষম কোণ ইত্যাদি রকমারি রেখা ও ক্ষেত্রের গোলক ধাঁধা। বইখানি খুলে বস্‌লেই মনের মধ্যে একটা তুমুল লাঠালাঠি বেধে যায়—সরল ও বক্র রেখার বাঁকা চোরা সমস্যাগুলি নিয়ে। তাই মণি অনুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু কান দুটি ছিল খরগোসের মতো সজাগ। সিঁড়ির গোড়ায় মাষ্টার মশায়ের পায়ের আওয়াজ পেলেই মণি জোরে চেঁচিয়ে পড়া সুরু করবে, 'এ বি সি এ্যাঙ্গল ইকোয়েল টু সি বি এ', আর সঙ্গে সঙ্গে অনুও তাড়াতাড়ি কাবলী বেড়ালটা কোলে তুলে পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হবে।

ঘরের দেয়াল-ঘেষা আলমারীর তাকে তাকে সরু, বেঁটে, পুরু, মোটা নানা শ্রেণীর বই সাজানো। পুজার দিনে ছেলেমেয়েরা যেমন রং বেরঙের জামা গায় দেয়, সেই বইগুলির তেম্নি নানা রঙের মলাট। কোন কোন বইয়ের পিঠে সোনার জলে নাম লেখা। এরা পাশের নোংরা বইগুলির সঙ্গে এক শ্রেণীতে বস্‌তে ঘৃণায় নাক সিঁটকায়—বোধ হয় বইপিংক্তির মধ্যে ওরা হরিজন শ্রেণীর। বইয়ের আলমারীর ভিতর এক সঙ্গে বাস করেও সৌখীন বাবুর মতো সিল্কে-মোড়া একশ্রেণীর

বই বিশেষ গর্ব্বের সঙ্গে নাক উঁচু ক'রে চারিদিকে তাকাচ্ছে। ওদের ভিতরে যদিও নর্দ্দমার পচা গন্ধ বিদ্যমান, কেবল চটক ও বাহারের জোরে নূতন ভেল ক'রে আজকাল বাজারে চলে; তাই ওদের নাম ন-ভেল।

অনু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা এই সব বই তুমি পড়তে পার?"

মণি আলমারীর একখানা মোটা বই টেনে এনে সেখানা উল্টে পাল্টে অনুকে অনেক গল্প ব'লে যাচ্ছিল। বই খানি যদিও চেম্বার্স ডিক্সনারী, তবু এর ভিতর এত গল্প কি ক'রে এল আমরা তা' ভেবে পাই না। কিন্তু মণির বল্‌বার বাহাদুরীতে অনু খুব মনোযোগ সহকারে সেই গল্পগুলি শুনে যাচ্ছিল।

অনু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—"আচ্ছা, এই সব বই তুমি পড়তে পার?" মণি নিজের গর্ব্ব কিছুতেই খর্ব্ব করতে প্রস্তুত ছিল না; কাজেই কথাটা পেঁচিয়ে জবাব দিল,—"জানিস, এ-সব বই বাবার পড়া হয়ে গেছে। তিনি তাই আমাকে এই বইগুলি দিয়েছেন।"

অনু দুই হাত তুলে 'ঈষ্' শব্দ করে কতকটা অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করতেই কালো বেড়ালটা অনুর কোল থেকে লাফিয়ে একেবারে দেরাজের উপর উঠে বসল। উঁচুতে টমাস শেঠের ক্লক ঘড়িটার দোলক বার বার 'টিক্ টিক টুক্ টাক্' শব্দে নড়তেই ইঁদুর ভেবে বেড়ালটা একদৃষ্টে সে দিকে তাকিয়ে রইলো।

'ঈষ্' শব্দের প্রত্যুত্তরে মণি অভিমান ক'রে ঘড়ি নেড়ে বল্‌ল,—"আচ্ছা, বাবা এলে জিজ্ঞেস করিস্, সত্যি কি মিথ্যা। কালিদাস কি ক'রে মহাকবি হয়েছিলেন বল্‌তো?" এক্ষেত্রে অন্ততঃ একটা শক্ত প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে অনুকে বেকুব করা একান্ত প্রয়োজন।

অনু কিন্তু অপ্রস্তুত হবার মেয়ে নয় মোটেই। সে ফস্ ক'রে জবাব দিল,—"মা সরস্বতীর বরে। তুমি বুঝি অম্নি কবি হবে?"

অনুর এই প্রশ্নে মণির হাঁ-না কিছুই করবার যো ছিল না। কেননা, কালিদাসের পিতা ছিল একটি আস্ত মূর্খ—আর মণির বাবা অসাধারণ পণ্ডিত। আর সে দিন ইস্কুলে মাষ্টার মশায় সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কবি (Poet) ও পাগল (Lunatic) এক শ্রেণীর লোক। কাজেই মণি কবি পরিচয় দিতে একান্ত নারাজ।

ক্লাশে পণ্ডিত মশায় তো সব বিদ্যে হজম করবার পরামর্শ প্রায়ই দেন। কিন্তু কি উপায় এই মোটা বইগুলি গিলে খাওয়া যায় তার উপায় কিছু বাৎলে দেন না কেন? অন্ততঃ জিওমেট্রী ও সংস্কৃত উপক্রমণিকা বই দু'খানি গিলে খেতে পারলে অনেক ল্যাঠাই চুকত। কুইনানের মতো হাজারো তিতো হ'লেও মণি সেগুলি গিল্‌তে কিছুমাত্র গররাজী নয়।

—"অনু—অনু, মেয়েটা গেল কোথায়!" মার ডাক শুনেই অনু 'যাই মা' ব'লে তাড়াতাড়ি ভিতরে ছুটে গেল।

অনু চলে যেতেই মণি মোটা ডিক্সনারীখানা যথা স্থানে রেখে জিওমেট্রী খানার পাতা ওল্টাতে লাগ্‌ল। তারপর স্কুলের একজন ছেলে যে অঙ্কের ধাঁধাটা আজ দিয়েছে সেটা শ্লেটে কষতে লেগে গেল।—

প্রমাণ কর দেখি, $৪ = ৫$

$$১৬ - ৩৬ = ২৫ - ৪৫$$

উভয়ের সঙ্গে $\frac{৮}{৪}$ যোগ দিলে দাঁড়ায়

$$১৬ - ৩৬ + (\tfrac{৮}{৪}) = ২৫ - ৪৫ + (\tfrac{৮}{৪})$$

তার মধ্যে, $১৬ - ৩৬ + \frac{৮}{৪} = (৪ - \frac{৯}{২})^২$

এবং $২৫ - ৪৫ + \frac{৮}{৪} = (৫ - \frac{৯}{২})^২$

সুতরাং $(৪ - \frac{৯}{২}) = (৫ - \frac{৯}{২})^২$

অর্থাৎ $৪ - \frac{৯}{২} = ৫ - \frac{৯}{২}$

উভয় থেকে $-\frac{৯}{২}$ বাদ দিলে দাঁড়ায়

$$৪ = ৫$$

অঙ্ক কষতে গিয়ে মণির চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে আস্‌ছিলো। মণি এতক্ষণে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়তো যদি উপরের দেয়ালের ঘড়িটা ক্রমাগত টিক্ টিক্ টাক্ টাক্ ক'রে গোল না বাধাতো। ঘরের ভিতর ঘড়িটা একলাই যেন কথা বল্‌তে সুরু করেছে! শ্রোতা জুটেছে তার সেই কালো বেড়ালটা।

টুক্ টুক্ টিক্ টাক্ ঠং ঠুং নানা রকম শব্দে বেজে শেষটায় ঘড়িটা যেন স্পষ্ট গলায় ব'লে উঠলো,—"কিহে মণি বাবু?"

মণি ধর-ফরিয়ে ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখ্‌লো,—ওমা, ঘড়িটার মাথাটা যেন ভারি ফেঁপে উঠেছে, পেটটা সেই সঙ্গে ঢাকের মতো লম্বা হয়েছে। সরু পায়ের উপর ভর ক'রে দাঁড়িয়ে ছড়ির মতো লম্বা হাত দু'খানি দুলিয়ে হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। তারপর এক হাত বাঁকিয়ে কপাল ঠেকিয়ে ঘড়িটা বল্‌ল,—"গুড মর্ণি মণি বাবু।"

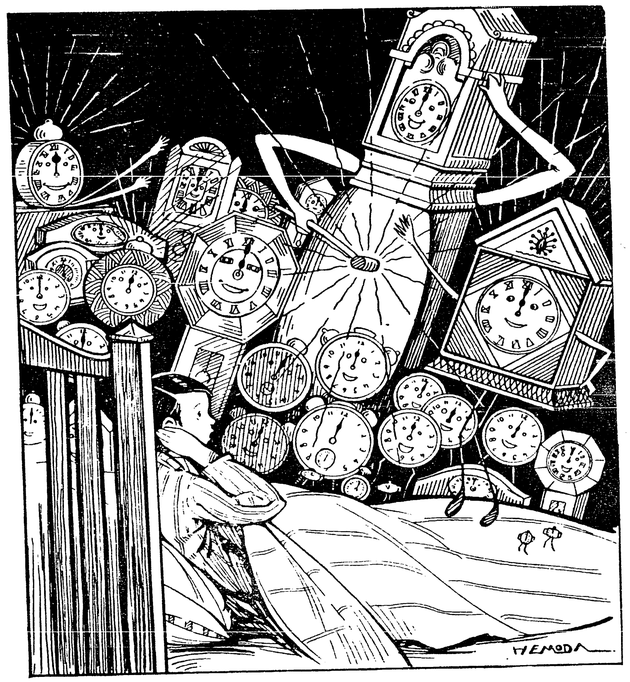

ঘড়ির শোভাযাত্রা

মণি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ বাদে বড় ক্লকঘড়িটা লম্বা একটা হাতুড়ি দিয়ে ঠং ঠং শব্দে নিজের ভুঁড়ি উপর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় থেকে বারোটা ঘা মেরে নিস্তব্ধ হ'ল। মণি তার দিকে চেয়ে একটু ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলো,—"আচ্ছা কিছুক্ষণ বা দে বেড়ালটা যেন গলায় টাই কলার প'রে, নাকে চশমা চড়িয়ে ঘড়িটার সঙ্গে রীতিমত ইংরাজীতে কথা-বার্ত্তা সুরু করেছে!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক দুই তিন চার পাঁচ সাত করে চারিদিক থেকে ঘড়িগুলি 'প্রসেশন' বের ক'রে রাস্তায় বের হবার মতলবে সেখানে এসে জড় হ'ল।

মিঃ ঘড়ি সাহেব, আপনাকে তো এমন অবস্থায় কখনো দেখি নাই।" মিঃ ঘড়ি ঘাড় বাঁকিয়ে ছোটবড় দুটো হাত একটু দোলাতে দোলাতে জবাব দিল,—"আশে পাশে যারা থাকে তাদের সবাইর খবর কি তুমি রাখ? মাষ্টার মশায়ের স্কুলের পড়া অঙ্ক, জিয়গ্রাফী, জিওমেট্রী এগুলি নিয়েই তো থাক রাতদিন ব্যস্ত, রাতদিন একঘেয়ে ঘড়ির কলকব্জা ঘুরিয়ে আমাদের কাজ চলছে। ফুরসুৎ যদিও পাইনা, তবু রাতের বেলা তোমরা যখন ঘুমিয়ে পড় তখন হাত পাগুলি একটু ছড়িয়ে আরাম করে নি। এ অঞ্চলের যত ঘড়ি আছে সবাই শোভাযাত্রা করে বেড়াতে বের হবে।"

এমন সময় মণি দেখতে পেল, লাইব্রেরী ঘরে যে বাঘের চামড়াখানা পাতা ছিল, সেখানা গা মোড়ামুড়ি দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে; এবং মণির দিকে তাকিয়ে 'বুর্ বুর্ বুর্' আওয়াজ কচ্ছে। মিঃ ঘড়ি অম্নি এগিয়ে এসে মিঃ টাইগারের ঘাড়ের উপর চড়ে বস্‌লো।

মিঃ ঘড়ি বল্‌ল,—"এখানে তো ঘুরে বেড়াবার যান-বাহন কিছু নেই, তাই এই বাঘের পিঠে চড়েই আমি সময় সময় ঘুরে বেড়াই। এটা এমন কিছু মন্দ নয়।"

বাঘটা দেখে মণির যে এতক্ষণ ভয় হচ্ছিল সেটা কেটে গেল।

এমন সময় পাশের আল্‌মারীর ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড মোটা বই ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে নীচে নেবে এল; মণি চেয়ে দেখ্‌ল, তার কপালে মোটা অক্ষরে লেখা আছে অভিধান (Dictionary)। ডিক্সনারী পাতা উল্টিয়ে হাওয়া খেতে খেতে মোটা গলায় বল্‌লো,—"দেখ মণি বাবু, সকল বিদ্যা আমার পেটের ভিতর পুরে রেখেছি। তুমি যদি এ নিয়ে রাত দিন চর্চ্চা কর তবেই একজন পণ্ডিত হয়ে উঠবে।"

একথা যেই কাণে গেছে, অমনি Arithmetic ও Geometry বই দু'খানা আলমারীর এককোণ থেকে লাফিয়ে এসে জোর গলায় চেঁচিয়ে বল্‌ল, "দেখ ডিক্স সাহেব, তুমি বিদ্যার বড়াই করছো কি সাহসে? পেটের ভিতর রাজ্যের কথা থাক্‌লেই হ'লো না, সেগুলির অর্থ ও ব্যবহার জানা দরকার।" ডিক্সনারী চটে উঁচু গলায় বল্‌ল, "অর্থ ছাড়া কোন কথাই আমি বলি না। জিওমেট্রীর এ্যাং ব্যাং চ্যাং—ছ্যা ছ্যা, লজ্জাও নেই!" Geometry জোর গলায় চেঁচিয়ে বল্‌ল,—"৪ হাজার

বছর আগে জ্যামিতি ও বীজগণিত পড়ে পণ্ডিতরা বড় হয়েছিলেন, এ কথা আজ-কাল বিদ্বান মাত্রই স্বীকার কচ্ছেন।”

ভূগোল তার হাসিভরা মুখের গোল গোল দাঁত বের ক'রে বল্‌ল, “যত দেশ বিদেশের খবর—কোথায় সাগর-তীরে বাস করে পেঙ্গুইন, কোথায় জাপান দেশের ছেলেমেয়েরা আনন্দে ঘুরে বেড়ায়, কোন দেশে বল্‌গা হরিণ আর চমরী বিচরণ করে—এসব খবর আমার কাছে জানতে পারবে। কত দেশের কত কথা কত গল্প আমি তোমাকে বল্‌বো মণি।”

এমন সময় সবুজ ওড়না জড়িয়ে একটী ছোট্ট মেয়ে এগিয়ে এল,—তার চোখের ভাষায় যেন স্বপ্ন জড়ানো; কত ফুলের গন্ধ তার চুলে মাখানো; নদীর ঢেউয়ের গানে তেপান্তরের রিম ঝিম সুরের বাজনা।

মণি হাসি মুখে এগিয়ে এসে তার দু'হাত ধরে বল্‌ল,—“কে তুমি?” হাসি মুখে তার সে জবাব দিল,—“আমি রূপকথা। ছোট ছেলে মেয়েদের প্রাণে ঘুমিয়ে থাকি, সারা পেলেই জেগে উঠি।” মণি দুই হাতে রূপকথার গলা জড়িয়ে ধরে বলল,—“এই সব অঙ্ক-জ্যামিতি-ভূগোল-ইতিহাস পড়া মন যখন এলিয়ে যায় তখন তুমি তোমার সোনার আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিবে আমার ক্লান্তি?”

এমন সময় মণির বাবা বাইরে থেকে ফিরে এসে দেখেন, একখানা বইয়ে মুখ ঢেকে মণি চেয়ারে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে আছে। বইখানা সরিয়ে নিতেই মণির বাবা দেখলেন বইখানি—“পৃথিবীর রূপকথা।”

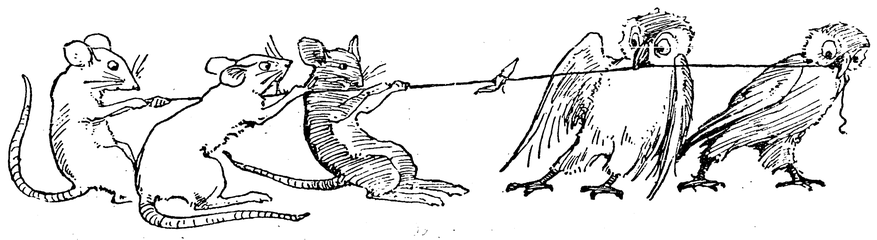

(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

আসামের বন্যা

(কুমারী হেমলতা লাহিড়ী—গ্রাহক নং ৯৪৭)

প্রবল ভীষণ বান!
মানুষ, গরু, নানান প্রাণী, হারায় কত প্রাণ!
রয়েছে যারা প্রাণ নিয়ে হায়
কাঠ ও ভেলা, ঘরের চালায়,
বস্ত্র বিহীন, অন্ন নাহি, নাই কো কুটীর খান!

প্রাণের বাড়া কোলের শিশু
যাচ্ছে ভেসে বানে,
ঘরের জিনিষ যা সব কিছু
যাচ্ছে জলের টানে।
দূর থেকে যা খবর আসে,
শুনে পরাণ কাঁপছে ত্রাসে,
এ কি তোমার কঠিন বিধান
—দয়াল ভগবান?

মানব কোথা? কোথায় দাতা?
বিপন্নে দাও সাড়া,
ভাসছে তারা বানের জলে,
সর্ব্ব সহায় হারা;
বস্ত্র দিয়ে জীবন বাঁচাও,
অন্ন তব ভাগ করে দাও,
শক্তি মত পয়সা দিয়ে, সৎকাজে দাও সাড়া,—
অনাথ তারা, আর্ত্ত তারা, তারা ভায়ের বাড়া।

নিমের চারা

(শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়—গ্রাহক নং ২১৭৯)

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরীতে বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিয়া মাতা পিতার মৃত্যুর পর তপস্যার জন্য তিনি হিমালয়ে গমন করেন।

হিমালয়ে যখন তিনি বাস করিতেন, সেই সময় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সেখানে না পাওয়ায় তাঁহাকে জনপদে আসিতে হইত। একদা তিনি নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে ভিক্ষার জন্য বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁহার চালচলন দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই ঋষিকুমার কেমন ধীর শান্ত! ইনি যেরূপ সতেজে ও সতর্কতার সহিত চলিয়া যাইতেছেন, তাহাতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে প্রতি পদবিক্ষেপে ইনি সহস্র মুদ্রার থলি রাখিয়া যাইতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা একজন অমাত্যকে বলিলেন, "ঐ ঋষিকুমারকে এখানে লইয়া আসুন।" অমাত্য বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বন্দনা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষা পাত্র গ্রহণ করিলেন।

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি চান?" উত্তরে অমাত্য বলিলেন, "রাজা আপনাকে ডাকিয়াছেন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি হিমালয়ে তপস্যা করি; আমি গৃহত্যাগী, রাজবাড়ীতে আমার যাওয়া উচিত নয়।" অমাত্য রাজাকে ইহা জানাইলে তিনি বলিলেন, "আমার বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসেন এবং ধর্ম্মোপদেশ দেন এরূপ কোন উপযুক্ত তাপস পাইতেছি না। ঐ তাপসকে আমার রাজপ্রাসাদে আসিতে অনুরোধ করুন।" অমাত্য পুনরায় গমন করিয়া রাজার প্রার্থনা জানাইলে, বোধিসত্ত্ব রাজভবনে আগমন করিতে সম্মত হইলেন। আহার ও বিশ্রামের পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আশ্রম কোথায়?" উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি হিমালয়ে তপস্যা করি।" রাজা বলিলেন, "ঋষিবর, বর্ষা কাল উপস্থিত, উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে আপনাকে কষ্ট করিতে হইবে এবং মনে হয় আপনি সহজে

যোগ্য স্থান পাইবেন না। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া আমার উদ্যানেই বাস করুন।"

এই প্রস্তাবে বোধিসত্ত্ব সম্মত হইলেন। রাজা তাঁহার জন্য একটি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন; এবং প্রব্রাজকদিগের যে অষ্টবিধ পরিষ্কার সম্বন্ধে নিয়ম পালন করা আবশ্যক তাহা রক্ষা করিবারও সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যাহাতে তাঁহার কিছু অসুবিধা না হয়, সে জন্য রাজা প্রত্যহই তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতেন এবং অসুবিধা নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

রাজার এক অতি দুষ্ট প্রকৃতির পুত্র ছিল। রাজ্যের লোক তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া রাজার কাছে তা'দের কাতর প্রার্থনা জানাইল। কিন্তু রাজা নিজেও কিছু করিতে পারিলেন না। কুলপুরোহিত, অমাত্যবর্গ প্রভৃতি রাজ পুত্রের চরিত্র সংশোধনে বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তার দুষ্ট স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না।

অবশেষে রাজা বোধিসত্ত্বকে পুত্রের স্বভাব সংশোধনের ভার দিলেন। এক-দিন বোধিসত্ত্ব কুমারকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে বেড়াইতেছিলেন। একটি নিম গাছের চারা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বৎস এই চারা গাছের পাতা খাইয়া দেখ ইহার স্বাদ কিরূপ।" কুমার নিমের কয়েকটা পাতা দাঁত দিয়া চিবাইয়াই মুখ বিকৃত করিয়া ফেলিয়া দিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে? রাজকুমার বলিল, "মহাশয়, এই পাতা হলাহল বিষের ন্যায়। বড় হইলে ইহা খাইয়া মানুষ নিশ্চয় মরিয়া যাইবে; আমি এখনই এটাকে তুলিয়া ফেলিব।" এই বলিয়া সে চারাটা তুলিতে গেল। ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, এই নিমের চারা এখনই এমন তিক্ত যে বড় হইলে মানুষের অনিষ্ট হইবে, ইহা ভাবিয়া তুমি তাহা তুলিয়া ফেলিতে যাইতেছ! কিন্তু তুমি এই চারাটি সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেছ, লোকেও তোমার সম্বন্ধে ঠিক তাহাই মনে করিতেছে। তুমি বাল্যকালে এতই উগ্রস্বভাব ও নিষ্ঠুর হইয়াছ যে বড় হইলে তুমি জনসাধারণের এবং রাজ্যের এক শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা ভাবিয়া সমস্ত লোক তোমাকে বিনাশ করার কথা ভাবিতেছে। সুতরাং কুমার, আজ হইতে তুমি শান্ত হও, তুমি নিজ হইতে যে দৃষ্টান্ত লাভ করিলে তাহা সম্মুখে রাখিয়া সাবধান হইতে চেষ্টা কর।"

বোধিসত্ত্বের এই উপদেশ শুনিয়া কুমারের স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

গল্প-স্বল্প

ব্যাট না খাতা—অনেকে ভাল ভাল খাতা তৈরী করে তাতে বড় বড় লোকের নাম সাক্ষর ও হাতের লেখা সংগ্রহ করে রাখে। চায়ের পেয়ালা, পীরিচ প্রভৃতি অন্যান্য জিনিষের উপরেও অনেকে হাতের লেখা সংগ্রহ করে। আমাদের দেশের এ রি য়া ন ক্লাবের (Aryan Club) পী মুখার্জ্জি মহাশয় একখানি ক্রিকেট ব্যাটের উপর বড় বড় ক্রিকেট খেলোয়ার ২৪ জনের নাম-সাক্ষর জোগাড় করেছেন। কিন্তু ক্রিকেট ব্যাটের এদিক ওদিক দুদিকে লিখলেও তার উপর এক শ'র বেশী নাম সই নেওয়া যায় না। তাই ক্যাপ্টেন ব্যালেন্‌টাইন বলে এক সাহেব এক ফন্দি বের করেছেন। তিনি তাঁর ব্যাটখানার সামনের দিকটা চিরে পাতলা পর্দ্দা বের করে তাতে কব্জা লাগিয়ে নিয়েছেন, যাতে ঠিক বইএর পাতার মত খোলে। এ পর্য্যন্ত দুবার চিরতে হয়েছে। তাতে ব্যাটখানা ছয় পৃষ্ঠার একখানা খাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পর্য্যন্ত তিনি ৪২০ জনের নাম সাক্ষর সংগ্রহ করেছেন। এঁদের সকলেই ক্রিকেট খেলায় নামকরা টেষ্টম্যাচ খেলোয়ার।

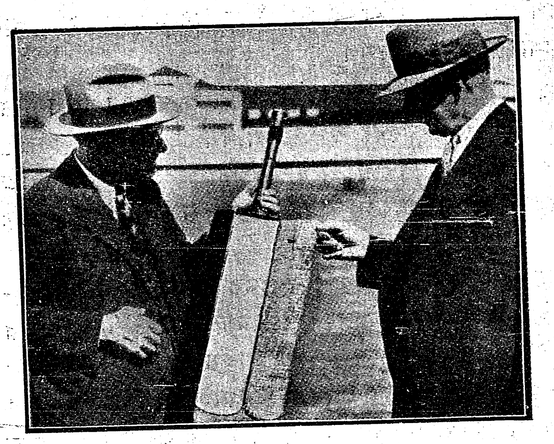

অদ্ভুত পাখীর বাসা—'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি' অবশ্য হয় না, কিন্তু ঐ ধরণের বেমানান ব্যাপার মধ্যে মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। নিউ গিনি দেশে মোরগ জাতীয় এক রকম পাখী আছে তারা তাদের ডিমের জন্য যে বাসা তৈরী করে সে এক বিরাট ব্যাপার। ডিমগুলোর ওজন মোটমাট সের

খানেক হবে কিনা সন্দেহ; কিন্তু তার জন্য আধপচা পাতা ও খড় কুটো দিয়ে যে পাহাড় তৈরী হয় তা অতি প্রকাণ্ড। ওজন করলে তার ১৩০।১৪০ মণ ওজন হবে। এই বাসা তৈরী করতে ৪।৫ মাস সময় লেগে যায়। এই প্রকাণ্ড ডিবির মাথায় একটু গর্ত্ত করে এই পাখীতে ডিম পারে ও তাকে আরো পাতা প্রভৃতি চাপা দিয়ে রেখে দেয়। পরে পাতা পচার গরমে তা' পেয়ে পেয়ে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়।



ফুটবল নাকি!—ও বাবা রে! কত বড় ফুটবল রে! দৈত্যদের ফুটবল বুঝি!

—না, এটা ফুটবল নয়। এটা হচ্ছে ফুটবলের মত করে তৈরী করা বিরাট একটা গ্যাস রাখার পাত্র। চামড়া দিয়ে তৈরী নয়, লোহার পাত দিয়ে তৈরী। চেহারাটা কিন্তু দেখতে ঠিক ফুটবলেরই মত। বেলজিয়ম দেশের অষ্টেণ্ড সহরে এটি তৈরী করা হয়েছে। কি প্রকাণ্ড এই পাত্রটি তা এর পাশের খাড়া পাত্র এবং লোহার থাম ও সিঁড়ি প্রভৃতি দেখলেই বুঝতে পারছো।

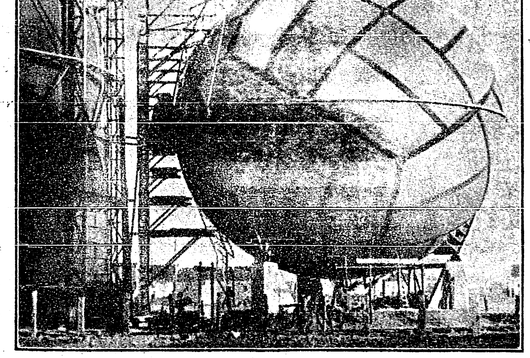

ধাঁধার উত্তর

প্রাচীর সমস্যা—কি ভাবে সোজা লাইনের প্রাচীর দিয়ে বাড়ী গুলিকে পৃথক ক'রে ফেলা যাবে, পাশের ছবিতে দেখান হ'লো।

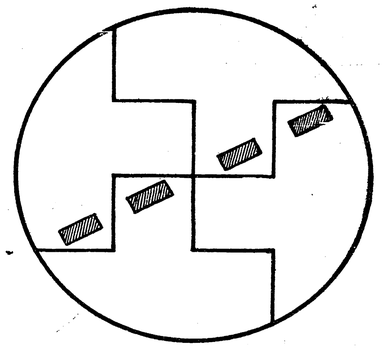

মাছের হিসাব—১ম থলিতে মাছ ছিল ৬টি এবং ২য় থলিতে ছিল ৭টি।

একটি ধাঁধার উত্তর দিয়েছেন—

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ পালিত, পাটনা ; নিতু, বুড়ো, বাণী সেন, বহরমপুর ; শ্রীআশামুকুল পাল, মেদিনীপুর ; ছবিরাণী, বুলু, টুলু, ময়না, হাসি, বাচুন, দীপালি, প্রতিমা, ইন্দিরা চৌধুরী, কলিকাতা ; অমল ও চামেলী মজুমদার, কোচবিহার ; রামপ্রসাদ, শিবশঙ্কর, শিবমুনি, রাশমনি, রাধা, বৌদি, কেশর দেবী, বেহালা ; শ্রীধীরসিংহ নাহার, কলিকাতা ; শ্রীঅশেষ মৈত্র, পাটনা ; মদন, আপাল, পচা (কুমার ভবন) চাইবাসা ; চন্দ্রশেখর, বীণা, রথী, যুঁই, আলো, ছায়া, বেণু, আলু, জামালপুর ; শ্রীকরুণা সেন, শাঁখারীটোলা ; নির্ম্মল ও আশা, কলিকাতা ; অধীর, ভোলা, মণ্টু, বর্দ্ধমান ; কুমারী হেমলতা লাহিড়ী, বর্দ্ধমান ; শ্রীগৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য, রামপুরহাট ; শ্রীপ্রবোধকুমার ভট্টাচার্য্য, সোনপুর ; বিল্ব বালা দেবী, কলিকাতা ; বকু ও সুধীররঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা ; শ্রীব্রজরাখাল রায়, কলিকাতা।

দুইটি ধাঁধার উত্তর দিয়েছেন—

শ্রীতারাদাস নাগ, খুলনা ; তড়িৎ, জ্যোতী, কুণ্ডল, রণজীৎ চাটার্জ্জি, দার্জ্জিলিং ; সত্যদাস, অজিত, হিমাংশু, প্রমোদ, হিরালাল, নিরঞ্জন, সুনামগঞ্জ ; শ্রীমান অমূল্যসুন্দর সরকার ; প্রভা, প্রজ্ঞা, পম্পা, মনোরমা, জলি, মীরা, পার্ব্বতী, ইন্দুপ্রভা, শিশির, বেতিয়া ; সত্যাশ্রয়, সুবিনয়, সুধাময়, বাদল, সুজু, সন্তোষ, সোমনাথ, ফটিক, গিরিজা, রসিক, গোপাল, জয়নুদ্দীন, পুরুলিয়া, (সরকার পাড়া) ; খুকী, বাণী, ডলি, লিলি, কমলাসাগর ; শ্রীঅচিন্তকুমার রক্ষিত, কলিকাতা ; অরুণ, কল্যাণ, শ্যামল, অশোককুমার দত্ত, (বীরহাটা) বর্দ্ধমান ; করুণাময়ী, সুধাময়ী, বিজু ও রমা, দুর্গাপুর, উত্তর পাড়া।

প্রিয় গ্রাহকগ্রাহিকাগণ,

তোমাদের "সন্দেশ"খানি গত কয়েক বৎসর যাবৎ মাসের প্রথমেই বাহির করিতেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিজেদের শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে গত কয়েক মাসের সন্দেশ দেরীতে বাহির হইয়াছে। তাহাতে তোমাদেরও অসুবিধা হইয়াছে, এবং আমরাও সেজন্য কম দুঃখিত নই। যাহা হউক, ভবিষ্যতে সন্দেশ যাহাতে মাসের প্রথমেই বাহির হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। ভাদ্রের সংখ্যা তোমরা ৮।১০ তারিখের মধ্যেই পাইবে, এবং তাহার পর আশ্বিন হইতে আবার সন্দেশ প্রতি মাসের প্রথমেই বাহির হইতে থাকিবে।

তোমাদের
"সন্দেশ" সম্পাদক

নূতন ধাঁধা

১। **তেলের পিপা**—এক দোকানদারের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে তার দোকানে ২১টা পিপা রয়েছে। তার মধ্যে ৭টা পিপায় পুরো তেল ভরা, ৭টায় অর্দ্ধেক তেল ভরা, এবং বাকি ৭টা খালি। তার ৩ ছেলের মধ্যে মহা গণ্ডগোল বেধে গেল কি করে সেগুলিকে তারা তিন জনে সমান ভাবে ভাগ করে নেবে। তেলের পরিমাণও সকলের সমান সমান পাওয়া চাই, আবার পিপার সংখ্যাও সকলের ভাগেই সমান পড়া চাই। পিপাগুলি যে যে ভাবে আছে সেই ভাবেই তারা ভাগ করে নেবে, এক পিপা থেকে আরেক পিপায় তেল ঢালতে গিয়ে অনর্থক তেল পড়ে গিয়ে নষ্ট হতে দেবে না। তা ছাড়া,



তিন রকমের পিপার কোন এক রকম পিপাই কারো ভাগে ৪টার বেশী পড়তে পাবে না। তোমরা বলতো কি করে তারা ৩ জনে পিপাগুলি ঠিকমত ভাগ করে নিতে পারবে।

২। **পদ পূরণ**—আমাদের কাজের যে সব আড্ডা (যেমন পাঠশালা ষ্টেসন প্রভৃতি স্থান) আছে, সেই সবের নাম দিয়া ফাঁকাগুলি পূরাইতে হইবে।

ব্যাঙাচিরা হ'লে ভে— — খ'সে পড়ে ;
যে— —লা ডোবা থাকে, সেই খানে চড়ে।
ঠোঁট দিয়ে সেথা — — —তা ছেঁড়ে ;
ঘরে ফিরে দেয় সে নি— ডিম পেড়ে।
মানুষেরা তাহা খায় ক— —ক নয় ;
করে গ্রা— —ল দ্রব্য যাহা কিছু হয়।

—(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

ছোটদের প্রিয় লেখক
শ্রীহেমদাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের



মজার মজার গল্প—পাতায় পাতায় ছবি—রঙিণ কাগজ-- বড় টাইপ
মাত্র চার আনা

হেমদা বাবুর আরো দু'খানা ছোটদের বই

ময়ূরপঙ্খী রাজকন্যা ... ... আট আনা
চীনের পাখী ... ... এক টাকা

দাসগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ও অন্যান্য বড় বড় লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ



রবিনসনের পেটেণ্ট বার্লী একশত বৎসরেরও উপর সুনাম অর্জন করিয়াছে। খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ ইহাই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

রবিনসনের "পেটেণ্ট" বার্লি

B.M. 2

দি সান্ অপ্‌টিকাল কোম্পানি

নিখুঁত চোখ পরীক্ষা
এবং চশমা ফিটিংএর
— জন্য অদ্বিতীয় —

২৪।১ কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—বড়বাজার ২১৬৫

নূতন সংস্করণ! নূতন সংস্করণ!

সচিত্র

মহাভারতেরগল্প

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত
৩য় সংস্করণ। দাম—১।০

মহাভারতের ৬৬টি বাছাই সুন্দর সুন্দর গল্প, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অতুলনীয় সরস ভাষায় লেখা। তাঁহার নিজের আঁকা একখানি ৩-রঙের ছবি ও অনেক গুলি এক-রঙের ছবিতে বইখানি আরো মনোরম হয়েছে। ছেলেমেয়েদের অতি সুন্দর বই। ঝকঝকে পরিষ্কার ছাপা; চমৎকার বোর্ড বাঁধাই।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,
১১৭।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৺ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

সন্দেশ

ভাদ্র, ১৩৪১

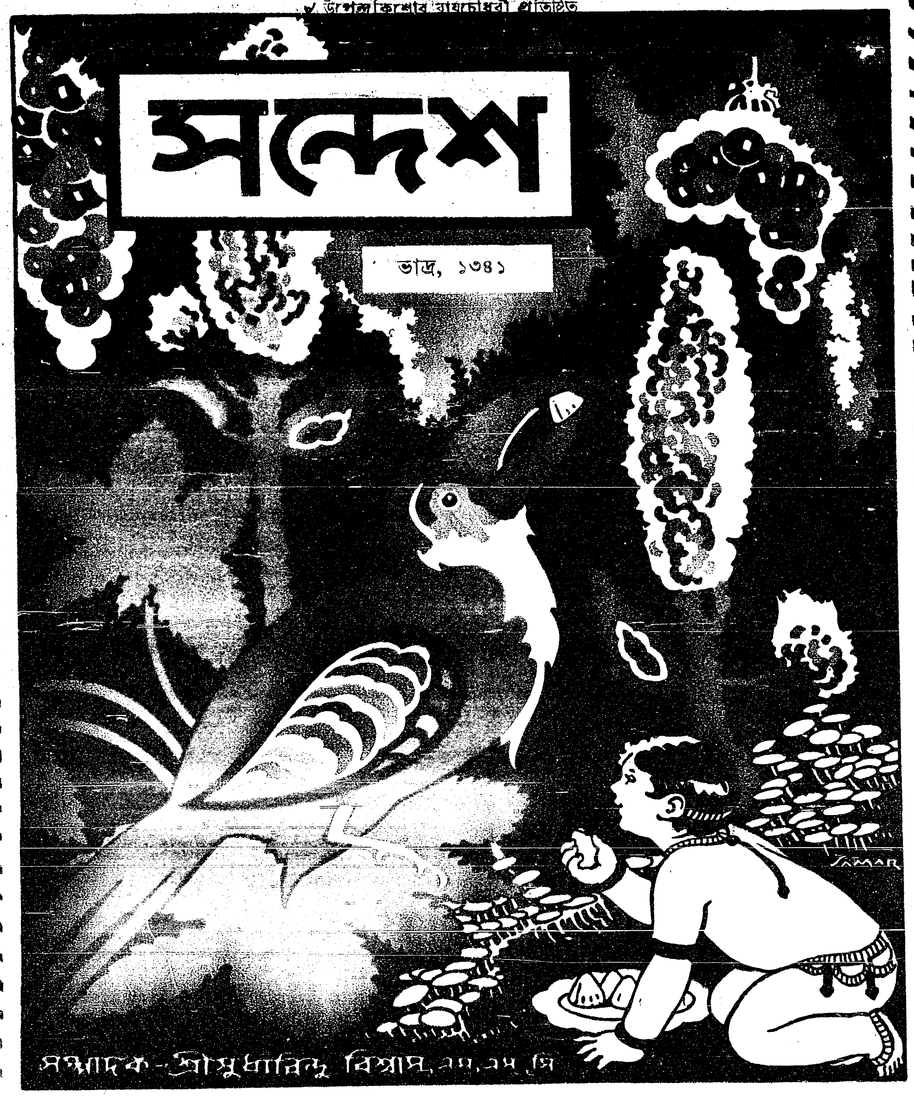

সম্পাদক—শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম, এস, সি

বার্ষিক ২॥৵০ আনা

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

COLOURED DOCUMENT.

—দেশনায়কগণের অভিমত—

যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য

দেশপূজ্য
৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির
অভিমত

"আমি মিঃ এইচ, বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, জিনিষগুলি খুবই ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে ইহাই ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।"

স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জননেতা
লালা লাজপৎ রায়ের
অভিমত

"আমি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি মিঃ এইচ, বসুর "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" বাস্তবিক ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধ অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"

স্বাঃ লালা লাজপৎ রায়

কেশতৈল—কুন্তলীন, কোকোলীন, ম্যাকেসার, চামেলীন প্রভৃতি।

হেয়ার লোসন—দেলখোস, দিলতোষ, হার্টস্ ডিলাইট, প্রভৃতি।

পমেটম—দেলখোস পমেড, গোলাপ ও বকুল পমেটম প্রভৃতি।

এসেন্স—দেলখোস, হোয়াইট রোজ, অপরাজিতা, বকুল, মাস্ক, যুঁই, বেলা, চামেলী, খস, অরিগ্যান প্রভৃতি নানা সিরিজের বিবিধ প্রকার সুগন্ধি।

নানাবিধ অটো, হেয়ারওয়াস, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, লাইম যুস ও গ্লিসারিন ক্রীম এবং স্নো প্রভৃতি।

সাবান—হোয়াইট রোজ, চন্দন, খসখস, মাস্ক, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ ফলের সিরাপ।

এইচ, বসু, পারফিউমার,
৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বিশ্ববরেণ্য
রবীন্দ্রনাথ
বলেন

"কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহারে একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক
৺মতিলাল নেহেরুর
অভিমত

"ভারতবর্ষের প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এইচ, বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
নদী পারের কেয়া	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫১৩
মাথা-ভাঙা ছেলে	শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি	..	৫১৫
চিরসুন্দর কাশ্মীর	শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু	...	৫২১
ঘুমের রাজা	শ্রীযতীন সাহা	...	৫২৯
জুজুর দেশে	শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী	...	৫৩৫
গোবিন্‌দা'র গোয়েন্দাগিরি	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...	৫৩৬
রূপকথা	শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫৩৯
বাদল্ স্বপন্	শ্রীষষ্ঠীধন সেন গুপ্ত	...	৫৪৪
খড়কুটোর জীব	শ্রীসুবিনয় রায়	...	৫৪৬
হাফ-টিকিট	...	...	৫৪৯(ক)
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় দলের ফুটবল খেলা		...	৫৪৯
চল্ চল্ চল্	শ্রীমান প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	..	৫৫৪
অন্ধ	শ্রীমান সুবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	৫৫৫
গল্প-স্বল্প	... ...	...	৫৫৮
ধাঁধার উত্তর	... ...	...	৫৬১
নূতন ধাঁধা	... ...	...	৫৬২

বাঁধানো "সন্দেশ"

পূর্ব্বের কোন কোন বৎসরের বাঁধানো সন্দেশ এখনো আছে—
১৩২৭, ১৩২৮, ১৩২৯ ও ১৩৩০ সাল —প্রতিখণ্ড, ১৷৷০
নব পর্য্যায়, ১ম বর্ষের (১৩৩৮-১৩৩৯) বাঁধানো সন্দেশ—৫৮০ পৃষ্ঠার প্রকাণ্ড বই—
১৭ খানি রঙিণ ছবি, এবং ৩০০ খানির বেশী ১-রঙা ছবি—দাম ২৲ টাকা
সন্দেশ কার্য্যালয়—১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

COLOURED DOCUMENT.

ছোটদের প্রিয় লেখক

শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের



মজামজার গল্প—পাতায় পাতায় ছবি—রঙিণ কাগজ - বড় টাইপ

মাত্র চার আনা

হেমদা বাবুর আরো দু'খানা ছোটদের বই

মযূরপঙ্খী রাজকন্যা .. ... আট আনা

চীনের পাখী ... ... এক টাকা

দাসগুপ্ত এণ্ড কোং

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ও অন্যান্য বড় বড় লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

যতীন বাবুর

লেখা আরো ৪ খানা ভাল বই

যাদুকর

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

আট আনা

চিচিং ফাঁক

আট আনা

আঁধার রাতের

মুসাফির

আট আনা

সোনার-ঘড়া

চৌদ্দ আনা

—মনে আঁচর রেখে যাওয়া গল্প—

—চোখে ছাপ রেখে যাওয়া ছবি—

যতীন সাহার লেখা

সমর দের আঁকা

"ঝিকিমিকি"

শ্রনে দেবে তোমাদের মনে সত্যিকারের ছাপ

শিগ্‌গীরই বেরুবে!

দাম আট আনা

সমস্ত বড় বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

ছেলেমেয়েদের সুন্দর উপহারের বই

এই বইগুলি ছেলেমেয়েদের যে কত প্রিয় তা এদের এতগুলি সংস্করণ থেকেই বোঝা যায়। সরল সুন্দর লেখায়, চমৎকার চমৎকার ছবিতে, ঝরঝরে ছাপায়, বইগুলি ছেলে মেয়েদের বিশেষ উপযোগী

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

ছেলেদের রামায়ণ

এরূপ সুন্দর ভাবে সরল ভাষায় বইখানি লেখা যে ইহার মত ছেলেমেয়েদের রামায়ণ আর নাই। ৮ খানি হাফটোন ছবি, ১ খানি রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

২০শ সংস্করণ। দাম ॥৵০

ছেলেদের মহাভারত

এখানিও ছেলেমেয়েদের একখানি অতুলনীয় বই। মহাভারতের মূল গল্প উপেন্দ্র বাবুর সুন্দর সরস ভাষায় লেখা। ৮ খানি হাফটোন ছবি, কয়েকখানি অন্যান্য ছবি, ১ খানি রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

১৮শ সংস্করণ, দাম ১॥০ টাকা

টুনটুনির বই

ছেলেমেয়েদের অতি সুন্দর গল্পের বই। ২৭টি চমৎকার গল্প, ৩০ খানি মজাদার ছোট ছবি, ও রঙ্গিন মলাট।

১১শ সংস্করণ, দাম ॥০ আনা

৺সুকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

আবোল তাবোল

পাতায় পাতায় হাসি, পাতায় পাতায় মজার ছবি! মোটা কাগজে সুন্দর ছাপা, চমৎকার রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট। ছেলে-মেয়েদের উপহারের এমন বই আর নাই।

৪র্থ সংস্করণ। দাম ৸৵০

হ-য-ব-র-ল

নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এমন মজার বই খুব কম। পড়িতে পড়িতে হাসির চোটে পেটে খিল ধরিবে। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বই। রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট, সুন্দর ঝক্‌ঝকে ছাপা।

দাম ।৵০ আনা।

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

গল্পের বই

২০টি মজার গল্প, ১৬ খানি সুন্দর হাফটোন ছবি। ১ খানি রঙ্গিন ছবি, রঙ্গিন মলাট।

৯ম সংস্করণ। দাম ॥৵০

আরো গল্প

১৫টি সুন্দর গল্প, ১৬ খানি চমৎকার হাফ-টোন ছবি। ১ রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট।

৮ম সংস্করণ। দাম ॥৵০

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি

২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের জন্য

কয়েকখানি বাছাই বই

এগুলির পরিচয় ছেলেমেয়েদের কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যেমনি সরস সুন্দর ভাষা, তেমনি চমৎকার চমৎকার এক রঙের ও ৩-রঙের ছবি। মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত, এবং ডিরেক্টর-অব-পাবলিক-ইনস্ট্রাকসন কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র ...	॥০	কথাসরিৎ সাগর ...	॥৶০
,, বেতাল পঞ্চবিংশতি	॥০	রবিন্ হুড্	॥৶০
,, বত্রিশ সিংহাসন	॥০	ওডিসিয়ুস	।৶০
পুরাণের গল্প ...	॥০	ইলিয়াড	।৶০

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত

নূতন সংস্করণ

স্বাস্থ্য

পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত

১। পড়া শুনা ।৶০
২। খেলার পড়া ।৶০

স্বাস্থ্যের কথা ছেলেমেয়েদের জন্য অতি সরল সরস ভাবে লেখা। ভাল কাগজে, বড় অক্ষরে, পরিষ্কার ছাপা। অনেকগুলি ছোট ছবি, সুন্দর মলাট। মূল্য—ছয় আনা

বই দুইখানির নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম-এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

U. RAY & SONS

for

THE BEST QUALITY PROCESS BLOCKS —

HALFTONE, LINE,
DUO-TONE AND
3-COLOUR BLOCKS
OF ALL VARIETIES.

and

THE HIGHEST CLASS OF ART, COLOUR, AND GENERAL PRINTING

in

ENGLISH, BENGALI,
ASSAMESE, HINDI,
AND ORYIA, ETC.

***Office:*—117-1, Bowbazar Street, Calcutta.**

PHONE : B.B. 2211 TELE : "RAYTONE". CALCUTTA.

"সন্দেশ"এর নিয়মাবলী

আশ্বিন হইতে "সন্দেশ"-এর বৎসর আরম্ভ হয়।

"সন্দেশ"-এর বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৷৶০ ; প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।
চার আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

ভিঃ পিঃ খরচ আলাদা। টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়াই ভাল।

সন্দেশ মাসের ১লা বাহির হয়। কোন গ্রাহক সময়মত সন্দেশ না পাইলে, ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। তাহার পরে প্রতিখানার আলাদা দাম লাগে।

চিঠিপত্র, টাকা পয়সা, লেখা প্রভৃতি সবই নীচের নামে পাঠাইবেন। অন্য নামে পাঠাইলে অসুবিধা হয়।

ম্যানেজার, "সন্দেশ"

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রত্নমেশা

যখন
প্রথম বের হয়
তখন
সন্দেশের গ্রাহকেরা
কিনেছিল সকলেই।
প্রথম সংস্করণ কয়েক খণ্ড
এখনও আছে।
নতুন গ্রাহকেরা সত্বর হও।
দাম একটাকা
ইউ রায় এণ্ড সন্স,
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুভা (সচিত্র)

শ্রীসুখলতা রাও প্রণীত

ছেলেমেয়েদের একখানি নূতন ধরণের নাটক।

খেলাচ্ছলে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, নানা নীতিকথা এমন চমৎকার সুললিত ভাষায় লেখা যে পড়তে বস্‌লে শেষ না ক'রে উঠা যায় না।

দাম ।৶০ ছয় আনা।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ



রবিনসনের পেটেণ্ট বার্লী একশত বৎসরেরও উপর সুনাম অর্জন করিয়াছে। প্যাতনামা চিকিৎসকগণ ইহাই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

রবিনসনের "পেটেণ্ট" বার্লি

B.M. 2

ডোঙ্গরের বালাম্‌ত

বালকবালিকার পক্ষে যথার্থই
অমৃততুল্য।

ইহা শিশুদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরে বলসঞ্চার করে। ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক। ইহা পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাশি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট; অনেকের ধারণা ইহা 'ফুড' বিশেষ। বস্তুতঃ ইহা অতি উপাদেয় সুমিষ্ট ঔষধ। বর্দ্ধনশীল শিশুদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা চলে।

মূল্য প্রতি বোতল এক টাকা মাত্র।
সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটর—

কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং
BOMBAY, Girgaon.

DONGRE'S
BALAMRIT



IDEAL TONIC FOR CHILDREN.



প্রত্যেকদিন তোমাদের রুমালে ব্যবহার করবার জন্যে

'ইরা'র মত এমন সুন্দর অথচ দামে কম
— সুগন্ধি বাজারে আর নাই —

চমৎকার বাক্সে, সুমনোহর কাচের শিশিতে থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল, কলিকাতা

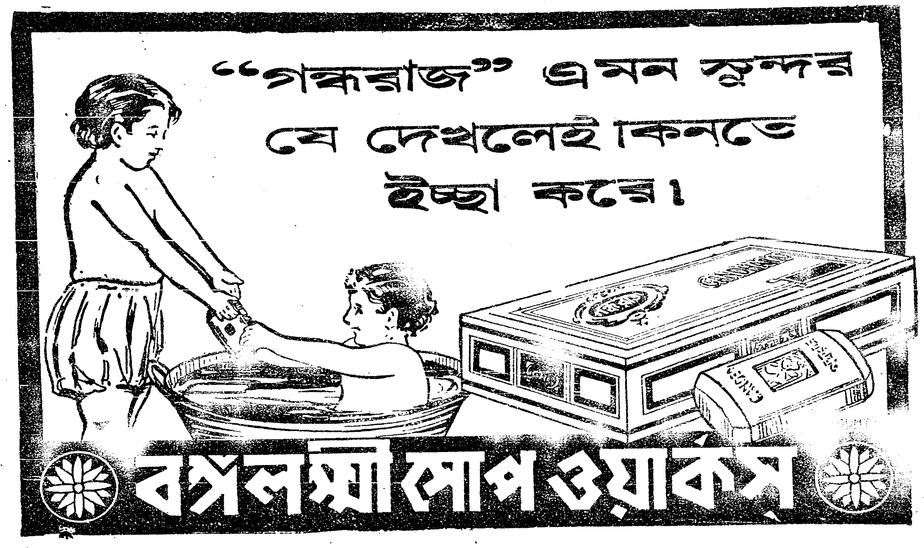

BLEED THROUGH.

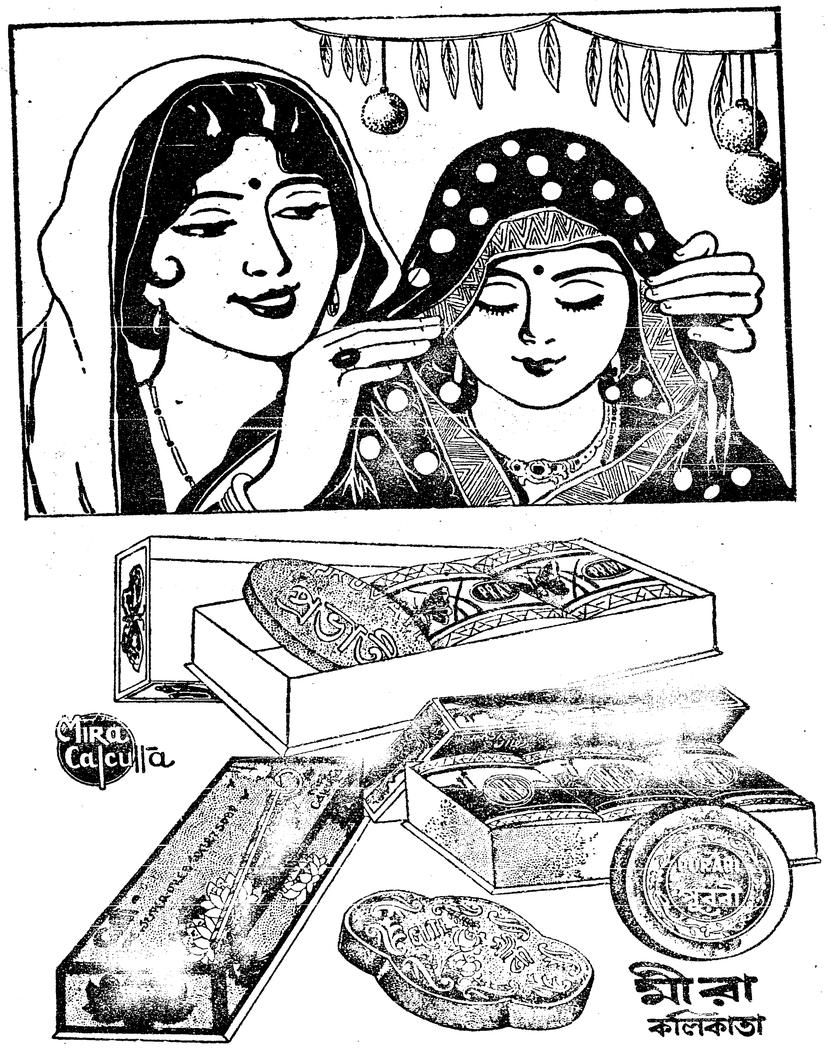
Mira Calcutta
মীরা
কলিকাতা



মাছরাঙা জিভ বের করে চোখ উল্টিয়ে মৎসকন্যাকে এক দারুণ ভেংচি দিল

শিল্পী শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে —৫৪১ পৃঃ

সন্দেশ

নব পর্য্যায়
৩য় বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৪১

১২শ সংখ্যা

নদী পারের কেয়া

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

নদী পারের কেয়া ওগো
নদী পারের কেয়া,
কোন অকূলে চাইছ যেতে—
ভাসিয়ে ফুলের খেয়া !

গহীন নদীর নতুন জলে
ছল্‌ছলিয়ে উজান চলে,
জলের বুকে ছায়া ফেলে
হাঁকছে কালো দেয়া ;
কোন সুদূরের ডাক শুনে আজ
ফুট্‌লে তুমি কেয়া !

বকুল বনে ঝর ঝরিয়ে
ঝরছে বকুল ফুল

COLOURED DOCUMENT.

দুল্‌ছে কানে ভুঁই-চাঁপাদের
বিষ্টি-ফোঁটার দুল্‌।

পার ছাপানো দীঘির কাছে
ঝিঙের ঝোপে ফিঙে নাচে,
জামের বনে এসে মেঘের
পথ হয়েছে ভুল;
পথ দেখতে তারে কি আজ
ফুট্‌লে কেয়া ফুল!

এ পারেতে ফুটে আছো
ওগো কেয়ার মেয়ে,
ওপার পানে বলো কাহার
পথের পানে চেয়ে!

কচি সবুজ ধানের ক্ষেতে
বাদল বাতাস উঠ্‌ছে মেতে,
ভাটির ডিঙা বাইছে মাঝি
ভাটিয়ালি গেয়ে;
নদী পারে ফুট্‌লে তুমি
সোণার কেয়া মেয়ে।

ভাদর ভোরে অঝোর ঝরণ
ঝরছে বাদর ধারা,
নিজন মাঠে ভোরের আলো
হয়েছে পথ হারা।

সুপুরি ঝাড় কেবল দোলে
তালের বনের মাদল রোলে,
সির সির সির বাঁশ বনে কে
গান গেয়ে হয় সারা!
নদীর পারে ফুট্‌ল কেয়া
পেয়ে বাদল ধারা



(শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি)

গ্রামের কেউ তাকে ভালো চোখে দেখত না। স্কুলে কোন কিছু গণ্ডগোল, কোন কিছু উৎপাত হয়েছে কি অমনি সকলে মিলে তার নামে দোষ চাপিয়ে বসেছে। মারের চোটে গায়ের চামড়া ফাটে, রক্ত ছোটে, কিন্তু জল ঝরে না চোখে এক ফোঁটাও। এমনি কঠিন ছেলে সে! বাড়ীতে জ্যাঠামশায়ের ধমক, বাবার মার, কাকার বকুনি, পাড়াপ্রতিবেশীর নিন্দাবাদ, মাষ্টার মশায়দের বেত, সব সে খোলা চোখে মুখ বুজে সহ্য করত—যেন সে সব তার গায়েই লাগে না।

কিন্তু লাগত তার খুবই। তবে বড় জেদী ছেলে সে, আর বড় অভিমানী। যারা তাকে ভালবাসে না, শুধু বকুনি, মার আর ধমক দিয়ে যারা তাকে চালাতে যেত, তাদের কথায় সে কিছুতেই চলত না।

ভাই বোন বা মা তার কেউ ছিল না। সারা জগতের মধ্যে কাকিমাই একমাত্র তাকে ভাল বাসতেন।

একদিন স্কুলে খুব গোলমাল। হেড মাষ্টার মশায়ের টেবিলের টানার মধ্যে থেকে পাঁচ টাকার এক খানা নোট চুরি গিয়েছে। সকলকেই বলল—"নেই নি।" সেও বলল—"না।" কিন্তু তার কথা কে শোনে? সকলে চীৎকার করে বলে উঠল—"আলবৎ নিয়েছিস!" তারপর চলল সপাসপ্‌ বেত। সে আর থামে না! গায়ের চামড়া ফেটে রক্ত ছুটলো, তবু সে চুপ করে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে মার খেতে লাগল।

ছুটি হয়ে গেল। সকলেই যে যার বাড়ী চলল; তার পানে তাকিয়ে কেউ

একবার আহা বা উহু বলল না। বলল—"বেশ হয়েছে, যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর!"

মার ও শাস্তির হাত থেকে সে যখন ছুটি পেল, তখন এক ছুটে বাড়ী গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাকিমার বুকে। কাকিমার কোলে মুখ গুঁজে সারাদিনের চেপে রাখা বুক-ভাঙা কান্না আর থামিয়ে রাখতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কাকা বাড়ী এলেন। পথে শুনে এসেছেন সব কথা। এসেই যখন দেখলেন কাকিমার কোলে মুখ গুঁজে সে আদর নিচ্ছে তখন তাঁর বকুনি দেখে কে! বললেন—"বুড়ো ধাড়ী ছেলে, টাকা চুরি করে এসে কাকিমার কোলে শুয়ে আদর পোয়াচ্ছেন! লজ্জা করে না বেহায়া? চোর! বেরো বাড়ী থেকে! দূর হ তুই এখান থেকে।"

সব কান্না তার শুকিয়ে গেল। সোজা সে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর সোজা বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

কোথায় গেল সে কেউ জানে না। সাত দিন কেটে গেল, তবুও তার দেখা নাই। তখন স্কুলের সকলে বলল—"চোর, চুরি করে পালিয়েছে।"

গ্রামের লোক বলল—"হাড় জুড়াল, গাঁয়ের লোক বাঁচল।"

বাবা বললেন—"ছেলেটা সত্যি গেল নাকি?"

কাকা জ্যাঠা বললেন—"কোন দিন কোথায় ফাঁসি কাঠে ঝুলবে কে জানে!"

কাকীমা কিছুই বললেন না—দিনরাত কেবলই কাঁদতে লাগলেন।

* * *

চার পাঁচ মাস পরে তার কথা আবার শোনা গেল। গ্রামে খবর এল যে কলকাতার কাছে নদীতে একটা নৌকাডুবি হয়েছিল। তাতে ছিল একজন খুব বড় লোকের বউ আর তার একমাত্র ছোট মেয়েটি। ঝড় বাদলের তুমুল গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে বহু কষ্টে সাঁতার কেটে মা ও মেয়েকে ডাঙ্গায় তুলে নিয়ে এসে তাদের রক্ষা করেছিল সে। জলে ভাসা একটা কাঠে ঘা লেগে তার মাথা ফেটে গিয়েছে। বড়লোক বাবুটি তাকে বাড়ী নিয়ে আদর যত্ন করে চিকিৎসা করাচ্ছেন।

এমন খবর পেয়েও কেউ তার নামে একটুও প্রশংসার কথা বলল না। স্কুলের সকলে বলল—"চোরটার ভাগ্যি ভাল!"

গ্রামের লোকে বলল—"বড়লোকের বাড়ী ঢুকেছে, এইবার তার সিন্ধুক ভাঙবে।"

বাবা বললেন—"ছেলেটাকে এইবার ধরে নিয়ে আসা যাক।"

জ্যাঠা ও কাকা বললেন—"না। বেশ আছে, থাক। বরং চল, বড়লোকটির সঙ্গে ভাব করে আসি।"

তিনজনে কলকাতায় চললেন। কাকীমা বাড়ী রয়ে গেলেন, অনেক দিন পরে তার চোখ মুখ আর মন পরিষ্কার হ'ল।

তখনও মাথার ঘা সারে নি। পরিষ্কার একটা ঘরে পরিষ্কার খাটে সে শুয়ে থাকে—মাথায় পটি বেঁধে। সেইখানে একদিন সন্ধ্যায় চাকর এসে খবর দিল—গ্রাম থেকে তার বাবা, কাকা ও জ্যাঠামশাই এসেছেন। হাত মুখ ধুচ্ছেন, একটু পরেই দেখা করতে আসবেন। শুনে কিছুই বলল না সে। চাকর যখন চলে গেল সেও তখনি একটা চাদর মুড়ি দিয়ে পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল।

তার বাবা কাকা জ্যাঠাকে নিয়ে লোক যখন তার ঘরে ঢুকল তখন দেখল ঘর খালি। কোথায় গেল, কোথায় গেল! রুগ্ন ও দুর্ব্বল শরীর নিয়ে কোথায় গেল! চারিদিকে খোজ খবরের ধুম চলল। কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না।

কলকাতায় তিনদিন অপেক্ষা করে বাবা কাকা জ্যাঠা গ্রামে ফিরে এলেন। বললেন—"কি অপমানটাই না করল! বেটা রীতিমত পাজি।"

স্কুলের সকলে বলল—"খালি হাতে আর যায়নি সে।"

গ্রামের লোকেরা বলল—"খাল কেটে কুমীর ঘরে নিয়ে এসে বেচারা বড়লোক এতক্ষণ পথে বসেছে।"

একমাত্র কাকীমাই বুঝলেন, কি বুকভাঙা অভিমান নিয়ে সে কাকা বাবা জ্যাঠার কাছ থেকে পালিয়েছে। তিনি মুখ চেপে গুম হয়ে রইলেন।

কলকাতার বড়লোকটির সেই একটি মাত্র মেয়ে। ভাই বোন তার কেউ নেই। যে তাকে নদী থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এল তাকেই দাদা দাদা বলে আদর করে, ও তার কাছ থেকে আদর ও ভালবাসা পেয়ে, বড় বেশী তার ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল। নদীর জলে ভেজার পর থেকেই ভুগছিল; এখন আবার এত আদরের দাদা না বলে চলে যাওয়ায় আরো যেন সে মুষড়ে পড়ল। অসুখ তার না কমে বাড়তেই

লাগল। তার বাবা তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সেই ঘর-পালানো মাথা-ভাঙা ছেলের উদ্দেশ্যে অনেক মিনতি করে লিখলেন যে সে যেখানেই থাকুক আর যেন একটুও দেরী না করে সে চলে আসে ; নইলে তার বোনটি আর বাঁচবে না।



হাঁটা পথে দশ বারো দিনের পথ দূরে, এক সহরে বসে সে এই বিজ্ঞাপন দেখল। অস্থির হয়ে পড়ল সে। সত্যিই কি তার বোনটি বাঁচবে না? সত্যিই কি আর তাকে সে দেখতে পাবে না। পাগলের মত সে ছুটলো। হাতে তার পয়সা নেই কিন্তু রেলগাড়ীতে না গেলে তো চলবে না। মাঠ পার হয়ে ষ্টেসনে গিয়ে সে সোজা গাড়ীতে চড়ে বসল। টিকিট ছিল না বলে কলকাতা আসতেই তাকে রেলের লোকে ধরল। ধরে নিয়ে যখন কিছু দূর গিয়েছে তখন ধাক্কা মেরে সঙ্গের লোকটাকে ফেলে সে সোজা ছুট দিল।—"চোর চোর" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সকলে তার পিছু নিল। কোন খানে না থেমে সে সোজা গিয়ে উঠল তার বোনটির বাড়ীতে। পুলিশের লোক, রাস্তার লোক, সকলে মিলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বাড়ীর বাইরে সোর গোল আরম্ভ করে দিল। মেয়েটির বাবা সব কথা বুঝিয়ে বলে রেলের পাওনা টাকা দিয়ে সব মিটিয়ে ফেললেন। চারিদিকে কিন্তু ছড়িয়ে পড়ল—পুলিশকে ছুরি মেরে একটা লোক পালিয়েছে।

গ্রামে খবর পৌঁছল, এতদিন সে খুনে ডাকাত হয়েছে। কলকাতার রাস্তায় ডাকাতি করে, পুলিশকে খুন করে সে পালিয়েছে।

গ্রামের লোকেরা বলল—"এইবার যাদু বুঝবেন!"

স্কুলের সবাই বলল—"চোরের পরিণাম এ হবেই হবে।"

বাবা বললেন—"একবার খোঁজ নিলে হয় না?"

কাকা জ্যাঠা বললেন—"এতো জানাই রয়েছে। আগেই তো বলে দিয়েছিলাম।"

এই সব গুজবের কোন মানে বুঝতে না পেরে কাকিমা চুপ করে রইলেন। আর কলকাতার বাড়ীতে তখন সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা।

তারপর আবার কিছুদিন কেটে গিয়েছে। গ্রামের স্কুলে আবার একবার চুরি হয়েছে। এবার কুড়ি টাকা। পুলিশ এসে খোঁজ করে চোর ধরল। পুলিশের কাছে চোর এ কথাও স্বীকার করে ফেলল যে আগের বারে স্কুলে যে পাঁচ টাকা চুরি গিয়েছিল তাও তারই কাজ।

সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। টাকা পাঁচটা তা হলে সেই মাথা-ভাঙা ছেলেটা চুরি করে নি! স্কুলের সকলে এক বাক্যে বলল—"ছেলেটা তো আচ্ছা বোকা, চুপ করে মার খেল!"

গ্রামের লোকে বলল—"যেমনি দস্যি তেমনি আহাম্মক!"

কাকা জ্যাঠাও বললেন—"তাইতো নিটে বোকা সে।"

বাবা চুপ করে ভাবতে লাগলেন। কাকিমা কিন্তু ডাক ছেড়ে সেদিন কেঁদে উঠেছিলেন।

সে তখন কলকাতায়। এ সব ব্যাপার কিছুই সে জানে না। এমন সময় বাবার চিঠি এল। চিঠি পড়ে দু'চোখ ফেটে তার জল পড়তে লাগল। তার বাবা লিখেছেন—"আমি ভুল বুঝে তোমাকে বকেছি মেরেছি। সে কথা ভেবে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমার উপর আর রাগ করে থেকো না। আমি তোমাকে আনতে যাচ্ছি। এবার যেন তোমাকে পাই। তোমার কাকিমাও তোমার জন্যে কান্না কাটি করছেন।"

বাবা এলে সে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। বাবা তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন—"চল আমার সঙ্গে"। সেও প্রস্তুত, কিন্তু বোনটি আর তাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তখন সকলের কথা মত বোনটিকেও নিয়ে সে বাবার সঙ্গে চলল।

গ্রামে এসে ঘাটে যখন নৌকা লাগল তখন গ্রামের সব লোক সেখানে ভিড় করে এসেছে। জ্যাঠামশাই, কাকা, স্কুলের মাষ্টার মশাই আর ছেলেরা, সবাই আছে। সে কিন্তু তাদের কোন দিকে তাকাল না, তাদের কারো কথায় কোন কাণ দিল না। সোজা দৌড়ে গিয়ে একেবারে কাকিমাকে জড়িয়ে ধরল। তাঁর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। তার বোনটিও ততক্ষণে এসে পৌঁছেছে ও তার চুলের মধ্যে হাত বুলাতে আরম্ভ করেছে।

গ্রামের লোকে বলতে লাগল—"নিজে করলেন আহাম্মকী, আবার দেমাক দেখান হচ্ছে!"

স্কুলের ছেলেরা বলল—"অতি দর্পে হতা লঙ্কা,···আবার মরবে।"

কাকা, জ্যাঠা বললেন—"সত্যি, ছেলেটা কি সভ্যতা ভব্যতা শিখবে না।"

বাবা কিছুই বললেন না। আর কাকিমা? তিনি তখন তাকে কোলে জড়িয়ে নিয়ে আনন্দ চাপতে না পেরে কেঁদে ফেলেছেন।

* * *

অনেক অনেক দিন কেটে গেছে। দেশের চারিদিকে, এখানে ওখানে, যেখানে সেখানে, খুব বড় একজন ডাক্তারের নাম ও পসার ছড়িয়ে পড়েছে। রোগী ও গরীবের তিনি বন্ধু। কিন্তু সকলে আদর করে তাঁকে ডাকে, "মাথা-ভাঙা ডাক্তার।" পরের মাথা তিনি ভাঙেন না, কিন্তু নিজের মাথায় ভাঙা দাগ আছে বলেই এই নাম। ছেলে বেলায় নদীর মধ্যে মাথা ভেঙে গিয়ে যে দাগ তাঁর হয়েছিল সেটা আর মেলায় নি। কিন্তু মনের মধ্যে ছেলে বেলায় কষ্টে দুঃখের যে দাগ পড়েছিল, তা বোধ হয় মিলিয়ে গেছে। আর অন্য সকলেও ভুলে গেছে, কি অবিচার অত্যাচার এই ছেলের উপরে তারা করেছিল। এখন তার নাম করে সবাই জাঁক করে। গ্রামের সকলে বলে—"বরাবরই বলে এসেছি এ ছেলে বড় না হয়ে যায় না।"

স্কুলের সকলে বলে—"হবে না! কাদের হাতে মানুষ হয়েছে তা দেখ!"

কাকা, জ্যাঠা বলেন—"হেঁ হেঁ, কাদের বাড়ীর ছেলে সেটা মনে আছে!"

বাবার মুখ নীরব আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আর কাকিমার মুখও হাসিতে ভরে যায়। আর তার সেই বোনটি যখন আসে তখন সকলের দিকে তাকিয়ে মুখ গম্ভীর করে বলে—"ও আমার দাদা যে!"

চিরসুন্দর কাশ্মীর

(শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু)

কাশ্মীর দেখিবার বাসনা আমার বাল্যকাল হইতে। চিরদিন শুনিয়াছি, কাশ্মীর ভূস্বর্গ, পৃথিবীতে নাকি এমন সুন্দর দেশ নাই। সত্যই, কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই রমণীয়, পৃথিবীর নানা দেশের মধ্যে একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডের সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে।

বরফ-ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী, দিগন্তবিস্তৃত সুন্দর হ্রদ, আঁকাবাঁকা পার্ব্বত্য নদী, নানা ফুলভরা বনভূমি, সহর-গ্রাম-ভরা ফুল-ফলের-বাগান-ঘেরা উপত্যকা,—এই সকলের সম্মিলনে দেশটি অপরূপ।

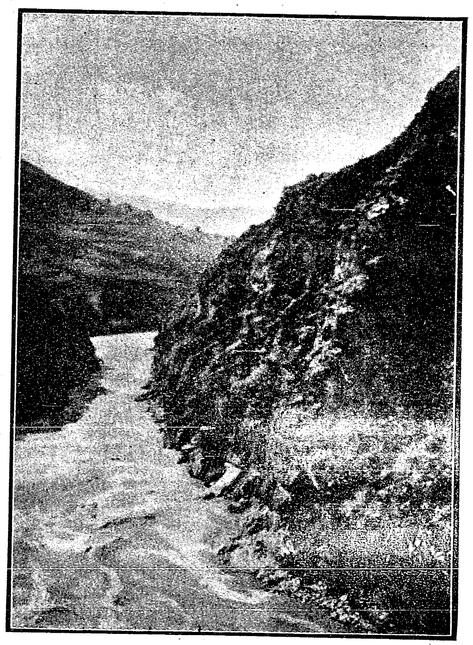

কাশ্মীরের পথে—ঝিলম উপত্যকা

সেবার পূজায় ঠিক করিলাম, কাশ্মীর যাইবই। এক বন্ধু প্রথমে আশা দিলেন সঙ্গী হইবেন, কিন্তু যাবার দিন তাঁহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না; সুতরাং একাই বাহির হইলাম। এরূপ মরীয়া হইয়া বাহির হইতে না পারিলে দূরদেশ-ভ্রমণ হইয়া ওঠে না।

কলিকাতা হইতে রওয়ালপিণ্ডি সুদীর্ঘ পাড়ি,—রেলপথে ১৩৫৫ মাইল, দুই রাত্রি দুই দিনের পথ; সোমবার রাত্রে কলিকাতা ছাড়িলে বুধবার বিকালে রওয়ালপিণ্ডি পৌঁছান যায়। ট্রেন হইতে অপরাহ্ণের আলোকে যখন রওয়ালপিণ্ডি ষ্টেশনে নামিলাম, রেলের ঝাঁকুনিতে সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, দেহ অত্যন্ত

শ্রান্ত ; কিন্তু কাশ্মীর দেখিবার ইচ্ছা তখন নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে, শারীরিক কষ্ট তখন অতি তুচ্ছ। উৎসাহে মন নাচিয়া উঠিল।

প্লাটফর্মে নামিতেই নানা মোটরবাস-সার্ভিসের লোক তীর্থের পাণ্ডাদের মত আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। রওয়ালপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর মোটরগাড়ীতে যাইতে হইবে। আমার কোন মোটরকার ভাড়া চাই কিনা, সবাই জানিতে চায়। শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত, এখন ওয়েটিংরুমে যাইয়া স্নান করিয়া কিছু খাইতে পারিলে বাঁচি ; কিন্তু সে সব কথা ভুলিয়া মোটরগাড়ীর লোকদের সঙ্গে দরাদরি করিতে লাগিয়া গেলাম। অনেক চেঁচামেচি দর কষাকষির পর এক মোটরকার সার্ভিসে আগামী কল্যের জন্য একটি সিট রিজার্ভ করিয়া মন শান্ত হইল। মোটরকার ভোর বেলা ছাড়িবে, সুতরাং ষ্টেশনে রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিতে হইল।

অতি প্রত্যুষে আমরা রওয়ালপিণ্ডি ছাড়িয়া শ্রীনগরের পথে রওনা হইলাম। রওয়ালপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর ১৯৮ মাইল, পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা পথ, কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ১৪ মাইলের অধিক মোটরগাড়ী চালাইবার হুকুম নাই, পৌঁছিতে প্রায় দুইদিন লাগিবে।

আমি মোটরগাড়ী চালকের পাশের সিট্ অধিকার করিয়া বসিলাম, তাহাতে সম্মুখের ও পথের দুই পার্শ্বের দৃশ্য বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পারিব, কাশ্মীরের শোভা দুই চক্ষু ভরিয়া পান করিতে চাই। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই মোটরগাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্রথম তের চোদ্দ মাইল সমতল ভূমি দিয়া চলিলাম, সম্মুখে পর্ব্বতশ্রেণী হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। চোদ্দ মাইলের পর গাড়ী ধীরে ধীরে উচুঁতে উঠিতে লাগিল, দুই ধারে ছোট ছোট পাহাড়। পর্ব্বত বন রাঙাইয়া সূর্য্য উঠিল, তাহার রাঙা আলো আমাদের সম্মুখে তাহার বিমল দ্যুতি আকাশ বাতাশ ভরিয়া। সূর্য্যের সহিত পাল্লা দিয়া আমরা ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া চলিলাম। সর্পিল পথ দুর্গম পর্ব্বতগাত্র জড়াইয়া জড়াইয়া নীলাকাশের কোন্ অজানা সৌন্দর্য্যলোকের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। উনচল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যখন মারী (Murree) সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন আমরা রওয়ালপিণ্ডি হইতে প্রায় পাঁচ হাজার ফিট উঁচুতে উঠিয়া আসিয়াছি। মারী সহর প্রায় সাত হাজার ফিট উঁচু এক পাহাড়ের মাথা জুড়িয়া প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস। এখানকার এক হোটেলে প্রাতরাশ করিয়া আবার যাত্রা সুরু করিলাম।

প্রথমে কয়েক শত ফিট নামিয়া যাইতে হইল, তারপর পাহাড় বনের গায়ে আবার আঁকিয়া বাঁকিয়া চলা। মারী হইতে ত্রিশ মাইল দূরে কোহালা নামক স্থানে ঝিলম নদী পার হইলাম। এইবার আমরা ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া মহারাজা স্যর্ হরি সিংহ বাহাদুরের কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এখান হইতে পথ চমৎকার, সুন্দরী গিরি-তরঙ্গিনী ঝিলম আমাদের সঙ্গিনী হইল ; কোথাও গভীর খাদ, কোথাও নিবিড় অরণ্য, কোথাও তাসের ঘরের মত ছোট গ্রামের বাড়ীগুলি ; রৌদ্রালোকে ঝিলমের খরস্রোত গলিত হীরকধারার মত ঝিকিমিকি করিতেছে ; পথের প্রতি বাঁকে নূতন সৌন্দর্য্য, কাশ্মীর-প্রকৃতির নব নব রূপ।

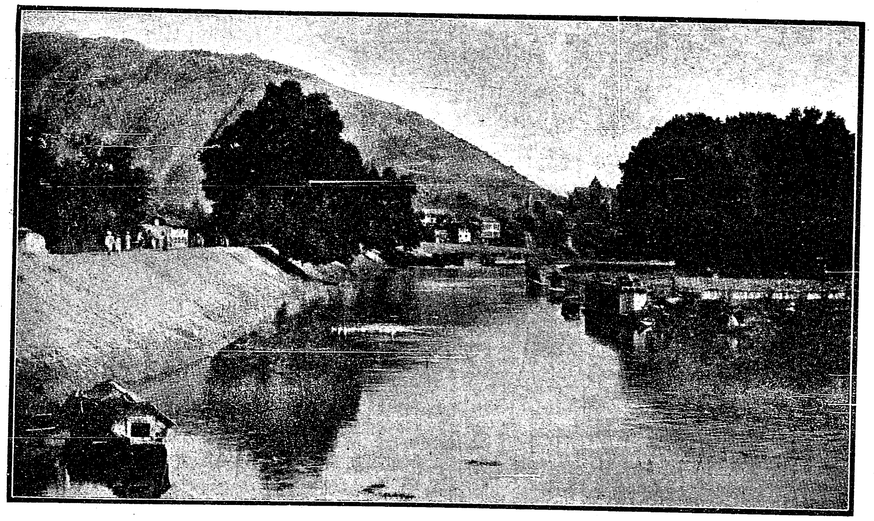

নদীর উপর হাউস্-বোট, দূরে 'তখ্ত' পাহাড়

সন্ধ্যায় আমরা উরি নামক এক ছোট সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম, রওয়ালপিণ্ডি হইতে ১২৫ মাইলে। উরির ডাকবাংলোতে রাত্রিযাপন করিয়া ভোর বেলা শ্রীনগরের দিকে যাত্রা করিলাম। সে প্রভাতের মোটরযাত্রা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। মনে হইল, কোন মায়াপুরী দিয়া চলিয়াছি। কোথাও কালো পাথরের

পাহাড়ে স্তবকে স্তবকে রঙীন ফুল ফুটিয়া, কোথাও দেওদার শ্রেণীর ঘন বনের অন্ধকার ঊষার আলোকে রাঙা, কোথাও গিরিবর্ত্মের গভীর নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া গিরিনির্ঝর বিদ্যুতশিখার মত ঝলমল করিতেছে। উরি হইতে বারামুল্লা ৩৭ মাইল পথ স্তব্ধ ভয়ঙ্কর পর্ব্বতমালা দিয়া এক হাজার ফিট উঠিয়া গিয়াছে। বারামুল্লাতে আসিয়া পার্ব্বত্যপথ শেষ হইল; পরম বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, চারিদিকে সুন্দর সমতলক্ষেত্র দিগন্তে বহুদূরে তুষারাবৃত পর্ব্বতমালার কোলে যাইয়া মিশিয়াছে, পর্ব্বতের পর পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এ কোন্ অপূর্ব্ব শ্যামল সমতল দেশে আসিলাম!



কাশ্মীরী মেয়েদের ধান ভানা

বারামুল্লা হইতে কাশ্মীর উপত্যকার আরম্ভ। এই উপত্যকা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২০ মাইল ও প্রস্থে ৭৫ মাইল, সমুদ্রতীর হইতে ইহার উচ্চতা পাঁচ হাজার হইতে ছয় হাজার ফিট; ইহার মধ্য দিয়া ঝিলম নদী বহিয়া গিয়াছে, এখানে ঝিলম শান্ত স্নিগ্ধ জলধারা; এই চির-সুন্দর সমতল উপত্যকার মধ্যে ঝিলমের দুই তীর জুড়িয়া কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর। উপত্যকার চারিদিকে চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতশ্রেণী, নীলাকাশের পটে ঝকমক করে,—নাঙ্গা পর্ব্বত (২৬,৯৯০ ফিট), হরমুখ (১৬,৯০০) কোলাহই (১৮,০০০) মহাদেও (৮,০০০)।

বারামুল্লা হইতে শ্রীনগর ৩৬ মাইল পথ সমতল, সোজা চলিয়া গিয়াছে, পথের দুই ধারে কোথাও পাইন-শ্রেণী, কোথাও পপ্‌লার-বৃক্ষ বীথিকা; পথের দুই পার্শ্বে ফলের বাগান, আপেল খুবানী পিচ্‌-ফল বাদাম আখ্‌রোট নানা ফলের গাছ। এই সকল ফলের ব্যবসা কাশ্মীরবাসীদের মস্ত ব্যবসা।

ড্রাইভারের পাশে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, বর্ত্তমানযুগে বিজ্ঞানের অদ্ভুত

উন্নতিতে আমি ট্রেনে মোটরকারে কলিকাতা হইতে শ্রীনগর চার পাঁচদিনে পৌঁছিতে পারি, কিন্তু পূর্ব্বকালে রাজা অশোকের সময় যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পাটালিপুত্র হইতে যাত্রা করিয়া তুষার-গিরি পার হইয়া এই কাশ্মীর উপত্যকায় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পথ কি দুর্গম ও দীর্ঘ ছিল; আর মোগল বাদসাহগণ যখন আগ্রা দিল্লী হইতে বাহির হইয়া গ্রীষ্মযাপন করিতে কাশ্মীরে আসিতেন, সে কি সমারোহের ব্যাপার ছিল! প্রথমে পদাতিক-গণ পথ পরিষ্কার করিয়া চলিত, তারপর তেজী আরব অশ্বে তরবারি-ধারি সৈনিকগণ; তার পর নানাবর্ণের স্বর্ণ-রৌপ্যময় বস্ত্রে সুসজ্জিত হস্তীশ্রেণী, হাওদাতে আমীর ওমরাগণ, পিছনে পাল্কীতে বেগমগণ। শোভাযাত্রার দৃশ্যটি কল্পনা করিতেছি, এমন সময় ফট্-ফট্-ফটাস্! চমকিয়া উঠিলাম, মোটরগাড়ী থামিয়া গেল, দেখি আমাদের গাড়ীর একটি টায়ার ফাটিয়া গিয়াছে। সবাইকে নামিতে হইল। গাড়ী ঠিক করিতে আধঘণ্টা লাগিল, এক ফলের বাগানের দিকে লুব্ধ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া সময় কাটাইয়া দিলাম। বেলা প্রায় ১১টার সময় শ্রীনগর আসিয়া পৌঁছিলাম।



কাশ্মীরী ছেলে মেয়ে

গাড়ী হইতে নামিতেই হাউস্-বোটের লোকেরা আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। শ্রীনগরে ভ্রমণকারিগণ সাধারণতঃ ঝিলম নদীর ওপর হাউস্-বোটে বাস করে। অনেক দরাদরি করিয়া এক হাউস্-বোটের মালিকের সহিত ঠিক করিলাম, থাকা খাওয়া নৌকা ভাড়া ইত্যাদি সর্ব্বসমেত দৈনিক ৫৲ দিব। বোটটি সহরের এক সেতুর পাশে বাঁধা ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহাতে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

সুন্দর বৃহৎ বজরা; হাউস্‌বোট দেখিয়া বড় খুসি হইলাম। কখনও এরূপ

নদীর উপর নৌকাতে দিনের পর দিন থাকি নাই, ভারি মজা লাগিতে লাগিল। প্রশস্ত বোট, প্রথমে একটি ড্রয়িংরুম, মেজেতে কার্পেট-পাতা, সুন্দর চেয়ার টেবিল আসবাব পত্র; তারপর খাইবার ঘর ও ভাঁড়ার ঘর; ভাঁড়ার ঘরে চায়ের সেট্, ডিনার সেট্, চিনামাটির বাসনে ভরা; তারপর দু'খানি সুন্দর শুইবার ঘর, পেছনে স্নানের ঘর ও পাইখানা। বড় বোটের সঙ্গে দু'খানি ছোট নৌকা লাগান, একটিতে রান্না হয়, আর একটিতে নৌকার মালিক লোকজন সব থাকে। আর একটি ডিঙ্গির মত ছোট নৌকা রহিয়াছে, ইহাকে "শিকারা" বলে; তাহাতে কুসান্-আঁটা দু'টি আরামদায়ক বসিবার জায়গা। ইতালীর ভেনিস নগরে যেমন 'গন্ডোলা', শ্রীনগরে তেমনি 'শিকারা'; সহরের নদীপথে ঘুরিয়া বেড়াইবার এমন সুন্দর আরামপ্রদ নৌকা আর পৃথিবীতে কোথাও নাই।

অপরাহ্ণে শিকারা করিয়া শ্রীনগর দেখিতে বাহির হইলাম। ঝিলমের বাঁকা স্রোত মৃদু, আলোকে ঝিলিমিলি করিতেছে; দুই পার্শ্বে নানা কারুকার্য্যময় কাঠের বাড়ীগুলি ঘেঁসাঘেঁসি, জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; কাঠের সেতুগুলিও কি সুন্দর! নদী হইতে বহু খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে; পাইন, এল্ম্, পপ্লার, দেওদার, নানা গাছের মধ্যে ছোট ছোট ঘর; চারিদিক অদ্ভুত, অপরূপ; আর দিগন্ত জুড়িয়া স্বচ্ছ নীলাকাশের পটে তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী।

ভাবিতেছিলাম, কোন বন্ধু সঙ্গী থাকিলে শ্রীনগরের সৌন্দর্য্য আরও ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারিতাম। এমন সময় আশ্চর্য্যভাবে এক পুরাতন বন্ধু লাভ হইল। পরদিন বাজারের পথ দিয়া যাইতেছি, পেছন হইতে কে আমাকে ডাকিল; অবাক হইয়া চাহিয়া দেখি, কোটপ্যাণ্ট-পরিহিত এক যুবক আমায় ডাকিতেছে। অগ্রসর হইয়া গেলাম; মাথার টুপি তুলিয়া ভদ্রলোকটি বলিল, "কি চিন্‌তে পারছ না?" আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এ যে আমাদের পুরাতন বন্ধু 'ক'-র মত মনে হইতেছে; কলিকাতা ছাড়িবার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। সত্যই ত, এ যে সেই 'ক'!

বলিলাম, "আরে তুমি! শুন্‌লুম, তুমি সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে কোথায় চলে গেছ। আর শ্রীনগরের বাজারে দিব্যি কোট পেণ্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ! যাক্, সন্ন্যাসীগিরির নেশা ছুটে গেছে দেখে খুসি হলুম!"

বন্ধু সত্যই সন্ন্যাসী হইতে মনস্থ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, হরিদ্বার পর্য্যন্ত

আসিয়া নেশা কাটিয়া যায়; তখন টাকা ও গরম কাপড় পাঠাইবার জন্য বাড়ীতে টেলিগ্রাম করেন। এখন সন্ন্যাসী নয়, ভ্রমণকারীরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে কাশ্মীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আনন্দে বন্ধুকে আলিঙ্গন করিলাম। বন্ধু বলিলেন, "তোমার দু'মাস আগে আসা উচিত ছিল; কাশ্মীরে আসতে হয় বসন্তের সময়—মার্চ্চ এপ্রিল মাসে, যখন চারিদিকে ফুল ফুটে, রঙে রঙে চারিদিক স্বপ্নপুরী হয়ে ওঠে; অথবা গ্রীষ্মকালে আসতে হয়, তখন ফলের ঋতু। তখন এসেছিলুম বলে আমি অমরনাথ ঘুরে আসতে পারলুম।"

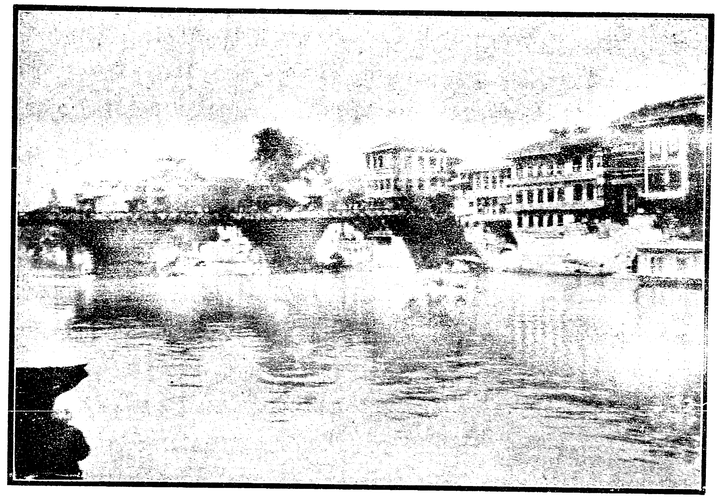

ঝিলম নদীর তীরে শ্রীনগর, নদীর উপর সুন্দর কাঠের সেতু

প্রসিদ্ধ তীর্থ অমরনাথ শ্রীনগর হইতে ৮৫ মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব্বে। শ্রীনগর হইতে পহলগ্রাম, ৫০ মাইল মোটরগাড়ীতে যাওয়া যায়; সেখান হইতে পার্ব্বত্যপথ, তুষার নদী হাঁটিয়া পার হইতে হয়। অমরনাথ গুহা ১৫,০০০ ফিট উঁচুতে। গুহাটি ছোট, প্রায় ১৫০ বর্গ গজ; গুহার ভিতর তুষার জমিয়া শিবের রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের এক দুর্গম তীর্থ।

পুরাতন এক বন্ধুকে পাইয়া উৎসাহে সানন্দে কাশ্মীর দেখিতে মাতিয়া গেলাম। পরদিন শিকারাতে ডাল-হ্রদে যাওয়া গেল। মাইলের পর মাইল সুবিস্তীর্ণ এই হ্রদটির সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। পর্ব্বতবেষ্টিত স্বচ্ছ স্থির জলরাশি, কোথাও অপরূপ পদ্ম-বন, কোথাও শ্বেত লিলির বন, মাঝে মাঝে বৃহৎ ভাসমান দ্বীপ। ডাল-

হ্রদের এই ভাসমান দ্বীপগুলি যেমন সুন্দর তেমনি আশ্চর্য্যকর ; এই দ্বীপগুলিতে নানা ফুল ফলের বাগান, ছোট ছোট পর্ণকুটীর, দ্বীপের তীরে উইলোর জঙ্গল, মধ্যে গোলাপ ফুলের বাগান, ডালিম গাছের বাগান, চারিদিকে নানা রংএর ফুল ফুটিয়া। দূর হইতে এই ভাসমান উদ্যানগুলি দেখিলে মনে হয় এ কোন মায়া-কানন, সুখ শান্তির চির আবাসভূমি ওইখানে বোধ হয় স্বর্গের পারিজাত ফুটিয়া আছে।

ডাল-হ্রদের তীরে তিনটি প্রসিদ্ধ বাগান আছে,—সালিমার বাগ, নিষাদ্ বাগ ও নাসিম বাগ। এ বাগানগুলি পৃথিবী-বিখ্যাত ; মোগল বাদশাহগণ এই সকল উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। নিষার্দ বাগ ও সালিমার বাগ পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজান, মধ্যে ফোয়ারার সারি, দুই পাশে পুষ্পকুঞ্জ ও তরুশ্রেণী। নাসিম বাগ সম্রাট আকবর নির্ম্মাণ করিয়া যান, ইহার 'চেনার'-বৃক্ষ বীথিকা বড় সুন্দর লাগিল। 'চেনার' গাছগুলি আমার বড় ভাল লাগে। বাংলার বটগাছ, ইংলণ্ডের ওকগাছের মত কাশ্মীরের চেনার গাছ ; মহান গম্ভীর মূর্ত্তি মন মুগ্ধ করে। সারাদিন ডালহ্রদে ঘুরিয়া যখন সন্ধ্যায় শিকারাতে ফিরিতেছিলাম, প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখিলাম। ডালহ্রদে নৌকা ভাসাইয়া সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের শোভা যে দেখে নাই, সে পৃথিবীর এক পরম সুন্দর দৃশ্যই দেখে নাই। দেখিলাম, স্বচ্ছ শীতল জলে রঙীন মেঘের ছায়া, কালো পাহাড়ের ছায়া কাঁপিতেছে ; পশ্চিমাকাশের বরণোৎসবে চারিদিক মায়াময় হইয়া উঠিয়াছে ; অদূরে ভাসমান উদ্যানগুলি রূপকথার স্বপ্নপুরীর মত ; চারিদিক শান্ত, শুধু মাঝে মাঝে শুভ্র বলাকাশ্রেণীর পক্ষসঞ্চালনে রঙীণ আকাশ শিহরিয়া উঠিতেছে ; পদ্মবনের গন্ধে বাতাস আকুল, চারিদিকে আলো-ছায়ার মায়া। ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া আসিল ; জল ঘন কালো, কিন্তু শুভ্র মহাদেত্ত পর্ব্বতশিখর ঝিকমিক করিতেছে ; কালো বনের পাশ দিয়া চাঁদ উঠিল ; নৌকা পদ্মবন পার হইয়া নিঃশব্দে চলিয়াছে, মনে হইতেছে এ পৃথিবী নয়, রূপকথার কোন অজানা সৌন্দর্য্যরাজ্যে পথ হারাইয়াছি।

ঝিলমের ওপর হাউস-বোটে দিনগুলি সুখস্বপ্নের মত কাটিয়া গেল।

ফিরিবার সময় রওয়ালপিণ্ডি দিয়া না ফিরিয়া জম্মু দিয়া ফিরিলাম। শ্রীনগর হইতে জম্মু ১৬৩ মাইল। এ পথও অতি সুন্দর, পথে বানিহাল-গিরিবর্ত্ম পার হইতে হয়, ইহার উচ্চতা ৯০০০ফিট। প্রসিদ্ধ চীনা ভ্রমণকারী হুয়েন সাং এই পথ দিয়া কাশ্মীর হইতে ফিরিয়াছিলেন।



(শ্রীযতীন সাহা)

—"মান্‌কে, মান্‌কে ?—কোথারে ? নাঃ এ ছোঁড়াটার সাথে আর পারা গেল না ! কোথা গেল বল দিকিনি ?" সমস্ত বাড়ীময় খুঁজে আর মানিককে পাওয়া যাচ্ছে না। মানিকের মেজদা ভারি কড়া মেজাজের লোক। মেজদা গেছে আজ ভয়ানক চটে।

মা বল্‌লেন—"দেখ্ কোথা খেল্‌তে গেছে।" রাগে গড়গড় কর্‌তে কর্‌তে মেজদা বল্‌ল—"হ্যাঁ, তেম্‌নি ছেলে কিনা ও ! ওর আবার খেলা ? ওর বয়সে খেলেছে কখন ও ? কোথা ঘুমিয়ে রয়েছে বেহুস হয়ে তাই বল।"

সত্যিই মানিক তখন ঘুমুচ্ছে। অদ্ভুত ছেলে মানিক ! সারা রাতদিন ওর ঘুম লেগেই আছে দু' চোখে। ওর জীবনে বোধ করি কোনো দিন ভাল করে চোখ মেলে আলোর দিকে চাইতে পারেনি। ঘুম আর ঘুম—কেবল ঘুম ! ঘুম কাতুরে ছেলে মানিক আমাদের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও ঘুমোয়, পথ চল্‌তে চল্‌তে ও ঘুমোয় ; ঘুমে ওর আলস্য নেই মোটেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয় ও ঘুমিয়ে—ও একটা ঘুমের রাজা !

ছোটো বেলায় এই ঘুম নিয়ে ওকে কম নাকাল হতে হয়েছে ! কত বার মরার হাত থেকে ও বেঁচে গেছে।

একবার পেয়ারা খেতে গাছে উঠে আগ্ ডালে গিয়ে মানিকের বড্ড ঘুম পেয়েছিল। এত ঘুম যে, মানিক আর গাছ থেকে নামবার অব্‌সর পেল না। ঘোড়ায় চড়ার মতন একটা ডালের ওপর চড়ে বসে মানিক অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের নেশায় ক্রমে ওর শরীর এলো শিথিল হয়ে, ও ঝুপ্ করে গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। হঠাৎ কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনে বাড়ীর সবাই ছুটে এলো ব্যস্ত হয়ে। গাছের তলায় ছিল এক গাদা বিচালি, তাই রক্ষে। নইলে অই খানেই মানিকের অক্কা পেতে হ'ত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মানিক জান্‌তেও পার্‌ল না যে ও গাছ থেকে পড়ে গেছে। বরং বিচালির ওপর পড়ে ওর ঘুমের আমেজ গেল আরও বেড়ে।

আর একবার যা হয়েছিল তা ভাব্‌তেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একদিন ভোর বেলা দশবার করে মেজদা মানিককে ডেকে দেয়—"ভোর হয়েছে রে মান্‌কে! ওঠ্, গোয়াল থেকে গরুগুলো বের করে খেতে দে। বেলা হ'ল রে মান্‌কে ওঠ্‌না! আঃ কি জ্বালাতন! বলি ও মান্‌কে তুই কি বেঁচে আছিস্ না মরে গেছিস্?"

নাঃ, মান্‌কের আর ঘুম ভাঙে না! বেলা তখন প্রায় মাথায় উঠেছে। মেজদা তো রেগে টং।—"হতভাগা ছেলে কোথাকার, দাঁড়াও! আমি তোমার ঘুম ভাঙাচ্ছি!"

ছুটে মেজদা ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। একটু পরই আবার তেম্‌নি ছুটে এসে ঘরে ডুক্‌ল, হাতে তার একটা লোহার সিক আগুনে তেতে জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে। মানিকের কিন্তু সে দিকে খেয়াল নেই, ও দিব্বি আরাম করে ঘুমুচ্ছে। মা ছুটে এলেন—"অ্যাঃ করিস্ কি! করিস্ কি? তুই কি পাগল হয়েছিস্, না ক্ষেপেছিস্? —আরে, রাখ্ রাখ্!" কার কথা কে শোনে। মেজদা রাগে গড় গড় করতে কর্‌তে সেই তাতানো লোহাটা দিয়ে মানিকের পায়ে দিল ছেঁকা। ঘুমের ঘোরে মশার কামড় খেয়ে লোকে যেমন করে হাত দিয়ে মশা মারে, তেম্‌নি করে বাঁ হাত দিয়ে পায়ে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে মানিক 'ও-ও-ও' করে হাই তুলে পাশ ফিরে শুলো।

মেজদার চোখ দিয়ে তখন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে।—"ওরে হতভাগা, ঘুমই তোর কাল হবে রে!—দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি।"

এবারে মেজদা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে লোহাটা মানিকের পায়ে চেপে ধরল। —"উঃ!" মানিক আঁৎকে উঠে বসল।—"নাঃ এদের জ্বালায় একটু ঘুমোনোও যাবে না!" মানিক মুখটা বেগুন পোড়ার মত করে উঠে গেল, কারও সাথে একটা কথাও কইল না। গম্ভীর হয়ে মেজদা বল্‌ল—"এবারে ওঠা হচ্ছে কেন? থাক না

দেখি শুয়ে! বাপমরা ছেলে, তোকে এ রোগে ধরেছে কেন বল্ দিকিনি! আমাদের কি বাবা আছেন রে যে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবো? ওসব চল্‌বে না বাপু! ঘুম ফুম্ ছাড়ো, কাজ করে খাও। কপালের ঘাম পায়ে ফেলে আমি পেটের ভাত জোগাড় কর্‌তে পারি না, আর উনি কিনা দিব্বি আরাম করে ঘুমোন্ রাতদিন! লেখাপড়া চুলোয় যাক্—লেখা পড়ার নাম করে আর ঘুমুতে হবে না তোর। যা কাজ করগে যা।"

গাল মন্দ যত কর মানিকের দুঃখ নেই। কিন্তু কাজ কর্‌তে বল্‌লেই মানিকের মাথায় যেন বাজ পড়ে! মানিক উঠে গোয়াল ঘরে এলো গরুগুলোকে বা'র কর্‌তে। কিন্তু ঘুমে ওর চোখের পাতা তখনও ভেঙ্গে পড়ছে। কোথায় ঘুমানো যায়? গোয়ালের পেছনে ছোট একটা ঝোপ। মানিক টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে কোন রকমে সেই ঝোপের ভেতর মাথা গুঁজে ঢুক্‌ে ভাব্‌লে—সেখানে হয়ত তাকে কেউ আর জ্বালাতে আস্‌বে না। রইল পড়ে গরু আর রইল পড়ে কাজ—মানিক সেই কাঁটা বনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

খাওয়ার সময় বয়ে গেল, মানিক নেই! আনাচে, কানাচে, পাড়ায়, বাজারে—না, মানিককে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! বিকেল বেলা গরুগুলোকে খেতে দিতে গোয়ালে গিয়ে হঠাৎ মেজদা তিন লাফে বাইরে এসে দাঁড়াল। কোথায় যেন সাপে একটা ব্যাং ধরেছে। ব্যাংটা ট্যাঁ-ও-ও ট্যাঁ-ও-ও করে ডাক্‌ছে। কোথায় শব্দ হচ্ছে দেখ্‌তে গিয়ে ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে মেজদা যা দেখ্‌ল তা'তে তার মুখ দিয়ে আর কথা বের হ'ল না।

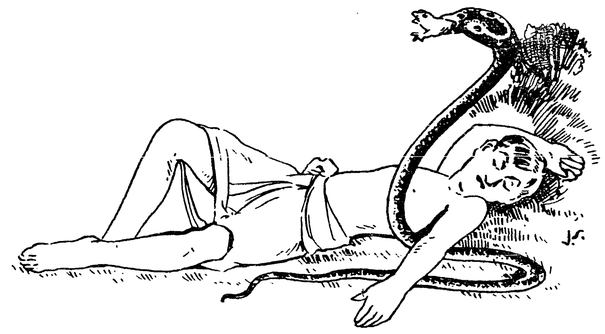

একটু পরে একটা চীৎকার করে মেজদা ছুটে এসে উঠোনে পড়ল—

"সর্ব্বনাশ হ'ল মা, সর্ব্বনাশ হ'ল; দেখ তোমার ছেলের কাণ্ডখানা। হতভাগা ঘুমোবার আর যায়গা পেল না। মাথার ওপর ফণা মেলে কাল সাপ!"

একটা গোখ্‌রো সাপে ব্যাং ধরে গিল্‌তে পারছে না। রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করে ব্যাং মুখে করে ছুটোপাটি খাচ্ছে, আর এক এক বার পড়ছে গিয়ে একেবারে মানিকের গায়ের ওপর। মানিকের সে দিকে খেয়ালই নেই, ও দিব্বি আরাম করে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের ঘোরে এক একবার সাপের ল্যাজের ওপর পা তুলে দিচ্ছে,—"একটি ছোবল—হায়! হায়! হায়! ঘুমই ওর কাল হল রে!" মা বুক চাপ্‌ড়ে কেঁদে উঠ্‌লেন।

কি হবে, কে বাঁচাবে! হায় ভগবান! পাড়ার লোক জুটে গেল, কিন্তু প্রাণের ভয় কার না আছে! কেবল হায়, হায়! আর হায়, হায়!

হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো একটা বেজি। রাগে তার চোখ দু'টো আগুনের মতন জ্বল্‌ছে,—গায়ের লোম উঠেছে বোতল সাফ্‌করা বুরুশের মত খাঁড়া হয়ে।

—ঠ্যাঁক্, ঠ্যাঁক্! অদ্ভুত শব্দ করে সেটা সাপের উপর লাফিয়ে পড়ল। ভয়ে ব্যাং ছেড়ে দিয়ে সাপ চোখের পলকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

মানিক বড় বাঁচাই বেঁচে গেল। সবাই বল্‌লে—'এ ছেলের কপাল জোর!'

আর একবার মানিক পড়েছিল গরুর গাড়ীর চাকার তলায়! সন্ধ্যে বেলা মানিক গেছিল বাজারে গুড় কিন্‌তে। রাস্তা চলতে আর ও পারে না—এতো ঘুম পেয়েছে! কি আর করে! শুয়ে পড়ল সটান রাস্তার উপরেই। রাত হয়ে এলো। পাড়াগেঁয়ে পথ ঘুর্‌ঘুট্টি অন্ধকার। ক্যাঁচোর কোঁচর করে গরুর গাড়ী চলেছে অন্ধকারের সাগর পাড়ি দিয়ে চেনা পথ ধরে। তারপর ওঠ্‌তো ওঠ্ চাকা গিয়ে উঠ্‌ল একেবারে মানিকের গায়ের ওপর। মানুষের চীৎকারে গাড়োয়ান আলো জ্বেলে দেখে, যে আর কেউ নয় মান্‌কে। ভাগ্যিস্ গাড়ীটা খালি ছিল। মাল বোঝাই থাক্‌লেই হয়েছিল আর কি!

সেই মানিক! বয়স কুড়িয়ে বুড়োধাড়ি হতে চলেছে, কিন্তু ওর ঘুম বেড়েছে বই কমেনি একটুও। মানিকের বন্ধুরা বলে—"তোর এত ঘুম আসে কোত্থেকে বল্‌তো। দিনে একটু ঘুমুলে তো আমাদের সারা রাত 'হা নিদ্রা' 'হা নিদ্রা' করে কাটাতে হয়। আর তুই কিনা···!" বাধা দিয়ে মানিক বলে—"ঘুমের আবার

আরাধনা কর্‌তে হয় নাকি? দাও আমায় খেতে, বল আমায় ঘুমুতে,—ব্যস্ আমি আর কিচ্ছু চাই না এ পৃথিবীতে—না বালিস, না কম্বল, না তোষক!" ব'লে ও হাসে।—"কিন্তু কি বল্‌বো ভাই, মেজদাটা আমার মানুষ নয়। রাত দিন কেবল জ্বালাবে। হ্যাঁ, থাক্‌তো যদি আজ বাবা! ঘুমের তুফান উড়িয়ে দিতুম ভাই, ঘুমের তুফান উড়িয়ে দিতুম!"

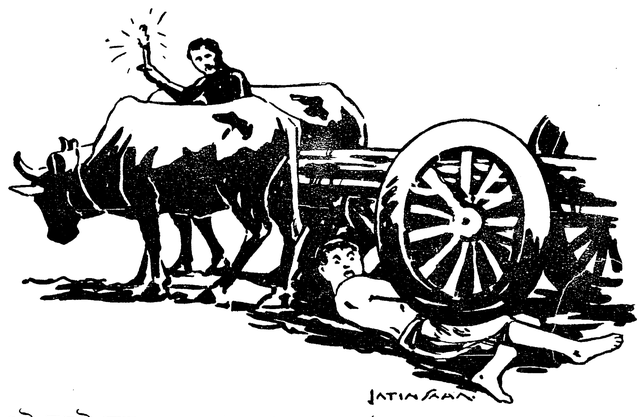

দুঃখ করে বন্ধুরা বলে—"ঘুমই তোর কাল হ'ল রে মান্‌কে! ঘুমই তোর কাল হ'ল। তোর মা মিছে বলেন নি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটালি, মানুষ হ'তে পারলি না!"

হেসে মানিক বলে—"ভুল, ভুল বল্‌ছ তোমরা! দেখ্‌বে এই ঘুমই করবে আমায় রাজা! এই বলে রাখ্‌ছি। মাথার ওপর আমার ফণা তুলে সাপ নেচেছিল। সবাই বলেছে বড় হয়ে আমি রাজা হব। মাথার ওপর ক'জনের বুনো সাপ নাচে হে ফণা তুলে? ঘুমিয়েই আমার সে সৌভাগ্য হয়েছে তা জানো? আমার রাজা হওয়া রোখে কে?"

এ হেন মান্‌কেকে আজ আবার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চারিদিকে ডাকাডাকি ও খোঁজাখুজি করে তার মেজদা হয়রাণ হয়ে পড়েছে। শেষ পর্য্যন্ত অনেক খোঁজাখুজির পর মানিককে পাওয়া গেলো, মস্ত বড় একটা জালার ভেতর। মানিক তখন দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছিল। মেজদা দু'কান ধরে তাকে টেনে বের করে এনে, দমাদ্দম কীল, গাঁট্টা, ঘুসীর চোটে তার ঘুম ছুটিয়ে দিল। তারপর রাগের মাথায় মারতে মারতে তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে বলল—"যা

হতভাগা, এখান থেকে বেরিয়ে যা। কাজ কর্ম্ম না করে দিনরাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি করে চলে দেখগে যা।”

মানিক রাস্তায় বের হ’ল। মনে মনে ওর ভারি কষ্ট! মেজদা কিনা আজ অমন করে মেরে তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিল! মানিক প্রতিজ্ঞা কর্‌ল, ও আর এ জীবনে মেজদার মুখ দেখ্‌বে না—মরে গেলেও না!

চল্‌তে চল্‌তে মানিকের দু’পা অবশ হয়ে এলো। আজ আর ওর চোখে ঘুম নেই! সারা মনটি জুড়ে আছে তার বিষম চিন্তা ও অভিমান। ওর কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল—এ পৃথিবীতে ও একা, ওর আর কেউ নেই। কিন্তু তবুও ও আর এদেশে থাক্‌বে না। যে দেশের লোকে মানুষকে ঘুমুতে দেয় না, সে দেশের মাটির সঙ্গে ও কোন সম্পর্ক রাখ্‌বে না। ও চলে যাবে ভিন্ দেশে, যেখানে গিয়ে ও প্রাণ ভরে ঘুমুতে পাবে। ছোট বেলায় মানিক ঘুমের দেশের গল্প শুনেছে। সেখানে নাকি সবাই দিনরাত মনের সুখে ঘুমোয়। মানিক সে দেশে গিয়ে তবে থামবে।

চল্‌তে চল্‌তে ক্ষুধায় মানিকের প্রাণ যায় আর কি। কিন্তু তবুও ও চলেছেই। পথে যাকে দেখে তাকেই বলে—“ও ভাই একটা কথা শোনো; বল্‌তে পারো কি ঘুমের দেশ কতদূর?” হেসে পথিক বলে—“এগিয়ে যাও আরও সাতদিনের পথ।”

মানিক আবার চলে; আবার পথের লোককে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সেই একই উত্তর দেয় তারা। কিন্তু সে ঘুমের দেশটা কোথায়? মানিক অনেক খুঁজেও আর সে দেশ বের কর্‌তে পার্‌ল না। যেখানেই যায় সেখানেই দেখে, দিনের বেলা সবাই করে কাজ, আর রাত্রে আরাম করে দেয় ঘুম। রাতদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয় এমন দেশ তো সে কোথাও দেখতে পেল না।

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে মানিক একেবারে হয়রাণ হয়ে পড়ল। ক্রমে সে বুঝ্‌তে পারল—ঘুমিয়ে আর রাজা হওয়া ওর সম্ভব নয়, তা সে মাথার ওপর যত সাপই নাচুক না কেন। বরং না ঘুমিয়ে কাজ করলে হয়ত রাজা হওয়া যেতে পারে।

অনেক কষ্টে মানিক আবার বাড়ী ফিরে চল্‌লো। আজ ক’দিন থেকে তার পেটে না পড়েছে খাবার, চোখে না এসেছে ঘুম।

উঠোনের মাঝে মেজদাকে দেখ্‌তে পেয়ে মানিক ছুটে গিয়ে তার দু’পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বল্‌ল—“আমার ঘুম উবে গেছে মেজদা, আর আমায় বোকো না। আমায় কাজ দাও মেজদা,—কাজ! কাজ!”

জুজুর দেশে

(শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী)

জুজুর দেশে যাও যদি ভাই দিচ্ছি আগেই বাত্‌লে,
মনে রেখো চলবে না কো ইচ্ছা মতন মাত্‌লে।
দেশটা যেমন মস্ত
আইন জবরদস্ত!
কিন্তু সেথায় মাছ মিলে ভাই আকাশে জাল পাতলে!

ফোড়নেতে লঙ্কা দিলেও পারবে না কো কাস্‌তে,
পায়ের তলায় সুরসুরিতে দাঁত দেখিয়ে হাস্‌তে।
নাকে দিলেও কেচ্চো
বলবে নাকো হেঁচ্চো,
হাতে পেয়েও পারবে না কো মিঠাই ভালবাস্‌তে।

চুলে ধরেও টানলে তোমার পায়না যেন কান্না,
খোস্ মেজাজে খেতেই হবে লবণ ছাড়া রান্না।
হোক্‌না কেন তিক্ত
ওষুধ খাবেই নিত্য,
নাইবা থাকুক অসুখ তবু বল্‌বে নাকো ‘আর না’!

রাত্রি বেলায় মশার মেলায় পারবে না কো ঢুল্‌তে,
গাছ্ থেকে ভাই নাম্‌তে গিয়ে বাদুর ঝোলা ঝুল্‌তে।
আম্‌লি দেখেও কিংবা
রসে না যেন জিহ্বা,
গ্রীষ্মকালেও পারবে না কো জান্‌লাগুলো খুল্‌তে।

শীত যদিও বেজায় তবু থাক্‌তে হবে উদ্‌লা,
পারবে না কো কাঁপতে তবু সাজতে তো-তো-তোত্‌লা!
করবে না কো উঃ আঃ
চিবিয়ে কাঁচা লঙ্কা,
হাল্লা করে সাঁজ দুপুরে করতে মানা জট্‌লা।

গোবিন্‌দা'র গোয়েন্দাগিরি

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

সেদিন ভোরবেলা সহরের সমস্ত দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে এই সংবাদটি বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল—

পাঁচশত টাকা পুরস্কার!

—"বাগবাজারের কোনো গলিতে কে বা কাহারা একটি অজ্ঞাত বাঙ্গালী যুবককে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারীর সন্ধান যে দিতে পারিবে তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

এই ঘোষণাটি প'ড়ে আমাদের গোবিন্‌দা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

গোবিন্‌দাকে তোমরা চেন না ?···ঐ যে যিনি ঘুঁটের ব্যবসা করে এক সময়ে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেছেন; যাঁর "অব্যর্থ ছারপোকা-বিধ্বংসী পাঁচন" এক সময়ে সারা বাংলায় হুলুস্থুল লাগিয়ে দিয়েছিল।

—"ছারপোকা-বিধ্বংসী পাচন !!" তোমরা যে অবাক হয়ে যাচ্ছ! তোমাদের অবাক হবার কথাই তো! তখন তোমরা নেহাৎ ছেলেমানুষ, জান্‌বেই বা কেমন করে। ছোট্ট ছোট্ট লাল শিশিতে নীল রংএর তরল ওষুধ; তার সঙ্গে ব্যবস্থাপত্র থাকত। ব্যবস্থা পত্রে ছাপার অক্ষরে লেখা থাকত—"অতি সাবধানে ছারপোকা ধরিয়া, তাহাকে 'হাঁ' করাইয়া এই অব্যর্থ পাঁচন এক ফোঁটা মুখে দিয়া দিবেন। খুব সাবধান, দেখিবেন পাঁচন খাওয়াইবার আগে যেন ছারপোকা না মরিয়া যায়।"

এই পাঁচন এখন আর পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে অবশ্যই তোমরা এক শিশি নিয়ে পরীক্ষা করতে পারতে।

তারপর গোবিন্‌দার "ভুঁড়ি-সংহারী মালিশ" এক অদ্ভুত আবিষ্কার। যত বিপুল ভুঁড়িই হোক্‌না কেন—এই মালিশের গুণে একদম্ আমসত্ত্বর মত চুপ্‌সে যেত। ভুঁড়িতে মালিশ লাগাবার পর দশ দিন মাত্র উপোসের ব্যবস্থা—তারপরেই ব্যস্! হাতে হাতে ফল। সে ওষুধও আজকাল আর বাজারে নাই।

যাক্, গোবিন্‌দা এখন ওসব আবিষ্কারের পথ ছেড়ে দিয়ে সখের গোয়েন্দা-গিরি আরম্ভ করেছেন। এমন উর্ব্বর মস্তিষ্ক তিনি এখন আর ছোট খাট বাজে কাজে নষ্ট করতে রাজী নন।

এইতো সেদিনও তিনি একটা ডাকাতের দল প্রায় ধরে ফেলেছিলেন আর

কি! অবশ্য শেষে জানা গেল সেটা ডাকাতের দল নয়—সেটা 'কংস-হারী যাত্রা পার্টি'।

তা এরকম ভুল অনেক বড় গোয়েন্দারও হতে পারে। গভীর রাত্রে একদল লোক মুখে রং চং মেখে ঢাল তলোয়ার, ছোরা ছুরি, নিয়ে যদি কোথাও যায়, কে না তাদের ডাকাতের দল বলে মনে করে! গোবিন্‌দারও ভুল হয়েছিল। কিন্তু ভুল্‌তো নাও হ'তে পারতো? 'কংস-হারী যাত্রা পার্টি' না হয়ে তারা তো 'ধ্বংস-কারী ডাকাতের দলও' হ'তে পারতো!

আর একবার এক টুক্‌রো চিঠির অংশ কুড়িয়ে পেয়ে গোবিন্ দা প্রায় একটা হত্যার ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছিলেন আর কি! চিঠির টুক্‌রোতে লেখা ছিল—

"··· ··আজ রাত্রেই সাবাড় করতে হবে। না হলে·····"

তারপর অবশ্য চিঠির অপর অংশও পাওয়া গেল—

"প্রিয় নন্দ,

বরিশাল থেকে যে রসগোল্লা এসেছে, সে গুলো আজ রাত্রেই সাবাড় করতে হবে। না হলে প'চে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা। তুমি নিশ্চয়ই এসো। ইতি

সুধীন"

গোবিন্‌দা সে দিন ষড়যন্ত্র ধরতে গিয়ে খুব এক পেট রসগোল্লা খেয়ে এসেছেন—এতে তাঁর লাভ বই লোকসান কিছু হয় নাই।

যাক্, এইবার আমাদের আসল গল্পটা বলি।

সেদিনকার খবরের কাগজে হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে গোবিন্‌দা মনে মনে স্থির করলেন, তিনি গোপনে এই ব্যাপারের তদন্ত করে পুলিশকে সাহায্য করবেন। ফাঁক্ তালে যদি পাঁচ শ' টাকা লাভ করা যায়—তা এই মাগ্যি গণ্ডার বাজারে মন্দ কি! আর টাকা না পেলেই বা কি? খবরের কাগজে যখন বড় বড় ক'রে গোবিন্‌দার বাহাদুরীর খবর বেরুবে তখন ·····, গোবিন্‌দাকে আর পায় কে!

সেদিন রাত্রি বারোটায় গোবিন্‌দা বাসে চ'ড়ে কালীঘাট থেকে শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। অত রাত্রে বাসে বেশী কেউ ছিল না। সাম্‌নের আসনে দু'জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, আর ঠিক্ তার পিছনে বসে গোবিন্ দা।

বাঙ্গালী দু'জনের মধ্যে একজনের খুব রোগা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, চোখে কালো চশ্‌মা; আর একজনের বেশ বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা।

ফাঁকা রাস্তায় বাস হু হু করে ছুটে চলেছে। গোবিন্‌দা অন্যমনস্ক—সেই

হত্যা রহস্যের এখন পর্য্যন্ত কোন কুল কিনারা পান্ নাই। হঠাৎ তাঁর কাণে এলো, সেই রোগা লোকটি তার সঙ্গীকে বলছে—"গোবর্দ্ধনকে মেরে ফেল্লাম।" সঙ্গী প্রশ্ন করল, "কি করে?" রোগা লোকটি উত্তর দিল, "বিষ খাইয়ে।"

এই পর্য্যন্ত···ব্যস্! গোবিন্দার চোখ দু'টি জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলে উঠ্ল, আগুনের মত নিশ্বাস পড়তে লাগ্ল,—ওঃ, একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়েছে!

পাছে কোনো রকমে তারা সন্দেহ করে তাই গোবিন্ দা মনের ভাব যথা-সম্ভব গোপন রেখে লোক দু'টোর উপর কড়া নজর রাখ্তে লাগ্লেন। আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই কিছুতেই।

বাগবাজারের মোড়ে লোক দুটো নাম্লো। হাঁ, এই বাগবাজারের কোনো গলিতেই তো সেই হত্যা কাণ্ড ঘটেছে—! আচ্ছা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি? তোমরা ঘোরো ডালে ডালে, গোবিন্দা ফেরেন পাতায় পাতায়!

গোবিন্দা বাস থেকে নেমে চুপে চুপে খুনে লোকটাকে অনুসরণ করে চল্লেন। বাড়ীটা জেনে এক্ষুনি পুলিশে খবর দিতে হবে। ঐ যে বাড়ী, গ্যাসের আলোতে বাড়ীর নম্বরটা বেশ পড়া যাচ্ছে—১৫নং। আচ্ছা দাঁড়াও!

গোবিন্দা পুলিশে ফোন্ করলেন—"হ্যালো! শীগ্গির আসুন, হত্যাকারীকে ধরেছি; ঠিকানা ১৫নং.....ষ্ট্রীট, আমি ঐ বাড়ীর সাম্নেই অপেক্ষা করছি।"

পুলিশ এলো, গোবিন্দার স্ফূর্ত্তি দেখে কে! সেই রোগা লোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, "এই আসামী।"

* * *

তার পরের দিনের ঘটনা।—

গোবিন্ দা মুখ চূণ ক'রে বাড়ী এলেন। তিনি আমাদের কিছু বল্লেন না বটে, তবে আমরা খবর পেলাম, গোবিন্ দা হত্যাকারী সন্দেহ ক'রে যাকে ধরেছিলেন তিনি একজন উদীয়মান সাহিত্যিক।

সাহিত্যিক বেচারীর একটি উপন্যাস সাময়িক একটা কাগজে প্রতি সপ্তাহে বের হচ্ছিল। সেই উপন্যাসের নায়ক হচ্ছে গোবর্দ্ধন। সেই গোবর্দ্ধন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে—পরের সংখ্যায় এই বিষয়টি বেরুবে। তাই সাহিত্যিক বায়োস্কোপ দেখে ফিরবার পথে সেই কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে এই সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলেন। গোবিন্ দা অতটা বুঝ্তে পারেন নাই।

তা গোবিন্ দা'র আর দোষ কি? ভুল্ তো সকলেরই হয়!

রূপকথা

—শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

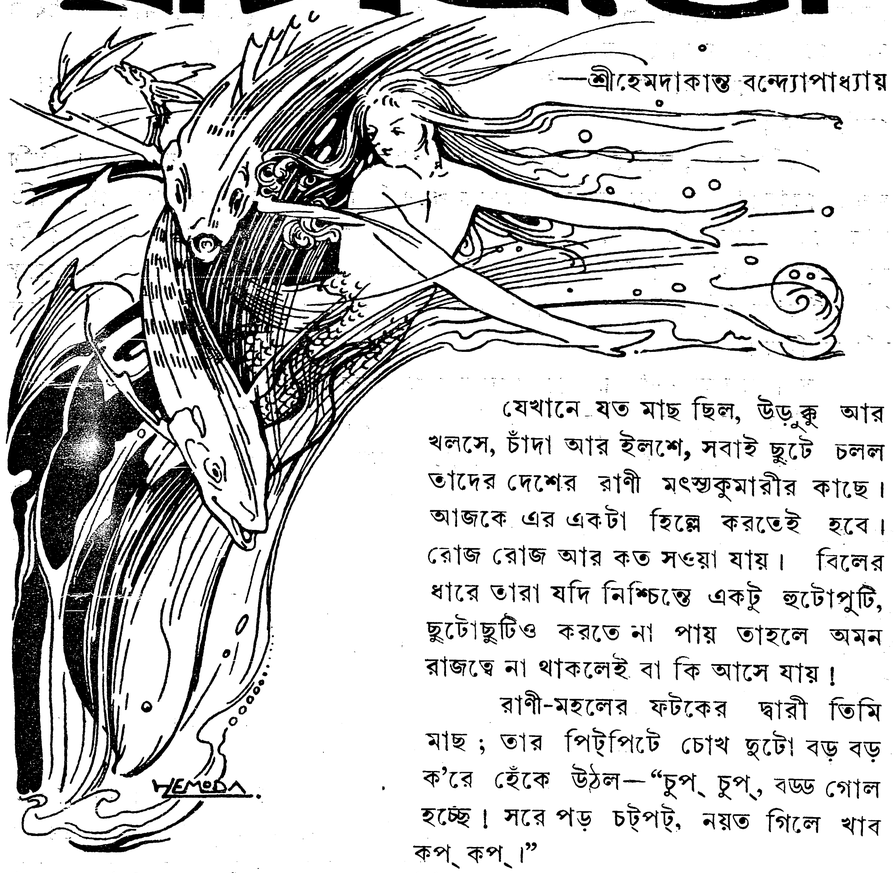

যেখানে যত মাছ ছিল, উড়ুক্কু আর খলসে, চাঁদা আর ইলশে, সবাই ছুটে চলল তাদের দেশের রাণী মৎস্যকুমারীর কাছে। আজকে এর একটা হিল্লে করতেই হবে। রোজ রোজ আর কত সওয়া যায়। বিলের ধারে তারা যদি নিশ্চিন্তে একটু হুটোপুটি, ছুটোছুটিও করতে না পায় তাহলে অমন রাজত্বে না থাকলেই বা কি আসে যায়!

রাণী-মহলের ফটকের দ্বারী তিমি মাছ; তার পিট্পিটে চোখ দুটো বড় বড় ক'রে হেঁকে উঠল—"চুপ্ চুপ্, বড্ড গোল হচ্ছে! সরে পড় চট্পট্, নয়ত গিলে খাব কপ্ কপ্।"

ভেট্কি মাছ খেঁচ্কি দিয়ে বলে উঠল—"আহা, তা আর পারবে না! স্বজাতি হয়ে এটুকু উপকার না করলে আর আছ কেন! তোমরা গভীর জলের মাছ, খাস্

রাজদরবারে চাক্‌রি করছ ; আমরা গরীব প্রজা, নিজেদের রক্ত দিয়ে তোমাদের পেট ভরাবার জন্যই ত আছি। বাইরের শত্রু এসে আমাদের খেয়ে যায় তখন তোমরা কেউ নও, খালি খাজনা আদায়ের বেলা দাঁতের ঝক্‌ঝকি দেখাও। এবার আর তোমাদের কথা শুনছি না, রাণীর সঙ্গে আমরা দেখা করব।"

সব মাছ কিল্‌বিল ক'রে উঠল—"হাঁ হাঁ, দেখা করব। আমরা রাণীমার সঙ্গে দেখা করব।"

তিমি দেখল, তাইত। দলটা ভারি আছে, বিশেষ জুৎ করা যাবে না। তিমি তখন কোতয়াল সাহেব হাঙ্গর মাছকে খবর দিল, হাঙ্গর মাছ সব কথা সেনাপতি রাঘব বোয়ালকে বুঝিয়ে বলল। রাঘব ভাবল, যাক্‌গে গোলমালে কাজ নেই, মন্ত্রীমশাইকে খবর দেই। বুড়ো মন্ত্রী গজকচ্ছপ রাজগুরু তপ্‌সি মাছের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গুটি গুটি গিয়ে রাণী মৎস্যকন্যাকে খুঁটিনাটি সব কথা পরিপাটি ক'রে বুঝিয়ে দিল।

রাণী বললেন—"চল, তাদের সঙ্গে দেখা করব।"

হোঁৎকামুখো সভাসদ্‌রা সব হাঁ হাঁ করে উঠল—"তাও কি হয় রাণীমা। মর্য্যাদা নষ্ট হবে যে। ওদের একজন প্রতিনিধি ডেকে আনুন, তার সঙ্গেই সব কথা হবে।"

রাণী বললেন, "এতে মর্য্যাদা নষ্ট হবার কি আছে ? প্রজারা সব তাদের কষ্ট জানাতে এসেছে, তাদের কাছে গিয়ে তাদের কথা শুনব এতে দোষ কি ? আমার যত দুর্নাম সব তোমাদের জন্যই। তোমাদের রাণী শুধু নামেই রাণী, আসলে সে সব চাইতে পরাধীন। অমন রাণীগিরি করার চাইতে দিনভিখিরী হয়েও বেশী সুখ। মর্য্যাদা আর সম্মানই আমার শেকল হয়েছে। আজকে আর তোমাদের কোন কথাই শুনছি না, ওদের কাছে যাবই।"

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাণীকে বাধ্য হয়েই মত বদলাতে হ'ল। তিনি দুঃখিত মনে প্রজাদলের প্রতিনিধির অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রজাদলের প্রতিনিধি এল দু'জন, বড়দলের তরফ থেকে কাৎলা আর ছোট দলের তরফ থেকে চাঁদা। চাঁদার চক্‌চকে রূপে রাজসভা ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে উঠল। রাণীমা আদর করে তাকে নিজের কোলে তুলে নিলেন—"হাঁ বাছা, তোমাদের কিসের নালিশ বলত !"

চাঁদা তার টানাটানা চোখ দু'টো তুলে বলল—"ঐ আমাদের ছোট বিলের

ধারে আমরা কত আনন্দে খেলে বেড়াতাম। কিন্তু আজ ক'দিন থেকে একটা ষণ্ডামত মাছরাঙা এসে বড় পাথরটার ওপর চুপ্‌টি করে বসে আছে ঘাপ্‌টি মেরে, আর আমাদের গণ্ডায় গণ্ডায় তুলে মণ্ডার মত মুখে পুরছে।"

রাণী বললেন—"চল, আমি নিজেই সেই মাছরাঙার কাছে যাব।"

একদিকে রাজশক্তি চলল তলোয়ার সাজিয়ে আর দামামা বাজিয়ে, আরেক দিকে চলল প্রজাশক্তি তাদের মস্ত দলের জয়ধ্বনিতে সাগরজল কাঁপিয়ে। সবার আগে কোতয়াল হাঙ্গর সাহেব, তার করাতের মত ঝক্‌ঝকে দাঁত বা'র করে সরাত্‌ সরাত্‌ করে ছুটে চলল।

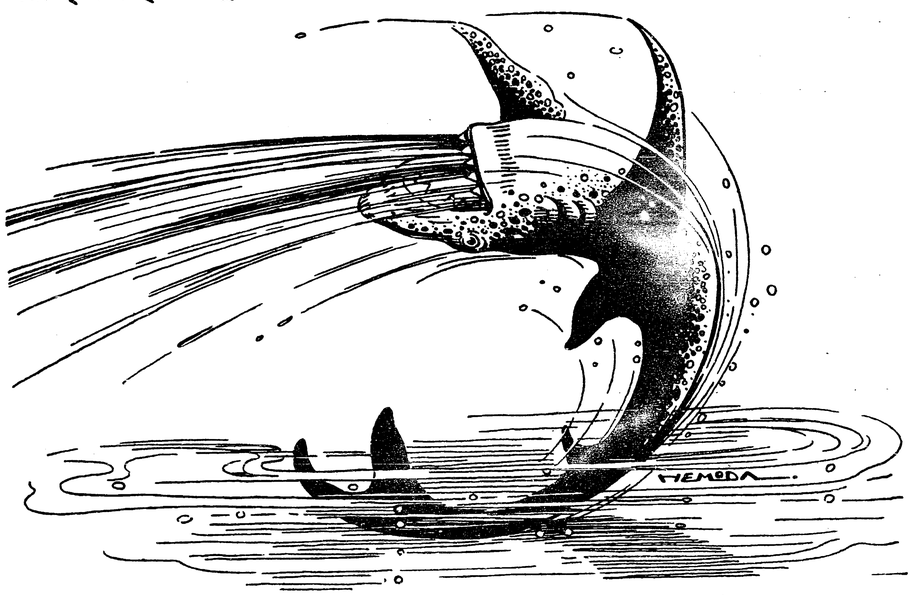

রাণী সোজা গিয়ে মাছরাঙার কাছে উপস্থিত—"কিগো কর্ত্তা, আমার রাজত্বে এসব জুলুম ত চলবে না, তোমাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে।"

মাছরাঙা তার লাল টকটকে জিবটা বা'র করে চোখ উল্টিয়ে রাণীকে দিল বিষম মুখ ভেংচিয়ে।

মাছরাঙার বেয়াদবি দেখে রাঘব বোয়াল আর সইতে পারল না। ভুস্ ক'রে মাথাটা জলের ওপর তুলেই এক পুকুর জল হুস্ করে মাছরাঙার গায় ছিটিয়ে দিল। জলের ঝাপ্টায় মাছরাঙা তিনটা মাঠ দূরে ছিট্‌কে পড়ল। মৎস্যকন্যা দলবল নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

কিন্তু সাতদিন যেতে না যেতেই রাণীর কাছে খবর এল মাছরাঙা ফিরে এসেছে, আবার তেমনি জুলুমও সুরু করেছে। রাণী ভাবনায় পরে গেলেন—একটা নতুন কিছু উপায় বা'র করতে না পারলে তো আর চলছে না। এমন কিছু করতে হবে যেন মাছরাঙা আর কখনো এমুখো না হয়। যুদ্ধ ক'রে সুবিধা হবে না, বুদ্ধি দিয়েই কাজ সারতে হবে।

রাণীকে ভাবতে দেখে তার সখী কাঁকড়াসুন্দরী এসে চুপিচুপি বলল—"চল, আমরা দু'জনেই ওকে রাজ্যিছাড়া করে আসতে পারব।"

তারপর দু'জনের মধ্যে কি পরামর্শ হ'ল কে জানে।

তারা আস্তে আস্তে রাজবাড়ীর খিড়কি দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

রাণী আবার এসে মাছরাঙার কাছে উপস্থিত; মিষ্টি ক'রে বললেন—"ওগো পক্ষীরাজ, তোমার সঙ্গে সন্ধি করতে এলাম। তুমি কি পেলে আর এমনি করে আমার নিরীহ প্রজাদের ধ্বংস করবে না তাই বল।"

মাছরাঙা বলল, "চাঁদা চাই এক কাঁড়ি, খলসে চাই পাঁচ হাঁড়ি—তবেই তোমাদের ছাড়তে পারি। যদি রোজ পাই, বসে বসে খাই; আর যদি তা না দাও ঠিক, সবাইকে করে দিব ঢিট্।"

রাণী বললেন—"বেশ বেশ, তাই হবে। রোজ সন্ধ্যার সময় তোমার কাছে এসব পাঠিয়ে দেব, কিন্তু আজকে আর এত সব কোথায় পাব? আজকের মত এইটি নাও।"

বলতে না বলতে জলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা কাঁকড়াসুন্দরীকে তুলে নিয়েই রাণী টুপ্ করে তাকে মাছরাঙার মাথার ওপর ছেড়ে দিল। কাঁকড়া সুন্দরী তার দাড়াগুলো দিয়ে বেশ জুৎমত মাছরাঙার মাথাটাকে চিমটে ধরল।

মাছরাঙার মাথা কট্ কট্, কত ডানা ঝট্‌পট্, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না; তার শুধু ছটফট্ করাই সার হ'ল। সে যতই হাঁচোর-পাঁচোর করে, কাঁকড়া সুন্দরী ততই জোরে কামড়ে ধরে।

পাঁচ মিনিটেই মাছরাঙা একেবারে কাবু!

—"রক্ষা করুণ রাণীমা! আপনার রাজ্যে আর কক্‌খনো ঢুকব না! এই নাকে খৎ কানে খৎ। খুব হয়েছে, খুব হয়েছে—এবার ছেড়ে দিন!"

রাণীমার হুকুমে কাঁকড়া সুন্দরী মাছরাঙাকে ছেড়ে দিল। রাণী বললেন, "এক্ষুনি এদেশ থেকে বেড়িয়ে যাও। আর যত দেশ দিয়ে উড়ে যাবে, বলে বলে যেয়ো—এ রাজ্যে প্রজার শান্তির জন্য রাণী নিজে এসে যুদ্ধ করেন; রাজ মর্য্যাদার চাইতেও প্রজার মঙ্গলেই তার বেশী আনন্দ, বাইরের কেউ এসে এ রাজ্যের প্রজার ওপর অত্যাচার করতে পাবে না।"

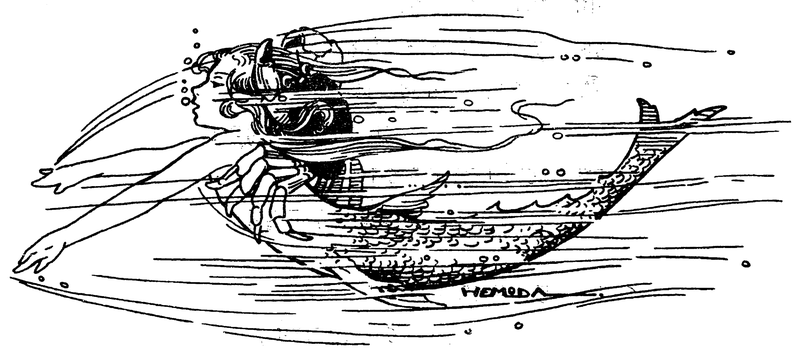

তারপর মনের আনন্দে রাণী তার কাঁকড়া সখীকে কাঁধে নিয়ে গান গাইতে গাইতে ফিরে গেলেন। প্রজারা দলে দলে ডিগ্‌বাজী খেয়ে রাণীকে তাদের অভিনন্দন জানাল আর প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করল।

মাছরাঙা মুক্তি পেয়েই অন্য দেশে চলে গেল।

সে এবার স্থির করেছে যে এমন একটা জলাশয়ে গিয়ে আস্তানা পাতবে, যেখানকার রাজা রাণী প্রজাদের সুখ দুঃখের খবর নেন না, যেখানে প্রজাদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কেউ হাঙ্গাম বাধাতে আসবে না। সেখানে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে সে নিরীহ মাছদের রক্তে উদর পূর্ণ করতে পারবে।

বাদল্ স্বপন্

(শ্রীষষ্ঠীধন সেন গুপ্ত)

সেদিন আমার মাঝ রাতেতে
ভাঙ্‌লো হঠাৎ ঘুম্,
চম্‌কে দেখি হাওয়ার সেকি
মাতামাতির ধূম !
বর্ষারাণী রাতের খেয়ায়
ঢেউ তুলে ওই পার হ'য়ে যায়
নীল পাথারের বালুবেলায়
চোখে নিয়ে ঘুম ;
চম্‌কে দেখি বাপরে সে কি
বৃষ্টি পড়ার ধূম্ !

কোন সুদূরের মেয়েরা সব
মেঘের বরণী,
সেই খানেতে খেল্‌তে আসে
বেয়ে তরণী।
তাদের বাড়ী স্বপন দেশে
চাঁদের বাড়ীর সীমা শেষে ;
শোকের ছায়া নাইরে সেথা,
মানস হরণী ;
সেই খানেতে খেল্‌তে আসে
বেয়ে তরণী !

মেঘ-মেয়েরা চলছে যে ঐ
গহন বনের শিরে,
নিকষ কালো আঁধার ঘনায়
মায়ার জগৎ ঘিরে ;
নিজন মাঠে আঁধার মগন্,
দেখ্‌ছে ধরা বাদল্ স্বপন,
বিষ্টি ঝরে অঝোর ঝরণ
গাঁয়ের নদী তীরে ;
নিকষ কালো আঁধার ঘনায়
মায়া জগৎ ঘিরে।

বাতাস এখন বাদল ঝরায়
মৃদুল কাঁপন তুলে,
এধার ওধার আঁধারখানি
লুকোয় গাছের মূলে।
মেঘ তখনো থেকে থেকে
বিদায় গাঁথা তুল্‌ছে হেঁকে,
মরা রাতের অবশ আঁখি
পড়ছে যেন ঢুলে ;
এধার ওধার আধারখানি
লুকোয় গাছের মূলে !



খড়কুটোর জীব

(শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী)

কয়েক টুকরো খড়-কুটো, লতা-পাতা, কয়েকটি শুক্‌নো ফল আর বীচি, গোটাকয় ডালপালা, গোটাকয় ঝুটো মুক্তো আর পুঁথি, কয়েকটা আল্‌পিন, আর সামান্য খানিকটা কাদা — ব্যাস্; এই পেলেই হ'লো!

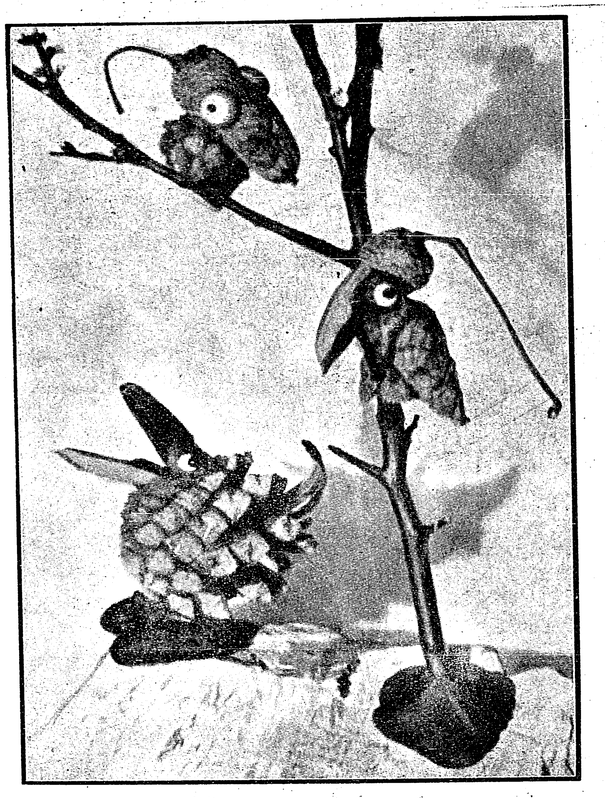

—কি হ'লো?

একটি লোকের খেয়াল বা সখ্ হচ্ছে, ঐ সব খড়-কুটো ইত্যাদি দিয়ে অদ্ভুত এবং মজার সব মূর্ত্তি বানিয়ে নানা রকমে সেগুলিকে সাজান। মূর্ত্তিগুলি যে বাস্তবিকই মজার হয়, তা' এই ছবিগুলি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

প্রথম ছবিটিতে হচ্ছে, "ধনঞ্জয়ের মেলা"! গাছের উপর দুই বিজ্ঞ ধনঞ্জয় টুপি মাথায়

ব'সে আছেন; আরেকজন নীচে ব'সে প্রাণ খুলে চেঁচাচ্ছেন। গাছের উপরের দুই বিজ্ঞ 'ব্যক্তি' যেন নীচের ধনঞ্জয়কে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখ্‌ছেন।

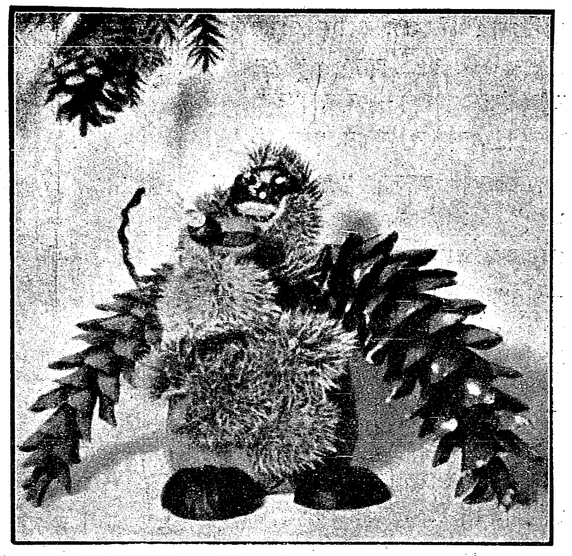

তারপর দেখ, "গরিলা-মায়ের কোলে গরিলার বাচ্চা"। দু'হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে বাচ্চা ঝুলে

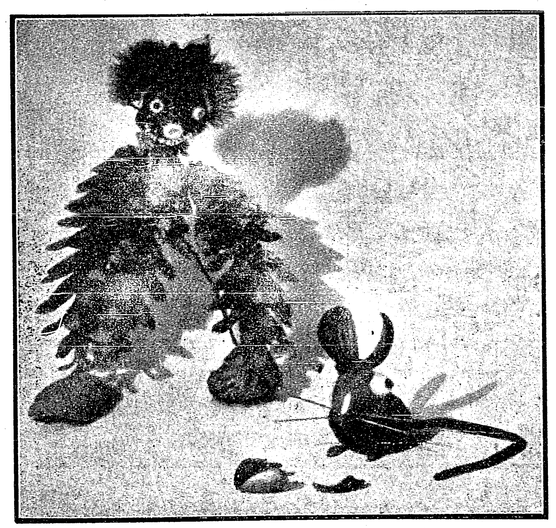

আছে; আবার মুখটি পাশ্ ফিরিয়ে এদিকে দেখ্‌ছে। গরিলার মুখখানা তো একবার দেখ!

এবার দেখ, "চোর পড়েছে ধরা"। ইদুর বেচারা দিব্য ব'সে কি যেন ফল খাচ্ছিল; হঠাৎ ঐ কালোপানা লোকটা এসে সব মাটি ক'রে দিল। নিশ্চয় কিছু চুরি ক'রে

খাচ্ছিল ; নইলে ইঁদুরের ও রকম কাঁচুমাঁচু ভাব কেনই বা হবে, আর ঐ কালোপানা লোকটিই বা অমন ক'রে তাকা'বে কেন !—যেন, "হ্যাঁ বাবা! এবার যাবে কোথায় ?"



শেষটি হচ্ছে, "দাও না মা !" ঠোঁটে ক'রে পাখী কি যেন লম্বাপানা জিনিষ এনেছে, —নিশ্চয় খাবার জিনিষ। ছানা পাখী প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে আর মুখ হাঁ ক'রে জানাচ্ছে, ঐ লম্বাপানা জিনিষটি সে খেতে চায় ;—যদিও অত বড় জিনিষের জায়গা তা'র পেটে হবে কিনা সন্দেহ। পাখীও যেন অবাক হয়ে ভাব্‌ছে, "সখ তো কম নয়! এটা খেলেই হয়েছে!" —অথচ আবার ভাব্‌ছে, "কিছু তো খেতে দিতেই হবে ; এখন করা যায় কি ?"

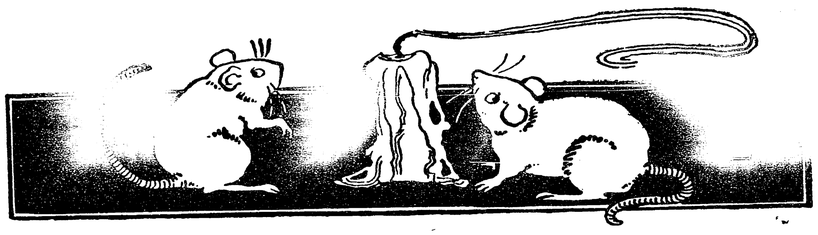

হাফ-টিকিট

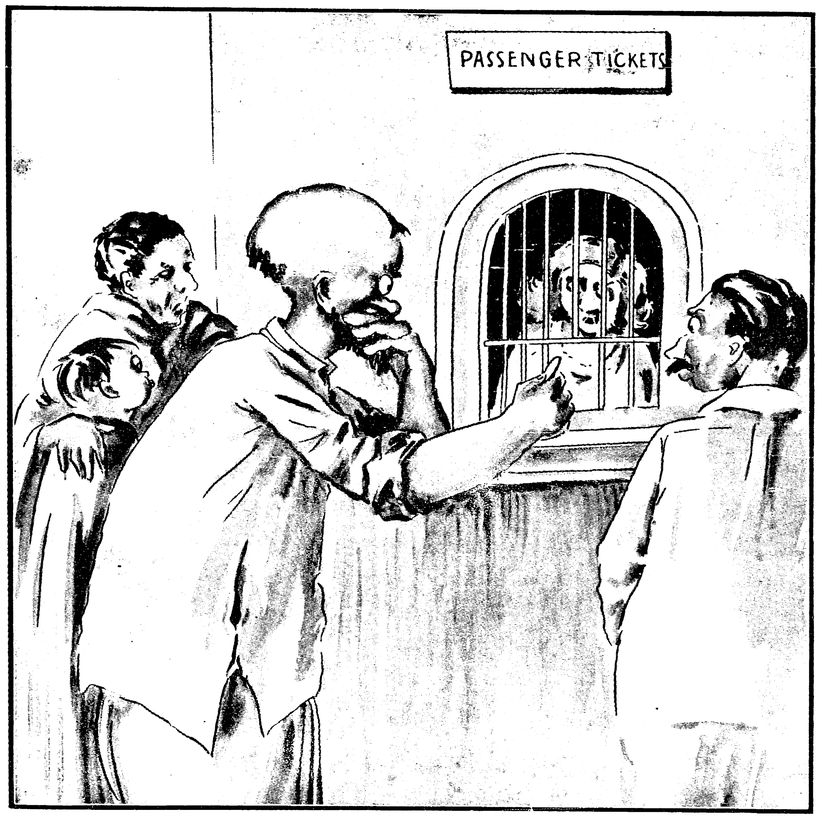

ফুরিয়ে গেছে গাঁটের কড়ি কল্‌কাতাতে এসে,
ভাব্‌ছি খালি কেমন ক'রে ফিরব এবার দেশে !—
মাথায় তো নাই চুলের বালাই, গোঁফটি যদি ঢাকি,
'হাফ-টিকিটে'র পয়সা দিয়ে মেমকে দেব ফাঁকি।
কচি আমার মুখটি দেখে ছেলেমানুষ ভেবে,
সন্দেহ না ক'রে কিছু 'হাফ-টিকিটই' দেবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় দলের ফুটবল খেলা

ভারতীয় ফুটবল পরিষদ বা Indian Football Association-এর নাম তোমরা অনেকেই জান। আমাদের দেশে ফুটবল খেলা যাহাতে ঠিক ভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য ভারতবর্ষের দেশী ও বিদেশী খেলোয়াড়দের লইয়া কলিকাতায় এই পরিষদটি গঠিত। সংক্ষেপে আই-এফ-এ (I. F. A.) নামেই এটি সকলের কাছে সুপরিচিত।

আই-এফ-এ পরিষদে স্থির করা হয় যে এই বৎসর আমাদের দেশ হইতে এক দল ফুটবল খেলোয়াড়কে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলিবার জন্য পাঠান হইবে। তাঁহারা সেখানে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলিত দলের সহিত টেষ্ট ম্যাচ (Test Match) খেলিয়া ফুটবল খেলায় তাহাদের শক্তি পরীক্ষা করিবেন। কেবল



ডারবান সহরে ডেপুটি মেয়র কর্ত্তৃক ভারতীয় দলের অভ্যর্থনা

যে শক্তিপরীক্ষা হইবে তাহাই নয়। টেষ্ট ম্যাচ ও অন্যান্য খেলার ভিতর দিয়া এই অবসরে এই দুই দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে, এমন কি দুই দেশের জন-সাধারণের মধ্যেও আলাপ পরিচয় ও সখ্যতা ঘটিবার যথেষ্ট সুযোগ হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আই-এফ-এ পরিষদের অন্যতর কর্ম্মসচিব ও এরিয়ান ক্লাবের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত পী কে মুখার্জ্জি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এ দেশের এক

দল ফুটবল খেলোয়াড়কে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠান হয়। এ দলে যে সব খেলোয়াড়গণ গিয়াছিলেন তাঁদের ছবি ও নাম নীচে দেওয়া গেল। মোহন-বাগান ক্লাবের শ্রীযুক্ত এস দত্ত এই সভার দলপতি বা ক্যাপ্টেন হন।



পিছনে দাঁড়াইয়া (বাঁ দিক হইতে)—নাসিম (স্পোর্টিং ইউনিয়ান) ; মহম্মদ হোসেম, (দিল্লী) ; এ, হামিদ, (মহম্মেডান স্পোর্টিং) ; পি, ব্যানার্জ্জি (হাওড়া ইউনিয়ান) ; মির হোসেম (মহম্মেডান স্পোর্টিং) ; লক্ষ্মীনারায়ণ (বাঙ্গালোর) ; রমন (বাঙ্গালোর) ; এ, গাঙ্গুলী (এরিয়ান)।

চেয়ারে বসিয়া—কে, ভট্টাচার্য্য, (মোহনবাগান) ; এস, দত্ত—ক্যাপ্টেন (মোহনবাগান) ; পি, কে, মুখার্জ্জি, (ম্যানেজার) ; এস, চৌধুরী, ভাইস-ক্যাপ্টেন (মোহনবাগান) ; এস, মজুমদার, (এরিয়ান)।

সামনে বসিয়া—এন, গুহ, (স্পোর্টিং ইউঃ) ; এস, চক্রবর্ত্তী, (এরিয়ান) ; এন, ঘোষ, (ভবানীপুর)।

সমুদ্রপথে কুড়ি দিন কাটাইয়া প্রথমেই তাঁহারা ডারবান (Durban) সহরে পৌছান। সেখানে পৌঁছিলে সেখানকার সহস্রাধিক ভারতীয়, দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড় সম্প্রদায়ের বহুলোক ও ভারত গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। পরে, ৮ই জুন সন্ধ্যায় ডারবান সহরের ডেপুটি মেয়র ভারতীয় দলকে প্রকাশ্য ভাবে রীতি মত অভিনন্দন দেন। তারপরই ম্যাচ খেলার ধুম পড়িয়া যায়। ৯ই জুন হইতে ২২শে জুলাই পর্য্যন্ত এই দেড় মাস সময়ের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ৮।১০টি সহরে ঘুরিয়া ভারতীয় দল সবশুদ্ধ ১৬টি ম্যাচ খেলিয়াছেন। তাহার মধ্যে পনেরটি ম্যাচের প্রত্যেক-টিতেই ভারতীয় দল জয়লাভ করিয়া-ছেন; কেবল মাত্র পিটারমারিস-বার্গের একটি খেলায় তাঁহাদের হার হয়। এই খেলাটিতে তাঁহাদের হারি-বার বিশেষ কতকগুলি কারণ ঘটে। আগের দিন ম্যাচ খেলার পর, খুব বেশী রাত্রি জাগিয়া তাঁহাদিগকে কয়েকটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হয়। তার পরেই, সকাল বেলা ৬২ মাইল পাহাড়ে পথ মোটরগাড়ীতে গিয়া, বিনা বিশ্রামে ম্যাচ খেলিতে হয়। ইহার উপর আবার মাঠের মধ্যের কাচে লাগিয়া কাপ্তেন এস দত্তের পা বিষম কাটিয়া যায়। এই সকল না ঘটিলে ভারতীয় দল এই খেলাটিতেও বোধহয় হারিতেন না, কারণ এই দলকেই তাঁহারা আগের ম্যাচে ৬—০ গোলে হারাইয়াছেন।



রোজমিড সহরে "কেপ পেনিন্সুলা" দলের সহিত খেলা—বামে কাপ্টেন এস দত্ত।

ম্যাচ খেলিবার জন্য ভারতীয় দলকে এই সময়টুকুর মধ্যে প্রায় দুই হাজার মাইল পথ রেল, ষ্টীমার ও মোটরে ছুটাছুটি করিয়া ৮।১০টি সহরে ঘুরিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, প্রতি সহরেই অভ্যর্থনা গ্রহণ ও ভোজনসভার নিমন্ত্রণ রক্ষা প্রভৃতিতেও তাঁহাদিগকে কম শ্রান্ত হইতে হয় নাই।

তিনটি টেষ্ট ম্যাচের প্রত্যেকটিতেই ভারতীয় দল জয়ী হইয়াছেন। প্রথম

দুইটির প্রত্যেকটি ২—০ গোলে ও শেষেরটি ২—১ গোলে জিত হয়। টেষ্টম্যাচ ছাড়া অন্য খেলার মধ্যে,—ট্রান্সভাল দল ৭—১ ও ৬—১ গোলে দু'বার পরাজিত হয়; উত্তর নেটাল ৮—১ গোলে ও নেটাল ৬—০ গোলে হারে; পূর্ব্ব প্রান্তের প্রদেশগুলিকে ৬—১ গোলে ও পশ্চিম প্রান্তীয় প্রদেশগুলিকে ৩—১ গোলে হারান হয়; ঈষ্ট লণ্ডনের বর্ডার টীম হারে ৯—০ গোলে। মোটের উপর দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৬টি খেলায় ভারতীয় দল মোট ৭৪টি 'গোল' করেন ও বিপক্ষ দল করেন মাত্র ১৩টি।



কেপ টাউন সহরের একটি আলোক-স্তম্ভ

দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা ছাড়া ভারতীয় দল মোম্বাসা (Mombasa)-তে ইউরোপীয় দলকে ৫—০গোলে ও বেইরা (Beira)-তে পোর্টুগীজদলকে ২—০ গোলে পরাজিত করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি যেরূপ ভীষণ বিদ্বেষ ভাব আছে তাহাতে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে ভারতীয় খেলোয়াড় দল সেখানে বোধহয় আদর আপ্যায়ন পাইবেন না। কিন্তু তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকার যে সহরেই যখন গিয়াছেন সেই খানেই রীতিমত সমাদর ও অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন।

এইরূপে খেলার বিজয় গৌরব ও আদর আপ্যায়নের আনন্দ লইয়া ভারতীয় দল ২২শে জুলাই তারিখের পর দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করেন ও ১৩ই আগষ্ট কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছান। হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহাদের সাদর সংবর্দ্ধনা করা হয়।

প্রিয় গ্রাহকগ্রাহিকাগণ,

এই ভাদ্র সংখ্যায় তোমাদের সন্দেশের আর এক বছর শেষ হ'ল। অসুস্থতা প্রভৃতির জন্য শেষ দিকের কয়েক সংখ্যা সন্দেশ দেরীতে বেরিয়েছিল। এমাসে অনেকটা এগিয়ে এনে ১২ই তারিখে বের করা হ'ল। আস্‌ছে আশ্বিন সংখ্যা থেকে আবার মাসের প্রথমেই রীতিমত বের হবে।

আশ্বিনের শারদীয় সংখ্যাটিকে একটু বিশেষ ভাল ক'রে বের কর্‌বার আয়োজন কর্‌ছি। দু'খানি রঙিন ছবি থাকবে; তা ছাড়া লেখা, গল্প ও অন্যান্য সব বিষয়েই এটিকে সাধারণ সংখ্যা থেকে বড়, সরস ও সুন্দর করবার চেষ্টা চলেছে। ২রা আশ্বিন তারিখেই তোমাদের পাঠাতে পারব আশা করি। যদি সে সময় কেউ নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা থেকে অন্য কোথাও যাও, তবে নূতন ঠিকানা ২২এ ভাদ্রের মধ্যে আমাদের জানালে সেই নূতন জায়গায় সন্দেশ পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌ব।

সন্দেশে প্রকাশের জন্য তোমাদের কাছ থেকে যে সব লেখা আসে সেগুলি পড়ে খুবই আনন্দ পাই। অনেকের লেখা অবশ্য প্রকাশ করার মত হয় না, কিন্তু তাদেরও হাল ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। সকল লেখকেরই প্রথম লেখা কাঁচা থাকে, লিখতে লিখতে ক্রমে ভাল হয়।

এ বছরে যতগুলি লেখা মনোনীত হয়েছিল, তাদেরও অনেকগুলি স্থানাভাবে বের করা যায় নাই। সেগুলি আস্‌ছে কয়েক মাসে বের করব।

তোমাদের লেখা ছাড়া, তোমাদের চিঠিপত্রও যাতে সন্দেশে প্রকাশ করা হয়, সেজন্য অনেকে লিখেছ। আস্‌ছে সংখ্যা থেকে উপযুক্ত চিঠিপত্রও সন্দেশে বের করা হবে।

গত কয়েক মাস সন্দেশে কোন প্রতিযোগিতা বের হয় নাই ব'লে তোমাদের কেউ কেউ অনুযোগ করেছ। বছরের শেষ দিকে প্রতিযোগিতা বের করা অসুবিধাজনক। আশ্বিন সংখ্যায় আবার কয়েকটি বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বের হবে। তোমরা সকলে তাতে যোগদান কর্‌লে সুখী হব।

তোমাদের
সন্দেশ সম্পাদক

(গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা)

চল্ চল্ চল্

(শ্রীমান প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—গ্রাহক নং ৮৯৭)

চলরে পথিক চল !
ও তোর চলার পথের বাধা মিছে,
চলার পথিক চল্ ;
চল্ চল্ চল্ !

ও পারে ওই তেপান্তরে
জাগল যে সুর ঘরে ঘরে,
সে সুরের মায়ায় আপন হাওয়ায়
চল্ চল্ চল্ !

জগৎ চলে তোমার আগে,
তারারা সব নিশি জাগে,
চন্দ্র ঢালে তোমার তরে আলোক সুনির্ম্মল।
চল্ চল্ চল্ !

যাবার পথে পরিয়ে দিল জয়টিকা,
চোখে কাজল মাখিয়ে দিল অগ্নিশিখা,
মেঘ বাজালো আনন্দেতে মেঘলা দিনে
জয়-মাদল।
চল্‌রে, চল্‌রে, চল !

অন্ধ

(শ্রীমান সুবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—গ্রাহক নং ১২৮৮)

—অকল্পিত—

আজকাল সকলেই হয়ত মনে করেন যে, কবি বা লেখক যা কিছু লেখেন সবই কল্পিত। তার মাঝে যে সত্যির এতটুকু স্থান আছে, তা কেউই স্বীকার করেন না। স্বীকার করা না করা পাঠকের হাতে ; কিন্তু বাদলা দিনের যে কাহিনীটি আজ আমার অক্ষম লেখনী ফুটিয়ে তুলতে চাচ্ছে, তা' সম্পূর্ণ সত্য, আমার জীবনের এক করুণতম দৃশ্য।

* * ক * *

ঝড়-বৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণ, নিবিড় আঁধারে পথ ঢাকা।

অন্ধ ভিক্ষুক হাত পেতে পথ চলেছে ; মুখে বলছে, 'একটা পয়সা দাও বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল ক'রবেন।"—কেউ শুন্‌ছে, কেউ শুন্‌ছে না, সবাই ছুটে চলেছে ঘরমুখো। পুণ্যের লোভ সবারই আছে, কিন্তু দেবার প্রাণ আছে ক'জনের ?

সবার আশ্রয় আছে, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই এই অভাগা ভিক্ষুকের। সুখে দুঃখে, জল ঝড় দুর্দ্দিনে গাছতলাই তার আশ্রয়। এ যেন বিধিলিপি, জীবনের সবটুকুই যেন তার ভাগ্য-বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয় বিধান।

মেঘে মেঘে আকাশ কালো হ'য়ে যেন সমস্ত ধরার বুকে একটা কালোর পোঁচ বুলিয়ে দিয়েছে। এমনি দিনেই রবিবাবু লিখেছিলেন 'বর্ষামঙ্গল',—

'...স্নিগ্ধ সজল মেঘ কজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে ;
শশি-তারা-হীনা অন্ধ তামসী যামিনী ;
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী।...'

বিদ্যুতের আলো কালো আঁধারের বুক চিরে আসুরিক হাসির দীপ্তিতে চমক লাগাচ্ছে। বজ্রের ঘন ঘন হুঙ্কারে বৃত্রবধকালীন দেবাসুরের যুদ্ধের জোর তালিম চলেছে। ঝোড়ো হাওয়া বিদ্যুতের আলো ছোঁবার জন্যে সারা আকাশে তার পিছু পিছু ছুটাছুটি করছে। যেন,—

'...শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা!
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা!...

অন্ধ ভিক্ষুক চলেছে পথ বেয়ে। আশঙ্কায় হয়ত বুক দুরু্ দুরু্ করছে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে।

ক্রোধান্ধ প্রকৃতির সাথে জন্মান্ধ মানবের অদ্ভুত সংগ্রাম!—একজনের নির্ম্মম প্রহার করবার শক্তি, আর একজনের সহনের বল! এ যেন দু'য়ের মারাত্মক পরীক্ষা।

* * খ * *

ঊষাদের বাড়ীতে চায়ের মজ্‌লিশ। 'সাহিত্য-জননীর' শ্রাদ্ধ। আধুনিক কবিরা প্রায় সকলেই তাতে নিমন্ত্রিত। এমন কি স্বর্গগত কবিরাও অন্তরীক্ষ থেকে তাতে যোগ দিয়েছেন।

'...অকস্মাৎ তারি মাঝে
ধ্বনি কার কাণে বাজে...'

—'একটা পয়সা দাও বাবা!'

বিস্ময় লাগল। এই দুর্যোগে, অন্ধকার পথে ভিক্ষুকের ডাক নিতান্তই অশোভন ব'লে মনে হ'ল।

'.. সহসা মোদেরই দ্বারে
ডাক এলো একেবারে...'

—'ভগবান তোমার মঙ্গল কর্‌বেন!'

লোকটা কে, দেখবার সাধ হ'ল। বাইরে বেরিয়ে দেখি,—এক নিরাশ্রয়, বেদনাতুর জন্মান্ধের অচিন্তনীয়, দুর্ভর ক্লেশ।

'...শ্রাবণ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে...'

দয়ার উদ্রেক হ'ল প্রাণে, তাই ঘরে আশ্রয় দিলাম তাকে ডেকে। কিন্তু আশ্রয়ের প্রত্যাশা সে কোনদিন করেনি, আজও না।

মজ্‌লিশ চলেছে আগের মতই; শ্রাদ্ধের মন্ত্রোচ্চারণে সবাই আবার মত্ত হ'য়ে ওঠেছে। এমনি সময় হঠাৎ একবার চম্‌কে উঠে দেখি,—কোন্ এক অজানা মুহূর্ত্তে ঘর ছেড়ে সে চলে গেছে। এ ভীষণ দুর্যোগে তার অবস্থাটা কল্পনা ক'রে শরীর শিউরে উঠল।

'...তখনো শ্রাবণ সন্ধ্যা
নিঃশেষে হয়নি বন্ধ্যা—
থেকে থেকে ঝরিতেছে জল;
পবন উঠিছে জেগে,
বিজলী ঝলিছে বেগে—
মেঘে মেঘে বাজিছে মাদল।...'

ভিক্ষুকের কথা মনে হ'ল। একে নিরাশ্রয়, তায় অন্ধ! ক্রোধান্ধ প্রকৃতির লীলার সময় চক্ষুষ্মান্ মানবেরই পথ চলা দায়। তার ওপর প্রকৃতি ধারণ করেছে আজ সংহার মূর্ত্তি, আর বসুন্ধরার বক্ষে চলেছে প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য। অনাগত ভীতির আশঙ্কায় প্রাণ কেঁপে উঠল। চোখ বুঁজে বেরিয়ে পড়লাম অন্ধের খোঁজে।

'...জনহীন ক্ষুব্ধ পথ
জাগিছে দুস্বপ্নবৎ—
বুকে চাপি' আর্ত্ত অন্ধকার।...'

ক্ষণিক বিদ্যুতালোকে দেখি,—পথেরই ওপর তার দেহ লুটিয়ে পড়েছে। কাছে গিয়ে ডাকলাম, কিন্তু সাড়া পেলাম না তার।—'না বলে চলে গেছ কোন্ অজানার দেশে!'

* * *

আমাদের ডাক সে শুন্‌তে পেয়েছিলো কিনা জানি না। কিন্তু শ্রাবণ দিনে এখনও মাঝে মাঝে জাগে তার স্মৃতি, আর চঞ্চল ক'রে তোলে মনটাকে এক সুগভীর বেদনায়।

গল্প-স্বল্প

কলের ঘোড়া—প্রকৃত 'কলের-ঘোড়া' যদি থেকে থাকে তো ছবিতে যে কলটি দেখ্‌ছ, সেটিই। এর রীতিমত চারটে ঠ্যাং আছে, পিঠে বস্‌বার গদি আছে। সোজা রাস্তায় এবং উঁচু নীচু জায়গায় এই ঘোড়া বেশ অনায়াসে লাফিয়ে লাফিয়ে পা ফেলে চ'লে যেতে পারে। কলের অবিষ্কর্ত্তা বলেন, এর সাহায্যে ছোট ছেলেদের নাকি ঘোড়ায় চড়া বেশ শেখানো যায়।

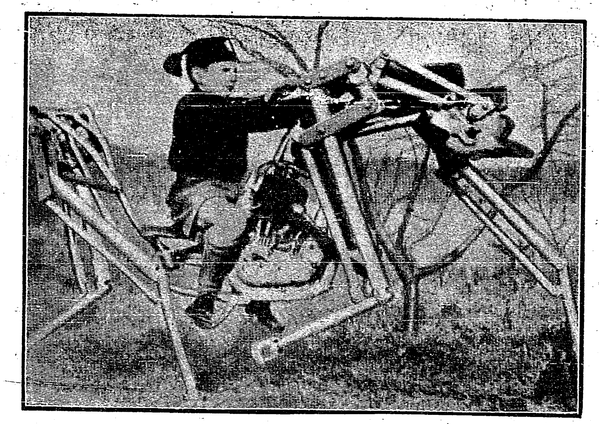

ছোট্ট বই—একটি সাধারণ ছোট থিম্‌ব্‌ল্ (Thimble) নিয়ে তা'র মধ্যে ২৮টি বই ভরা হয়েছে—কাজেই বুঝ্‌তে পারছ বইগুলি কত ছোট। যত প্রকাশিত বই আছে তা'র মধ্যে এই বই নাকি সব চেয়ে ছোট। প্রত্যেকটির আকার $\frac{১}{১৬}$"×$\frac{১}{৮}$"—অর্থাৎ, একটি সাধারণ ডাকটিকিটের অর্দ্ধেকেরও কম। বইতে ২৮ পৃষ্ঠা আছে—ওমার খৈয়ামের কয়েকটি কবিতা। বলা বাহুল্য, এই বইএর লেখা এত ছোট যে লেন্সের সাহায্য ছাড়া পড়া অসম্ভব।



মুখের বাহার—এই ভদ্র লোক নাকি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বিশ্রী মুখ কর্‌তে পারেন—অর্থাৎ, মুখ বিকৃত ক'রে সব চেয়ে খারাপ চেহারা কর্‌তে পারেন। এঁর নাম দেওয়া হয়েছে "রবর-মুখো", কারণ, ইনি রবরের মত মুখটিকে ইচ্ছামত বাঁকাতে পারেন। মুখের চেহারাটা যে বিশ্রী হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এঁর স্বাভাবিক চেহারার একটি ফটো না পাওয়ায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মুখখানা কতটা বিকৃত হয়েছে।



দু'ঘণ্টায় ১১,৫০০ সই!—দু'টি ঘণ্টার মধ্যে এগার হাজার পাঁচ শ' কাগজ সই করা একজন লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় কি? হয় বই কি!—সে রকম ব্যবস্থা

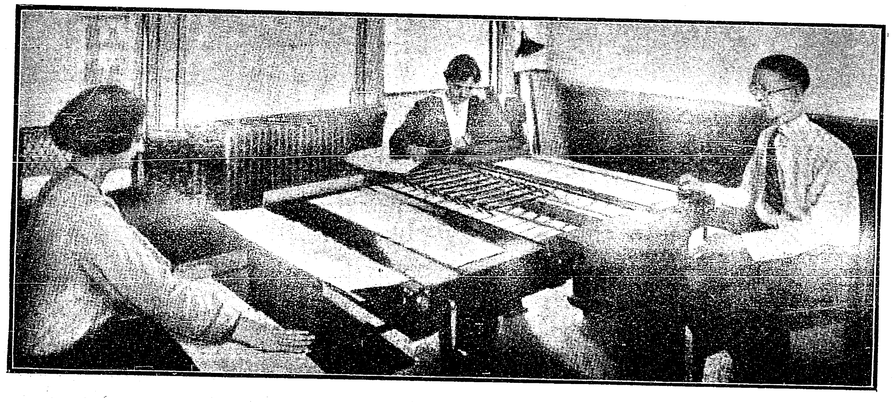

কর্‌তে পার্‌লেই হয়। ছবিতে দেখ, কালো জামা পরা মেম-সাহেব একটা ফাউণ্টেন

পেন দিয়ে সই করছেন আর সঙ্গে সঙ্গে দুই লাইনে আরো কুড়িটা ফাউণ্টেন পেন চল্‌ছে,—এক সঙ্গে একুশটা সই হ'য়ে যাচ্ছে। একজন সাহেব কাগজগুলিকে সরিয়ে দিচ্ছেন আর অন্য একজন মেমসাহেব কাগজ গুছিয়ে নিচ্ছেন। এইভাবে দু' ঘণ্টায় ১১,৫০০ সই হয়েছিল।

লেখা পড়া জানা কুকুর—জাপানের নাগোয়া সহরের একজন লোকের একটি কুকুর আছে, সে নাকি লেখা পড়া শিখেছে—অর্থাৎ, লেখা চিন্‌তে শিখেছে। অনেকগুলি ছোট কার্ডে নানান কথা লিখে, কুকুরকে যে কোন কার্ডের



লেখা বিষয়টি বল্‌লেই সে খুঁজে ঠিক সেই কার্ডটি বের ক'রে দেবে। যা' তা' লিখে, যে কোন লোক কুকুরের বিদ্যার পরীক্ষা কর্‌লে কুকুর কতখানি পার্‌বে তা' অবশ্য বলা শক্ত। ছবিতে দেখ, কুকুরটি একটা কার্ড খুঁজে বের ক'রে আন্‌ছে।

ধাঁধার উত্তর

১। তেলের পিপা—

	ভরা পিপে	½ ভরা পিপে	খালি পিপে
১ম ছেলে পাবে—	৩	১	৩
২য় " "	২	৩	২
৩য় " "	২	৩	২

২। পদপূরণ—এই শব্দগুলি দিয়ে পর পর ফাঁকগুলি পূরাইতে হইবে—কলেজ, থানা, হাঁসপাতাল, টোল, মঠ, সভা।

দুইটি ধাঁধার উত্তর দিয়েছেন—

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়, কলিকাতা; প্রভা, প্রজ্ঞা, পম্পা, প্রীতি, প্রবুদ্ধ, ডোরা, মীরা, বেতিয়া; কেলো, ইরা, শিশির, পশুপতি, পুষ্পলতা, ইন্দুপ্রভা ও পার্ব্বতী, বেতিয়া; কুমারী তৃপ্তি বানার্জ্জি, জামসেদপুর; পরিমল, জামসেদপুর; প্রবীণ, পরমা, পদ্মা, পদ্ম, পনি, পিন, পিকা, প্রকৃতি ও শিশিরেন্দু, বেতিয়া; নিতু, প্রশান্ত, বাণী সেন, বহরমপুর; কুমারী প্রভা দেবী, মাদারীপুর; শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী, গড়জয়পুর; বীরেন্দ্র নারায়ণ, মণি, চন্দ্রা ও পাথরফোড়, গড়জয়পুর (রাজবাটী); গোবিন্দ, মীরা, মিহির, বহরমপুর; নদু, নিমাই, বাবু, বাসু, রমা ও খুকু, বহরমপুর; শ্রীসতীনাথ ভট্টাচার্য্য, নৈহাটি; অরবিন্দ ইন্‌ষ্টিটিউসনের ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ, অকালপৌষ (বর্দ্ধমান); শ্রীঅচিন্ত্যকুমার রক্ষিত, কলিকাতা; শ্রীশরৎচন্দ্র পাল, কলিকাতা।

একটি ধাঁধার উত্তর দিয়েছেন—

শ্রীচুণী দাস গুপ্ত, যশোহর; রামপ্রসাদ সিংহ, বেহালা; বলাই, সুধীর, কল্যাণী, হীরণ, সাতকড়ি বেহালা; শ্রীসুশীলমাধব বসু, (ইণ্টালী) কলিকাতা; অষ্টম মানের ছাত্রবৃন্দ, বেহালা; মঞ্জুশ্রী ও রাঘব, হাজারিবাগ; শ্রীঅনিলবরণ রায়, ঢাকা; শ্রীকনককান্ত দাসগুপ্ত, আগরতলা; শ্রীরণেন্দ্রকুমার মল্লিক, এলাহাবাদ; ভুট্টা, মনি, লক্ষ্মী, মণ্ট, বসন্ত, হরেন্দ্রনাথ, চাঁপাই, নবাবগঞ্জ; অশেষ, অহীশ, অর্চ্চনা মৈত্র, পাটনা; শ্রীনন্দদুলাল সরকার, রঘুনাথপুর; ভোলানাথ মুখার্জ্জি, পুরুলিয়া; জয়নুদ্দীন, আবুলহোসেন, পুরুলিয়া; শ্রীপ্রভাতকুমার গাঙ্গুলী, বারাকপুর; রসিক, সত্যাশ্রয়, গিরিজা, সোমনাথ, গোপাল, ফটিক, পুরুলিয়া; লীলু, মিণ্ট, কলিকাতা; সমর, কালি, সুবিনয়, সুধাময়, বাদল, ও অমল, পুরুলিয়া, (সরকার পাড়া); রাণু, মিনু, হাবুল, কলিকাতা; শ্রীআশামুকুল পাল, কাঁথি; শ্রীমতী বিল্ববালা দেবী, কলিকাতা।

নূতন ধাঁধা

১। **পদ পূরণ**—শেষ পদের ফাঁকগুলি দুই দুই অক্ষরের এমন শব্দ দিয়া পূরাইতে হইবে যে শব্দগুলি সবই পরস্পরের সঙ্গে পদ্যে মিল হয়।

মায়ের মাকে ঢাকা জেলার লোকে বলে —
ফৌজদারির বিচারপতির নাম ছিল —
কৌশলের তামাসাকে বলে থাকে —
আমাদের ভাষায় শাক, হিন্দী ভাষায় —
নৌকা যারা চালায় তাদের নাম হয় —
করতে কিছু করলে স্বীকার, কাজে হ'ল—
ফুল তুল্‌তে লাগে যাহা নাম তার —
অতি দুষ্ট মেজাজ টেরা, তাকে বলে —

—(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

২। কাগজ থেকে পেনসিল না তুলে একটানা এই ছবিটি আঁকতে হবে। পেনসিল যতবার পর পর মোড় বেঁকবে, তত-বারই এক একটি আলাদা লাইন হ'ল বলে ধরা হবে। এইরূপ কত কম সংখ্যক লাইন দিয়ে তোমরা ছবিটি আঁকতে পার? দরকার হ'লে একই জায়গা দিয়ে একবারের বেশীও লাইন যেতে পারবে, কিন্তু ছবির কোন অংশ বাদ রাখলে চলবে না।

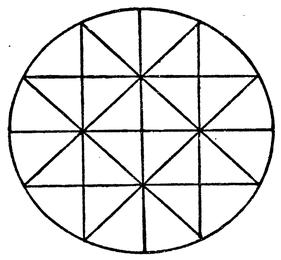

কি রকম করে লাইনগুলি পর পর টান্‌বে অন্য কাগজে এঁকে পাঠাতে পার।

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ উপহারের বই

রত্নদ্বীপ (সচিত্র)

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত

প্রাইজের জন্য ডিরেক্টর কর্ত্তৃক অনুমোদিত

২য় সংস্করণ—মূল্য ॥৵০ আনা

গৃহে, জঙ্গলে, সাগরে, দস্যু তস্করের মধ্যে বালকের অসীম সাহসিকতা ও কর্ম্মতৎপরতার কাহিনী পড়িয়া ছেলেদের মন সাহসে ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিবে। R. L. Stevenson এর Treasure Island-এর গল্প—অতি চিত্তাকর্ষক। ভাল কাগজে ঝকঝকে ছাপায় ও সুন্দর সুন্দর ছবিতে বইখানি সুশোভিত।

সচিত্র

সাঁওতালী উপকথা

শ্রীমতী নির্ম্মলা রায় প্রণীত

কত যে সুন্দর তাহা না পড়িলে বোঝান যায় না। সরল সিধা সাঁওতালদের উপকথাগুলি অতি মনোরম। তাহার উপর গল্পের ভাষা ও পদ্ধতি এমন চমৎকার যে, পড়িলে মন আনন্দে ও শান্তভাবে ভরিয়া উঠে। বহু সুন্দর সুন্দর ছবিতে, উৎকৃষ্ট কাগজে ও ঝকঝকে ছাপায় বইখানি ছেলেমেয়েদের উপহারের পক্ষে অতুলনীয়। মূল্য ॥০ আট আনা।

সচিত্র

২য় সংস্করণ **ছেলেদের কাদম্বরী** মূল্য ।৵০

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত

বাণভট্টের সুবিখ্যাত পুস্তক হইতে ছেলেদের অনুপযোগী স্থানগুলি বাদ দিয়া, অতি সুন্দর সরল ভাষায়, ছেলেদের মত করিয়া লেখা। সমস্ত গল্পটি একখানি ছবির মতই সুন্দর। পরিষ্কার ছাপা ও চমৎকার চমৎকার ছবিতে বইখানি অতি মনোরম।

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম এস-সি
২৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউ, রায় এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Regd. No. C 700.

দি সান্ অপ্‌টিকাল কোম্পানি

নিখুঁত চোখ পরীক্ষা
এবং চশমা ফিটিংএর
— জন্য অদ্বিতীয় —

২৪।১ কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—বড়বাজার ২১৩৫

নূতন সংস্করণ!

নূতন সংস্করণ!

সচিত্র

মহাভারতেরগল্প

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত

৩য় সংস্করণ। দাম—১।০

মহাভারতের ৬৬টি বাছাই সুন্দর সুন্দর গল্প, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অতুলনীয় সরস ভাষায় লেখা। তাঁহার নিজের আঁকা একখানি ৩-রঙের ছবি ও অনেক গুলি এক-রঙের ছবিতে বইখানি আরো মনোরম হয়েছে। ছেলেমেয়েদের অতি সুন্দর বই। ঝকঝকে পরিষ্কার ছাপা। চমৎকার বোর্ড বাঁধাই।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,
১১৭।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা